ড. আবদুর রহমান রাফাত পাশা
সাহাবায়ে
কেরামের
ঈমানদীপ্ত
জীবন
রাযিয়াল্লাহু আনহুম
মাওলানা মাসউদুর রহমান অনূদিত

সাহাবায়ে কেরামের ঈমানদীপ্ত জীবন

(রাযিয়াল্লাহু আনহুম)

(৫৪জন সাহাবীর জীবনী)

১

ড. আবদুর রহমান রাফাত পাশা

মাওলানা মাসউদুর রহমান
অনূদিত

প্রকাশনায়

রাহনুমা প্রকাশনী™

অর্পণ–

আমার উস্তায হযরত মাওলানা মাহমুদুল আলম সাহেবকে।

যিনি বারো বছরের এক অবুঝ বালকের বুকে 'বড়' হওয়ার স্বপ্ন এঁকে দিয়েছিলেন।

আমার দুর্ভাগ্য, বুড়ো হয়ে গেলাম কিন্তু 'বড়' হতে পারলাম না।

–অনুবাদক

অনুবাদকের কিছু কথা

সকল প্রশংসা রাব্বুল আলামীন আল্লাহর জন্য, যিনি আমাকে প্রিয় নবীর প্রিয় সাহাবীদের *সাহাবায়ে কেরামের ঈমানদীপ্ত জীবন* নামের এই বরকতময় বইটির প্রথম খণ্ডের কাজ শেষ করার তাওফীক দান করেছেন।

দরূদ ও সালাম বিশ্বনবী শ্রেষ্ঠনবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর অগণিত সাহাবী, আহলে বাইত এবং তাঁর সকল অনুগত অনুসারীর প্রতি।

বইটি আরবী ভাষা-সাহিত্যের প্রবাদ পুরুষ, লেখক, গবেষক ড. আবদুর রহমান রাফাত পাশা রহ. এর কালজয়ী রচনা *সুওয়ারুম মিন হায়াতিস সাহাবা*'র অনুবাদ, লেখকের আরও দুটো অনূদিত বই *তাবেঈদের ঈমানদীপ্ত জীবন* এবং *নারী সাহাবীদের ঈমানদীপ্ত জীবন*'র সঙ্গে মিলিয়ে এর নাম দেওয়া হলো *সাহাবায়ে কেরামের ঈমানদীপ্ত জীবন*। বইটি সাহাবীদের জীবনীভিত্তিক হওয়ার কারণে সাহাবী সংক্রান্ত মৌলিক কিছু কথা যেমন : সাহাবী পরিচিতি, তাঁদের মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য, তাঁদের সম্পর্কে আকীদা-বিশ্বাস ইত্যাদি বিষয়গুলো সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো :

সাহাবীর সংজ্ঞা

এ বিষয়ে ইমাম বুখারী, সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব, আবদুল কুদ্দুস ইবনে মালেক আল-আত্তার, আলী ইবনুল মাদীনী-সহ আরও অনেকের অনেক বক্তব্য রয়েছে। আমরা সেদিকে না গিয়ে শুধুমাত্র হাফেয ইবনে হাজারের সংজ্ঞাটি এখানে তুলে ধরছি। সাধারণ পাঠকের জন্য সেটাই সহজ, বিশুদ্ধ ও ব্যাপক। তিনি বলেন-

اَلصَّحَابِيُّ مَنْ لَقِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُؤْمِنًابِهِ وَمَاتَ عَلَى الْاِسْلَامِ

'যে ব্যক্তি প্রিয় নবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন তাঁকে রাসূল মেনে এবং মুসলিম হিসাবে মৃত্যুবরণ করেছেন তিনিই সাহাবী।'

'নবীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন তাঁকে রাসূল মেনে' এবং 'মুসলিম হিসাবে মৃত্যু'র শর্তের কারণে প্রিয় নবীর 'সাহাবী' হিসাবে বিবেচিত হবেন-

এক- যাঁরা দীর্ঘকাল তাঁর সঙ্গে ওঠা-বসা করেছেন।

দুই- যাঁরা অল্প কিছুদিন তাঁর সাহচর্য পেয়েছেন।

তিন- যাঁরা মোটেও সাহচর্য পাননি, (কিন্তু উপরোক্ত শর্তে তাঁর সাক্ষাৎ লাভ করেছেন)

চার- যাঁরা তাঁর হাদীস বর্ণনা করেছেন বা করেননি।

পাঁচ- যাঁরা তাঁর সঙ্গে জিহাদে শরীক হয়েছেন বা হননি।

ছয় - যাঁরা উপরোক্ত শর্তে একবারমাত্র তাঁকে দেখেছেন।

সাত- দৃষ্টিশক্তিহীনতার কারণে যিনি তাঁকে চোখের দেখা দেখতে পাননি। তাঁরা সকলেই সাহাবী।

পক্ষান্তরে কাফের অবস্থায় তাঁর সাক্ষাৎপ্রাপ্ত ব্যক্তি সাহাবী নয়। এমনকি পরিবর্তীতে ঈমান এনেও তিনি সাহাবী হতে পারবেন না যদি পুনরায় তাঁর সাক্ষাৎ না পান। কারণ 'সাহাবী' হতে হলে মুমিন হিসাবে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ জরুরি। নবীজীর সঙ্গে ঐ ব্যক্তির ঈমান গ্রহণের পর আর সাক্ষাৎ হয়নি। একইভাবে 'সাহাবী' বিবেচিত হবেন না আহলে কিতাবের সেই মুমিন ব্যক্তিও যিনি নবুওয়াতপ্রাপ্তির পূর্বে প্রিয় নবীর সাক্ষাৎ পেয়েছেন। কারণ 'প্রিয় নবীকে রাসূল মেনে তাঁর সাক্ষাৎ...' এর শর্ত এই ব্যক্তির মধ্যে পাওয়া যায়নি।

যে ব্যক্তি নবীজিকে রাসূল মেনে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছে কিন্তু পরে মুরতাদ হয়ে মৃত্যুবরণ করেছে (নাউযুবিল্লাহ), সেও 'সাহাবী' নয়—মুসলিম হিসাবে মৃত্যুর শর্তের কারণে। যেই ব্যক্তি মুরতাদ হয়ে যাওয়ার

পর মৃত্যুর পূর্বেই আবার ইসলামে ফিরে এসেছেন। তিনি বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য মতে প্রিয় নবীর সঙ্গে পুনরায় সাক্ষাৎ না হলেও সাহাবী হিসাবে পরিগণিত।[১]

সাহাবায়ে কেরামের অনন্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মর্যাদা

কয়েকটি আয়াত, তরজমা ও ব্যাখ্যা তুলে ধরা হচ্ছে যা সাহাবীদের মর্যাদার প্রমাণ বহন করে।

আয়াত-১

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ

'তোমরা সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত, যাদেরকে মানুষের (কল্যাণ ও সংশোধনের) জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে।' সূরা আ-লি ইমরান : ১১০

আয়াত-২

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَّسَطًا لِتَكُوْنُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ

'আমি তোমাদের বানিয়েছি এমন একটি দল যারা (সকল দিক বিবেচনায়) অত্যন্ত ভারসাম্যপূর্ণ নীতি, আর্দশ ও কর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত, যেন তোমরা বিরোধী লোকদের বিরুদ্ধে সাক্ষী হতে পারো।' –সূরা বাকারা : ১৪৩

উভয় আয়াতের আসল সম্বোধন সাহাবায়ে কেরাম। তাঁরাই এর প্রথম মেছদাক (লক্ষ্যস্থল)। নিজ নিজ আমল অনুসারে উম্মতের অন্য সকলেও তাতে অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু আয়াত দুটোর প্রকৃত লক্ষ্য সাহাবায়ে কেরাম, এটা সকল মুফাসসির ও মুহাদ্দিসের ঐক্যমতে প্রমাণিত। আয়াত দুটোতে স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে সকল মানুষের মাঝে সাহাবায়ে কেরামই সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বোত্তম, ন্যায়নিষ্ঠ ও নির্ভরযোগ্য।[২]

---

১. *আল-ইসাবা*, ১/৭-৯

২. ابن عبد البر في مقدمة الاستيعاب

আল্লামা সাফারীনী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আম্বিয়ায়ে কেরামের পরে সাহাবায়ে কেরামই সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ, এটাই জমহুর (সকল) উম্মতের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত।[১]

ইবরাহীম ইবনে সাঈদ জওহারী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আমি হযরত আবু উমামা রহমাতুল্লাহি আলাইহিকে জিজ্ঞাসা করলাম, সাহাবী হযরত মুআবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং তাবেঈ উমর ইবনে আবদুল আযীয রহমাতুল্লাহি আলাইহির মধ্যে কে উত্তম। তিনি জবাব দিলেন–

لَا نَعْدِلُ بَاَصْحَابِ محمد صلى الله عليه وسلم اَحَدًا (الروضةالندية لابن تيمية ٤,٥)

'আমরা মনে করি না যে, কোনো মানুষের পক্ষে সাহাবীদের সমকক্ষ হওয়া সম্ভব, উত্তম হওয়া তো দূরের কথা।'

আয়াত-৩

مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ

'মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল এবং তাঁর সহচরগণ কাফেরদের প্রতি কঠোর, নিজেদের মধ্যে পরস্পর সহানুভূতিশীল। আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় আপনি তাদেরকে রুকু ও সেজদারত দেখবেন। তাদের মুখমণ্ডলে রয়েছে সেজদার চিহ্ন।' –সূরা আল-ফাতহ : ২৯

সাধারণ মুফাসসিরীন-সহ ইমাম কুরতুবী বলেন, 'তাঁর সহচরগণ' এর মধ্যে সাহাবায়ে কেরামের গোটা জামাতই অন্তর্ভুক্ত। এতে সকল সাহাবীর ন্যায়নিষ্ঠতা, তাঁদের হৃদয় ও মনের পবিত্রতা-পরিচ্ছন্নতা এবং তাঁদের সম্পর্কে ব্যাপক প্রশংসার বাণী ঘোষিত হয়েছে খোদ জগৎস্রষ্টা মহান রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে।

---

১. شرح عقيدة الدرة المضية

আবু উরওয়াহ যুবাইরী বলেন, একদিন আমি ইমাম মালেক রহমাতুল্লাহি আলাইহির মজলিসে উপস্থিত ছিলাম, সেখানে লোকজন এক ব্যক্তি সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন, লোকটি সাহাবায়ে কেরামের সমালোচনা করে এবং তাঁদেরকে মন্দ বলে থাকে। একথা শুনে ইমাম মালেক রহমাতুল্লাহি আলাইহি উক্ত আয়াতের অংশ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارُ (অর্থ : যাতে আল্লাহ তাদের দ্বারা কাফেরদের অন্তর্জ্বালা সৃষ্টি করেন) তেলাওয়াত করে বললেন, যেই ব্যক্তির অন্তরে প্রিয় নবীর কোনো সাহাবীর ব্যাপারে বিদ্বেষ থাকবে, সে এই আয়াতের শাস্তি পাবে। অর্থাৎ তার ঈমান বিপদজনক অবস্থায় পড়ে যাবে। কেননা আয়াতের মধ্যে কোনো সাহাবীর প্রতি বিদ্বেষ পোষণকে কাফেরদের আলামত আখ্যায়িত করা হয়েছে।

<u>আয়াত-৪</u>

وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ

'আর যারা সর্বপ্রথম হিজরতকারী ও আনসারদের মাঝে পুরাতন এবং যারা তাদের অনুসরণ করেছে, আল্লাহ ঐ সকল ব্যক্তির প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে আর তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন জান্নাত যার তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত ঝরনাসমূহ।' –সূরা তাওবা : ১০০

এখানে সাহাবায়ে কেরামের দুটো স্তরের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, এক. অগ্রগামী প্রথম ও পুরাতন (সাবেকীনে আওয়ালীন) দুই. পরবর্তীতে ঈমান গ্রহণকারী। উভয়স্তরের সাহাবীদের সম্পর্কে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে–

'তাদের প্রতি আল্লাহ তাআলা সন্তুষ্ট এবং তারাও আল্লাহ তাআলার প্রতি পরিপূর্ণরূপে তুষ্ট। তাদের জন্য অনন্তকালের জান্নাত নির্ধারিত' সকল সাহাবীই এই হুকুমের অন্তর্ভুক্ত। মুহাজিরীন ও আনসার সাহাবীদের চেয়ে সাবেকীনে আওয়ালীন (অগ্রগামী প্রথম পুরাতন) আর কারা?

'সাবেকীনে আওয়ালীনে'র ব্যাখ্যা : প্রথম ব্যাখ্যা–হযরত আবু মূসা আশআরী, সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব, ইবনে সীরীন ও হাসান বসরী প্রমূখের। তাঁদের বক্তব্যের সারকথা এই যে, বাইতুল মুকাদ্দাস থেকে বাইতুল্লাহর দিকে কেবলা পরিবর্তনের ঘটনা ঘটেছিল হিজরতের দ্বিতীয় বর্ষে। এই ঘটনার পূর্বেই যারা ইসলাম গ্রহণ করে সাহাবী হওয়ার অনন্য গৌরব লাভ করেছিলেন তাঁরাই সাবেকীনে আওয়ালীন (অগ্রগামী প্রথম ও পুরাতন)। দ্বিতীয় ব্যাখ্যা– ইমাম শাবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি থেকে বর্ণিত, হিজরতের ৬ষ্ঠ বর্ষে সঙ্ঘটিত 'বাইয়াতে রিদওয়ানে' যাঁরা শরীক হয়েছিলেন, তাঁরাই 'সাবেকীনে আওয়ালীন' (অগ্রগামী প্রথম ও পুরাতন) হিসাবে গণ্য।

'সাবেকীনে আওয়ালীনে'র যে ব্যাখ্যাই গ্রহণ করা হোক অর্থাৎ, উভয় কেবলার দিকে নামায আদায়কারী সাহাবী হোন অথবা বাইয়াতে রিদওয়ানে অংশগ্রহণকারী হোন, তাঁদের পরেও 'সাহাবী'র গৌরব অর্জনকারীদের সকলকেই আল্লাহ তাআলা وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ (এবং যারা তাদের অনুসরণ করেছে) অংশের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে তাদের সকলের জন্যেই নিজের পরিপূর্ণ সন্তুষ্টি এবং জান্নাতের চিরস্থায়ী পুরস্কারের ঘোষণা দিয়েছেন।

আয়াত-৫ ও ৬

قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ

'বলো, সকল প্রশংসাই আল্লাহর এবং শান্তি তাঁর মনোনীত বান্দাগণের প্রতি। অতঃপর আমি কিতাবের অধিকারী করেছি তাদের, যাদেরকে আমি আমার বান্দাদের মধ্য থেকে মনোনীত করেছি, তাদের কেউ নিজের প্রতি অত্যাচারী, কেউ মধ্যপন্থা অবলম্বনকারী এবং তাদের মধ্যে কেউ কেউ

আল্লাহর নির্দেশক্রমে কল্যাণের পথে এগিয়ে গেছে, এটা মহা অনুগ্রহ।' –সূরা আন্-নমল : ৫৯, সুরা ফাতির : ৩২

উক্ত দুই আয়াতেই সাহাবায়ে কেরামকে মনোনীত বান্দা বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। পরে তাঁদেরই একটি শ্রেণি সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'তাদের কেউ নিজের প্রতি অত্যাচারী'। এতে বুঝা যায় সাহাবায়ে কেরামের কারও দ্বারা যদি কখনো কোনো গুনাহ হয়েও থাকে, তবে তা ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে। নইলে তাদেরকে 'মনোনীত বান্দা'র মধ্যে উল্লেখ করা হতো না।

কুরআনের প্রথম অধিকারী সাহাবায়ে কেরাম, কুরআনের সুস্পষ্ট ভাষ্য মতে তাঁরা আল্লাহ তাআলার 'মনোনীত বান্দা'। আর প্রথম আয়াতে সেই মনোনীত বান্দাদের প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে সালাম এসেছে। এভাবে সকল সাহাবীই মহান সৃষ্টিকর্তার এই সালামের মধ্যে শামিল রয়েছেন।

আয়াত-৭

وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ
وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ
فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

'কিন্তু আল্লাহ তোমাদের অন্তরে ঈমানের মুহাব্বত সৃষ্টি করে দিয়েছেন এবং তা হৃদয়গ্রাহী করে দিয়েছেন। পক্ষান্তরে কুফর, পাপাচার ও নাফরমানীর প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করে দিয়েছেন, তারাই সৎপথ অবলম্বনকারী, এটা আল্লাহর কৃপা ও নেয়ামত, আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।' –সূরা হুজুরাত : ৭-৮

এই দুই আয়াতে সকল সাহাবী সম্পর্কে বলা হয়েছে, আল্লাহ তাআলা তাঁদের অন্তরে ঈমানের প্রতি ভালোবাসা এবং কুফর, পাপাচার ও গুনাহের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করে দিয়েছেন।

এখানে যে কয়েকটি আয়াত তুলে ধরা হলো, আশা করি এগুলোই সাহাবীদের মর্যাদা, তাঁদের মাকবুল ও মাগফুর (ক্ষমাপ্রাপ্ত) হওয়া, তাঁদের প্রতি আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং চিরস্থায়ী জান্নাত তাঁদের জন্য অবধারিত হওয়া প্রমাণের জন্য যথেষ্ট।

সাহাবায়ে কেরামের অনন্য মর্যাদা হাদীসে

হাদীস-১

বুখারী, *মুসলিম*সহ অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

خَيْرًا لنَّاسِ قَرْنِىْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْــ فَلَا ادري ذَكَرَ قَرْنَيْنِ اَوْ ثَلَاثَةً. ثُمَّ بَعْدَ هُمْ قَوْمٌ يَشْهَدُوْن وَلَا يُشْتَشْهَدُوْنَ وَيَخُوْنُوْنَ وَلَايُؤْ تَمَنُوْنَ وَيُنْذِرُوْنَ وَلَا يُوْفُوْنَ وَيَظْهَرُ فِيْهِمُ السَّمَنُ

'সর্বশ্রেষ্ঠ যুগ আমার যুগ, মর্যাদার বিচারে এর পরের স্থানে তাদের যুগ যারা আমার যুগের সঙ্গে মিলিত। এরপর তাদের যুগ যারা তাদের (সাহাবীদের) সঙ্গে মিলিত। এরপর তাদের যুগ যারা তাদের (তাবেঈদের) সঙ্গে মিলিত। বর্ণনাকারী বলেন, এখন আমার মনে নেই যে তিনি যুগ দুইটি উল্লেখ করেছিলেন না তিনটি। এরপর এমন এমন লোক আসবে যারা না চাইলেও সাক্ষ্য দিতে তৈরি হয়ে যাবে। খিয়ানত করবে, আমানত রক্ষা করবে না, ওয়াদা ভঙ্গ করবে, অঙ্গীকার রক্ষা করবে না। তাদের মাঝে (আদর্শিক চিন্তা-চেতনা না থাকার দরুন) স্থূলতা প্রকাশ পাবে।'

এই হাদীসে যদি যুগের উল্লেখ দু'বার হয়ে থাকে, তবে দ্বিতীয় যুগ সাহাবীদের এবং তৃতীয় যুগ তাবেঈদের। তিনবার বললে চতুর্থ যুগ তাবে তাবেঈগণের—হাদীসের মধ্যে তাঁরাও শামিল হয়ে যাবেন।

হাদীস-২

لَا تَسُبُّوْا اَصْحَابِىْ فَاِنَّ اَحَدَكُمْ لَوْ اَنْفَقَ مِثْلَ اُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ اَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيْفَهُ

'খবরদার আমার সাহাবীদের মন্দ বলো না। কেননা তোমাদের কেউ যদি ওহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করে তাহলে সেটা সাহবীদের এক মুদ অথবা আধা মুদের সমানও হবে না।' (মুদ এক কেজির কাছাকাছি একটি পরিমাণ)

এই হাদীস সাহাবীদের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এক অনন্য মর্যাদার কথা তুলে ধরেছে। অন্যদের পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণও তাঁদের এক কেজি বরং আধা কেজি পরিমাণ দানের কাছাকাছি মর্যাদা পাবে না। তাহলে সাহাবীদের আমলকে অন্যদের আমলের সঙ্গে কী করে তুলনা করা সম্ভব?

হাদীস-৩ *তিরমিযী শরীফে* হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফ্ফাল রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

اَللهَ اَللهَ فِىْ اَصْحَابِىْ, لَا تَتَّخِذُوْ هُمْ غَرَضًامِنْ بَعْدِىْ. فَمَنْ اَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّىْ اَحَبَّهُم وَمَنْ اَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِىْ اَبْغَضَهُمْ. وَمَنْ اَذَاهُمْ فَقَدْ اَذَانِىْ وَمَنْ اَذَانِىْ فَقَدْ اذى اللهَ وَمَنْ اَذَى اللهَ فَيُوْشِكُ اَنْ يَّأْخُذَهُ

'সাবধান! সাবধান আমার সাহাবীদের ব্যাপারে, আমার পরে তাদের সমালোচনার ক্ষেত্র বানিয়ো না। যে ব্যক্তি তাদের মুহাব্বত করল, সে

প্রকৃত পক্ষে আমাকে মুহাব্বতের কারণেই তাদের মুহাব্বত করল। যে ব্যক্তি তাদের প্রতি বিদ্বেষ রাখল, সে মূলত আমার প্রতি বিদ্বেষের কারণে তাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করল, যে ব্যক্তি তাদের কাউকে কষ্ট দিল সে আমাকেই কষ্ট দিল। যে আমাকে কষ্ট দিল, সে আল্লাহকে কষ্ট দিল। যে ব্যক্তি আল্লাহকে কষ্ট দেবে শিগগিরই আল্লাহ তাআলা তাকে কঠিন শাস্তি দেবেন।'

'যে ব্যক্তি তাদের মুহাব্বত করল, প্রকৃতপক্ষে আমাকে মুহাব্বতের কারণেই সে তাদের মুহাব্বত করল' বাক্যটির দুটো ব্যাখ্যা রয়েছে :

এক- সাহাবীদের প্রতি মুহাব্বত-ভালোবাসা, আমার প্রতি মুহাব্বত-ভালোবাসার আলামত, অর্থাৎ সেই ব্যক্তিই তাঁদের ভালোবাসে যার অন্তরে আমার প্রতি ভালোবাসা আছে।

দুই- যে ব্যক্তি আমার কোনো সাহাবীকে ভালোবাসে, এর অর্থ সেই ব্যক্তির প্রতি আমি মুহাম্মাদের ভালোবাসা রয়েছে। একই ব্যাখ্যা বিদ্বেষের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

যে ব্যাখ্যাই গ্রহণ করা হোক এই হাদীস তাদের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে সতর্ক সঙ্কেত, যারা সাহাবায়ে কেরামকে স্বাধীনভাবে যথেচ্ছ সমালোচনার লক্ষ বানিয়ে থাকেন, তাঁদের ব্যাপারে এমন এমন কথা বলেন বা লেখেন যার কারণে শ্রোতা বা পাঠক তাঁদের ব্যাপারে আস্থা, বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেন। চিন্তা করলে বুঝা যায় যে, সাহাবীদের সমালোচনা করা প্রিয় নবীর নির্দেশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার সমতুল্য।

হাদীস-৪

ইমাম আহমাদ রহমাতুল্লাহি আলাইহি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন-

مَنْ كَانَ مُتَأَسِّيًا فَلْيَتَأَسَّ بِأَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ صَلى اللهِ عليه وسلم فَإِنَّهُمْ اَبَرُّهَذِهِ الاُمَّةِ قُلُوْبًا وَاَعْمَقُهَا عِلْمًا وَ اَقَلُّهَا تَكَلُّفًا وَ اَقْوَمُهَا هَدْيًا وَاَحْسَنُهَا حَالًا. قَوْمٌ اِخْتَارَهُمُ اللهُ بِصُحْبَةِ نَبِيِّه وَاِقَامَةِ دِيْنِهِ- فَاعْرِفُوْا لَهُمْ فَضْلَهُمْ وَاتَّبِعُوْا اٰثَارَهُمْ فَاِنَّهُمْ كَانُوْا عَلٰى الْهُدَى الْمُسْتَقِيْمِ-

'কেউ যদি কারোর আদর্শের অনুসরণ করতে চায়, তবে তার উচিৎ প্রিয় নবীর সাহাবীদের অনুসরণ করা। কারণ গোটা উম্মতের মাঝে তাঁরাই অন্তরের দিক থেকে সবচেয়ে বেশি পবিত্র, জ্ঞান ও ইলমের বিষয়ে গভীরতম। লৌকিকতার বিচারে স্বল্পতম, আদর্শ, চরিত্র ও বৈশিষ্ট্যের দিক লক্ষ করলে তাঁরা দৃঢ়তম, অবস্থার দিক দিয়ে তাঁরা ছিলেন শ্রেষ্ঠতম। তাঁরা ছিলেন এমন এক কওম যাঁরা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে প্রিয় নবীর সাহচর্যের জন্য এবং দীন প্রতিষ্ঠার জন্য মনোনীত। অতএব, তোমরা তাঁদের শ্রেষ্ঠত্বের কথা জেনে রাখো এবং তাদের অনুসরণ করে চলো। কারণ তাঁরাই সরল, সোজা ও সঠিক পথে পরিচালিত।

বর্ণিত আয়াত ও হাদীসের সারমর্ম

উপরে বর্ণিত আয়াত ও হাদীসগুলোতে শুধুমাত্র সাহাবায়ে কেরামের প্রশংসা, তাঁদের জন্য আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং জান্নাতের ঘোষণা দিয়েই শেষ করা হয়নি বরং উম্মতের প্রতি জোরালো হুকুম দেওয়া হয়েছে যেন তাঁদের আদব-সম্মান বজায় রাখে এবং তাঁদের অনুসরণ করে চলে। তাঁদের কাউকেই মন্দ বলার বিরুদ্ধে উচ্চারণ করা হয়েছে কঠোর হুশিয়ারী। তাঁদের প্রতি ভালোবাসাকে আখ্যায়িত করা হয়েছে প্রিয় নবীর প্রতি ভালোবাসা হিসাবে। তাঁদের প্রতি বিদ্বেষকে গণ্য করা হয়েছে নবীজীর প্রতি বিদ্বেষ হিসাবে।

সাহাবায়ে কেরামের বিষয়ে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাত

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের আকীদা : উম্মতের প্রতি ওয়াজিব সাহাবায়ে কেরামের জন্য ভক্তি, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা পোষণ করা, তাঁদের ইজমা (ঐক্যমত)কে শরীয়তের দলীল মনে করা এবং তাঁদের অনুসরণ-অনুকরণ করা। তাঁদের প্রতি অন্তরে বিদ্বেষ রাখা, তাঁদের সকলকে অথবা কোনো একজনকে মন্দ বলা বা সমালোচনা করা ইসলামী শরীয়তে হারাম বলে ঘোষণা করা হয়েছে। উল্লেখিত আয়াত ও হাদীসগুলোতেই রয়েছে এর সুস্পষ্ট প্রমাণ।

সাহাবায়ে কেরাম নিস্পাপ নন

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের আরও একটি আকীদা এই যে, নবীদের মতো সাহাবীগণ মাছুম বা নিস্পাপ নন। কিন্তু তাঁরা মাগফুর অর্থাৎ তাঁরা নিজেদের ভুল-ত্রুটির ওপর অটল থাকেননি, তওবা করেছেন এবং আল্লাহ তাআলা তাঁদের ক্ষমা করে দিয়েছেন।

মুশাজারাতে সাহাবা

সাহাবায়ে কেরামের পারস্পরিক মতপার্থক্য হয়েছে। প্রকাশ্য যুদ্ধ পর্যন্ত ঘটেছে। কিন্তু উলামায়ে উম্মত সাহাবীদের আদব রক্ষার্থে সেই যুদ্ধকে 'যুদ্ধ' বা 'লড়াই' নামে আখ্যায়িত করা উচিত মনে করেননি। তারা একে আখ্যায়িত করেন 'মুশাজারাহ' নামে। যার অর্থ শাখাবহুল গাছ বা বহু ডাল-পালা বিশিষ্ট বৃক্ষ। যার একটি ডাল অন্য ডালের মধ্যে ঢুকে পড়ে, একটির সঙ্গে অন্যটির টক্কর লাগে যা গাছের জন্য দোষণীয় নয়, ক্ষতিকরও নয়।

মুশাজারাতে সাহাবার ব্যাপারে উম্মতের ইজমা হলো, উভয়পক্ষের প্রতিই ভক্তি-শ্রদ্ধা রাখা ওয়াজিব। কোনো পক্ষকেই মন্দ বলা হারাম।

উম্মতের ইজমা রয়েছে এ বিষয়েও যে, 'জামাল' (উটের) যুদ্ধে আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর মত সঠিক। তাঁর প্রতিপক্ষ ছিল ভুলের ওপর।

একইভাবে সিফফীন যুদ্ধেও হযরত আলী ছিলেন হকের ওপর আর প্রতিপক্ষ হযরত মুআবিয়া এবং তাঁর সহযোগীরা ছিলেন ভুলের ওপর। অবশ্য তাঁদের ভ্রান্তিকে আখ্যায়িত করা হয়েছে 'ইজতেহাদী খতা' রূপে, যা শরীয়তের দৃষ্টিতে 'গুনাহ' নয় (সুতরাং শাস্তিরও প্রশ্ন নেই) বরং ইজতেহাদের মূলনীতি হিসাবে পূর্ণচেষ্টার পরও ভুল হয়ে গেলে, ঐ ব্যক্তিও সাওয়াব থেকে মাহরূম হয় না। (সিদ্ধান্ত সঠিক হলে দুটো সাওয়াব, আর ভুল হলে) একটি সাওয়াব সেও পায়।

এভাবে একদিকে মুশাজারাতে সাহাবার ক্ষেত্রে 'সঠিক মত' ও 'ভুল মত' চিহ্নিত করে দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা ও আদব পূর্ণরূপে রক্ষা করা হয়েছে। এ ব্যাপারে নিজের জবান ও ভাষাকে সংযত রাখতে উপদেশ দেওয়া হয়েছে।

আল্লামা কুরতুবী রহ. আহলুস সুন্নাহ এর নীতি-আদর্শের প্রতিনিধিত্ব করে এই মুশাজারায়ে সাহাবা বিষয়ে আলোকপাত করেছেন এভাবে :

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত তালহা ও যুবাইর রাযিয়াল্লাহু আনহুমাকে 'আশারায়ে মুবাশ্‌শারা' এর অন্তর্ভুক্ত বলে জানিয়ে ছিলেন, তাদের ব্যাপারে নবীজীর ভবিষ্যত বাণী ছিল, তাঁরা উভয়েই শহীদ হবেন। বাস্তব ক্ষেত্রে তারা হযরত উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহুর হত্যার বদলা বা 'কেসাসে'র দাবিতে হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর বিপক্ষে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে শহীদ হয়েছিলেন। প্রিয় নবীর হাদীস তাঁদেরকে শহীদ আখ্যায়িত করেছে। পক্ষান্তরে হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসার হযরত আলী কাররামাল্লাহুর পক্ষে জোরালো তৎপরতা চালিয়ে যুদ্ধে অংশ নেন। পূর্ণ শক্তি দিয়ে হযরত আলীর বিরোধীদের মুকাবেলা করেন। প্রিয় নবী তাকেও শহীদ বলে আখ্যায়িত করেছেন।"

এক্ষেত্রে একজন মুমিনের প্রধান ভাবনার বিষয় প্রিয় নবীর ভবিষ্যতবাণী, যা স্পষ্ট ভাষায় বুঝিয়ে দেয়, হযরত তালহা ও যুবাইর রাযিয়াল্লাহু আনহুমা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য লড়াই করেছিলেন, সে

কারণেই তাঁরা দু'জনও শহীদ। একই সঙ্গে হযরত আম্মার রাযিয়াল্লাহু আনহুর লক্ষ্য-উদ্দেশ্যও আল্লাহর সন্তুষ্টি ছাড়া অন্য কিছু ছিল না, সে কারণে তিনিও শহীদ এবং তিনিও প্রশংসার যোগ্য। উভয় দলের মতের ভিন্নতা কোনো পার্থিব গরজে ছিল না, ছিল ইজতেহাদ ও নেক ভাবনার ভিত্তিতে। ফলে কোনো দলকেই সমালোচনার আঘাতে জর্জরিত ও অসংযত ভাষায় আহত করা কোনোভাবেই বৈধ হতে পারে না। নিজের ঈমানকে নিরাপদ রাখতে চাইলে কুরআন সুন্নায় বর্ণিত সকল সাহাবীর ক্ষমাপ্রাপ্ত হওয়া এবং তাঁদের জন্য চিরস্থায়ী জান্নাত অবধারিত হওয়ার বিশ্বাস অন্তরে বদ্ধমূল করতে হবে। প্রিয় নবীর নির্দেশে নিজের জবান ও ভাষাকে সাহাবীদের ব্যাপারে সংযত করে অন্তরে তাঁদের প্রতি মুহাব্বত ও ভালোবাসা জাগ্রত রাখতে হবে। কুরআন ও হাদীসের সঙ্গে সাংঘর্ষিক ইতিহাস—যা সাহাবায়ে কেরামকে কোনোপ্রকার কালিমা লিপ্ত করে, সম্পূর্ণ বর্জন করতে হবে।

সাহাবায়ে কেরামের তাবাকা (শ্রেণি)

উলামায়ে কেরাম সাহাবীদের বারোটি তাবাকার আলোচনা করেছেন। কেউ কেউ বেশিও বলে ছেন, মুহাম্মাদ ইবনে সাআদ বলেছেন পাঁচটির কথা। ইসলাম গ্রহণে অগ্রগামিতা, হিজরত এবং জিহাদের ময়দানে অংশগ্রহণ ইত্যাদি বিবেচনায় যে বারোটি স্তর করা হয়েছে, নিচে সংক্ষেপে তার বিবরণ তুলে ধরা হলো :

প্রথম তাবাকা- যাঁরা মক্কায় একেবারে শুরুতে ইসলাম গ্রহণ করেছেন, যেমন : আবু বকর, উমর, উসমান ও আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুম।

দ্বিতীয় তাবাকা- দারুন নাদওয়াতে ইসলাম গ্রহণের বাইয়াতকারী সাহাবীগণ।

তৃতীয় তাবাকা- হাবশায় হিজরতকারী সাহাবীগণ।

চতুর্থ তাবাকা- সেই সকল সাহাবী যাঁরা প্রথম আকাবায় ইসলাম গ্রহণকারী।

পঞ্চম তাবাকা- দ্বিতীয় আকাবায় ইসলাম গ্রহণকারী, যাঁদের বেশির ভাগ মদীনার আনসার।

ষষ্ঠ তাবাকা- প্রথমভাগে মদীনায় হিজরতকারী, যাঁরা রাসূলের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন কুবায়, যখন তিনি সেখানে মসজিদ নির্মাণ করছিলেন।

সপ্তম তাবাকা- বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবায়ে কেরাম।

অষ্টম তাবাকা- যাঁরা বদর ও হুদাইবিয়ার মধ্যবর্তী সময়ে হিজরতকারী

নবম তাবাকা- বাইয়াতে রিদওয়ানে অংশগ্রহণকারী সাহাবীগণ।

দশম তাবাকা- হুদাইবিয়ার পর থেকে মক্কা বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত সময়ে হিজরতকারী। এই তাবাকার অন্তর্ভুক্ত বিখ্যাত বীর খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ, আমর ইবনুল আস, আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহুম প্রমূখ।

একাদশ তাবাকা- মক্কা বিজয়ের সময় যাঁরা ইসলাম গ্রহণ করেছেন। যাঁদের মধ্যে কুরাইশের একটি বড় দল শামিল ছিল।

দ্বাদশ তাবাকা- সেই সকল শিশু ও বালক, যাঁরা মক্কা বিজয়ের সময় এবং বিদায় হজের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছিলেন, যাঁদের মাঝে ছিলেন সায়েব ইবনে ইয়াযীদ, আবদুল্লাহ ইবনে সালাবা—এরা রাসূলের দরবারে এলে তিনি তাঁদের দু'জনের জন্য দুআ করেছিলেন, তাঁদের মাঝে আরও ছিলেন, আবুত তুফাইল আমের ইবনে ওয়াসেলাহ এবং আবু জুহাইফা ওয়াহাব ইবনে আবদুল্লাহ। তাঁরা দু'জন প্রিয় নবীকে তাওয়াফের সময় এবং যমযমের নিকট দেখেছিলেন।

অনুবাদকের কৈফিয়ত

ড. আবদুর রহমান রাফাত পাশার *সুওয়ারুম মিন হায়াতিস সাহাবা* বইটির অনুবাদ বাজারে আছে, তারপরও কেন এই অনুবাদ?

ভালো বইয়ের অনেক অনুবাদ হয়ে থাকে, হওয়া উচিৎ। এর নজির রয়েছে অনেক পুর্ব থেকে। ভারতের মাওলানা আবুল কালাম আজাদের একটি লেখার (انسانیت موت کے دروازے پر) তিনটি বিখ্যাত অনুবাদ বাংলা ভাষায় করেছিলেন মাওলানা মুহিউদ্দীন খান রহ., মরহুম অধ্যাপক আখতার ফারূক ও মাওলানা আবদুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী আল-আযহারী—*মৃত্যুর দুয়ারে মানবতা*, *জীবন সায়াহ্নে মানবতার রূপ*, *জীবন সন্ধ্যায় মানবতা*[১] নামে। এক উর্দূ বেহেশতী জেওরের কতগুলো অনুবাদ যে বাজারে আছে তার সঠিক সংখ্যা এই অধমের জ্ঞানের বাইরে।

সাহাবায়ে কেরামের প্রতি মুহাব্বত এবং ড. পাশার অনন্য রচনাশৈলীর প্রতি আকর্ষণের কারণে এই বইটি অনুবাদের পরিকল্পনা করা হয়েছিল ১৯৯৭ ঈ. সালে। আল্লাহর ইচ্ছায় সেই পরিকল্পনার বাস্তবায়ন শুরু হলো ২০১৪ তে। এই বিলম্বের ফলে যে নগদ লাভটি আমরা দেখতে পাচ্ছি তা হলো, লেখকের ব্যাপক পরিবর্তন, সংশোধন ও পরিমার্জনকৃত সর্বশেষ সংস্করণের মূল আরবী বইটি আমরা হাতে পেয়েছি।

পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বইয়ের পার্থক্য

বর্তমান বইটিতে কোনো নারী সাহাবীর জীবনী নেই, যা পূর্ব সংস্করণে ছিল। পরে লেখক নিজেই সেই জীবনীগুলো পৃথক করে স্বতন্ত্র বই হিসাবে প্রকাশ করেন। আল-হামদুলিল্লাহ *নারী সাহাবীদের ঈমানদীপ্ত জীবন* নামে সেটা এই অনুবাদকের হাতে অনূদিত এবং রাহনুমা প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

পুর্ববর্তী বইটি শুরু হয়েছিল 'সাঈদ ইবনে আমের আল জুমাহী'র জীবনী দিয়ে। বর্তমান বইটি শুরু হয়েছে রাসূলের খাদেম 'আনাস ইবনে মালেকে'র জীবনী দিয়ে। এই জীবনী পূর্বের বইতে ছিলই না। পূর্ববর্তী

---

১. *জীবন সন্ধ্যায় মানবতা*, লেখক আবদুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী আল-আযহারী। রাহনুমা প্রকাশনী দীর্ঘ ৪০ বছর পর পুনরায় ছেপে বইটি পাঠকের হাতে পৌঁছে দিচ্ছে।

বইয়ের বহু জীবনীর মন্তব্যে অনেক পরিবর্তন এনেছেন লেখক পাশা নিজে। যেমন সালমান আল-ফারসী, যায়েদুল খাইরের জীবনীর মন্তব্যে দেখুন—এমনি ধরনের বেশ কিছু পরিবর্তনের কারণে আমরা মনে করি ইনশাআল্লাহ কিছু নতুনত্ব পাঠকরা এখানে অবশ্যই পাবেন।

মূল থেকে বিচ্যুত না হওয়াই অনুবাদকের কর্তব্য। একথা মাথায় রেখে আমরা সবসময় অনুবাদকে মূলানুগ করার চেষ্টা করে থাকি, তবে পাঠকের বোধগম্যতাকে আমরা সর্বাধিক গুরুত্ব দেই বলে কোথাও কোথাও প্রয়োজনে ভাবানুবাদেরও আশ্রয় নিতে হয়। পাঠকের জন্য যেখানে জরুরি মনে হয়েছে কিছুটা বাখ্যামূলক তরজমাও আমরা করেছি। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে সাহাবীদের জীবনী দ্বারা উপকৃত হওয়ার তাওফীক দান করুন, আমীন।

বিনীত–
মাসউদুর রহমান
কমলাপুর, কুষ্টিয়া

রমাযান ১৪৩৮
জুন ২০১৭

লেখকের দুআ

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে

হে আল্লাহ্! আমি হৃদয়ের গভীর থেকে অকৃত্রিমভাবে তোমার প্রিয় নবীর সাহাবীদের ভালোবাসি। দয়া করে কেয়ামতের কঠিন দুর্দিনে আমাকে তাঁদের কোনো একজনের একটুখানি সঙ্গ দিয়ো।

ইয়া আর-হামার রাহিমীন আল্লাহ!
তুমি তো জানোই আমি তাঁদের অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ভালোবাসিনি, ভালোবেসেছি শুধু তোমার ক্ষমা আর সন্তুষ্টি পাবার আশায়।

—আবদুর রহমান

ডক্টর আবদুর রহমান রাফাত পাশা
রহমাতুল্লাহি আলাইহি

জন্ম ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে।

জন্মস্থান সিরিয়ার উত্তরাঞ্চলের 'আরীহা' শহর। সেখানেই প্রাথমিক শিক্ষা।

মাধ্যমিক শিক্ষা 'হলব' শহরের খসরুবিয়া বিদ্যালয় থেকে। উচ্চ মাধ্যমিক ডিগ্রী মিশর আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের 'উসূলুদ্দীন' (ধর্ম) অনুষদ থেকে। সব শেষে কায়রো ইউনিভার্সিটি থেকে আরবী সাহিত্যে অনার্স, মাস্টার্স ও পি.এইচ.ডি.।

কর্মজীবনের শুরু শিক্ষক হিসাবে। দ্বিতীয় পর্যায়ে সিরিয়ার শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক আরবী ভাষার প্রধান পরিদর্শক (Inspector)। তারপর দামেস্কের 'দারুল কুতুব' এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পাশাপাশি দামেস্ক ইউনিভার্সিটির কলা অনুষদের প্রভাষক।

সৌদি আরবের ইমাম মুহাম্মদ ইবনে সউদ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা। এখানে ইসলামী সাহিত্য কারিকুলাম এবং 'অলঙ্কার ও সমালোচনা' বিভাগের চেয়ারম্যান, 'মজলিসে ইল্‌মী'র (শিক্ষা পরিষদ) আজীবন সদস্য ছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা ও প্রকাশনা পর্ষদ প্রধানের দায়িত্ব পালন।

মরহুম ড. আবদুর রহমান ইসলামী সাহিত্য সৃষ্টির উদ্বোধক নন, বহু চিন্তাশীল, গবেষক তাঁর পূর্বেও এ কাজ করেছেন... তবে তিনি সক্ষম হয়েছিলেন পূর্বসূরীদের স্বপ্নের বাস্তবায়ন ও স্বার্থক রূপায়ন ঘটাতে। সাহিত্য ও সমালোচনার ক্ষেত্রে একমাত্র তিনিই ফুটিয়ে তুলেছিলেন পরিপূর্ণ ইসলামী ভাবধারা।

তিনি সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভীর সভাপতিত্বে *রাবেতা আল-আদাবুল ইসলামী*'র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই এর সহ-সভাপতি। এছাড়াও বহু সংস্থা ও কমিটির তিনি ছিলেন একজন সক্রিয় সদস্য।

মৃত্যু ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দের ১৮ জুলাই শুক্রবারে তুর্কিস্তানের ইস্তাম্বুল শহরে। তাঁকে দাফন করা হয় সেখানেরই 'ফাতেহা' গোরস্থানে। যেখানে সমাহিত রয়েছেন অনেক সাহাবী ও তাবেঈ। জীবদ্দশায় যাঁদের তিনি সর্বাধিক ভালোবাসতেন এবং যাঁদের পাশে একটু স্থান পাওয়ার ব্যাকুল প্রার্থনা করতেন মহান প্রভুর দরবারে। আল্লাহ সেই প্রার্থনা কবুল করে পৃথিবীতেই তাঁর মৃতদেহকে স্থান দিয়েছেন মহান সাহাবী ও তাবেঈদের কবরের পাশে।

সর্বশক্তিমান আল্লাহর দরবারে আমাদের প্রার্থনা—চিরস্থায়ী জান্নাতেও তাঁকে তাঁদের সঙ্গী বানিয়ে দিন। আমীন।

সূচিপত্র

আনাস ইবনে মালেক আল-আনসারী

হে আল্লাহ! তাকে দান করো সন্তান ও সম্পদ,
তার জীবনকে করে দাও বরকতময়।

-প্রিয় নবীর দুআ

আনাস ইবনে মালেক ছিলেন নিষ্পাপ গোলাপের মতো নিশ্চিন্ত বয়সের ছোট্ট এক বালক, যখন তার মা 'গুমাইসা'[১] তাকে শিখিয়েছিলেন কালিমা-ই শাহাদাত। তার হৃদয়ের কোমল পাত্রটিকে তিনি পূর্ণ করে দিয়েছিলেন ইসলামের নবী মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভালোবাসা দিয়ে...

আনাস প্রিয় নবীর ভালোবাসায় পাগলপারা হয়ে পড়েছিল শুনতে শুনতে।

বিস্ময়ের কিছু নেই, দেখা-সাক্ষাৎ ছাড়া অনেক সময় শুধু শুনে শুনেও প্রেম সৃষ্টি হয় ...

ছোট্ট বালক হৃদয়ে কতবার আকাঙ্ক্ষা জাগল, আহা! যদি আমি মক্কায় ছুটে যেতে পারতাম তাঁর নূরানী চেহারাখানা দেখতে! অথবা যদি তিনি নিজেই চলে আসতেন 'ইয়াসরিবে' আমাকে সাক্ষাতের সুযোগ দিতে!

---

১. গুমাইসা রাযিয়াল্লাহু আনহার জীবনী দেখুন রাহনুমা প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত *নারী সাহাবীদের ঈমানদীপ্ত জীবন*-এ।

বালক আনাসের এই ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষার পর খুব বেশিদিন পার হয়নি, এর মধ্যে 'ইয়াসরিবে' ছড়িয়ে পড়ল এই সুসংবাদ—প্রিয় নবী [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এবং তাঁর সঙ্গী আবু বকর সিদ্দীক রওনা করেছেন ইয়াসরিবের উদ্দেশ্যে...

এতে প্রতিটি গৃহে বয়ে গেল আনন্দের জোয়ার... প্রতিটি হৃদয় নেচে উঠল খুশির ছোঁয়ায়। সব মানুষের ব্যাকুল হৃদয় আর চঞ্চল চাহনি আটকে রইল সেই মুবারক পথে, যেই পথ ধরে এগিয়ে আসছেন প্রিয় নবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] ও তাঁর সঙ্গী 'ইয়াসরিব' এর দিকে।

* * *

এরপর প্রতিদিন প্রভাতে শিশু বালকেরা হৈ চৈ করে গুজব ছড়াত-

'মুহাম্মাদ এসে পড়েছে'... 'এসে পড়েছে...'

এই হৈ চৈ শুনে প্রতিদিনই ঘর থেকে ছুটে বেড়িয়ে পড়ত আনাস অন্য শিশুদের সঙ্গে; কিন্তু কাউকেই খুঁজে না পেয়ে চিন্তিত ও বিষণ্ন মনে আবার ফিরে আসত ঘরে।

* * *

কোনো এক আলোকিত ও উজ্জ্বল প্রভাতে 'ইয়াসরিব' এর বড় বড় পুরুষ মানুষেরা চিৎকার করে জানাল,

'মুহাম্মাদ ও তাঁর সঙ্গী এসে পড়েছেন মদীনার কাছাকাছি।'

বড় বড় লোকেরা এগিয়ে গেলেন সেই মুবারক পথের দিকে, যে পথ ধরে তাদের কাছে আসছেন হিদায়াত আর কল্যাণের নবী...

তারা দলে দলে পাল্লা দিয়ে এগিয়ে যেতে থাকলেন তাঁর উদ্দেশ্যে, যাদের মধ্যে ঢুকে ছিল ছোট ছোট শিশু বালকের দল, যাদের চেহারায় ফুটে উঠছিল শিশু-অন্তর ছাপানো, হৃদয় উপচানো আনন্দ-উল্লাস...

আর সেই সব শিশুর অগ্রভাগে ছিল আনাস ইবনে মালেক আল-আনসারী।

প্রিয় নবী [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এলেন সঙ্গী আবু বকর সিদ্দীক [রাযিয়াল্লাহু আনহু]-সহ। তাঁরা আগাতে থাকলেন কিশোর বালক আর বড় বড় মানুষের বিশাল দলের মাঝখান দিয়ে...

নারীরা আর ছোট্ট ছোট্ট শিশুরা ছিল ঘর-বাড়ির ছাদগুলিতে, তারা রাসূলুল্লাহকে [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এক নজর দেখার জন্য ছটফট করে জানতে চায়-

'নবী কোন্‌টা?'

সে ছিল এক অবিস্মরণীয় দিন...

আনাস ইবনে মালেক নিজের শতাধিক বয়সের দীর্ঘজীবন ধরে স্মরণ করেছেন সেই অবিস্মরণীয় দিনটির কথা।

* * *

প্রিয় নবী [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] মদীনায় এখনো স্থির হননি, এরই মধ্যে তাঁর কাছে এলেন আনাসের মা 'গুমাইসা বিনতে মিলহান'। সঙ্গে ছিল তাঁর ছোট্ট বালকপুত্র, মায়ের সম্মুখে লাফালাফি করছিল আর কপালের ওপর ঝুলছিল বেণীর মতো দুটো কেশগুচ্ছ।

গুমাইসা প্রিয় নবীকে সালাম দিয়ে বললেন,

'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আনসারের প্রতিটি নারী-পুরুষ আপনাকে দিয়েছেন কিছু না কিছু হাদিয়া। কিন্তু আমার কাছে আপনাকে দেওয়ার মতো কিছুই যে নেই এই পুত্রটি ছাড়া! দয়া করে একেই গ্রহণ করুন। আপনার খেদমতের জন্য একে দিয়ে গেলাম।'

প্রিয় নবী [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] শিশু বালকটিকে পেয়ে দারুন খুশি হলেন, সে খুশির ঝিলিক দেখা গেল তাঁর হাস্যোজ্জ্বল চেহারায়। তিনি বালকটির মাথায় বুলিয়ে দিলেন নিজের পবিত্র হাত, নিজের কোমল আঙ্গুলগুলি দিয়ে স্পর্শ করলেন কপালে ঝুলে থাকা তার কেশগুচ্ছ, তাকে যুক্ত করে নিলেন নিজের পরিবারের মধ্যে।

আনাস ইবনে মালেক অথবা প্রিয় নবীর আদরের 'উনাইস' ছিলেন দশ বছর বয়সের এক বালক, যেদিন তিনি গৃহীত হয়েছিলেন প্রিয় নবীর খেদমতের জন্য।

প্রিয় নবীর ওফাত পর্যন্ত তিনি তাঁরই পাশে, তাঁরই তত্ত্বাবধানে জীবন কাটিয়েছিলেন।

প্রিয় নবীর একান্ত সাহচর্য লাভ করেন তিনি পূর্ণ দশ বছর। এই দীর্ঘ সময়ে তিনি গ্রহণ করেন প্রিয় নবীর জীবন দর্শন—যা দ্বারা তিনি পরিশুদ্ধ করেন নিজের নফসকে।

মুখস্থ করেন তাঁর হাদীস—যা দ্বারা পরিপূর্ণ করেন নিজের অন্তরকে।

জেনে নেন তাঁর জীবনচরিত, তাঁর ভেতর-বাহির এবং তাঁর উত্তম আখলাক—যা একমাত্র তাঁর মাধ্যমেই জানতে পেরেছে সমগ্র উম্মত।

* * *

আনাস ইবনে মালেক দয়ার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পেয়েছেন এমন দয়া ও স্নেহের আচরণ, যা কোনো সন্তান পায়নি পিতার নিকট...

তিনি স্বাদ গ্রহণ করেছেন তাঁর উন্নত চরিত্রের এবং মহত্তম স্বভাবের, যার জন্য তিনি জগৎময় হয়ে পড়েছেন ঈর্ষণীয়।

আমরা এখন দয়ার নবীর কোমলতা, উদারতা ও স্নেহপূর্ণ ব্যবহারের কিছু উজ্জ্বল চিত্র উপস্থাপনের ভার দিচ্ছি খোদ আনাস ইবনে মালেকের ওপর। কারণ এ বিষয়ে তিনিই সর্বাধিক জ্ঞাত আর তাঁর বর্ণনাই হবে সর্বাধিক শক্তিশালী...

আনাস ইবনে মালেক বলেন :

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ চরিত্রের, প্রশস্ততম হৃদয়ের এবং পূর্ণতম মমতার অধিকারী...

একদিন তিনি আমাকে একটি কাজে পাঠালেন, আমি সঙ্গে সঙ্গেই বের হলাম কিন্তু তাঁর কাজে না গিয়ে চলে গেলাম বাজারে খেলাধুলায় মত্ত বালকদের সঙ্গে খেলতে। সেখানে পৌঁছার কিছুক্ষণ পর বুঝলাম কেউ একজন আমার পেছনে দাঁড়িয়ে আমার জামা ধরে টানছে...

পেছনে ফিরে তাকালাম, চমকে উঠে দেখি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। পেছনে দাঁড়িয়ে তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন মুখে মিষ্টি হাসি ছড়িয়ে,

'হে উনাইস! তোমাকে যেখানে যেতে বলেছিলাম সেখানে কি গিয়েছিলে?'

আমি হতভম্ব হয়ে বললাম, 'হ্যাঁ... এক্ষুনি যাব ইয়া রাসূলাল্লাহ...!

'আল্লাহর কসম! আমি দশ বছর তাঁর খেদমত করেছি, (এই দীর্ঘ সময়ে) তিনি কখনোই এমন প্রশ্ন করেননি, 'কেন করলে?' কখনোই বলেননি, 'কেন করোনি?'

* * *

প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ডাকতেন আনাসকে, তখন নিজের কণ্ঠে সবটুকু স্নেহ-মমতা আর আদর মেখে শিশু বাচ্চার মতো করে বলতেন, ইয়া উনাইস! কখনো বলতেন, ইয়া বুনাইয়া (হে আমার আদরের বেটা!)

তিনি তাকে প্রচুর উপদেশ দিতেন, নসিহত করতেন যেগুলো পুর্ণ করে রাখত তার হৃদয়কে, অধিকার করে থাকত তাঁর জ্ঞানের জগৎকে।

তাঁর একটি উপদেশবাণী ছিল এমন :

'বেটা! তোমার অন্তরে কারোর প্রতি কোনো বিদ্বেষ নেই—এমনভাবে যদি সকাল (থেকে সন্ধ্যা) এবং সন্ধ্যা (থেকে সকাল) কাটাতে পারো তাহলে তুমি তাই কোরো...

বেটা! মনে রেখো ওটাই আমার সুন্নাত। যে আমার সুন্নাত জীবিত করল (দৃঢ়তার সঙ্গে আমল করল) নিশ্চিত সে আমাকে সত্যিকারের মুহাব্বত করল...

আর যে আমাকে সত্যিকারের মুহাব্বত করল, সে থাকবে আমার সঙ্গে জান্নাতে...

বেটা! যখন তুমি প্রবেশ করবে তোমার গৃহে, পরিবারের লোকদের সালাম দেবে, তাহলে সেটা তোমার ও তোমার পরিবারের লোকদের জন্য হবে বরকতের কারণ।'

* * *

আনাস ইবনে মালেক প্রিয় নবীর ওফাতের পর বেঁচেছিলেন আশি বছরেরও বেশি। এই দীর্ঘ সময়ে তিনি মানুষের অন্তরকে পূর্ণ করে দিয়েছেন ইলমে রাসূল দ্বারা, ভরে দিয়েছিলেন তাদের জ্ঞান-উপলব্ধিকে ফিকহে নববী দ্বারা...

এর মাঝে তিনি জীবন্ত করে তুলেছেন অন্তরসমূহকে, সাহাবী ও তাবেঈদের মাঝে প্রিয় নবীর আদর্শের প্রসার ঘটিয়ে এবং মানুষের মাঝে মহানবীর অমূল্য বাণী ও মহৎ কর্মের প্রচার করে।

আনাস দীর্ঘ জীবনের বিস্তৃত পরিসরে ছিলেন মুসলিমজাতির আশ্রয়স্থল। তারা ছুটে আসত তাঁর কাছে যখনই সৃষ্টি হতো কোনো জটিলতা, ভরসা করত তাঁরই ওপর যখনই তাদের কাছে অস্পষ্ট বোধ হতো কোনো হুকুম।

কেয়ামতের ময়দানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাউজে কাউসারের পানি পান করাবেন—এর সত্যতা নিয়ে কিছু লোক তর্ক-বিতর্ক করল। এ বিষয়ে তাঁর কাছে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন,

ভাবতে অবাক লাগে যে হাউজে কাউসার নিয়ে এমন ঝগড়া-বিবাদ আমাকে দেখতে হচ্ছে। অথচ এমন অনেক অভিজ্ঞ ও বয়স্ক বৃদ্ধ আছেন, যারা প্রত্যেক নামাযের পর আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেন, যেন তারা কেয়ামতের ময়দানে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাউজের পানি পান করার তাওফীক লাভ করেন।

* * *

আনাস ইবনে মালেক রাযিয়াল্লাহু আনহু দীর্ঘজীবন কাটিয়েছেন প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পুণ্য স্মৃতি স্মরণ করে...

তিনি খুব প্রফুল্য হতেন প্রিয় নবীর সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাতের মুহূর্তটি মনে পড়লে। প্রচুর অশ্রু ঝরাতেন তাঁকে হারানো বিষাদময় দিনটি স্মরণ হলে।

তিনি বারবার প্রিয় নবীর কথা বলতেন, বারবার তাঁকে স্মরণ করতেন। তিনি নিজের কাজে ও কথায় তাঁরই অনুসরণ করতেন, তিনি তাই পছন্দ করতেন যা ছিল প্রিয় নবীর পছন্দ, তিনি সেটাই অপছন্দ করতেন যা ছিল তাঁর অপছন্দ।

আনাস ইবনে মালেক রাযিয়াল্লাহু আনহুর জীবনের সেরা স্মরণীয় দিন ছিল দুইটি। একটি ছিল, প্রিয় নবীর সঙ্গে তার প্রথম সাক্ষাতের দিন, অন্যটি ছিল তাঁকে চিরতরে হারানোর দিন।

যখন মনে পড়ত প্রথম দিনের কথা, তিনি খুবই খুশি হতেন এবং সতেজ হয়ে উঠতেন। আর যখন মনে হতো দ্বিতীয় দিনটির কথা, শোকে কাতর হতেন—নিজে এমনভাবে কাঁদতেন যে আশপাশের সকলকেও তাঁর সেই কান্না স্পর্শ করত।

তিনি প্রায়ই বলতেন, আমি প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছিলাম আমাদের মাঝে আগমনের দিন, আবার তাঁর চির বিদায়ের দিন, ঐ দুটো দিনই আমার জীবনে তুলনাহীন।

মদীনাতে তাঁর আগমনের দিনে সবকিছুই ঝলমলে আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। যেদিন তিনি চলে গেলেন আপন প্রভুর সান্নিধ্যে, জগতের সবকিছুই অন্ধকারে ছেয়ে গেল...

তাঁকে সর্বশেষ দেখেছিলাম সোমবার, যখন তাঁর হুজরা থেকে পর্দা সরানো হয়েছিল। সেদিন সকলে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর পেছনে দাঁড়িয়ে তাঁর দিকে তাকিয়েছিলেন। তারা প্রায় অস্থির হয়ে পড়েছিলেন, আবু বকর ইঙ্গিতে তাদের স্থির থাকতে বললেন।

সেই দিনেরই শেষ বেলায় প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকাল হয়ে গেল। আমরা যখন তাঁকে দাফন করছিলাম, আমাদের নিকট তাঁর চেহারার চেয়ে অধিক পছন্দনীয় আর কিছু ছিল না।

* * *

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনাস ইবনে মালেকের জন্য একাধিকবার দুআ করেছেন। তাঁর একটি দুআ ছিল :

'হে আল্লাহ! তাকে দান করো সম্পদ ও সন্তান, আর বরকত দাও তার জীবনে।'

আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রিয় নবীর দুআ কবুল করলেন। আনাস হলেন আনসার সাহাবীদের মাঝে সম্পদে ও সন্তানে সর্বাধিক প্রাচুর্যময়; এমনকি তিনি আপন জীবনকালেই দেখেছিলেন শতাধিক সন্তান ও নাতিকে।

আল্লাহ তাআলা তাঁর জীবনে দিয়েছিলেন এমন বরকত যে তিনি বেঁচেছিলেন পূর্ণ এক শতাব্দীকাল আরও তিন বছর।

আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শাফাআত প্রাপ্তির ব্যাপারে ছিলেন তীব্র আশাবাদী। তিনি প্রায়ই বলতেন,

আমি কিয়ামতের দিনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখে হাজির হয়ে বলব, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই যে দেখুন আপনার 'পিচ্চি' খাদেম উনাইস।

আনাস ইবনে মালেক যখন মৃত্যুমুখে উপনীত হলেন, তখন নিজ পরিবারের লোকদের বললেন, তোমরা আমাকে লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর তালকীন করো।

এরপর তিনি ঐ কালেমা পড়তে পড়তে মৃত্যুবরণ করলেন।

তিনি অসিয়ত করেছিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ছোট্ট লাঠি যেন তাঁর সঙ্গে কবরে দাফন করে দেওয়া হয়। সুতরাং সেটা তাঁর দেহের পাশে কামিসের মধ্যে রেখে দাফন করা হলো।

* * *

অভিনন্দন আনাস ইবনে মালেক আল-আনসারীর প্রতি, আল্লাহ তাআলা পূর্ণ করে দিয়েছেন তার প্রতি কল্যাণ।

তিনি মহান নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচর্যে কাটিয়েছেন পূর্ণ দশ বছর...

তিনি ছিলেন তাঁর হাদীস রেওয়ায়েতের ক্ষেত্রে তৃতীয় ব্যক্তিত্ব, অন্য দু'জন ছিলেন আবু হুরাইরা এবং আবদুল্লাহ ইবনে উমর...

আল্লাহ তাআলা ইসলাম ও মুসলিমজাতির পক্ষ থেকে দান করুন সর্বোত্তম বিনিময় তাঁকে ও তাঁর মা গুমাইসাকে।

তথ্যসূত্র :

১. *আল-ইসাবা*, ১ম খণ্ড, ৭১ পৃষ্ঠা; *আত্তারজামা* : ২৭৭।
২. *আল-ইসতীআব*, ১ম খণ্ড, ৭১ পৃষ্ঠা।
৩. *তাহযীবুত তাহযীব*, ১ম খণ্ড, ৩৭৬ পৃষ্ঠা।
৪. *আল-জামউ বাইনা রিজালিস সহীহাইন*, ১ম খণ্ড, ৩৫ পৃষ্ঠা।
৫. *উসদুল গাবাহ*, ১ম খণ্ড, ৩৫৮ পৃষ্ঠা।
৬. *সিফাতুস সফওয়া*, ১ম খণ্ড, ২৯৮ পৃষ্ঠা।
৭. *আল-মাআরিফ*, ১৩৩ পৃষ্ঠা।
৮. *আল-ইবার*, ১ম খণ্ড, ১০৭ পৃষ্ঠা।
৯. *সীরাতু বাতল*, ১০৭ পৃষ্ঠা।
১০. *তারীখুল ইসলাম* লিযযাহাবী, ৩য় খণ্ড, ৩২৯ পৃষ্ঠা।
১১. *ইবনে আসাকির*, ৩য় খণ্ড, ১৩৯ পৃষ্ঠা।
১২. *ইবনে আসাকিরআল-জারাহ ওয়াত তাদীল*, ১ম খণ্ড, ২৮৬ পৃষ্ঠা।

সাঈদ ইবনে আমের আল-জুমাহী

সাঈদ ইবনে আমের এমন একজন মানুষ, যিনি দুনিয়া দিয়ে আখেরাত ক্রয় করেছিলেন এবং আল্লাহ ও রাসূলকে সবকিছুর ওপর অগ্রগণ্য করেছিলেন।

—ঐতিহাসিকদের মতামত

মক্কার অদূরে 'তানঈম' এর খোলা প্রান্তর। যেখানে আজ কুরাইশ নেতাদের আহ্বানে সমবেত হচ্ছে হাজার হাজার মানুষ। মক্কার তরুণ সাঈদ ইবনে আমেরও অন্যদের মতো তানঈমের উদ্দেশ্যে বেরিয়েছে। তানঈমের এই খোলা ময়দানে আজ প্রকাশ্যে হত্যা করা হবে মুহাম্মাদের এক সহচর খুবাইব ইবনে আদিইকে। যাকে ধোঁকা দিয়ে বন্দী করে আনা হয়েছে মক্কায়।

টগবগে যুবক সাঈদ ইবনে আমের সমবেত জনতার ভিড় ঠেলে ঠেলে পৌঁছে গেল একেবারে সম্মুখসারিতে। এমনকি এই আনন্দ মিছিলের নেতৃত্ব দানকারী কুরাইশের বর্ষীয়ান নেতৃবৃন্দ—আবু সুফিয়ান ইবনে হারব এবং সফওয়ান ইবনে উমাইয়া প্রমুখের পাশাপাশি গিয়ে তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন।

এতে তিনি খুব কাছ থেকে দেখতে পেলেন কুরাইশের শৃঙ্খলিত বন্দীকে। যাঁকে বহু মানুষের ঠেলা আর ধাক্কা খেয়ে পায়ে পায়ে এগিয়ে

যেতে হচ্ছে চূড়ান্ত মৃত্যুর দিকে। যাঁকে হত্যা করে শাস্তি দেওয়া হবে মুহাম্মাদকে। যাঁকে হত্যার মাধ্যমে বদরযুদ্ধে নিহত আত্মীয়দের কিছুটা প্রতিশোধ নেওয়া যাবে।

* * *

জনতার এই বিশাল ভিড় বন্দীকে ঠেলে নিয়ে যখন উপনীত হলো প্রস্তুতকৃত বধ্যভূমিতে, দীর্ঘদেহী তরুণ সাঈদ ইবনে আমের আল-জুমাহী দাঁড়িয়ে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করতে থাকলেন খুবাইবকে। তাঁকে নেওয়া হচ্ছিল শূলমঞ্চের দিকে। নারী-পুরুষ ও শিশুর উৎকট চেঁচামেচির মধ্যেও তিনি শুনলেন খুবাইবের দৃঢ়, অকম্পিত শান্ত কণ্ঠস্বর... তিনি বলছেন-

'তোমরা যদি হত্যার পূর্বে আমাকে দু'রাকাত নামাযের সুযোগ দিতে চাও, তাহলে দাও...'

এরপর খুবাইবকে দেখলেন কাবার দিকে ফিরে দাঁড়াতে, দু'রাকাত নামায পড়তে। আহা! সে যে কী চমৎকার নামায! দু'রাকাত নামাযের সে যে কী পরিপূর্ণতা! নামায শেষে তিনি নেতৃবৃন্দের কাছে এগিয়ে গিয়ে বললেন,

'আল্লাহর কসম! আমি মৃত্যুর ভয়ে দীর্ঘ নামাযের মাধ্যমে কালক্ষেপণ করছি—তোমাদের এই ধারণার ভয়টা যদি আমার না হতো, তাহলে আরও বেশি দীর্ঘ নামায পড়তাম।'

এরপর সাঈদ ইবনে আমের স্বচক্ষে তাঁর কওমের নির্মম নিষ্ঠুরতা দেখলেন। দেখলেন জীবন্ত খুবাইবের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ একটি একটি করে কেটে ফেলা হচ্ছে। এরই মধ্যে কুরাইশ নেতারা জিজ্ঞাসা করল খুবাইবকে,

'তুমি কি নিজের শাস্তি মুহাম্মাদের ওপর চাপিয়ে দিয়ে নিজেকে মুক্ত করতে চাও?'

খুবাইব কর্তিত দেহে রক্তরঞ্জিত হয়েও চিৎকার করে জবাব দিলেন,

'অসম্ভব! আমার শাস্তি আমার প্রাণের চেয়ে প্রিয় নবীর ওপর চাপিয়ে দিয়ে নিজেকে মুক্ত করার তো প্রশ্নই ওঠে না। তাঁর শরীরে একটু কাঁটার আঁচর লাগাতে চাইলেও আমি আমার নিজের ও পরিবারের সকলের জীবন দিয়ে হলেও সেটা প্রতিরোধ করব।'

মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে নিজের নবী ও বিশ্বাসের জন্য এত পাগল ও প্রেমিক সূলভ দৃঢ় জবাব শুনে কাফেরদের মাথা খারাপ হয়ে গেল। তারা হৈচৈ করে বলতে থাকল, 'মেরে ফেলো... ওকে হত্যা করো...'

এবার সাঈদ ইবনে আমের দেখলেন শূলমঞ্চের ওপর থেকে খুবাইব আকাশের দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে বলছেন-

اللهم احصهم عددا، واقتلهم بددا، ولا تغادرمنهم احدا

'হে আল্লাহ! এদের একটি একটি করে গুনে রাখো। এদের প্রত্যেককে তাড়িয়ে তাড়িয়ে হত্যা কোরো, এদের কেউই যেন ছাড়া না পায়।'

অগণিত তরবারি আর বল্লমের আঘাতে ঝাঁঝরা দেহে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

* * *

কুরাইশের লোকেরা ফিরে এল মক্কায়, আর ভুলে গেল বড় বড় ঘটনা-দুর্ঘটনার ভিড়ে খুবাইব ও তাঁর মৃত্যুকে। কিন্তু খুবাইবের বিষয়টি তাজাপ্রাণ তরুণ সাঈদ ইবনে আমের আল-জুমাহীর স্মৃতি থেকে এক মুহূর্তের জন্যও আড়াল হলো না।

ঘুমালে দেখতে পেতেন তাঁকে স্বপ্নে। জাগ্রত অবস্থায় দেখতেন তাঁকে কল্পনায়। তার স্মৃতিতে ভেসে উঠত শূলদণ্ডের সম্মুখে তাঁর ধীর ও প্রশান্ত দু'রাকাত নামায পড়ার সেই অদ্ভুত দৃশ্য। তার দু'কানে বারবার ঝঙ্কার তুলত সেই বদদুআর ধ্বনি—যা তিনি উচ্চারণ করেছিলেন কুরাইশের বিরুদ্ধে। ফলে তার আশঙ্কা হতে থাকত, এই বুঝি আকাশ থেকে বিশাল

কোনো পাথর তার ওপর নিক্ষিপ্ত হবে অথবা কোনো বজ্রের আঘাত তার জীবনের অবসান ঘটাবে।

খুবাইব এমন শিক্ষা দিয়ে গেলেন সাঈদকে যা তিনি আগে জানতেন না...

তিনি শিখিয়ে গেলেন—জীবনের আসল অর্থ হলো একটি আকীদা ও বিশ্বাস আর মৃত্যু পর্যন্ত সেই আকীদা-বিশ্বাসের জন্য সংগ্রাম-সাধনা চালিয়ে যাওয়া।

আরও শিখিয়ে গেছেন যে, সুদৃঢ় ঈমান সৃষ্টি করে অনেক বিস্ময়, তৈরি করে প্রচুর অলৌকিকতা।

আরও একটি বিশেষ বিষয় শিখিয়ে গেছেন, সেটি হলো যে নবীকে তাঁর সঙ্গী-সাথীরা এইভাবে জীবনের চেয়ে বেশি ভালোবাসে সন্দেহ নেই যে, তিনি আসমান থেকে সাহায্যপ্রাপ্ত সত্য নবী।

সেই মুহূর্তে আল্লাহ তাআলা সাঈদ ইবনে আমেরের হৃদয়ের রুদ্ধ দুয়ার খুলে দিলেন ইসলামের জন্য। একদল মানুষের মাঝে তিনি দাঁড়ালেন আর স্পষ্টভাষায় কুরাইশের পাপ-পঙ্কিলতার সংশ্রব ত্যাগের ঘোষণা দিলেন। ঘোষণা দিলেন দেব-দেবীর পূজা-অর্চনা বর্জন করার এবং আল্লাহর দীন ইসলাম কবুল করার।

* * *

সাঈদ ইবনে আমের রাযিয়াল্লাহু আনহু হিজরত করে চলে গেলেন মদীনায়। আঁকড়ে ধরে থাকলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সংসর্গ। তাঁর সঙ্গে হাজির থাকলেন 'খাইবার' যুদ্ধে এবং পরবর্তী সকল রণাঙ্গনে।

তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট থেকে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যখন ইন্তেকাল হয়ে গেল, তিনি পরিণত হলেন পরবর্তী দুই খলীফা আবু বকর ও উমরের খোলা তরবারিতে। জীবন-যাপন করলেন একজন

মুমিনের এমনই বিরল দৃষ্টান্তরূপে, যিনি আখেরাত ক্রয় করেছেন দুনিয়া দিয়ে আর অগ্রগণ্য করেছেন আল্লাহর মর্জি ও সাওয়াবকে দেহের সকল আরাম ও নফসের সকল আকাঙ্ক্ষার ওপর।

* * *

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উক্ত দুই খলীফাই ভালোভাবে জানতেন সাঈদ ইবনে আমেরের সততা ও তাকওয়ার কথা। তাঁরা শুনতেন তাঁর নসিহত, গভীর মনোযোগ দিয়ে কান লাগিয়ে থাকতেন তাঁর উপদেশবাণীর প্রতি।

তিনি একবার সাক্ষাৎ করতে গেলেন খলীফা উমরের সঙ্গে, তাঁর শাসন আমলের সূচনার কোনো একদিনে। তিনি বললেন,

'উমর! আমি আপনাকে উপদেশ দিচ্ছি, মানুষের সেবা করার সময় আল্লাহকে ভয় করুন, কিন্তু আল্লাহর হুকুম পালনের সময় মানুষের পরোয়া করবেন না। আপনার কথা যেন কখনোই কাজের বিপরীত না হয়। মনে রাখবেন সর্বশ্রেষ্ঠ কথা সেটাই যার বাস্তবায়ন ঘটে কর্মে।

হে উমর! কাছের ও দূরের মুসলিমদের ব্যাপারে সজাগ থাকুন, যাদের জন্য আল্লাহ আপনাকে শাসক বানিয়েছেন। তাদের জন্য তাই পছন্দ করুন যা করেন নিজের ও পরিবারের জন্য, তাই অপছন্দ করুন যা করেন নিজের ও পরিবারের লোকদের জন্য। সত্যের জন্য সব কষ্ট স্বীকার করে নিন। আল্লাহর হুকুমের সামনে কোনো তিরস্কারের পরোয়া করবেন না।'

উমর জিজ্ঞাসা করলেন, এমন করতে কে সক্ষম হে সাঈদ!

তিনি জবাব দিলেন :

'এটা আপনার মতো সেই ব্যক্তিই করতে সক্ষম, যাকে আল্লাহ উম্মতে মুহাম্মাদের শাসক বানাবেন এবং যার মাঝে ও আল্লাহর মাঝে কোনো আড়াল থাকবে না অর্থাৎ আল্লাহর সঙ্গে যার গভীর সম্পর্ক থাকবে।'

* * *

সে সময় উমর ইবনুল খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহু সাঈদ ইবনে আমেরের কাছে সহযোগিতা চেয়ে বললেন,

'হে সাঈদ! আমি আপনাকে হিমস নগরীর গভর্নর নিযুক্ত করছি।'

তিনি ব্যাকুল হয়ে বললেন,

'উমর! আল্লাহর দোহাই দিয়ে আপনাকে বলছি, আমাকে এই বিপদে ফেলবেন না, দয়া করে আমাকে দুনিয়ার ঝামেলায় জড়াবেন না।'

উমর তাতে ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন :

'কী আশ্চর্য ব্যাপার, আমার ঘারে খেলাফতের গুরুদায়িত্ব চাপিয়ে আপনারা আমার পেছন থেকে সরে দাঁড়াতে চান!

আল্লাহর কসম! আমি আপনাকে ছাড়ব না।'

এরপর তার ওপর 'হিমস' নগরীর দায়িত্ব অর্পণ করে বললেন :

'আপনার জন্য ভাতা নির্ধারণ করব কি?'

তিনি এর জবাবে বললেন :

'আমীরুল মুমিনীন! (প্রজা হিসাবে) বাইতুল মাল থেকে প্রাপ্ত ভাতাই হয়ে যায় আমার প্রয়োজনের অতিরিক্ত। তাহলে গভর্নর হিসাবে পাওনা ভাতা দিয়ে আমি কী করব?'

তিনি চলে গেলেন 'হিমস' নগরীতে।

* * *

এর অল্পকাল পরেই 'হিমস' থেকে আমীরুল মুমিনীনের নিকট এল তাঁর নির্ভরযোগ্য একটি প্রতিনিধি দল। তিনি তাদের নির্দেশ দিলেন, তোমাদের এলাকার দরিদ্র-ফকিরদের একটি তালিকা তৈরি করে দাও, যেন তাদের কিছু সাহায্য করতে পারি। নির্দেশমতো তারা একটি তালিকা পেশ করলেন। দেখা গেল সেখানে রয়েছে অমুক, অমুক এবং সাঈদ ইবনে আমেরও।

খলীফা জিজ্ঞাসা করলেন,

‘এই ‘সাঈদ ইবনে আমের’টা কে?’

তারা জবাব দিলেন,
‘আমাদের আমীর ও গভর্নর।’

তিনি বিস্মিত হয়ে আবার জিজ্ঞাসা করলেন,
‘তোমাদের আমীরও কি ফকির?’

তারা বললেন,
‘হ্যাঁ হ্যাঁ, আল্লাহর কসম! দিনের পর দিন পেরিয়ে যায় তার বাড়িতে চুলা জ্বলে না।’

একথা শুনে উমর এত কাঁদলেন যে তাঁর দাড়ি একদম ভিজে গেল, এরপর এক হাজার দিনার ভরা একটি থলে তাদের হাতে দিয়ে বললেন,
‘তাকে আমার সালাম দিয়ে বলবে, আমীরুল মুমিনীন এই অর্থ আপনার জন্য পাঠিয়েছেন, এগুলো দিয়ে আপনার প্রয়োজন মেটাবেন।’

* * *

প্রতিনিধি দল থলেটি নিয়ে সাঈদ ইবনে আমেরের নিকট এল। তিনি সেটা দেখেই বুঝলেন তাতে অনেক দিনার রয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে তিনি ‘ইন্না-লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন’ বলে সেটাকে দূরে সরাতে থাকলেন—যেন তার ওপর কোনো বিপদ নেমে এসেছে অথবা তার এই আঙ্গিনায় কোনো ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা ঘটে গেছে। তার স্ত্রী ভয়ে ছুটতে ছুটতে এসে আড়াল থেকে জিজ্ঞাসা করলেন,
‘কী ব্যাপার সাঈদ! আমীরুল মুমিনীনের কি ইন্তেকাল হয়ে গেল?’

‘ব্যাপার এরচেয়েও বেদনাদায়ক।’

‘তাহলে কি মুসলিমবাহিনী কোনো রণাঙ্গনে হেরে গেছে?’

‘ব্যাপারটি তারচেয়েও অধিক হতাশাজনক।’

‘এগুলোর চেয়েও বেদনাদায়ক, হতাশাজনক—তাহলে কী বিষয় সেটা?’

'আমার আখেরাত বরবাদ করতে আমার ঘরে দুনিয়ার ফেতনা ঢুকেছে।'

'সেটা থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিন।' (দীনারের ব্যাপারে কিছুই না জেনে স্ত্রী বললেন।)

'তুমি কি এ ব্যাপারে আমাকে সহযোগিতা করবে?'

'কেন করব না, অবশ্যই করব।'

এই কথাবার্তা শেষ হলে তিনি সেই দীনারগুলো ছোট ছোট অনেক থলের মধ্যে ভাগ করে রাখলেন এবং পরে সেগুলো মুসলিম-দরিদ্রদের মাঝে পৌঁছানো ব্যবস্থা করলেন।

* * *

এরপর খুব বেশি দিন অতিক্রম করেনি, উমর ইবনুল খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহু এলেন সিরিয়াতে—সেখানের সার্বিক খোঁজ-খবর নিতে। 'হিমস' নগরীতে যখন যাত্রা বিরতি করলেন, সে সময় এ অঞ্চলটিকে 'কুফা' নামের সঙ্গে মিলিয়ে বলা হতো 'কুওয়াইফা' মানে ছোট কুফা। কারণ এখানের লোকেরাও কুফার লোকদের মতোই বেশি বেশি শাসক ও গভর্নরদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করত। লোকেরা হযরত উমরকে সালাম জানাতে ও তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে সমবেত হলো। তিনি এসব মানুষকে কাছে পেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন :

'তোমাদের গভর্নর কেমন?'

তারা খলীফার নিকট তুলে ধরল গভর্নরের বিরুদ্ধে চারটি গুরুতর অভিযোগ, যার প্রতিটিই অন্যটির চাইতে মারাত্মক।

হযরত উমর বলেন, আমি বাদি-বিবাদি উভয়কেই একত্র করলাম। আল্লাহকে ডাকতে থাকলাম যেন তার ব্যাপারে আমার সুধারণা নষ্ট না হয়। কারণ তার প্রতি ছিল আমার গভীর আস্থা ও বিশ্বাস...

তারা ও তাদের গভর্নর যখন আমার কাছে সমবেত হলো, তখন আমি অভিযোগকারীদের বললাম :

'বলো.., গভর্নরের বিরুদ্ধে তোমাদের কী অভিযোগ?'

'বেলা অনেকটা পার হওয়ার আগে তিনি ঘর থেকে বের হন না, কেন এই বিলম্ব?'

আমি বললাম :

'এ অভিযোগ সম্পর্কে আপনার কী বক্তব্য হে সাঈদ?'

কিছু সময় তিনি নীরব হয়ে থাকলেন। তারপর বললেন ;

'আল্লাহর কসম! আমি বিব্রতবোধ করছি কথাটি বলতে, কিন্তু কী করা যাবে! এখন তো না বলে কোনো উপায়ই নেই...। আমার কোনো খাদেম-চাকর-চাকরানী নেই, ফলে প্রতিদিন সকালে ঘরের জরুরি কাজের দায়িত্ব আমাকেই পালন করতে হয়। আমিই আটা গোলাই, আমিই খামির বানাই, রুটি তৈরি করি। এসব শেষ হলে অযু করে তবেই জনগণের খেদমতে বের হই। কিছুটা বিলম্ব এ কারণেই হয়ে যায়।'

হযরত উমর বলেন :

'আমি আবার জিজ্ঞাসা করলাম তোমাদের আর কী অভিযোগ তার বিরুদ্ধে?'

তারা বলল, 'রাতের বেলা তিনি কারও ডাকেই সাড়া দেন না কেন?'

আমি জানতে চাইলাম :

'হে সাঈদ! এ বিষয়ে আপনার জবাব কী?'

তিনি বললেন,

'আল্লাহর কসম! এর কারণ প্রকাশ করাটা আমার জন্য খুবই অপ্রীতিকর। কিন্তু বাধ্য হয়েই বলতে হচ্ছে যে, দিন ও রাতকে আমি ভাগ করেছি স্রষ্টা ও সৃষ্টির মাঝে। দিনে ব্যস্ত থাকি সৃষ্টির খেদমতে আর রাতে মহান স্রষ্টার ইবাদতে।'

আমি বললাম :
'তোমাদের আর কী অভিযোগ তার ব্যাপারে?'

তারা বলল, 'মাসে একদিন তিনি বাড়ি থেকেই বের হন না।'

আমি প্রশ্ন করলাম :
'হে সাঈদ! এটা কেন করেন?'

তিনি বললেন :
'আমীরুল মুমিনীন! আমার কোনো গোলাম নেই এবং আমার দ্বিতীয় কোনো পোশাকও নেই এটা ছাড়া, যা এখন পরে আছি। মাসে একবারমাত্র এটা ধুয়ে পরিষ্কার করি, ভেজা পোশাক না শুকানো পর্যন্ত অপেক্ষা ছাড়া আমার কিছুই করার থাকে না। অবশ্য দিনের শেষে জনগণের উদ্দেশ্যে বের হয়ে যাই।'

আমি তাদের বললাম :
'আর কী অভিযোগ তোমাদের?'

তারা বলল, 'হঠাৎ হঠাৎ তিনি মূর্ছিত ও সংজ্ঞাহারা হয়ে যান। তখন তিনি নিজের মজলিসের ব্যাপারেও বে-খবর হয়ে পড়েন।'

আমি জিজ্ঞাসা করলাম তাকে,
'এর কারণ কী হে সাঈদ!'

তিনি বললেন :
'মুশরিক অবস্থায় আমি খুবাইব ইবনে আদিইকে শূলীতে চড়াতে দেখেছি..., দেখেছি কুরাইশের লোকেরা জীবিত খুবাইবের শরীরের বিভিন্ন অংশ নিষ্ঠুরতম উপায়ে কেটে টুকরো টুকরো করেছে আর তাঁকে বলেছে, তুমি কি চাও তোমার পরিবর্তে এই শাস্তি মুহাম্মাদকে দেওয়া হোক?

জবাবে অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে তিনি বলেছিলেন, আল্লাহর কসম! এই শাস্তি তো দূরের কথা, আমি আমার নিজের জীবন, আমার পরিবারের

সকলের জীবন বিসর্জন দিতে রাজি কিন্তু আমার প্রাণের চেয়ে প্রিয় নবী মুহাম্মাদের পায়ের তলায় একটি ছোট্ট কাঁটা ফুটতে দিতে রাজি নই। সেদিনের সেই ভয়াবহ স্মৃতি যখনই আমার মনে পড়ে এবং তাঁকে কোনো সাহায্য না করে নিষ্ক্রীয় থাকার অপরাধবোধ যখনই আমার মাঝে জাগে, তখনই আমার মনে হয় যে আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করবেন না... ব্যাস, আমি সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ি।'

এইসব অভিযোগ ও জবাব শোনার পর হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন,

'সকল প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য যিনি আমার সুধারণাকে মিথ্যা হতে দেননি।'

পরে খলীফা একসময় এক হাজার দিনার তাকে দিলেন প্রয়োজনে কাজে লাগানোর জন্য।

তার স্ত্রী সেগুলো দেখে বললেন :

'আল্লাহর জন্যই সকল প্রশংসা, যিনি আমাদের আপনার খেদমত নেওয়ার দায় থেকে মুক্ত করে দিলেন। এবার যান আমাদের জন্য কিছু খাদ্যসামগ্রী কিনে আনুন আর একটি খাদেম ঠিক করুন।'

তিনি বললেন তাকে :

'এরচেয়েও উত্তম কিছু কি তুমি চাও না?'

'কী সেটা?' স্ত্রী জানতে চাইলেন।

'এইগুলো আমরা এমন একজনকে দিয়ে দেই যিনি আজকের চেয়েও বেশি অভাবের সময় আমাদের বহুগুণ বাড়িয়ে ফেরৎ দেবেন!'

'কীভাবে হবে সেটা?'

'যদি আমরা আল্লাহ তাআলার জন্য দান করে দেই।'

'ঠিক আছে, তাই করুন, আপনার মঙ্গল হোক।'

তিনি সেই হাজার দিনার ভাগ করে বিভিন্ন থলেতে রাখলেন। পরিবারের একজনকে নির্দেশ দিয়ে বললেন,

'এটা অমুকের বিধবার কাছে পৌঁছে দাও। এটা অমুকের এতীম সন্তানদের, এটা অমুক বংশের অসহায় মানুষদের আর এটা অমুক পরিবারের দরিদ্রদের কাছে পৌঁছে দাও।'

* * *

আল্লাহ তাআলা সাঈদ ইবনে আমের আল-জুমাহীর প্রতি আপন সন্তুষ্টি দান করুন। তিনি ছিলেন সেই সব বিরল ও মহান মানুষের দলভুক্ত যাঁরা নিজেদের অভাব সত্ত্বেও অন্যের প্রয়োজনকে অগ্রগণ্য করেন।

তথ্যসূত্র :

১. *তাহযীবুত তাহযীব*, ৪র্থ খণ্ড, ৫১ পৃষ্ঠা।
২. *ইবনে আসাকির*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১৪৫-১৪৭ পৃষ্ঠা।
৩. *সিফাতুস সফওয়াহ*, ১ম খণ্ড, ২৭৩ পৃষ্ঠা।
৪. *হুলইয়াতুল আউলিয়া*, ১ম খণ্ড, ২৪৪ পৃষ্ঠা।
৫. *তারীখুল ইসলাম*, ২য় খণ্ড, ৩৫ পৃষ্ঠা।
৬. *আল-ইসাবা*, ২য় খণ্ড, ৪৮ পৃষ্ঠা, অথবা *আত্তারজামা*, ৩২৭০।
৭. *নাসাবু কুরাইশ*, ৩৯৯ পৃষ্ঠা।

তুফাইল ইবনে আমর আদ-দাউসী

হে আল্লাহ! তুমি তাকে দান করো এমন একটি নিশানা যা তাকে কাঙ্ক্ষিত কল্যাণের কাজে সাহায্য করবে।

-প্রিয় নবীর একটি দুআ

তুফাইল ইবনে আমর আদ-দাউসী 'দাউস' গোত্রের জাহেলী যুগের সর্দার। আরবের চিহ্নিত সম্ভ্রান্ত লোকদের অন্যতম। সীমিত পৌরুষদীপ্ত ব্যক্তিবর্গের একজন...

তার ডেগ কখনো চুলা থেকে নামত না..., আগন্তুকের সম্মুখে তার দুয়ার কখনো রুদ্ধ হতো না...

খাবার দিতেন ক্ষুধার্তকে, নিরাপত্তা দিতেন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে, আশ্রয়প্রার্থীকে দিতেন আশ্রয়। এসবের পাশাপাশি তিনি ছিলেন একজন তীক্ষ্ণ মেধাবী ও বুদ্ধিদীপ্ত সাহিত্যিক, সুক্ষ্ম আবেগ ও অনুভূতিজাত কাব্য-প্রতিভার অধিকারী কবি, কোনো বিষয়ের পক্ষে বা বিপক্ষে মধুময় ও জ্বালাময়ী ভাষণে তিনি এমনই পারঙ্গম যে, তার মুখ থেকে বেরোনো কথা শ্রোতার অন্তরে সৃষ্টি করত যাদুর প্রভাব।

* * *

তুফাইল নিজ গোত্রের এলাকা (লোহিত সাগরের নিকটবর্তী আরব উপদ্বীপের সমতলভূমি) তেহামা ত্যাগ করলেন, রওনা করলেন মক্কার উদ্দেশ্যে। সে সময় দ্বন্দ্ব ও যুদ্ধের চাকা ঘুরছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও কুফ্‌ফারে কুরাইশের মাঝে। তারা প্রত্যেকেই সংগ্রহ করতে চাচ্ছিলেন নিজের সাহায্যকারী আর আকর্ষণ করছিলেন নিজ নিজ দলের সমর্থক...

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষকে দাওয়াত দিচ্ছেন আপন রবের পথে, হাতিয়ার তাঁর ঈমান-বিশ্বাস, হক-ইনসাফ।

পক্ষান্তরে কাফের কুরাইশীরা তাঁর সেই আহ্বান প্রতিরোধের চেষ্টা চালাচ্ছে সকল প্রকার অস্ত্র দিয়ে, সকল পথ ও পন্থা অবলম্বন করে। তারা মানুষকে তাঁর থেকে দূরে সরিয়ে রাখছে সবরকম উপকরণ ব্যবহার করে। তুফাইল দেখলেন, বিনা প্রস্তুতিতে নিজেকে এই দ্বন্দ্ব যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে, অনিচ্ছা সত্ত্বেও এই ঝামেলায় সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়তে...

তিনি তো এই লক্ষ নিয়ে মক্কায় আসেননি। ইতিপূর্বে মুহাম্মাদ ও কুরাইশের এমন দ্বন্দ্বের কথা তাঁর জানাও ছিল না। এই দ্বন্দ্ব-যুদ্ধকে কেন্দ্র করে তুফাইল ইবনে আমর আদ-দাউসীর জীবনে ঘটেছে এক অবিস্মরণীয় ঘটনা। চলুন, সবাই মিলে শুনি সেই বিরল কাহিনী।

* * *

তুফাইল বর্ণনা করেন :

'আমি এলাম মক্কায়। দেখামাত্র কুরাইশ নেতৃবৃন্দ ছুটে এল আমার কাছে। আমাকে জানাল উষ্ণ অভ্যর্থনা এবং স্থান করে দিল আরামদায়ক ও মর্যাদাপূর্ণ মেহমানখানায়।

তাদের নেতৃবর্গ ও বিশিষ্ট লোকেরা সমবেত হলো আমাকে ঘিরে। তারা উদ্বেগের সঙ্গে আমাকে জানাল,

'হে তুফাইল! তুমি তো আমাদের এলাকায় এসেই পড়েছ, এখানে তোমাকে একটু সাবধানে থাকতে হবে। কারণ, এই যে লোকটি নিজেকে নবী বলে দাবি করে বেড়াচ্ছে, সে দুর্বল করে দিয়েছে আমাদের নেতৃত্ব, বিনষ্ট করে ফেলেছে আমাদের ঐক্য ও সংহতি। বিভক্ত করে দিয়েছে আমাদের সকলকে। আমাদের ভীষণ আশঙ্কা হচ্ছে যে তোমার ওপর এবং স্বজাতির মধ্যে তোমার নেতৃত্বের ওপরও আপতিত হবে সেই বিপদ

যা হয়েছে আমাদের ওপর। অতএব, তুমি লোকটির সঙ্গে কোনো কথা বলতে যেয়ো না। কিছুতেই তাঁর কোনো কথা শুনতে যেয়ো না। কারণ, সে এমন কিছু কথা বলে থাকে যা যাদুমন্ত্রের মতো দ্রুত অন্তরে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। সে কথা পিতা-পুত্রের মাঝে, ভাইয়ে ভাইয়ে এবং স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদের দুর্ভেদ্য দেয়াল খাড়া করে দেয়।'

তুফাইল কাহিনীর পরবর্তী অংশের বর্ণনায় বলেন :

'আল্লাহর কসম! এভাবেই তারা আমাকে শোনাতে থাকল তাঁর চমকে দেওয়া ঘটনাবলী এবং আমাকে আতঙ্কিত করতে থাকল নিজের প্রতি ও নিজ কওমের প্রতি তাঁর ভীতি জাগানো কর্ম-কাণ্ডের বিবরণ দ্বারা। অবশেষে আমি এই সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হলাম, আমি তাঁর ধারে কাছেই যাব না, তাঁর সঙ্গে কোনো কথাই বলব না এবং শুনবও না তাঁর কোনো কথা।

আমি যখন কাবা-তাওয়াফের উদ্দেশ্যে এবং আমাদের পূজনীয় দেব-দেবীর বরকত লাভের উদ্দেশ্যে বের হলাম। তখন দুই কানে তুলা ভরে নিলাম যেন মুহাম্মাদের কোনো কথা আমার কানে ঢুকে না পড়ে।

কিন্তু যেইমাত্র আমি কাবা-প্রাঙ্গনে প্রবেশ করলাম, প্রথমেই আমার চোখে পড়ল কাবার নিকট দাঁড়িয়ে মুহাম্মাদের নামায পড়ার অপূর্ব দৃশ্য। তিনি নামায পড়ছেন—সেটা আমাদের মতো নয়। তিনি ইবাদত করছেন—আমাদের ইবাদতের মতো নয়। তাঁর নামাযের দৃশ্যে আমি থমকে গেলাম। তাঁর ইবাদত একেবারে ওলট-পালট করে দিল আমার সব পূর্ব-পরিকল্পনা। জানি না, কেমন করে যেন একটু একটু করে আমি তাঁর দিকে এগুতে থাকলাম, তাঁর একেবারে নিকটে পৌঁছে গেলাম... আল্লাহর ইচ্ছায় তাঁর তেলাওয়াতের কিছু অংশ আমার কানে এল। আমি শুনতে পেলাম অসম্ভব সুন্দর, ভারি চমৎকার কিছু কথা। তখন আমি নিজেকে তিরস্কার করে মনে মনে বললাম,

হায়রে হতভাগা তুফাইল! এত বড় পোড়া কপাল তোর! তুই একজন বিচক্ষণ কবি। ভালো-মন্দের পার্থক্য জ্ঞান তো তোর আছে। তাহলে

লোকটির কিছু কথা শুনতে তোর বাধা কোথায়? তাঁর বক্তব্য ভালো হলে গ্রহণ করবি, আর মন্দ হলে ত্যাগ করবি!'

* * *

তুফাইল বলেন :

'এরপর আমি অপেক্ষা করতে থাকলাম। রাসূলুল্লাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইবাদত শেষ করে আপন গৃহে রওনা হলেন। আমি তাঁর পিছু নিলাম। তিনি যখন নিজগৃহে প্রবেশ করলেন সেখানেই আমি তাঁর মুখোমুখি হলাম এবং তাঁকে বললাম–

'হে মুহাম্মাদ! আপনার কওমের লোকেরা আমাকে আপনার সম্পর্কে একগাদা সতর্কবাণী দিয়েছে। আপনার ব্যাপারে তারা আমাকে এত আতঙ্কিত করে তুলেছিল যে, শেষ পর্যন্ত আমি তুলা দিয়ে দুই কান বন্ধ করে এসেছিলাম যেন আপনার কোনো কথা আমার কানে ঢুকতে না পারে। কিন্তু আল্লাহ তাআলা সে ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দিয়ে আমাকে শুনিয়েছেন কিছু কথা, আহা! কী অপূর্ব সেই বাণী। ...যার আকর্ষণে আপনার পিছু পিছু আমি এখানে হাজির হয়েছি। দয়া করে আপনার বক্তব্য ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্য আমার কাছে খুলে বলুন...'

তিনি আমার কাছে তাওহীদ ও রিসালাতের ব্যাখ্যা দিলেন। পাঠ করে শোনালেন সূরা ইখলাস ও সূরা ফালাক। আল্লাহর কসম! এরচেয়ে উত্তম কোনো বাণী সারাজীবনেও আমি শুনিনি। এত বাস্তবধর্মী, যুক্তি ও ইনসাফপূর্ণ দীন আমি আর দেখিনি... সুতরাং আর কিসের বিলম্ব? তাঁর সামনে বাড়িয়ে দিলাম সমর্পণের হাত, পড়ে নিলাম তাওহীদ ও রিসালাতের ঘোষণা-সম্বলিত ঈমানের দৃপ্ত শপথের বাণী...

اَشْهَدُ اَنْ لَآاِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই এবং এটাও যে মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল।

এবং এভাবে আমি দীক্ষিত হলাম ইসলামে।'

তুফাইল রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন :

‘এরপর কিছুকাল আমি অবস্থান করলাম মক্কায়, শিখে নিলাম ইসলামের শিক্ষাগুলো। সাধ্যমতো মুখস্থ করে নিলাম কুরআনের কিছু অংশ। যখন স্বগোত্রে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত স্থির করে ফেললাম, তখন প্রিয় নবীর নিকট গিয়ে বললাম–

ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি নিজ গোত্রে একজন অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব, আজ তাদের কাছে ফিরে যাব এবং আমি তাদের ইসলামের দিকে আহ্বান করব। আপনি দয়া করে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করুন, তিনি যেন আমাকে দান করেন কোনো নিশানা—যা হবে এই দাওয়াতি কাজে আমার সহায়ক।

তিনি বললেন :

‘হে আল্লাহ! তুমি তাকে দান করো কোনো নিশানা।’

এরপর আমি বের হলাম আমার কওমের উদ্দেশ্যে। যখন আমি তাদের এলাকার কাছাকাছি একটি উঁচু স্থানে পৌঁছি তখনই আমার দু'চোখের মাঝখানে প্রকাশ পেল বাতির মতো উজ্জ্বল আলো। আমি প্রার্থনা করলাম-

‘হে আল্লাহ! দয়া করে এই আলো আমার মুখমণ্ডল থেকে অন্য কোথাও স্থানান্তর করে দাও! কারণ আমি আশঙ্কা করছি, তারা বলবে আমার কপালে আগুন জ্বলছে—তাদের ধর্ম ত্যাগের কারণে আমার জন্য এই শাস্তির ব্যবস্থা হয়েছে। সেই অলৌকিক আলো স্থানান্তরিত হলো আমার চাবুকের মাথায়। লোকেরা আমার চাবুকের মাথায় ঝুলন্ত প্রদীপের ন্যায় উজ্জ্বল সেই নূরের দিকে তাকাতাকি করতে লাগল। তখন আমি পাহাড়ের খাড়া ঢাল বেয়ে নিচে নামছিলাম। যখন নিচে পৌঁছলাম, আমার কাছে এগিয়ে এলেন আমার পিতা—তিনি ছিলেন এক অতিবৃদ্ধ মানুষ। আমি তাকে বললাম,

‘বাবা! তুমি আমার কাছ থেকে দূরে থাক। কারণ আমি তোমার কেউ নই, তুমিও আমার কেউ নও।’

'কেন রে ব্যাটা? ...'

'আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি, মুহাম্মাদের দীনের অনুসারী হয়ে গেছি।'

'ব্যাটা, তুমি যে দীন গ্রহণ করেছ, আমিও সেটা গ্রহণ করলাম।'

'তাহলে তুমি গোসল করে পবিত্র হও, পবিত্র পোশাক পরে এসো। তোমাকে শিখিয়ে দেই সেই বিষয় যা শেখানো হয়েছে আমাকে।

তিনি যথারীতি গেলেন, গোসল করলেন এবং পবিত্র পোশাক পরে এলেন। তখন আমি তার কাছে ইসলামের বাণী তুলে ধরলাম। তিনি সানন্দে ইসলাম কবুল করে নিলেন।

এরপর এল আমার স্ত্রী। আমি বললাম, 'একটু দূরত্ব বজায়ে রাখো। কারণ, এখন আর তোমার-আমার মাঝে কোনো সম্পর্ক নেই।'

সে জিজ্ঞাসা করল, 'কী কারণে এমন হলো? আমার পিতা-মাতা তোমার জন্য উৎসর্গিত। এই বিচ্ছেদের কারণটা কি জানতে পারি?'

আমি বললাম, 'আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি, দীনে মুহাম্মাদের অনুসারী হয়েছি। ইসলাম কোনো মুসলিম-পুরুষকে মুশরিক-স্ত্রী রাখার অনুমতি দেয় না। ইসলাম তোমার আমার সম্পর্ককে ছিন্ন করে দিয়েছে।'

সে বলল, 'তাহলে তোমার দীন ইসলামকেই আমি আমার দীন হিসাবে মেনে নিলাম।'

আমি বললাম, 'তাহলে এক্ষুণি যাও, ঐ যীশ্‌শারা'র (দাউসের দেবী মন্দির) পার্শ্ববর্তী পাহাড়ী ঝরনার নির্মল পানিতে গোসল করে পবিত্র হয়ে এসো।'

সে আবার জিজ্ঞাসা করল, 'আমার পিতা-মাতা উৎসর্গিত তোমার জন্য। তুমি কী দেবী 'যীশ্‌শারা'র দিক থেকে শিশুদের কোনো ক্ষতির আশঙ্কা করছ? সে কারণেই কি সেখানে গোসলের জন্য পাঠাচ্ছ?'

আমি ক্রুদ্ধ হয়ে বললাম, 'চুলোয় যাক তোর দেবী 'যীশ্‌শারা', চুলোয় যাক তোর শেরেকী চিন্তা-ভাবনা... আমি সেখানে গিয়ে গোসল করতে বলেছি—সেটা লোকালয় থেকে দূরে, লোকচক্ষুর আড়ালে বলে। আমি

তোমাকে নিশ্চয়তা দিচ্ছি, এই বধির পাথুরে মূর্তির ভালো-মন্দ কিছুই করার ক্ষমতা নেই।'

সে গেল। গোসল করে আমার সম্মুখে এসে হাজির হলো। আমি তার কাছে ইসলাম তুলে ধরলাম, সে কবুল করে নিল।

এরপর আমি দাওয়াত পেশ করলাম 'দাউস' গোত্রের সামনে। একমাত্র আবু হুরাইরা ছাড়া সকলেই সে দাওয়াতে সাড়া দিতে বিলম্ব করল।

* * *

তুফাইল রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন :
'আমি মক্কায় এলাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আবু হুরাইরাকে সঙ্গে নিয়ে।'

তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন,
'হে তুফাইল, তোমার কওমের অন্যদের কী অবস্থা?'

আমি হতাশার সুরে বললাম,
'তাদের অন্তরগুলো তীব্র কুফরীর আবরণে আচ্ছাদিত... তাদের মধ্যে বিরাজ করছে প্রবল পাপাচার আর অবাধ্যতা।'

একথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উঠে পড়লেন, ওযূ করে এসে নামায পড়লেন। এরপর তাঁর মুবারক হাত উঁচু করলেন আকাশের দিকে...

আবু হুরাইরা বলেন, 'আমি এইসব দেখে শঙ্কিত হয়ে পড়লাম, হয়তো তিনি আমার কওমের বিরুদ্ধে বদ-দুআ করবেন আর তারা ধ্বংস হয়ে যাবে... আমি মনে মনে বললাম, হায়রে আমার কপাল পোড়া জাতি!... কিন্তু রাসূলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলতে শুরু করলেন,

اَللّٰهُمَّ اهْدِ دَوْسًا ... اَللّٰهُمَّ اهْدِ دَوْسًا... اَللّٰهُمَّ اهْدِ دَوْسًا

হে আল্লাহ! তুমি দয়া করে দাউস গোত্রের লোকদের হেদায়াত দাও, হেদায়াত দাও, হেদায়াত দাও।

এরপর তিনি তুফাইলের প্রতি ঘুরলেন এবং বললেন,

'তোমার কওমের কাছে ফিরে যাও, তাদের সঙ্গে কোমল আচরণ করবে আর নম্র ভাষায় ইসলামের দিকে আহ্বান জানাবে।'

* * *

তুফাইল রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন :

'আমি অব্যাহতভাবে দাউস জনগোষ্ঠীকে ইসলামের দিকে ডাকতে থাকলাম। ইতোমধ্যে রাসূলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] হিজরত করে মদীনায় চলে গেলেন। পেরিয়ে গেল আরও বহু সময়। ঘটে গেল বদর, ওহুদ ও খন্দকের যুদ্ধ। এরপর আমি হাজির হলাম প্রিয় নবীর [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] খেদমতে। এবার আমার সঙ্গে হাজির হলো দাউস গোত্রের আশিটি পরিবার; যারা সকলেই ইসলাম গ্রহণ করে খাঁটি মুসলিমের পরিচয় দিয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] ভারি খুশি হলেন। আর যুদ্ধে অংশগ্রহণ ছাড়াই মুজাহিদদের সঙ্গে আমাদেরকেও খায়বর যুদ্ধের গনিমত প্রদান করলেন। আমরা তখন বললাম,

'ইয়া রাসূলাল্লাহ! পরবর্তী প্রতিটি জিহাদে আমাদেরকে আপনার ডান দিকের সৈনিক হিসাবে নির্ধারণ করুন আর 'মাবরুর' শব্দটি আমাদের সংকেত হিসাবে নির্ধারণ করুন।'

তুফাইল রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন :

'এরপর আমি মক্কা বিজয় পর্যন্ত রয়ে গেলাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে। পরে আমি নিবেদন করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে আমার এলাকার আমর ইবনে হামামা'র দেবী 'যুল-কাফফাইন'কে জ্বালিয়ে ধ্বংস করার অনুমতি প্রদান করুন...'

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুমতি দিলে তুফাইল রাযিয়াল্লাহু আনহু নিজ কওমের ছোট্ট একটি বাহিনী নিয়ে রওনা হলেন সেই দেবী মূর্তির উদ্দেশ্যে...

যখন সেখানে পৌঁছে গেলেন এবং মূর্তির গায়ে আগুন ধরানোর আয়োজন করলেন, তখন তার আশ-পাশে বহু নারী-পুরুষ আর শিশু দর্শক জমে গেল। তারা সকলেই অপেক্ষা করছিল কখন তার ওপর বিপদ নামবে। তারা নিশ্চিত ছিল যে, দেবী 'যুল-কাফফাইনে'র সঙ্গে বেয়াদবি করলে অবশ্যই বজ্রপাতে তার মৃত্যু ঘটবে। কিন্তু তুফাইল রাযিয়াল্লাহু আনহু নির্ভিক গতিতে এগিয়ে গেলেন, মূর্তিটির সম্মুখে দাঁড়ালেন এবং একদল অন্ধ-ভক্ত পূজারীর বিস্ময়ভরা দৃষ্টির সামনে দেবীর গায়ে আগুন ধরিয়ে দিলেন আর ছন্দে-ছড়ায় গাইতে লাগলেন,

يَاذَا الْكَفَّيْنِ لَسْتُ مِنْ عُبَّادِكَا

مِيْلَادُنَا اَقْدَمُ مِنْ مِيْلَادِكَا

إِنِّيْ حَشَوْتُ النَّارَ فِيْ فُؤَادِكَا

রে যুল-কাফফাইন, ফুরালো তোর দিন,
তোর পূজা করি না, জানি তুই শক্তিহীন।
জন্মেছি আগে তোর জন্মের,
রাখব না কোনো পথ শিরকের।
জ্বালিয়ে দিলাম তোর আস্তানা
গায়রুল্লাহর পূজা চলবে না।

আগুন জ্বলে উঠল দাউ দাউ করে, সে আগুন দেবী মূর্তিকে জ্বালিয়ে ভস্ম করে দিল। এরই সঙ্গে জ্বলে-পুড়ে ছাই হয়ে গেল দাউস গোত্রে মূর্তিপূজা ও শিরকের শেষ চিহ্নটুকুও। এরপর সেখানের নারী-পুরুষ সকলেই ইসলাম গ্রহণ করল এবং সেই ইসলাম গ্রহণ নিখুঁত ও নিখাদ প্রমাণিত হলো।

* * *

এরপর তুফাইল ইবনে আমর আদ-দাউসী রাযিয়াল্লাহু আনহু আঁকড়ে ধরলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সংশ্রব এবং এই ধারা চলতেই থাকল প্রিয় নবীর ওফাতের পূর্ব পর্যন্ত।

তাঁর পরে খেলাফতের দায়িত্ব যখন আরোপিত হলো তাঁরই ঘনিষ্ঠতম সাহাবী আবু বকর সিদ্দীকের প্রতি, তখন তুফাইল রাযিয়াল্লাহু আনহু নিয়োজিত করলেন নিজেকে, নিজের সন্তান ও তরবারিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খলীফার আনুগত্যে।

রিদ্দতের যুদ্ধ যখন শুরু হলো মুসাইলামাতুল কাযযাবের বিরুদ্ধে। মুসলিমসৈনিকদের শীর্ষস্থানীয় হিসাবে বের হলেন তুফাইল এবং তাঁর পুত্র আমর... ইয়ামামার এই সফরে তিনি এক স্বপ্ন দেখলেন। স্বপ্ন দেখে তিনি সাথীদের ডেকে বললেন,

'আমি এক স্বপ্ন দেখেছি, তোমরা এর তাবির (ব্যাখ্যা) বলো।'

তারা জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী দেখেছেন?'

তিনি বললেন, 'দেখলাম আমার মাথা মুণ্ডন করা হয়েছে, একটি পাখি আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল আর এক মহিলা আমাকে তার পেটের মধ্যে ঢুকিয়ে নিল। আমার পুত্র আমর নিরন্তর চেষ্টা করতে লাগল আমাকে উদ্ধারের, কিন্তু তার ও আমার মাঝে (দেয়ালের মতো) আড়াল তৈরি হয়ে গেল।'

তারা বললেন, 'ভালো স্বপ্ন দেখেছেন...'

তখন তিনি বললেন, 'আমি এর যে ব্যাখ্যা বুঝেছি, তা হলো :

আমার মাথা মুণ্ডন করা—এর মানে তা কর্তিত হবে... অর্থাৎ আমি শহীদ হয়ে যাব। আর যে পাখিটিকে দেখেছি আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, সেটা আমার রূহ... আর যে মহিলা আমাকে নিজের পেটে ঢুকিয়ে নিল, সেটা সেই জমিন যা আমার জন্য খনন করা হবে এবং তার পেটের মধ্যে আমাকে দাফন করা হবে... আমি আশাবাদী যে, আমার শাহাদাতের মৃত্যু হবে ইনশাআল্লাহ...

আর আমার পেছনে পুত্রের নিরন্তর প্রচেষ্টার অর্থ, আমি আল্লাহর ইচ্ছায় যে শাহাদাত খুব শিগগির পেয়ে যাচ্ছি, সেই শাহাদাতের জন্য তারও অবিরাম চেষ্টা থাকবে, কিন্তু সে তা পাবে পরবর্তী কোনো জিহাদে। (এই যুদ্ধে সে শহীদ হতে পারবে না)'

ইয়ামামার জিহাদের ময়দানে বিখ্যাত সাহাবী তুফাইল ইবনে আমর আদ-দাউসী রাযিয়াল্লাহু আনহু শত্রুর বিরুদ্ধে ভয়ঙ্কর লড়াই করলেন, বীর বিক্রমে লড়তে লড়তে এক সময় তাঁর দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়ল, তিনি শহীদ হয়ে গেলেন।

ওদিকে তাঁর পুত্র আমর শত্রুর বিরুদ্ধে প্রাণপন লড়াই করতে থাকলেন, এক সময় শত্রুর আঘাতে তার ডান হাতের তালু কেটে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। তিনি শক্তিহীন-দুর্বল হয়ে পড়লেন। ফলে তিনি ইয়ামামার প্রান্তরে শহীদ পিতা আর নিজের শহীদ হাত ফেলে মদীনায় ফিরে এলেন।

উমর ইবনুল খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতকালে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলেন আমর ইবনে তুফাইল। সেদিন খলীফার দরবারে আরও অনেক রাষ্ট্রীয় মেহমান হাজির ছিলেন। সকলের জন্য খাবার আনা হলে খলীফা সবাইকে দস্তরখানে আমন্ত্রণ জানালেন। আমর ইবনে তুফাইল খাবার গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন,

'কেন? কী হয়েছে তোমার? তুমি সম্ভবত তোমার হাতের কারণে লজ্জায় খাবারে শরিক হতে চাচ্ছ না'

তিনি জবাব দিলেন, 'আমীরুল মুমিনীন ঠিকই বুঝেছেন।'

খলীফা বললেন,

وَاللهِ لَا أَذُوْقُ هٰذَا الطَّعَامَ حَتّٰى تُخَلِّطَه بِيَدِكَ الْمَقْطُوْعَةِ ... وَاللهِ مَافِي الْقَوْمِ اَحَدٌ بَعْضُه فِي الْجَنَّةِ إِلَّا أَنْتَ-

'আল্লাহর কসম! এই খাবার আমি কিছুতেই মুখে দেব না, যতক্ষণ না তুমি এতে তোমার কাটা হাতের ছোঁয়া লাগাবে। এই মজলিসে তুমি ছাড়া এমন আর একজন মানুষও নেই, যার একটি অঙ্গ ইতিমধ্যেই জান্নাতে পৌঁছে গেছে।'

পিতাকে হারানোর পর থেকে আমর ইবনে তুফাইলের চোখে অবিরাম জ্বলতে থাকে শাহাদাতের স্বপ্ন। তিনি ব্যাকুল হয়ে পড়েন শহীদ হওয়ার জন্য। অবশেষে ইয়ারমুকের যুদ্ধ যখন সংঘটিত হলো, (তখনকার অন্যতম সেরা শক্তিশালী রোমসাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে পনেরো হিজরীতে সংঘটিত ইতিহাসের বিখ্যাত যুদ্ধের নাম ইয়ারমুক। যেখানে মুসলিমবাহিনী লাভ করেছিল বিশাল বিজয়।) আমর সেই যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়লেন সর্বাগ্রে। বীরবিক্রমে লড়াই করতে করতে একসময় তিনি সেই শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করলেন, যার স্বপ্ন দেখেছিলেন তাঁর পিতা।

* * *

আল্লাহ তাআলা তুফাইল ইবনে আমর আদ-দাউসীর প্রতি বর্ষণ করুন রহমতের বৃষ্টিধারা। তিনি নিজেও আল্লাহর পথে জীবন দানকারী শহীদ এবং শহীদ পুত্রের পিতাও।

তথ্যসূত্র :

১. *আল-ইসাবা*, ২য় খণ্ড, ২২৫ পৃষ্ঠা। অথবা *আত্তারজামা*, ৪২৫৪।
২. *আল-ইসতীআব*, ২য় খণ্ড, ২৩০ পৃষ্ঠা।
৩. *উসদুল গাবাহ*, ৩য় খণ্ড, ৫৪-৫৫ পৃষ্ঠা।
৪. *সিফাতুস সফওয়াহ*, ১ম খণ্ড, ২৪৫-২৪৬ পৃষ্ঠা।
৫. *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, ১ম খণ্ড, ২৪৮-২৫৭ পৃষ্ঠা।
৬. *মুখতাসার তারীখি দিমাশ্‌ক*, ৭ম খণ্ড, ৫৯-৬৪ পৃষ্ঠা।
৭. *আল-বিদায় ওয়ান-নিহায়া*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৩৩৭ পৃষ্ঠা।
৮. *শুহাদাউল ইসলাম*, ১৩৮-১৪৩ পৃষ্ঠা।
৯. *সীরাতু বাতাল*, মুহাম্মাদ ইবনে যায়দান, সৌদি সংস্করণ, ১৩৮৬ হিজরী।

আবদুল্লাহ ইবনে হুযাফা আস-সাহমী

প্রত্যেক মুসলিমের কর্তব্য আবদুল্লাহ ইবনে হুযাফার মাথায় চুমু দেওয়া, শুরুটা আমিই করে দিচ্ছি।

-উমর ইবনুল খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহু

আমাদের এই কাহিনীর মহানায়ক একজন বিখ্যাত সাহাবী, যার নাম আবদুল্লাহ ইবনে হুযাফা আস-সাহমী।

ইতিহাস এই মানুষটিকে স্মরণ না করেই আপন গতিতে এগিয়ে যেতে পারত, যেমন তার পূর্বে মিলিয়ন মিলিয়ন আরবকে অতিক্রম করে গেছে তাদেরকে স্মরণ না করেই।

কিন্তু সুমহান ইসলাম আবদুল্লাহ ইবনে হুযাফা আস-সাহমীকে দিয়েছে তখনকার পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দুই পরাশক্তি—পারস্যসম্রাট কিসরা এবং রোমসম্রাট কায়সারের মুখোমুখি হওয়ার বিরল সুযোগ...

উভয় সম্রাটের সঙ্গে তার সাক্ষাৎকে কেন্দ্র করে সৃষ্টি হয়েছে এমন এমন ঘটনা— যুগের স্মৃতিতে যা থাকবে অম্লান হয়ে, ইতিহাসের পাতা যার বিবরণ দিতে থাকবে অনন্তকাল ধরে।

* * *

পারস্যসম্রাট কিসরার সঙ্গে তার ঘটনাটি ঘটেছিল হিজরতের ষষ্ঠ বর্ষে, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন ইসলাম গ্রহণের আহ্বান সম্বলিত পত্র দিয়ে একদল সাহাবীকে পাঠাবেন বিভিন্ন অনারব বাদশার কাছে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যথার্থই বুঝতেন এই গুরুত্বপূর্ণ কাজের ঝুঁকি ও বিপদ সম্পর্কে...

কারণ, এইসব দূত যাচ্ছেন অজানা, অচেনা দুর্যোগ-দুর্ঘটনার সম্ভাবনাপূর্ণ বিভিন্ন অঞ্চলে...

এছাড়া তাদের জানা নেই সেইসব অঞ্চলের ভাষা এবং কোনো ধারণাও নেই সেই সকল রাজা-বাদশার মেজায-মর্জির বিষয়ে...

এসকল সাহাবী ওইসব রাজা-বাদশাকে আহ্বান জানাবেন নিজেদের দীন (ধর্ম ও বিশ্বাস) ত্যাগ করতে, নিজেদের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি ছাড়তে। তারা আহ্বান জানাবেন এমন কওমের দীন গ্রহণ করতে, যারা নিকট-অতীতেও ছিল তাদেরই অনুগত।

সন্দেহ নেই এটা এক বিপদসঙ্কুল যাত্রা, এখানে নেই মুসাফিরের জীবনের কোনো নিরাপত্তা, নেই প্রত্যাবর্তনের কোনো নিশ্চয়তা। যে যাবে যেন সে জীবন হারাবে, যে ফিরবে যেন সে (মৃত্যুর পর) নতুন জীবন ফিরে পাবে।

এসব নানাবিধ ঝুঁকি ও বিপদ-সম্ভাবনার কথা বিবেচনা করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের জমা করলেন এবং তাদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য শুরু করলেন। প্রথমেই হামদ ও সানা (আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান) করলেন, কালিমায়ে শাহাদাত পড়ে বললেন,

'আম্মাবাদ, আমি তোমাদের ভেতর থেকে কয়েকজনকে বিভিন্ন অনারব-বাদশার কাছে পাঠাতে চাই। সুতরাং আমি আশা করি তোমরা কেউ আমার এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করবে না, যেমন করেছিল বনী ইসরাঈল ঈসা ইবনে মারয়ামের বিরুদ্ধে।'

একথা শুনে সাহাবায়ে কেরাম সমস্বরে বলে উঠলেন,

'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা (বিরোধিতা নয়) আপনার যে কোনো ইচ্ছা পূরণের জন্য জীবন বাজি রাখব, অতএব নির্দ্বিধায় আপনি আমাদের পাঠিয়ে দিন যেখানে পাঠাতে চান।'

* * *

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছয়জন সাহাবীকে মনোনীত করলেন বিভিন্ন আরব-অনারব রাজা-বাদশার কাছে তাঁর চিঠি নিয়ে যাওয়ার জন্য। সেই ছয়জনের একজন ছিলেন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে হুযাফা আস-সাহমী। তিনি মনোনীত হয়েছিলেন পারস্যসম্রাট কিসরার হাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চিঠি পৌঁছানোর জন্য।

* * *

আবদুল্লাহ ইবনে হুযাফা প্রস্তুত করে ফেললেন নিজের বাহন, বিদায় জানালেন স্ত্রী ও সন্তানদের। রওনা করলেন বহু দূরের সেই পারস্য-দেশের উদ্দেশ্যে। পারি দিলেন বহু উঁচু-নিচু পথের ঘাত-প্রতিঘাত। আল্লাহ ছাড়া সঙ্গে কেউ নেই—এমন নিঃসঙ্গ-একা বহু দুর্গম পথ পেরিয়ে এক সময় তিনি পৌঁছে গেলেন গন্তব্যে—পারস্য-দেশে। পারস্যসম্রাটের সাক্ষাৎ প্রার্থনা করলেন এবং রাজ-দরবারের সদস্যদের সেই চিঠির সংবাদ জানিয়ে দিলেন—যা তিনি সম্রাটের উদ্দেশ্যে বয়ে এনেছেন।

সদস্যদের নিকট থেকে সবখবর শুনে কিসরা রাজ-দরবার প্রস্তুত করার নির্দেশ দিলেন। তার নির্দেশ পালিত হলো। রাজ-দরবারকে সুসজ্জিত করা হলো। পারস্যের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গকে আমন্ত্রণ জানালে তারা কিসরার আহ্বানে সেই মজলিসে হাজির হলো। এরপর তিনি আবদুল্লাহ ইবনে হুযাফাকে তার দরবারে হাজির হওয়ার অনুমতি দিলেন।

* * *

আবদুল্লাহ ইবনে হুযাফা আস-সাহমী পারস্যসম্রাটের সম্মুখে উপস্থিত হলেন পাতলা চাদর এবং মোটা কাপড়ের আবা (আরবদের ঐতিহ্যবাহী পুরুষদের পোশাক) পরে। তার মধ্যে বেদুইনদের গ্রাম্যপনা ও সরলতার ছাপ ছিল স্পষ্ট।

কিন্তু তিনি ছিলেন উন্নত মনোবল ও মজবুত দেহ-কাঠামোর অধিকারী, তার সারা দেহে টগবগ করছিল ইসলামী মর্যাদা, অন্তরে জ্বলজ্বল করছিল ঈমানের গৌরব। পারস্যসম্রাট কিসরা তাকে এগিয়ে আসতে দেখেই দরবারের একজনকে ইঙ্গিত করলেন চিঠিটা তার থেকে নেওয়ার জন্য।

তিনি অন্য কারোর হাতে চিঠি দিতে অস্বীকার করে বললেন,

'রাসূলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এটা সরাসরি পারস্যসম্রাটের হাতে দিতেই আমাকে হুকুম করেছেন।'

কিসরা বললেন, 'তাহলে তাকে আসতে দাও।'

তিনি কিসরার দিকে এগিয়ে গেলেন এবং সরাসরি কিসরার হাতে চিঠি হস্তান্তর করলেন।

এরপর কিসরা ইরাকের হীরা-অঞ্চলের একজন আরবী জানা লোককে ডাকলেন। চিঠির বক্তব্য পারস্যভাষায় তাকে অনুবাদ করে শোনানোর নির্দেশ দিলেন। চিঠিতে লেখা ছিল,

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُوْلِ اللهِ إِلٰى كِسْرٰى عَظِيْمِ فَارِسٍ–سَلَامٌ عَلٰى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدٰى ....

'পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি। আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদের পক্ষ থেকে পারস্যসম্রাট কিসরার প্রতি.. সালাম ও চিরশান্তি বর্ষিত হোক তাদের প্রতি যারা হিদায়াতকে কবুল করে তার অনুসরণ করে...'

চিঠির এতটুকু পরিমাণ শোনামাত্রই কিসরার বুকের মধ্যে রাগ ও ক্রোধের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল, তার চেহারা লাল হয়ে গেল, গর্দানের রগগুলো ফুলে উঠল। কেননা, এতে প্রথমে রয়েছে প্রেরক মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এর নাম, তারপর প্রাপক পারস্যসম্রাটের নাম। আরবী জানা সেই দোভাষীর হাত থেকে তিনি চিঠিটা টান দিয়ে নিয়ে নিলেন এবং টুকরা টুকরা করে ছুঁড়ে ফেললেন চিঠির বিষয়বস্তু না জেনেই। আর চিৎকার করে বলতে লাগলেন, 'আমার অনুগত একজন দাস হয়ে আমার সঙ্গে এত বড় বেয়াদবি!'

এরপর আবদুল্লাহ ইবনে হুযাফাকে তার মজলিস থেকে বহিষ্কার করার নির্দেশ দিলেন। নির্দেশমতো তাকে সেখান থেকে বের করে দেওয়া হলো।

* * *

আবদুল্লাহ ইবনে হুযাফা রাযিয়াল্লাহু আনহু পারস্যসম্রাট কিসরার রাজ দরবার থেকে বের হয়ে এলেন। তিনি জানতেন না আল্লাহ কী রেখেছেন তার ভাগ্যে... তাকে কি হত্যা করা হবে নাকি ছেড়ে দেওয়া হবে?

তিনি অবিলম্বে বলে উঠলেন,

وَاللهِ مَا أُبَالِي عَلٰى اَىِّ حَالٍ اَكُوْنُ بَعْدَ اَنْ اَدَّيْتُ كِتَابَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم

'আল্লাহর কসম! আল্লাহর রাসূল [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এর চিঠি যথাস্থানে পৌঁছানোর গুরুদায়িত্ব পালনের পর আমি এ ব্যাপারে মোটেও চিন্তিত নই যে আমার কী হবে...?' একথা বলেই তিনি চড়ে বসলেন নিজ বাহনের পিঠে এবং শুরু করলেন পথচলা।

কিসরার রাগ যখন থেমে গেল, তিনি নির্দেশ দিলেন আবদুল্লাহকে তার সম্মুখে হাজির করা হোক। কিন্তু পাওয়া গেল না তাকে... সকলে মিলে খোঁজাখুজি করল কিন্তু তার কোনো সন্ধান কেউই বের করতে পারল না... অবশেষে ঘোরসওয়ার-বাহিনী সম্রাটের নির্দেশে তাকে তন্ন তন্ন করে খুঁজল আরব উপদ্বীপের সীমা পর্যন্ত বিস্তীর্ণ পথে। সর্বশেষ তারা জানতে পারল, তিনি আরও পূর্বে জাযিরাতুল আরব সীমানায় প্রবেশ করেছেন।

আবদুল্লাহ ইবনে হুযাফা আস্-সাহমী ফিরে এসে সাক্ষাৎ করলেন প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে। তাঁকে কিসরার সঙ্গে সাক্ষাৎ ও রাজ দরবারের সকল সংবাদ সবিস্তারে জানালেন। বিশেষত কিসরা কর্তৃক তাঁর পবিত্র চিঠি টুকরো টুকরো করে ফেলার খবরও দিলেন। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু একটি বাক্য বললেন,

مَزَّقَ اللهُ مُلْكَه

'আল্লাহ তার সাম্রাজ্যকে টুকরো টুকরো করে দিন'

* * *

পারস্যসম্রাট কিসরা (ক্রুদ্ধ হয়ে) করদরাজ্য ইয়েমেনের শাসক 'বাযান' এর কাছে লিখিত নির্দেশ জারি করলেন, 'হিজায ভূমিতে আত্মপ্রকাশকারী (নবুওয়াতের দাবিদার) লোকটির কাছে তোমার বাছাইকৃত দু'জন শক্তিশালী সৈনিক পাঠাও, তারা যেন লোকটিকে গ্রেফতার করে আমার কাছে হাজির করে।' 'বাযান' নির্দেশ পেয়ে নিজের বাছাইকৃত সেরা দু'জন সেনাসদস্য পাঠিয়ে দিলেন রাসূলের কাছে। তাদের হাতে রাসূলের উদ্দেশ্যে লেখা এক পত্রে হুকুম জারি করলেন- 'হে মুহাম্মাদ! অবিলম্বে এদের সঙ্গে সম্রাট 'কিসরা'র দরবারে গিয়ে সাক্ষাৎ করুন।'

'বাযান' সৈনিকদের আরও একটি গোপন নির্দেশ দিলেন, তারা যেন মুহাম্মাদের খোঁজ-খবর ও তথ্য সংগ্রহ করে তাকে অবহিত করে।

* * *

সৈনিক দু'জন অবিরাম সফর করে তায়েফ পর্যন্ত পৌঁছে গেল। সেখানে তারা দেখা পেল কুরাইশের একদল ব্যবসায়ীর। তারা বণিক দলকে মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তারা জানাল, তিনি এখন (মক্কায় নয়) মদীনায় আছেন। বাণিজ্য কাফেলার লোকজন ইয়ামেনী ঐ দুই সৈনিকের উদ্দেশ্য জেনে ভীষণ আনন্দ নিয়ে মক্কায় ফিরে এল। কুরাইশের লোকদের অভিনন্দন জানিয়ে তারা বলতে লাগল, 'আরে! তোমরা এবার আনন্দ করো, পারস্যসম্রাট কিসরা লেগে গেছে মুহাম্মাদের পিছে, আমাদের আর কোনো চিন্তা নেই। তার সর্বনাশ দেখার অপেক্ষা করো।'

ব্যবসায়ীদের কথামতো ইয়েমেনী সেনারা তাদের সফরের দিক পাল্টাল এবং মদীনার দিকে রওনা করল। মদীনায় পৌঁছার পর রাসূলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁর কাছে 'বাযান' এর চিঠি হস্তান্তর করে বলল, 'রাজাধিরাজ কিসরা আমাদের বাদশা বাযানের উদ্দেশ্যে লিখিত ফরমান জারি করেছেন, আপনাকে কিসরার সম্মুখে হাজির করার জন্য যেন তিনি লোক পাঠান। সে উদ্দেশ্যেই আমরা আপনার কাছে এসেছি। আপনি যদি (স্বেচ্ছায়) আমাদের সঙ্গে যেতে রাজি হয়ে যান তাহলে আমরা কিসরার সঙ্গে কথা বলব, আপনার পক্ষে সুপারিশ করে আপনার শাস্তি কমিয়ে দিতে বলব। আর যদি আপনি আমাদের সঙ্গে যেতে অস্বীকার করেন, তাহলে নিশ্চয় আপনি জানেন তিনি কে? এবং তার ক্ষমতা কতখানি? আপনাকে এবং আপনার কওমকে ধ্বংস করতে তার বেশি কিছুর দরকার হবে না।'

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুনে মুচকি হাসি দিয়ে বললেন, 'আজ তোমরা ফিরে যাও, বিশ্রাম নিয়ে আগামীকাল এসো।'

পরের দিন তারা প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কি আমাদের সঙ্গে কিসরার দরবারে যেতে তৈরি হয়েছেন? '

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন :

'আর কখনোই তোমরা কিসরাকে দেখতে পাবে না। আল্লাহ তাকে ধ্বংস করে দিয়েছেন। অমুক মাসের অমুক তারিখের রাতে তার পুত্র 'শীরাওয়াই' কিসরাকে হত্যা করে পারস্যের ক্ষমতা দখল করেছে।'

তাদের চোখে মুখে বিস্ময় ও ব্যাকুলতা ফুটে উঠল। দৃষ্টিকে তীক্ষ্ম করে তারা প্রিয় নবীর চেহারা পড়তে চেষ্টা করল এবং জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কি জানেন আপনি কি বলছেন?! একথা কি আমরা 'বাযান' কে লিখে জানাব?!'

তিনি জবাব দিলেন, 'অবশ্যই, লিখে দাও এবং তাকে এটাও জানিয়ে দাও, আমার দীন খুব শিগগির পৌঁছে যাবে পারস্যসম্রাট কিসরার সাম্রাজ্যের শেষ সীমা পর্যন্ত। বাযান যদি ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে আমি তাকে দান করব সেই বিস্তীর্ণ অঞ্চল যা তার অধীনে রয়েছে আর তাকেই বাদশা বানাব তার কওম ও জাতির জন্য।'

* * *

তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবার থেকে উঠে পড়ল। সেখান থেকে বেরিয়ে অবিলম্বে ইয়েমেন সফর করে 'বাযান'-র সঙ্গে সাক্ষাৎ করল। তাকে সবিস্তারে নবীর সংবাদ শোনাল। সবকিছু শুনে বাযান মন্তব্য করলেন, 'মুহাম্মাদ যা বলেছে তা যদি সত্যি হয়, তাহলে তিনি নিঃসন্দেহে একজন নবী আর যদি তাঁর কথামতো ঘটনাটি না ঘটে থাকে, তাহলে তার ব্যাপারে আরও ভেবে সিদ্ধান্ত নেব।' এর একটু পরেই 'বাযান' এর নিকট এসে গেল কিসরার পুত্র 'শীরাওয়াইহি'-র পত্র। তাতে সে লিখেছে :

'আম্মা বাদ... আমি পারস্যসম্রাট কিসরাকে হত্যা করেছি। শুধুমাত্র পারস্যজাতির প্রতি কৃত তার অন্যায়-অপরাধের শাস্তি বিধানের উদ্দেশ্যেই আমি এ কাজ করেছি। কারণ, তিনি পারস্যজাতির শরীফ ও সম্ভ্রান্তদের হত্যা, নারীদের বন্দী এবং সম্পদ লুণ্ঠন করার ব্যাপক ও বাধাহীন প্রচলন ঘটিয়েছিলেন। যা হোক আমার এই পত্র-পাঠ আমার প্রতি তোমার এলাকার জনগণের বাইআত (আনুগত্যের শপথ) গ্রহণ করবে।'

'বাযান' শীরাওয়াইহি-র পত্র পাঠ করার সঙ্গে সঙ্গে সেটাকে দূরে ছুঁড়ে মারল এবং ইসলাম গ্রহণের স্পষ্ট ঘোষণা দিল। তার সঙ্গে ইয়েমেনে অবস্থানকারী পারস্যের সকলেই ইসলাম গ্রহণ করে নিল।

* * *

এ ছিল পারস্যসম্রাট কিসরার সঙ্গে আবদুল্লাহ ইবনে হুযাফা আস্-সাহমীর সাক্ষাতের কাহিনী।

তাহলে রোমসম্রাট 'কায়সার' এর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাতের কাহিনীটি কেমন ছিল?.. রোমসম্রাট 'কায়সার' এর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটেছিল উমর ইবনুল খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহুর শাসনামলে। সেখানে তাঁর সঙ্গে ঘটেছিল বিস্ময়কর ও মজার কাহিনী।

হিজরী উনিশতম বর্ষে হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু রোমসাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধের উদ্দেশ্যে একদল সেনা পাঠালেন, যাদের মাঝে ছিলেন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে হুযাফা আস্-সাহমী। রোমসম্রাট 'কায়সার' মুসলিমদের বিভিন্ন সংবাদ ও বৈশিষ্ট্যের কথা পূর্বেই শুনেছিলেন। তাদের খাঁটি ঈমান, মজবুত বিশ্বাস আর আল্লাহর পথে অকাতরে জীবনদানের কথাও তার কানে গিয়েছিল।

তাই তিনি নিজের লোকদের বলে রেখেছিলেন, 'তোমরা যদি কোনো মুসলিমসৈনিককে হাতে পাও, তবে যে কোনো উপায়ে তাকে আমার

নিকট জীবিত হাজির করবে।' আল্লাহর ইচ্ছায় আবদুল্লাহ ইবনে হুযাফা আস্-সাহমী রোমবাহিনীর হাতে বন্দী হলেন। তারা বন্দীকে তাদের সম্রাটের নিকট হাজির করে বলল,

'এ হলো মুহাম্মাদের অন্যতম শীর্ষ অনুসারী, বন্দী হয়েছে আমাদের হাতে। তাঁকে আপনার সামনে হাজির করলাম।'

* * *

রোমসম্রাট দীর্ঘসময় ধরে তাকিয়ে থাকলেন আবদুল্লাহ ইবনে হুযাফা আস্-সাহমীর দিকে। তাঁকে পরখ করলেন এবং এক সময় বলে বসলেন,

'আমি তোমাকে একটি প্রস্তাব দিচ্ছি।'

'কী প্রস্তাব সেটা?'

'তুমি খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করে নাও...

যদি তুমি প্রস্তাব মেনে নাও তাহলে তোমাকে মুক্ত করে দেব এবং রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় তোমার ঘরে ফেরার ব্যবস্থা করে দেব।'

যুদ্ধ বন্দী আবদুল্লাহ ইবনে হুযাফা ঘৃণাভরে সম্রাটের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন, 'হায় হায়! এটা কী করে হয়! এর চেয়ে মৃত্যুই আমার নিকট হাজার গুণ শ্রেষ্ঠ।'

এরপর রোমসম্রাট বলে উঠলেন, 'আমি নিশ্চিত তুমি একজন বিচক্ষণ মানুষ। একটু ভেবে দ্যাখো, তুমি আমার প্রস্তাব মেনে নিলে তোমাকে আমার ক্ষমতায় অংশীদার বানাব এবং আমার সাম্রাজ্যের অর্ধেক তোমাকে প্রদান করব।'

শিকল পরা বন্দী মিষ্টি হাসি দিয়ে বললেন-

وَاللهِ! لَوْاَعْطَيْتَنِىْ جَمِيْعَ مَاتَمْلِكَ، وَجَمِيْعَ مَا مَلَكَتْهُ الْعَرَبُ عَلٰى اَنْ اَرْجِعَ عَنْ دِيْنِ مُحَمَّدٍ طَرْفَةَ عَيْنٍ مَا فَعَلْتُ-

'আল্লাহর কসম! তুমি যদি আমাকে তোমার মালিকানাধীন সবটুকু এবং আরবদের অধিকারভুক্ত সকল অঞ্চল ও সম্পদ দিয়ে দাও এই শর্তে যে, আমি এক পলকের জন্য দীনে মুহাম্মাদী ত্যাগ করব, তবে শুনে রাখো আমি কস্মিনকালেও তা মানতে রাজি নই।'

সম্রাট বললেন, 'তাহলে তোমাকে হত্যা করব।'

'তোমার যা খুশি তাই করো, কিছুই আসে যায় না।'

এবার সম্রাট তাকে শূলীমঞ্চে উঠানোর নির্দেশ দিলেন, তাঁকে সেখানে নেওয়ার পর সম্রাট ভয় দেখানোর উদ্দেশ্যে জল্লাদকে স্থানীয় ভাষায় নির্দেশ দিলেন তাঁর হাতের কাছাকাছি তীর নিক্ষেপ করো। সম্রাট নিজে তাঁকে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণের দাওয়াত দিতে থাকলেন আর তিনি নির্দ্বিধায় প্রত্যাখ্যান করে চললেন।

সম্রাট পুনরায় জল্লাদকে নির্দেশ দিলেন তার পায়ের কাছাকাছি তীর ছুঁড়তে, আর যথারীতি আবদুল্লাহকে ইসলাম ত্যাগের জন্য উদ্বুদ্ধ করতে থাকলেন, কিন্তু তিনি স্পষ্ট ভাষায় অস্বীকৃতি জানাতেই থাকলেন।

এবার সম্রাট তাঁকে ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়ে বললেন,

'শূলীমঞ্চ থেকে তাঁকে নামিয়ে আনো।' সম্রাটের নির্দেশে সেখানে হাজির করা হলো বিশাল ডেগ—তাতে তেল ঢেলে আগুনের ওপর চড়িয়ে দেওয়া হলো। আগুনের উত্তাপে যখন তেল টগবগ করতে থাকল, তখন দু'জন মুসলিমকয়েদিকে সেখানে এনে ফুটন্ত তেলে নিক্ষেপ করা হলো, সঙ্গে সঙ্গে তাদের শরীরের গোস্ত পুড়ে গলে পৃথক হয়ে গেল, সারা দেহের চামড়া ও গোস্ত জ্বলে-পুড়ে হাড্ডি উন্মুক্ত হয়ে পড়ল। সম্রাট আবার আবদুল্লাহ ইবনে হুযাফার প্রতি মনোযোগ দিলেন, আবারও তাঁকে খ্রিস্টধর্মের প্রতি আহ্বান জানালে তিনি পূর্বের চাইতে অধিক জোরালো ভাষায় অস্বীকৃতি জানালেন।

রোমসম্রাট কায়সার যখন তাঁর খ্রিস্টধর্ম গ্রহণের ব্যাপারে হতাশ হয়ে পড়লেন, তখন তাঁকেও সেই ডেগচিতে নিক্ষেপের নির্দেশ দিলেন। তাঁকে

নিয়ে যাওয়ার সময় তাঁর দুই চোখ অশ্রুসজল দেখে লোকজন গিয়ে সম্রাটকে বলল, 'তিনি কাঁদছেন।' সম্রাট ভাবলেন, হয়তো মৃত্যুর ভয়ে ঘাবড়ে গেছে। ফলে তিনি বললেন, 'তাঁকে নিয়ে এসো।' সম্রাটের সামনে তাঁকে আনা হলে তিনি আবারও খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করতে বললে তিনি আগের মতোই অস্বীকার করলেন।

সম্রাট বললেন, 'আরে হতভাগা! যদি নাই মানবে তাহলে কাঁদছ কেন?'

তিনি বললেন, 'কাঁদছি তো এই দুঃখে যে, আমার দেহে প্রাণ রয়েছে মাত্র একটি, যা এখনই এই ফুটন্ত ডেগের মধ্যে ফেলে নিঃশেষ করে দেওয়া হবে। আহা! আমার কাছে যদি দেহের পশমের মতো অগণিত প্রাণ থাকত, আর সেই সবগুলো প্রাণ যদি আল্লাহর জন্য এভাবেই এই ডেগের মধ্যে ফেলে বিসর্জন দিতে পারতাম!'

নিজের সকল প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় চরম অপমানিত সম্রাট এবার একটু সহজ শর্ত দিয়ে বললেন, 'তুমি কি পারবে আরবদের রীতি হিসাবে আমার মাথায় চুমু দিয়ে শ্রদ্ধা জানাতে, তাহলেই আমি তোমাকে মুক্ত করে দেব।'

আবদুল্লাহ বললেন,
'চুমু দেব এক শর্তে, সকল মুসলিমবন্দীকেও মুক্তি দিতে হবে।'
সম্রাট রাজি হয়ে বললেন,
'ঠিক আছে সকল মুসলিমবন্দীকেও মুক্তি দেওয়া হবে।'

আবদুল্লাহ বলেন :
'আমি এই প্রস্তাব পেয়ে মনে মনে চিন্তা করলাম, আল্লাহর এক দুশমনের মাথায় চুমু দেওয়ার বিনিময়ে যদি আমার এবং এতগুলো মুসলিমবন্দীর মুক্তির ব্যবস্থা হয়ে যায় তাহলে ক্ষতি কী?'

এই চিন্তা করে তিনি সম্রাটের নিকট এগিয়ে গেলেন এবং তার মাথায় চুমু দিলেন। রোমসম্রাট কায়সার সকল মুসলিমবন্দীকে সমবেত করে

আবদুল্লাহ ইবনে হুযাফা আস্-সাহমীর নিকট সমর্পণের নির্দেশ দিলেন। এভাবেই সকল বন্দীর মুক্তি নিশ্চিত হলো।

* * *

আবদুল্লাহ ইবনে হুযাফা আস্-সাহমী খলীফা উমর ইবনুল খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। সবিস্তারে সকল সংবাদ তাঁর কাছে তুলে ধরলেন। উমর ফারূক রাযিয়াল্লাহু আনহু সবকিছু শুনে ভীষণ আনন্দিত হলেন। মুক্তিপ্রাপ্ত বন্দীদের দেখে তিনি মন্তব্য করলেন,

حَقٌّ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ اَنْ يُقَبِّلَ رَأْسَ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُذَافَةَ... وَاَنَا اَبْدَأُ بِذَالِكَ...

'প্রত্যেক মুসলিমের এখন উচিৎ হবে আবদুল্লাহ ইবনে হুযাফার মাথায় চুমু দেওয়া, আমি নিজেই এই শুভ কর্মের সূচনা করছি।'

একথা বলেই তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন এবং তাঁর মাথায় চুমু খেলেন।

তথ্যসূত্র :

১. *আল-ইসাবা*, ২য় খণ্ড, ২৯৬ পৃষ্ঠা অথবা *আত্তারজামা*, ৪৬২২।
২. ইবনে হিশামের *আস-সীরাতুন্নববিয়্যাহ*, সূচিপত্র দ্রষ্টব্য।
৩. মুহাম্মাদ ইবনে ইউসুফ কান্ধলবীর *হায়াতুস সাহাবা*, ৪র্থ খণ্ডের সূচিপত্র দ্রষ্টব্য।
৪. *তাহযীবুত তাহযীব*, ৫ম খণ্ড, ১৮৫ পৃষ্ঠা।
৫. *ইমতাউল আসমা*, ১ম খণ্ড, ৩০৮,৪৪৪ পৃষ্ঠা।
৬. *হুসনুস সাহাবা*, ৩০৫ পৃষ্ঠা।
৭. *আল-মুহাব্বার*, ৭৭ পৃষ্ঠা।
৮. যাহাবীর *তারীখুল ইসলাম*, ২য় খণ্ড, ৮৮ পৃষ্ঠা।

উমায়ের ইবনে ওয়াহাব

> উমায়ের ইবনে ওয়াহাব (ইসলাম গ্রহণের পর) আমার কাছে কোনো কোনো পুত্রের চেয়ে বেশি প্রিয় হয়ে গেছে।
>
> -উমর ইবনুল খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহু

উমায়ের ইবনে ওয়াহাব আল-জুমাহী (কাফের অবস্থায়) বদর যুদ্ধ থেকে কোনোরকমে নিজের জীবন নিয়ে পালাতে সক্ষম হলেন, কিন্তু পেছনে ফেলে আসতে হলো নিজ পুত্র ওয়াহাবকে মুসলিমবাহিনীর হাতে বন্দী অবস্থায়।

উমায়েরের আশঙ্কা হতে লাগল মুসলিমবাহিনী হয়তো তার যুবক পুত্রকে কঠিন শাস্তি দিয়ে তার অতীত জুলুমের বদলা নেবে। সে নিজে মক্কার জীবনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর এবং তাঁর সাহাবীদের ওপর প্রচুর জুলুম করেছে।

* * *

কোনো এক দুপুরে উমায়ের বাইতুল্লাহ শরীফে গেলেন কাবার তাওয়াফ করা এবং দেব-দেবীর শুভ দৃষ্টি কামনার উদ্দেশ্যে। তিনি

দেখলেন সফওয়ান ইবনে উমাইয়া* হাতীমে কাবার অন্তর্ভুক্ত ইসমাঈলী পাথরের পাশে বসে আছেন। উমায়ের তার কাছে এগিয়ে গিয়ে বললেন, 'সুপ্রভাত হে কুরাইশের সরদার!'

সফওয়ান বললেন, 'সুপ্রভাত আবু ওয়াহাব! এসো, দু-দণ্ড বসে একটু সুখ-দুঃখের কথা বলি। আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে আমাদের এই দুঃসময়ের বেদনা কিছুটা লাঘব হবে।'

উমায়ের বসে পড়লেন সফওয়ানের সম্মুখে। দু'জনে মিলে স্মৃতিচারণ করতে লাগলেন বদর যুদ্ধের এবং সেখানে তাদের ভয়াবহ ও গ্লানিকর পরাজয়ের। তারা মুহাম্মাদ ও তার সঙ্গীদের হাতে তাদের বন্দীদের সংখ্যা গণনা করলেন। তারা নিহত সেইসব কুরাইশী নেতার স্মরণে বেদনায় শিউরে উঠলেন, যাদেরকে মুসলিমসৈনিকদের তরবারি নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেছে এবং প্রাচীনকালের কালীব জলাশয়ের গভীরতা যাদের লাশ দিয়ে ভরাট করা হয়েছে। এরপর সফওয়ান ইবনে উমাইয়া হতাশার দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে টেনে টেনে বললেন :

لَيْسَ وَاللهِ فِي الْعَيْشِ خَيْرٌ بَعْدَهُمْ

'আল্লাহর কসম! ওইসব নেতাকে হারিয়ে (আর মুসলিমবাহিনীর হাতে আমাদের যুবক সন্তানদের বন্দী রেখে) এভাবে কাপুরুষের মতো বেঁচে থাকার মধ্যে কোনো গৌরব নেই।'

উমায়ের বললেন : 'সত্যি তুমি একেবারে যথার্থ কথাটিই বলেছ।' এরপর তিনি কিছুক্ষণ নীরব থেকে বললেন,

'এই কাবার প্রভুর কসম করে বলছি, আমার ঘাড়ে যদি কঠিন ঋণের বোঝা না থাকত, যা শোধ করতে আমি অক্ষম এবং যদি না থাকত

---

* সফওয়ান ইবনে উমাইয়া ইবনে খালফ আল-জুমাহী আল-কুরাইশী। বিখ্যাত বীর ও কুরাইশী এই নেতা মক্কা বিজয়ের পর ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। ইয়ারমূকের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। ৪১ হিজরীতে মক্কায় ইন্তেকাল করেন।

আমার পরিবার ও সন্তানাদি—আমার অবর্তমানে যাদের অনাহারে ও নিরাপত্তাহীনতায় ধুঁকে ধুঁকে মরতে হবে—তাহলে আমি এখনই ছুটে গিয়ে মুহাম্মাদকে খতম করে দিতাম, তাঁর কর্মকাণ্ডকে চিরতরে স্তব্ধ করে দিয়ে তাঁর জ্বালানো আগুন থেকে জাতিকে চিরস্থায়ী মুক্তির ব্যবস্থা করে ফেলতাম। এরপর চুপি চুপি বলার মতো মৃদু আওয়াজে বললেন, তা ছাড়া ওদের হাতে আমার পুত্র বন্দী থাকার কারণে আমার মদীনায় যাত্রা কারোর মনে ভিন্ন কোনো সন্দেহও জাগাবে না। সকলেই ভাববে পুত্রকে মুক্ত করার জন্যই এসেছে।'

* * *

সফওয়ান ইবনে উমাইয়া উমায়ের ইবনে ওয়াহাবের কথা (এবং কথার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত জিঘাংসা)কে গণ্য করলেন এক সোনালী সুযোগ হিসাবে, তিনি চাইলেন না এই সুযোগ হাতছাড়া হোক, ফলে রাজ্যের আগ্রহ কণ্ঠে ঢেলে তিনি বললেন,

'ওহে উমায়ের! তোমার সকল ঋণের দায়-দায়িত্ব আমার ওপর ছেড়ে দাও। আমার ওপর আস্থা রাখো। আমিই তোমাকে কথা দিচ্ছি তোমার সকল ঋণ আমি পরিশোধ করে দেব। আর তোমার পরিবারবর্গের ব্যাপারে আমার ওয়াদা রইল, আজ থেকে যতদিন আমি বেঁচে থাকব এবং তারা বেঁচে থাকবে, ওরা আমারই পরিবারের অংশ হয়ে থাকবে।

তোমার চিন্তার কিছুই নেই, আমার অঢেল সম্পদ তাদের জীবনের জন্য যথেষ্ট হবে। তাদের আরামদায়ক জীবন ও স্বাচ্ছন্দপূর্ণ জীবিকার ব্যবস্থা নিশ্চিত করবে। আমি তোমার সকল দুশ্চিন্তা ও আশঙ্কার ভার নিজ কাঁধে তুলে নিলাম।'

উমায়ের বললেন, 'তাহলে কথা এটাই ঠিক রইল.. তোমার আমার এই চুক্তির কথা গোপন রেখো, কেউ যেন একথা জানতে না পারে।'

সফওয়ান বললেন, 'কথা দিলাম, একথা কেউই জানতে পারবে না।'

উমায়ের বাইতুল্লাহ থেকে নিজ বাড়ির উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লেন, মুহাম্মাদের [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বিরুদ্ধে তার অন্তরে জ্বলতে থাকা প্রতিশোধের আগুন আজকের আলোচনায় দ্বিগুণ উত্তাপ ছড়াতে থাকল। নিজ সংকল্প বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে প্রস্তুতি গ্রহণ শুরু করলেন। তার এই মদীনার সফরকে সেখানের কারোর সন্দেহ করার আশঙ্কাও নেই। কারণ, মুসলিমদের হাতে বন্দীদের মুক্ত করার জন্য তাদের আত্মীয়-স্বজনদের মদীনায় আসা-যাওয়ার ধারা চালু ছিল।

* * *

উমায়ের ইবনে ওয়াহাবের নির্দেশে তার তরবারি আরও শাণিত করা হলো এবং তাতে মাখানো হলো বিষ... বাহন প্রস্তুত করে তার সম্মুখে পেশ করা হলে তিনি চড়ে বসলেন তার পিঠে। হত্যার গোপন পরিকল্পনা আর হিংসার আগুন বুকে নিয়ে রওনা দিলেন মদীনার অভিমুখে।

উমায়ের পৌঁছে গেলেন মদীনায়, রাসূলকে খোঁজার উদ্দেশ্যে মসজিদে নববীর দিকে এগিয়ে গেলেন। মসজিদের গেটের কাছে পৌঁছার পর তিনি বসিয়ে দিলেন তার বাহন, নেমে পড়লেন উটের পিঠ থেকে।

* * *

ঠিক সেই মুহূর্তে উমর ইবনুল খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহু কয়েকজন সাহাবীর সঙ্গে মসজিদে নববীর সদর দরজায় বসেছিলেন। তাঁরা আলোচনা করছিলেন 'বদর' যুদ্ধ এবং যুদ্ধে কুরাইশদের চরম পরাজয়, তাদের নিহত নেতৃবৃন্দ ও যুদ্ধবন্দীদের নিয়ে। তাঁরা স্মরণ করছিলেন মুসলিমমুহাজির ও আনসারদের বীরত্বপূর্ণ অবদানের কথা। কৃতজ্ঞ হচ্ছিলেন নিজেদের প্রতি আল্লাহর সাহায্য নেমে আসার কারণে। শুকরিয়া আদায় করছিলেন শত্রুদের পরাজয়, আহত, নিহত ও বন্দীত্বের লাঞ্ছনার কারণে। এরই মধ্যে হঠাৎ হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু মসজিদের দরজার দিকে দৃষ্টি ফেরালে তিনি দেখতে পেলেন উমায়ের

ইবনে ওয়াহাব উটের পিঠ থেকে নেমে উন্মুক্ত তরবারি নিয়ে মসজিদে প্রবেশ করছে। উমর আতঙ্কে চিৎকার দিয়ে উঠলেন,

'ঐ দেখো, আল্লাহর দুশমন! কুত্তা উমায়ের ইবনে ওয়াহাব... আল্লাহর কসম! সে কোনো না-কোনো কু-মতলব নিয়েই এসেছে। মক্কায় সে আমাদের বিরুদ্ধে মুশরিকদের উত্তেজিত করত, বদর যুদ্ধের পূর্বক্ষণেও সে মুসলিমদের বিরুদ্ধে গুপ্তচরবৃত্তিতে ভীষণ ব্যস্ত ছিল। কোনো ভালো মতলবে তার আসার কথা নয়।'

তিনি সঙ্গীদের বললেন,

'তোমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে চলে যাও। চতুর্দিক থেকে তাঁকে ঘিরে রাখো, তাঁর নিরাপত্তা জোরদার করো। সর্বোচ্চ সতর্ক থাক। এই কুচক্রী শয়তানটা যেন কোনো দুর্ঘটনা না ঘটাতে পারে।'

উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু নিজে দৌড়ে গেলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে। বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহর দুশমন উমায়ের ইবনে ওয়াহাব নাঙ্গা তলোয়ার নিয়ে মসজিদে প্রবেশ করেছে। সে অবশ্যই কোনো কু-মতলব নিয়ে এসেছে।'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'ওকে আমার কাছে নিয়ে এসো।' হযরত উমর ফারুক রাযিয়াল্লাহু আনহু ছুটে গেলেন উমায়ের ইবনে ওয়াহাবের নিকট। তার জামার কলার চেপে ধরে, তরবারির খাপ গলায় রশির মতো পেঁচিয়ে তাকে রাসূলের সামনে হাজির করলেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই অবস্থা দেখে হযরত উমরকে নির্দেশ দিলেন,

'উমর! তাকে ছেড়ে দাও।' উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু সঙ্গে সঙ্গে তাকে ছেড়ে দিলেন। নবীজী আবার তাকে বললেন, 'উমর! তার থেকে একটু দূরে সরে যাও।' তিনি দূরে সরে দাঁড়ালেন।

এবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উমায়ের ইবনে ওয়াহাবকে বললেন, 'উমায়ের! আমার কাছে এসে বসো।'

তিনি নবীজীর কাছে গিয়ে 'সুপ্রভাত' বলে জাহেলী যুগের নিয়ম মতো সালাম দিলেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'হে উমায়ের! আল্লাহ তাআলা আমাদের এরচেয়ে উত্তম অভিবাদন দান করেছেন 'আস-সালামু আলাইকুম', আর এটাই হবে জান্নাতীদের সালাম ও অভিবাদন।'

উমায়ের বললেন, 'খুব বেশিদিন হয়নি ঐ অভিবাদনটাই তোমার এবং আমাদের সকলের মাঝে প্রচলিত ছিল। তোমার অভিবাদনটা আমাদের কাছে একেবারে নতুন ও অজানা।'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞাসা করলেন,

'উমায়ের! কী উদ্দেশ্যে এসেছ?'

'এসেছি আমার পুত্রকে ছাড়ানোর আশা নিয়ে—যে রয়েছে তোমাদের কাছে বন্দী। আশা করি এ ব্যাপারে আমাকে সহযোগিতা দেবে।'

'উদ্দেশ্য যদি তাই হবে তাহলে উন্মুক্ত এই তরবারি নিয়ে যুদ্ধ-সাজে কেন?'

'ধ্বংস হোক এসব তরবারি, বদরের যুদ্ধে এগুলো কি আমাদের কোনো কাজে এসেছে? সত্যি বলছি, এছাড়া আমার আর কোনো উদ্দেশ্য নেই।'

'তুমি সত্য বলছ না..., তুমি সফওয়ান ইবনে উমাইয়ার সঙ্গে হাতীমে কাবার অন্তর্গত ইসমাঈলী পাথরের পাশে বসে কুরাইশী নেতাদের লাশ দিয়ে কালীব জলাশয় ভরাট করার বিষয়ে আলোচনা করেছিলে। সে সময় তুমি বলেছিলে :

'আমার ঘাড়ে যদি ঋণের বোঝা না থাকত এবং পরিবার না থাকত, তাহলে আমি এক্ষুণি গিয়ে মুহাম্মাদকে খতম করে ফেলতাম... তখন

সফওয়ান ইবনে উমাইয়া তোমার ঋণ ও পরিবারের দায়িত্ব নিয়ে নিল এই চুক্তিতে যে, তুমি আমাকে খতম করে দেবে... আল্লাহ তোমার আর তোমার ঐ পরিকল্পনার মাঝে দেয়াল খাড়া করে দিয়েছেন।'

এসব কথা শুনে উমায়ের যেন কথা বলার শক্তি হারিয়ে ফেললেন, বেশ কিছু সময় রাসূলের মুখের দিকে হা করে নির্বাক তাকিয়ে থেকে বললেন,

اَشْهَدُ اَنَّكَ لَرَسُوْلُ اللهِ

'আমি দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করছি যে, আপনি আল্লাহর রাসূল, এতে কোনো সন্দেহ নেই।'

তিনি বলতে লাগলেন,

'হে আল্লাহর রাসূল! আপনার কাছে যে ওহী নাজিল হতো এবং আমাদের আপনি আসমানের যেসব খবর শোনাতেন, সেসব বিষয়ে আমরা সর্বদা আপনাকে মিথ্যাবাদী বলে সাব্যস্ত করতাম। কিন্তু সফওয়ান ইবনে উমাইয়ার সঙ্গে আমার যে আলাপ-আলোচনা হয়েছে, সেটা শুধু আমরা দু'জনই জানি। আমরা ছাড়া সেটা আর কেউই জানে না। আমি আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি, আমার মাঝে সন্দেহাতীত বিশ্বাস ও ইয়াকীন জন্ম নিয়েছে যে এটা আল্লাহই আপনাকে জানিয়ে দিয়েছেন...

অতএব, প্রাণখুলে প্রশংসা করছি ঐ আল্লাহর যিনি আমাকে ইসলামের সত্য-সঠিক পথে পরিচালনার উদ্দেশ্যে আপনার নিকট টেনে এনেছেন।'

সঙ্গে সঙ্গে তিনি পড়লেন-

اَشْهَدُ اَنْ لَآاِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُه وَرَسُوْلُه

'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই, আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসূল।'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের নির্দেশ দিলেন, 'তোমাদের এই ভাইকে ইসলাম ও কুরআনের শিক্ষা দাও আর মুক্ত করে দাও তার বন্দী পুত্রকে।'

* * *

মুসলিমজাতি উমায়ের ইবনে ওয়াহাবের ইসলাম গ্রহণে ভীষণ আনন্দিত হলো। এমনকি উমর ইবনুল খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহু বলে উঠলেন,

لَخِنْزِيْرٌ كَانَ اَحَبَّ اِلَّى مِنْ عُمَيْرِبْنِ وَهَبٍ حِيْنَ قَدِمَ عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-وَهُوَ الْيَوْمَ اَحَبُّ اِلَّى مِنْ بَعْضِ اَبْنَائِىْ

'উমায়ের ইবনে ওয়াহাব যখন রাসূলের দরবারে খোলা তরবারি নিয়ে তাঁকে হত্যার উদ্দেশ্যে এসেছিল, তখন সে ছিল আমার কাছে একটি শূকরের চেয়ে বেশি জঘন্য আর আজ ইসলাম গ্রহণের পর সে আমার কাছে হয়ে পড়েছে কোনো কোনো সন্তানের চেয়ে বেশি প্রিয়।'

* * *

মদীনাতে যে সময় উমায়ের ইবনে ওয়াহাব নিজেকে পরিশুদ্ধ করছিলেন ইসলামী শিক্ষায়, আলোকিত করছিলেন অন্তরকে কুরআনের আলোয়, পার করছিলেন নিজের জীবনের চমৎকার ও সুখময় দিন—যা তাঁকে ভুলিয়ে দিয়েছিল মক্কার কথা এবং মক্কায় ফেলে আসা পরিবারের কথা।

মক্কায় সেই মুহূর্তে সফওয়ান ইবনে উমাইয়া মনে মনে নানা রকম সুখ-স্বপ্নের জাল বিস্তার করছিলেন। কুরাইশের বিভিন্ন সভা-সমাবেশে আসা-যাওয়া করছিলেন আর উমায়ের-এর সঙ্গে কৃত গোপন চুক্তির দিকে ইঙ্গিত দিয়ে বলছিলেন, 'হে কুরাইশের লোকেরা! খুব শিগগির এক মহা

সুসংবাদের প্রতীক্ষা করো—যা তোমাদের ভুলিয়ে দেবে বদরের সকল দুঃখ-বেদনা, মুছে দেবে তোমাদের হৃদয় থেকে পরাজয়ের সকল গ্লানি।

* * *

সফওয়ান ইবনে উমাইয়ার অপেক্ষার পালা দীর্ঘ হতে থাকল। একটু একটু করে অস্থিরতা তার ভেতরটাকে উদ্বিগ্ন করে তুলল। এক সময় ফুটন্ত কড়াইয়ের ওপর খৈ এর মতো ফুটতে আর ছটফট করতে শুরু করলেন তিনি। মদীনা থেকে আগত যে কোনো বণিক বা যাত্রীকে প্রশ্ন করেন উমায়ের ইবনে ওয়াহাবের ব্যাপারে। কিন্তু কারও কাছেই পান না সন্তোষজনক জবাব। সবশেষে এক আরোহী এসে জানাল 'উমায়ের ইসলাম কবুল করেছেন।'

এটা কোনো সংবাদ নয়, যেন তার মাথার ওপর ঘটল ভয়াবহ বজ্রপাত... কারণ, সফওয়ান বিশ্বাস করত সারা পৃথিবীর মানুষ ইসলাম কবুল করলেও উমায়ের অন্তত কখনোই একাজ করবে না।

* * *

ওদিকে উমায়ের ইবনে ওয়াহাব দীনের শিক্ষা নিতে থাকলেন, হিফয করতে থাকলেন কুরআন মাজীদ। এক পর্যায়ে তিনি প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হয়ে বললেন,

'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আমার অতীত কাটিয়েছি আল্লাহর নূর (ইসলামের আলো) নিভিয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টায়। সত্য দীনের বিরুদ্ধে দীনের ওপর প্রতিষ্ঠিত মুসলিমদের ওপর চরম নির্যাতন করে। আমার খুব ইচ্ছা আমাকে মক্কায় যাওয়ার অনুমতি দেবেন। আমি কুরাইশের লোকজনকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে ডাকতে চাই, ইসলাম গ্রহণে তাদের উদ্বুদ্ধ করতে চাই। যদি তারা আমার দাওয়াত কবুল করে নেয় তাহলে তো খুবই ভালো। আর যদি প্রত্যাখ্যান করে, তাহলে আমি

তাদের ওপর সেভাবেই নির্যাতন করব যেভাবে করতাম আল্লাহর রাসূলের সাহাবীদের ওপর।'

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে অনুমতি প্রদান করলে তিনি মক্কায় এসে পড়লেন। হাজির হলেন সফওয়ান ইবনে উমায়ের-এর গৃহে।

তাকে বললেন :

'হে সফওয়ান! তুমি মক্কার একজন প্রসিদ্ধ নেতা। তুমি কুরাইশের অন্যতম সেরা জ্ঞানী-বুদ্ধিজীবি। তুমি একটু চিন্তা করে দ্যাখো তো, এই যে তোমরা পাথরের তৈরি দেব-দেবীর পূজা করো এবং ওইসব নিষ্প্রাণ মূর্তির উদ্দেশ্যে কুরবানী করে থাক, বুদ্ধি-বিবেকের বিচারে এটা কি দীন-ধর্ম হওয়ার যোগ্য?

আমি চিন্তা-ভাবনা করে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি, আমি দৃপ্ত শপথে ঘোষণা দিচ্ছি যে, 'আল্লাহ ছাড়া ইবাদত ও আনুগত্যের উপযুক্ত আর কোনো মাবুদ নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর প্রেরিত রাসূল।'

* * *

উমায়ের ইবনে ওয়াহাব মক্কায় একের পর এক মানুষকে আল্লাহর পথে ডাকতে থাকলেন। বহু মানুষ তাঁর পবিত্র হাতে হাত রেখে ইসলামের কালিমা পড়ে জান্নাতী কাফেলায় শামিল হলো।

হে আল্লাহ! উমায়ের ইবনে ওয়াহাবকে সীমাহীন পুরস্কারে ভূষিত করো, তাঁর কবরকে তোমার নূর ও রহমতে ভরপুর করে দাও। আমীন।

তথ্যসূত্র :

১. *হায়াতুস সাহাবা*, ৪র্থ খণ্ডের সূচিপত্র দৃষ্টব্য।
২. ইবনে হিশামের '*সীরাত*', সূচিপত্র দ্রষ্টব্য।
৩. *আল-ইসাবা*, ৩য় খণ্ড, ৩৬ পৃষ্ঠা অথবা *আত্তারজামা*, ৬০৫৮।
৪. *তাবাকাতু ইবনি সাআদ* : ৪র্থ খণ্ড, ১৪৬ পৃষ্ঠা।

বারা ইবনে মালেক আল-আনসারী

খবরদার! তোমরা কখনো বারাকে কোনো মুসলিমবাহিনীর সেনাপতি বানিয়ো না। কারণ, নিজের দুর্দান্ত, দুঃসাহসী ও মারকুটে মনোভাবের ফলে তিনি নিজ সেনাদলকে বিপদের মুখে ঠেলে দিতে পারেন।

–উমর ইবনুল খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহু

তিনি ছিলেন কোঁকড়ানো চুল, শীর্ণ দেহের অধিকারী একেবারে হাড়-হাড্ডি দেখা যায় এমন। তাঁর ঐ রোগা-পাতলা দুর্বলদেহের দিকে তাকিয়ে থাকা ছিল দর্শকের জন্য কষ্টদায়ক।

কিন্তু তাতে কি! এই দেহ নিয়েই তিনি দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রায় শতাধিক মুশরিককে খতম করে জাহান্নামে পাঠিয়েছেন। এছাড়া আরও বহু সম্মুখ সমরে তিনি অন্য যোদ্ধাদের সঙ্গে কত কাফের-মুশরিক যে হত্যা করেছেন তার সঠিক হিসাব বলা বেশ কঠিন।

তিনিই সেই দুঃসাহসী মারকুটে বীর, যিনি নিজ দলের তোয়াক্কা না করে একাই শত্রু পক্ষের সকল বাধা ভেদ করে সম্মুখে এগিয়ে যেতেন। জিহাদের ময়দানে যার এই বেপরোয়া অগ্রগামিতার কারণে বিচক্ষণ খলীফা উমর ফারুক রাযিয়াল্লাহু আনহু মুসলিম-সাম্রাজ্যের গভর্নরদের কাছে এক বিশেষ নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিলেন এই মর্মে–

'খবরদার! তোমরা কখনো তাকে কোনো মুসলিমবাহিনীর সেনাপতি বানিয়ে পাঠিয়ো না। কারণ, নিজের বেপরোয়া দুঃসাহসী মনোভাবের ফলে তিনি নিজ বাহিনীকে বিপদের মুখে ঠেলে দিতে পারেন।'

তিনিই হচ্ছেন প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খাদেম আনাস ইবনে মালেকের ভাই বারা ইবনে মালেক আল-আনসারী।

আমি যদি তোমার জন্য বারা ইবনে মালেকের বীরত্বপূর্ণ কাহিনীর আলোচনা শুরু করি, তাহলে কথা হয়ে পড়বে অনেক দীর্ঘ আর স্থান হয়ে যাবে সঙ্কুচিত। সেজন্যই আমি ভাবছি পাঠকের কাছে তাঁর বীরত্বের মাত্র একটি কাহিনী তুলে ধরব, যা পড়লে বোঝা যাবে তাঁর অন্যান্য কাহিনী কেমন হতে পারে!

* * *

তাঁর বীরত্ব ও সাহসের এই কাহিনী শুরু হয় প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাত ও মহান প্রভুর সান্নিধ্যে তাঁর মিলিত হওয়ার পর। যখন আরবের বিভিন্ন জাতি-উপজাতি আল্লাহর দীন থেকে দলে দলে বেরিয়ে যাওয়া শুরু করেছিল, যেমন করেছিল তারা এই দীন ইসলামে প্রবেশের বেলায়।

ধর্মত্যাগের এই ফিৎনা এমন ব্যাপক রূপ ধারণ করল যে মক্কা, মদীনা ও তায়েফের বাসিন্দারা এবং এখানে-ওখানে বিচ্ছিন্ন কিছু মানুষই শুধু ইসলাম ও ঈমানের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকলেন, বাকি সবাই হয়ে পড়ল দীন ত্যাগী মুরতাদ।

এই জটিল ও ভয়াবহ ফিৎনা বিস্তারকালে আল্লাহর দীন রক্ষায় পাহাড়ের মতো অটল, অনড় ও অবিচল রইলেন সিদ্দীকে আকবার হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু। তিনি মুহাজির ও আনসারদের মিলিয়ে এগারোটি সশস্ত্র দল প্রস্তুত করলেন এবং এগারোটি ঝাণ্ডা প্রত্যেক সেনাপতির হাতে তুলে দিলেন। জাযিরাতুল আরবের সকল প্রান্তে পাঠিয়ে দিলেন তাদের—যেন দীনত্যাগী মুরতাদদের সত্য ও

হিদায়াতের পথে ফিরিয়ে আনা যায়। তরবারির ভয় দেখিয়ে হলেও বিচ্যুতদের যেন আবার দীনের ওপর প্রতিষ্ঠিত করা যায়।

মুরতাদদের মধ্যে সংখ্যা ও শক্তিতে সর্ববৃহৎ দলটি ছিল হানীফা গোত্রের মুসায়লামাতুল কাযযাবের অনুসারী। এই দলে মুসায়লামার পক্ষে সংঘবদ্ধ হয়েছিল তার নিজ গোত্র ও চুক্তিবদ্ধ গোত্রের মোট চল্লিশ হাজার দুর্ধর্ষ যোদ্ধা।

যাদের অধিকাংশই মুসায়লামার দলে যোগ দিয়েছিল একেবারে অন্ধ গোত্রপ্রীতির কারণে, তার প্রতি আস্থা ও বিশ্বাসের কারণে নয়। একথা তাদের কারও কারও বক্তব্যে স্পষ্ট ধরা পড়ত। তারা বলত,

أَشْهَدُ أَنَّ مُسَيْلَمَةَ كَذَّابٌ وَمُحَمَّدٌ صَادِقٌ لٰكِنَّ كَذَّابَ رَبِيْعَةَ أَحَبُّ إِلَيْنَا

مِنْ صَادِقِ مُضَرْ

'আমি নিঃসন্দেহে ঘোষণা দিচ্ছি যে, মুসায়লামা মিথ্যুক ও ভণ্ড নবী এবং মুহাম্মাদ সত্যবাদী ও সত্য নবী। কিন্তু কুরাইশের সত্যবাদীর চেয়ে আমাদের নিকট নিজগোত্র রাবীআর মিথ্যাবাদীই ভালো।'

* * *

মুসলিমসৈনিকদের প্রথম যে দলটিকে আবু জাহলের পুত্র ইকরিমা রাযিয়াল্লাহু আনহুর নেতৃত্বে মুসায়লামার বিরুদ্ধে পাঠানো হয়েছিল, মুসায়লামা তাদের পরাজিত করে পিছু হঠতে বাধ্য করে।

এরপর হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহু তার বিরুদ্ধে পাঠালেন দ্বিতীয় বাহিনী খালিদ ইবনে ওয়ালীদের নেতৃত্বে। এই দলে অন্তর্ভুক্ত করলেন মুহাজির ও আনসারের বিশিষ্ট সাহাবায়ে কেরামকে। যাঁদের শীর্ষে ছিলেন বারা ইবনে মালেক আল-আনসারী রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং একদল দুঃসাহসী যোদ্ধা সাহাবী।

* * *

নজদের ইয়ামামা প্রান্তরে খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ এবং মুসায়লামার বাহিনীর মাঝে শুরু হলো প্রচণ্ড রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ। অল্পসময়ের মধ্যে মুসায়লামার বাহিনী ময়দান নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে ফেলল। বিজয়ের পাল্লা ঝুঁকে রইল তাদের দিকে। মুসলিমবাহিনীর অবস্থা হয়ে পড়ল শোচনীয়। তাঁদের পায়ের নিচ থেকে মাটি যেন সরে যেতে থাকল। তাঁরা নিজ নিজ অবস্থান থেকে পিছু হটতে বাধ্য হলো। মুসায়লামার লোকজন খালিদ ইবনুল ওয়ালীদের বিশাল তাঁবুতে ঢুকে পড়ে তার খুঁটিগুলো উপড়ে ফেলল এবং তাঁর স্ত্রীকে হত্যা করেই ফেলত যদি না তাদেরই একজন 'স্ত্রী হত্যা কাপুরুষোচিত ও অন্যায় কর্ম' বলে তাদেরকে বাধা দান করত।

এতক্ষণে মুসলিমবাহিনী ভয়াবহ ও শোচনীয় পরাজয়ের সম্ভাবনা আঁচ করতে পারল। এই আশঙ্কা চরমভাবে তাঁদের অনুভূতিতে আঘাত হানল যে, আজ মুসায়লামার কাছে যদি তাঁদের পরাজয় ঘটে, তাহলে আর কখনো ইসলামের পক্ষে দাঁড়ানোর জন্য কোথাও কেউ থাকবে না। শিরকমুক্ত জাযিরাতুল আরবে এক অদ্বিতীয়, লা-শারীক আল্লাহর ইবাদত করার কাউকে খুঁজে পাওয়া যাবে না।

হযরত খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ নিজ তাঁবু শত্রুদের দ্বারা আক্রান্ত হওয়ায় নড়ে-চড়ে উঠলেন। ঝড়ো হাওয়ার গতিতে তিনি সেনাদলের সর্বত্র ছুটতে থাকলেন। ছোট-বড় সকল ত্রুটি-বিচ্যুতি চিহ্নিত করে সেগুলো মাথায় রেখে দল পুনর্গঠন করলেন। প্রধান ও স্বতন্ত্র পরিচিতি বজায় রেখে তিনি সেনাদলকে আলাদা আলাদা বিভাগে ভাগ করলেন। ফলে মুসলিমবাহিনীর মধ্যে মুহাজির পৃথক হলো আনসার থেকে, মরুচারী বেদুইন যোদ্ধা দল শহুরে যোদ্ধাদের থেকে আলাদা হলো। এমনকি বিভিন্ন গোত্রীয় যোদ্ধাদের নিজ নিজ গোত্র-প্রধানের অধীন করে দেওয়া হলো। তারই হাতে গোত্রীয় পতাকা তুলে দিয়ে তাকে করা হলো উপ-প্রধান। এসব করা হলো যেন যুদ্ধের ময়দানে প্রত্যেক দল ও উপদল

নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থেই শত্রুর বিরুদ্ধে মরণপণ লড়াই চালিয়ে যায় এবং শত্রুবাহিনীর আক্রমণ কোন দলে বা উপ-দলে হচ্ছে সেটা নির্ণয় করে সহজে ব্যবস্থা নেওয়া যায়।

* * *

দুই দলের মাঝে আবার শুরু হলো তুমুল যুদ্ধ—যার কোনো নজির ইতিপূর্বে আর দেখা যায়নি। এবার মুসলিমবাহিনীর চিত্র একেবারেই ভিন্ন। তারা দুশমনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল জীবন বাজি রেখে। মুসলিমবাহিনীর ঝলসে ওঠা মুজাহিদদের আক্রমণে দলে দলে মুসায়লামার মুরতাদবাহিনীর লাশ পড়তে থাকল। ইয়ামামার প্রান্তর লাশের স্তুপে পরিণত হলো। কিন্তু এত অধিক লাশ চোখে দেখেও মুসায়লামার লোকজনের মাঝে কোনো ভাবান্তর হলো না। যুদ্ধের ময়দানে পাহাড়ের মতো অবিচল থেকে তারা যুদ্ধ চালিয়ে যেতে লাগল। মুসলিমমুজাহিদরা বিস্ময়কর, অপূর্ব শৌর্য-বীর্য ও বাহাদুরির এমন পরাকাষ্ঠা দেখালেন, যা একত্র করলে বীরত্বের এক মহাকাব্য রচিত হয়ে যাবে।

এই যে সাবেত ইবনে কায়েস—আনসারদের পতাকাবাহী। তিনি ভাবছেন আজই আমি শহীদ হয়ে যাব। সুগন্ধি মাখছেন। কাফনের কাপড় পরে নিজের জন্য কবরের গর্ত খুঁড়ছেন। গর্তের মধ্যে হাঁটু পর্যন্ত গেড়ে নিজের অবস্থান গ্রহণ করছেন। তাঁর একহাতে কওমের পতাকা অন্য হাতে তরবারি। মরণজয়ী মুজাহিদের আবেগ নিয়ে লড়াই করতে করতে, শত্রুর আক্রমণ ঠেকাতে ঠেকাতে এক সময় শহীদ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন।

এই ময়দানেরই অন্য একটি চিত্র... উমর ইবনুল খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহুর ভাই যায়েদ ইবনুল খাত্তাব মুজাহিদবাহিনীকে চিৎকার করে আহ্বান করছেন-

يها النَّاسُ! عَضُّوْا عَلٰى اَضْرَاسِكُمْ، وَاضْرِبُوْا فِىْ عَدُوِّكُمْ وَامْضُوْا قُدُمًا-

يها النَّاسُ! وَاللهِ لَا اَتَكَلَّمُ بَعْدَ هٰذِهِ الْكَلِمَةِ اَبَدًا حَتّٰى يَهْزِمَ مُسَيْلَمَةُ اَوْ

قى اللهَ فَاُدْلِىْ اِلَيْهِ بِحُجَّتِىْ....

'আমার মুসলিমমুজাহিদ ভাইয়েরা! দাঁত কামড়ে নিজেদের আদর্শে মজবুত থাক, শত্রুকে নিপাত করতে করতে সম্মুখে এগিয়ে যাও। আল্লাহর শপথ! তোমাদের কাছে এটাই আমার সর্বশেষ আহ্বান, আমি হয়তো মুসায়লামাকে খতম করব, নয়ত আমি নিজেই খতম হয়ে যাব, আল্লাহর কাছে গিয়ে নিজের অক্ষমতার ওজর তুলে ধরব।'

একথা বলেই তিনি শত্রুবাহিনীর ওপর বীর বিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়লেন, বহু শত্রুসেনা নিপাত ঘটিয়ে এক সময় নিজের কসম পূর্ণ করে শাহাদাতের সিঁড়ি বেয়ে আল্লাহর দরবারে পৌঁছে গেলেন।

এই ময়দানের আরও এক মুজাহিদের নাম সালিম। তিনি আবু হুযায়ফার মুক্তদাস। তাঁর দায়িত্বে ছিল মুহাজিরদের পতাকা। তাঁর ব্যাপারে কওমের সকলে আশঙ্কা করতে লাগল, শত্রুর আক্রমণের মুখে হয়তো তিনি অনড় থাকতে পারবেন না। অথবা হয়তো যে কোনোপ্রকার দুর্বলতা তাঁর কাছ থেকে প্রকাশ পাবে। এ কারণেই সকলে মিলে তাঁকে জানালেন, 'আমাদের ভয় হচ্ছে আপনার এদিক থেকে আমরা আক্রান্ত হব।' একথা শুনে তিনি বললেন, 'আমার এদিক থেকে যদি তোমাদের শরীরে একটি আঘাতও লাগে, তবে বুঝবে আমার চেয়ে নিকৃষ্ট হাফিজে কুরআন একজনও নেই।'

একথা বলেই তিনি ঝাঁপিয়ে পড়লেন আল্লাহর দুশমনদের ওপর। নির্ভীক আক্রমণ চালিয়ে দুর্দান্ত লড়াই করলেন। প্রতিপক্ষ মুরতাদবাহিনীর তরবারির আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হলেন। ইসলামের পতাকা সমুচ্চ রেখেই এক সময় শহীদ হয়ে গেলেন।

কিন্তু সেদিন সকল মুজাহিদের এমন বিস্ময় জাগানো বীরত্বও একেবারে ম্লান হয়ে যায় বারা ইবনে মালেকের বীরত্বের পাশে।

সেনাপতি খালিদ ইবনে ওয়ালীদ যখন মনে করলেন লড়াই এখনই চূড়ান্ত পরিণতির দিকে গড়াবে। উভয় পক্ষের সংঘর্ষ এখন একেবারে তীব্র আকার ধারণ করেছে, তখন তিনি বারা ইবনে মালেকের উদ্দেশ্যে হাঁক ছাড়লেন,

'হে আনসারী নওজোয়ান! শত্রুবাহিনীর বিরুদ্ধে চূড়ান্ত আঘাত হানো, আল্লাহর দুশমনদের খতম করে দাও।'

বারা ইবনে মালেকের রক্ত যেন টগবগ করে ফুটতে লাগল। তিনি নিজ কওম আনসারদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন-

يَا مَعْشَرَالْأَنْصَارِ لَا يُفَكِّرَنَّ اَحَدٌ مِّنْكُمْ بِالرُّجُوْعِ إِلَى الْمَدِيْنَةِ فَلَا مَدِيْنَةَ لَكُمْ بَعْدَ الْيَوْمِ ... وَإِنَّمَا هُوَ اللهُ وَحْدَه ... ثُمَّ الْجَنَّةَ

'হে আনসারী ভাইয়েরা! তোমাদের কেউ যেন মদীনায় ফিরে যাওয়ার চিন্তা না করে। আজকের পর তোমাদের জন্য কোনো মদীনা থাকবে না। চূড়ান্ত লক্ষ্য থাকবে শুধুমাত্র লা-শারীক আল্লাহর তাওহীদকে সমুন্নত করা, এরপর একমাত্র গন্তব্য হবে জান্নাত...'

তিনি চূড়ান্ত হামলা করলেন মুরতাদ-মুশরিকদের ওপর। তাঁর সঙ্গে একযোগে হামলা করলেন সকল আনসার মুজাহিদ। বারা ইবনে মালেক দুর্বিনীত, দুর্দান্ত আক্রমণ চালিয়ে একাই দুশমনদের সারি ভেদ করে সামনে এগুতে থাকলেন। দুশমনদের গর্দানে তরবারির কোপ মারতে মারতে চারিদিকে লাশের স্তুপ জমা করে ফেললেন। মুসায়লামা এবং তার বাহিনীর পায়ের নিচে যেন ভূমিকম্প শুরু হয়ে গেল। কোনো রকমে জান বাঁচানোর আশায় তারা স্বদলবলে ঢুকে পড়ল সেই বাগানে—যা অগণিত লাশের স্তুপ জমা হওয়ার কারণে সেই দিনের পর ইতিহাসে প্রসিদ্ধ হয়েছে 'লাশের বাগান' নামে।

এই 'লাশের বাগান'টি ছিল বেশ প্রশস্ত পরিসর এবং উঁচু দেয়াল ঘেরা। মুসায়লামা এবং তার হাজার হাজার সৈনিক সেখানে ঢুকেই বাগানের ছোট-বড় সকল দরজা দিল বন্ধ করে। এর উঁচু দেয়ালের আশ্রয়ে নিজেদের প্রতিরক্ষাকে তারা নিশ্ছিদ্র করে নিল এবং ভেতর থেকে মুসলিমবাহিনীর বিরুদ্ধে বৃষ্টির মতো তীরের অবিরাম বর্ষণ করে তাদের নিশ্চিত বিজয় সম্ভাবনাকে পরাজয়ের দিকে ঘুরিয়ে দিল।

ময়দানের নতুন পরিস্থিতি অর্থাৎ মুসলিমবাহিনীর পরাজয় সম্ভাবনার ভয়াবহতা আঁচ করে সামনে এগিয়ে এলেন দুর্দান্ত, দুঃসাহসী বীর সেনানী বারা ইবনে মালেক আল-আনসারী রাযিয়াল্লাহু আনহু। তিনি গ্রহণ করলেন এমন এক অবিশ্বাস্য কৌশল, যার বদৌলতে আল্লাহ তাআলা মুসলিম-বাহিনীকে দান করলেন চূড়ান্ত বিজয়। আর মুরতাদ ও ভণ্ড নবীর দলকে দিলেন চিরতরে খতম করে।

বারা ইবনে মালেক শক্ত-সামর্থ্য কয়েকজন যোদ্ধাকে নির্দেশ দিয়ে বললেন,

'আমাকে একটি ঢালের ওপর বসিয়ে বর্শার ফলায় উঁচু করে বাগানের ভেতরে প্রধান ফটকের কাছে নিক্ষেপ করো। এতে দ্বার-রক্ষীদের হাতে হয়তো আমার জীবন যাবে, শহীদ হব; নইলে আমি তোমাদের জন্য দরজা খুলে দেব। তোমরা ঢুকতে পারলেই এর মধ্যে আশ্রয় নেওয়া ভণ্ড নবী ও তার বাহিনীকে চিরতরে খতম করে দেবে।'

* * *

চোখের পলকে বারা একটি ঢালের ওপর বসে পড়লেন। তিনি ছিলেন হালকা-পাতলা, শীর্ণদেহী। অনেকগুলো বর্শার আগা দিয়ে উঁচু করে 'লাশের বাগানে' তাঁকে নিক্ষেপ করা হলো। তিনি ওপর থেকে বজ্রপাতের মতো নেমেই দ্বার রক্ষীদের সঙ্গে মরণপণ লড়াই করে তাদের দশজনকে খতম করে জাহান্নামে পাঠিয়ে দিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে খুলে দিলেন দরজা। পঙ্গপালের মতো সেদিক দিয়ে হাজার হাজার মুজাহিদ

প্রবেশ করে ঝড়ের গতিতে মুসায়লামার প্রায় বিশ হাজার সৈনিককে হত্যা করে পৌছে গেলেন মুসায়লামার কাছে। অবিলম্বে তাকেও হত্যা করে পাঠানো হলো জাহান্নামে। কিন্তু এই ঘটনার মহানায়ক বারা ইবনে মালেককে দেখা গেল তীর, তরবারি, বর্শা ও বল্লমের প্রায় আশিটা আঘাতে জর্জরিত হয়ে জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে উপনীত।

* * *

অবিলম্বে তাঁকে চিকিৎসার উদ্দেশ্যে স্থানান্তর করা হলো। স্বয়ং সেনাপতি খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ দীর্ঘ একটি মাস তার চিকিৎসা ও সেবা শুশ্রুষায় ব্যয় করলেন। অবশেষে এই যুদ্ধের বিজয় যার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা দান করলেন সেই মহাবীর বারা ইবনে মালেক আল-আনসারী রাযিয়াল্লাহু আনহুকে আল্লাহ তাআলা পূর্ণ আরোগ্য দান করলেন। তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠলেন।

* * *

বারা ইবনে মালেক আল-আনসারী রাযিয়াল্লাহু আনহুর অন্তর শহীদী মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষায় ছটফট করতে থাকল, যে শাহাদাত লাভের সুযোগ তার হাতছাড়া হয়েছে 'লাশের বাগান'-এ।

প্রিয় নবীর সঙ্গে গিয়ে মিলিত হওয়ার বাসনা আর শাহাদাতের পেয়ালা পান করার আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের স্বপ্নে তিনি একটির পর একটি যুদ্ধের ময়দানে ছুটতে থাকেন। এভাবেই একদিন এসে গেল পারস্যনগরী 'তুসতার' বিজয়ের দিন। পারস্যবাসীরা 'তুসতার' নগরীর একটি সুউচ্চ ও দুর্ভেদ্য দুর্গে গিয়ে আশ্রয় নিল। উচ্চতা ও দুর্ভেদ্যতার কারণে যেহেতু সেই দুর্গের ভেতরে আক্রমণ পরিচালনা সম্ভব ছিল না, ফলে মুসলিমবাহিনী ঐ দুর্গের চতুর্দিক দিয়ে নিশ্ছিদ্র অবরোধ প্রতিষ্ঠা করল। খাদ্য-পানিসহ সকল জীবন উপকরণ সরবরাহ ব্যবস্থা রুদ্ধ হলো।

অবরোধ যখন দীর্ঘ হলো, পারস্যবাসীদের জন্য চতুর্মুখী বিপদ যখন ঘণিভূত হলো, তখন তারা দুর্গের ওপর থেকে লোহার শিকল ঝুলিয়ে

দিতে থাকল, যার সঙ্গে আটকানো থাকত আগুনে পোড়ানো উত্তপ্ত ট্যাটার মতো লোহার আংটা, সেটা মুসলিমদের গায়ে বিঁধিয়ে উপরে টেনে তোলা হচ্ছিল—হয় মৃত লাশ অথবা মৃতপ্রায় অবস্থায়।

ঐরূপ একটি আংটা বিদ্ধ হলো আনাস ইবনে মালেকের দেহে। বারা ইবনে মালেক নিজ ভাইয়ের এই দৃশ্য দেখে দুর্গের দেয়ালে লাফ দিয়ে ভাইকে বিদ্ধ করা শিকলটি শক্ত করে এক হাতে ধরে অন্যহাতে জ্বলন্ত আংটা খুলতে লেগে গেলেন। জ্বলন্ত আংটার উত্তাপে তার হাত পুড়ে ধোঁয়া উঠতে লাগল। তিনি সেদিকে ভ্রুক্ষেপ করলেন না। ভাইকে আংটামুক্ত করে যখন নিচে নামলেন তখন তাঁর হাত ও কবজিতে ছিল শুধু হাড্ডি। গোস্তের কোনো চিহ্নও সেখানে ছিল না।

বারা ইবনে মালেক আল্লাহর কাছে শাহাদাতের জন্য এই যুদ্ধে বিশেষভাবে প্রার্থনা করেছিলেন, যা আল্লাহ তাআলা কবুল করেছিলেন। ফলে এখানেই তিনি শাহাদাতের অমিয়সুধা পান করে মহান আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে গেলেন।

* * *

আল্লাহ তাআলা জান্নাতে বারা ইবনে মালেক আল-আনসারীর মুখ উজ্জ্বল ও আলোকিত করুন। তাঁর চক্ষুকে শীতল ও শান্তিময় করুন প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সান্নিধ্যসুখ দ্বারা। তিনি তাঁর প্রতি প্রীত ও সন্তুষ্ট হোন এবং তাঁকেও করে দিন প্রীত ও সন্তুষ্ট। আমীন।

তথ্যসূত্র :

১. *আল-ইসাবা*, ১ম খণ্ড, ১৪৩ পৃষ্ঠা, *আত্তারজামা*, ৬২০।
২. *আল-ইসতীআব*, ১ম খণ্ড, ১৩৭ পৃষ্ঠা।
৩. *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, ৩য় খণ্ড, ৪৪১ পৃষ্ঠা। ৭ম খণ্ড, ১৭ ও ১২১ পৃষ্ঠা।
৪. *তারীখুত তাবারী*, ১০ খণ্ডের সূচিপত্র দ্রষ্টব্য।
৫. *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, সূচিপত্র দ্রষ্টব্য।
৬. *আস-সীরাতুন্নবিয়্যাহ লিবনি হিশাম*, সূচিপত্র দৃষ্টব্য।
৭. *হায়াতুস সাহাবা*, ৪র্থ খণ্ডের সূচিপত্র দৃষ্টব্য।
৮. *কাদতু ফাতহি ফারিস*।

সুমামা ইবনে উসাল

কুরাইশের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক
অবরোধ আরোপকারী ব্যক্তিত্ব।

হিজরতের ষষ্ঠবর্ষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাওয়াত ইলাল্লাহ (আল্লাহর দিকে মানুষকে আহ্বান)-এর পরিসর আরও প্রশস্ত করার সংকল্প করলেন। এ উদ্দেশ্যে আরব-অনারবের বিভিন্ন রাজা-বাদশাদের কাছে তিনি আটটি পত্র লিখে পাঠালেন।

যাদের উদ্দেশ্যে চিঠি লেখা হয়েছিল তাদের অন্যতম ব্যক্তিত্ব ছিলেন সুমামা ইবনে উসাল আল-হানাফী।

কারণ, সুমামা ছিলেন জাহেলী যুগে আরবের এক বিখ্যাত নেতা...

হানীফা গোত্রের একজন নামকরা সর্দার...

এবং ইয়ামামার একজন দুর্দান্ত প্রতাপশালী বাদশা...

* * *

সুমামা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পত্র তাচ্ছিল্যের সঙ্গে এবং অগ্রাহ্যের মানসিকতায় গ্রহণ করলেন।

আত্ম-অহমিকা তাকে পেয়ে বসল। তিনি চিন্তা করলেন, আমি এত বড় বাদশা! আমার কাছে পত্র লেখার সাহস মুহাম্মাদ কোথায়

গেল? ফলে সত্য ও কল্যাণের আওয়াজ শুনতে তিনি অক্ষম ও বধির হয়ে গেলেন।

হিংসা ও হত্যার প্রবৃত্তি তার ঘাড়ে সওয়ার হলো, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হত্যা করে তাঁর মিশনকে চিরতরে স্তব্ধ করে দেওয়ার জন্য তাকে উত্তেজিত করে তুলল। তিনি মদীনায় এসে রাসূলকে চিরতরে খতম করার সুযোগ সন্ধান করতে লেগে গেলেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একবার অসাবধান অবস্থায় পেয়েও গেলেন। তিনি কুৎসিত ও জঘন্য অপকর্মটি করতে উদ্যতও হয়েছিলেন কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাঁর নবীকে রক্ষা করলেন এভাবে যে, শেষ মুহূর্তে তার চাচা তাকে নিজ সংকল্প থেকে নিবৃত্ত করে ফেললেন।

কিন্তু সুমামা রাসূলকে হত্যার সংকল্প থেকে নিবৃত্ত হলেও সাহাবায়ে কেরামকে হত্যার সংকল্প থেকে নিবৃত্ত হলেন না। সুতরাং তাঁদের হত্যা করার উদ্দেশ্যে সুযোগের অপেক্ষা করতে থাকলেন। এক সময় সুযোগ পেয়ে কয়েকজন সাহাবীকে অত্যন্ত নিষ্ঠুর ও নির্দয়ভাবে হত্যা করে গোপনে ইয়ামামায় পালিয়ে গেলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবে গুপ্ত হামলায় সাহাবায়ে কেরামের নিহত হওয়াতে অত্যন্ত ব্যথিত হলেন এবং এই হত্যাকাণ্ডের শাস্তি স্বরূপ হত্যাকারীকে হত্যা করা বৈধ বলে প্রকাশ্যে ঘোষণা দিলেন।

* * *

অল্প কিছুদিন পরেই সুমামা ইবনে উসাল বাইতুল্লাহর তাওয়াফ ও উমরা আদায়ের সংকল্প করলেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি ইয়ামামা থেকে মক্কার পথে বেরিয়ে পড়লেন। কাবার তাওয়াফ করবেন এবং দেব-দেবীর নামে পশু বলি দেবেন—মনে মনে এই আনন্দ স্বপ্ন দেখতে দেখতেই তিনি পৌঁছে গেলেন মদীনার কাছাকাছি।

* * *

মদীনার সন্নিকটে পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে সুমামা অকল্পনীয় এক বিপদের মুখে পড়ে গেলেন।

বিষয়টি ছিল : গুপ্ত হামলায় কয়েকজন সাহাবী নিহত হওয়ার পর পরই প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের সজাগ ও সতর্ক থাকার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এছাড়াও তিনি যে কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর অতর্কিত আক্রমণ থেকে নবগঠিত রাষ্ট্র মদীনাকে এবং এর নাগরিকদের রক্ষার উদ্দেশ্যে গঠন করেছিলেন বেশ কয়েকটি সশস্ত্র দল। যারা মদীনার প্রবেশ পথ ও অলি-গলিতে সতর্ক পাহাড়া ও টহল দিতে থাকত। সেই রকমের একটি টহল দল মদীনার সন্নিকটে সুমামার গতিবিধি সন্দেহজনক মনে করে, না চিনেই তাকে বন্দী করে মদীনায় নিয়ে আসে এবং মসজিদে নববীর একটি খুঁটির সঙ্গে বেঁধে রাখে, যেন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে বন্দী সম্পর্কে জেনে ফায়সালা করেন।

এরপর কোনো এক কাজে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাড়ি থেকে বেরিয়ে মসজিদের দিকে আসেন। প্রবেশ করতে গিয়েই তিনি সুমামাকে খুঁটির সঙ্গে বাঁধা দেখে বিস্মিত হয়ে পড়লেন। সাহাবীদের প্রশ্ন করলেন,

'তোমরা কি জানো কাকে ধরে এনেছ?'

তাঁরা সরলতার সঙ্গে জানালেন, 'না, ইয়া রাসূলাল্লাহ!'

'তিনিই সুমামা ইবনে উসাল আল-হানাফী। যা হোক তোমরা বন্দীর সঙ্গে উত্তম আচরণ করো।' প্রিয় নবী এই নির্দেশ দিয়ে বাড়ির ভেতর প্রবেশ করলেন এবং স্ত্রীদের বললেন, 'খাবার-দাবার যা তোমাদের কাছে আছে জমা করে সুমামা ইবনে উসালের জন্য পাঠিয়ে দাও...'

তিনি আরও নির্দেশ দিলেন, 'আমার উটনী সকাল-সন্ধ্যায় দোয়াবে এবং সুমামার জন্য দুধ পাঠিয়ে দেবে'

এসকল ব্যবস্থা তিনি করে ফেললেন তার সঙ্গে সাক্ষাৎ ও কথাবার্তা হওয়ার পূর্বেই।

* * *

এরপর নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুমামার মুখোমুখি হলেন, ধীরে ধীরে তাকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে তার সামনে গিয়ে বললেন,

'কী খবর সুমামা? কিছু কি বলার আছে?'

'আমার খবর ভালো হে মুহাম্মাদ! বলার কথা আমার এটুকুই যে, আমাকে যদি হত্যা করতে চাও হত্যার শাস্তি হিসাবে, আমি অবশ্যই তার উপযুক্ত। সুতরাং আমাকে হত্যা করলে তোমার বিরুদ্ধে বলার কিছু নেই। আর যদি খুনের অপরাধ ক্ষমা করে আমার প্রতি অনুগ্রহ করো তবে সেটাও বৃথা যাবে না। আজীবন কৃতজ্ঞ একজন মানুষ তোমার এই দয়া স্মরণ রাখবে। আর যদি মুক্তিপণ নিয়ে আমাকে ক্ষমা করতে চাও, তবে পরিমাণটা শুধু মুখ দিয়ে বলো, তোমার চাহিদা ষোলআনা পূর্ণ করা হবে।'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরের দুইদিন তাকে আর কিছুই বললেন না। যথারীতি তার জন্য খাদ্য, পানি ও উটনীর দুধ সরবরাহ চালু রাখা হলো। পরের দিন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে আবারও জিজ্ঞাসা করলেন,

'কী খবর সুমামা? কিছু কি তুমি বলতে চাও?'

'নতুন কিছুই আমার বলার নেই, বলার মতো যা ছিল পূর্বেই বলে ফেলেছি। যদি তুমি দয়া করতে চাও, তবে সেটা হবে যথার্থই একজন কৃতজ্ঞ ব্যক্তির প্রতি দয়া। আর যদি হত্যা করতে চাও, তবে সেটাও হবে যথার্থ অপরাধীরই যোগ্য শাস্তি। আর যদি তুমি রক্তপণ চাও, তবে শুধু

তোমার মুখটা একবার খোলো, তোমার চাহিদার সবটুকুই পূর্ণ করে দেওয়া হবে।'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবারও তাকে ওভাবেই আপন হালে ছেড়ে দিলেন। পরের দিন আবার এসে তাকে একই ভাবে প্রশ্ন করলেন,

'হে সুমামা! কিছু কি তোমার বলার আছে?'

'আমার বলার যা ছিল সবই তো তোমার কাছে বলেছি, তুমি যদি দয়া পরবশ হয়ে আমাকে ক্ষমা করো, তাহলে সারাজীবন আমি তোমার কৃতজ্ঞ থাকব। যদি আমাকে হত্যা করো, আমি তারই উপযুক্ত। আর যদি অর্থের বিনিময়ে আমাকে ক্ষমা করতে চাও, তবে তুমি যা চাইবে আমি তাই তোমাকে দিতে রাজি আছি।'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবার সাহাবীদের দিকে তাকিয়ে নির্দেশ দিলেন, 'সুমামার বন্ধন খুলে দাও'।

তাঁরা সুমামার বন্ধন খুলে তাকে মুক্ত করে দিলেন।

* * *

সুমামা মসজিদে নববী থেকে বের হলেন এবং মদীনার উপকণ্ঠে 'বাকী' এর সন্নিকটে অবস্থিত একটি খেজুর বাগানের নিকট পৌঁছে দেখলেন, বাগানের মধ্যে একটি মিষ্টি পানির ঝরনা। নিজের বাহন থামিয়ে নেমে পড়লেন সেখানে। পানিতে নেমে সুন্দরভাবে গোসল করে পবিত্র হলেন। আবার একই পথ ধরে মসজিদে ফিরে এলেন। মসজিদে ঢুকে একদল সাহাবীর সম্মুখে দাঁড়িয়ে স্পষ্ট ঘোষণা দিলেন,

اَشْهَدُ اَنْ لآاِلٰهَ اِلَّااللّٰهُ، وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُه وَرَسُوْلُه

'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই এবং আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা এবং রাসূল।'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এগিয়ে এসে বললেন,

'হে মুহাম্মাদ! আল্লাহর কসম! এই পৃথিবীতে আপনার চেয়ে ঘৃণিত মানুষ আমার কাছে আর কেউ ছিল না। অথচ আজ আমার কাছে এই পৃথিবীর সর্বাধিক প্রিয় মানুষ হয়ে গেছেন আপনি...

আল্লাহর কসম! আপনার ধর্মের চেয়ে বেশি ঘৃণিত আমার কাছে আর কোনো ধর্ম ছিল না অথচ আজ আপনার ধর্মই আমার কাছে হয়ে গেছে পৃথিবীর সর্বাধিক প্রিয় ধর্ম...

আল্লাহর কসম! আপনার শহর ছিল আমার কাছে এ পৃথিবীর সর্বাধিক ঘৃণিত ও নিকৃষ্ট শহর, অথচ সেটাই আজ আমার কাছে হয়ে গেছে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বাধিক প্রিয় শহর।'

এর পরপরই তিনি জিজ্ঞাসা করলেন,

আমি তো আপনার বেশ কজন সাহাবীকে হত্যা করেছি, সে অপরাধের জন্য আমাকে কী করতে বলেন? কী করলে আমার মুক্তি মিলবে?'

দয়ার নবী তাকে আশ্বস্ত করে বললেন,

لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكَ يَاثُمَامَةُ – فَإِنَّ الْإِسَلَامَ يَجُبُّ مَا قَبْلَه

'হে সুমামা! তুমি ইসলাম কবুল করে নিয়েছ বলে পূর্বের কোনো অপরাধের জন্যই তুমি আর অভিযুক্ত নও। কারণ, ইসলাম পূর্বের সকল অপরাধ মিটিয়ে দেয়।'

তিনি সুমামাকে সে সকল কল্যাণ, মর্যাদা ও ফজিলতের সুসংবাদ শোনালেন—ইসলাম গ্রহণের কারণে আল্লাহ যেগুলোর অধিকারী তাকে করেছেন।

নবীজীর জবান মুবারক থেকে ঐ শুভ সংবাদ শুনে তার চোখে-মুখে আনন্দ ঝিলিক মেরে উঠল। অতীত অপরাধের প্রায়শ্চিত্তের মনোভাব থেকেই তিনি স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলে উঠলেন,

'আমি আপনার যতজন সাহাবীকে হত্যা করেছি, এবার তার কয়েকগুণ বেশি কাফেরকে হত্যা করে ক্ষতিপূরণ করব। আমি শপথ করছি, এখন থেকে আপনার ও আপনার দীনের সাহায্যের জন্য সর্বদা হাজির থাকবে আমার দলবল, আমার শক্তি, অস্ত্রবল। এমনকি প্রয়োজন হলে আমার জীবনও আপনার যে কোনো খেদমতের জন্য উৎসর্গ করতে প্রস্তুত থাকব। এরপর তিনি প্রশ্ন করলেন উমরা আদায় প্রসঙ্গে,

'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার লোকেরা আমাকে ধরে এনেছে এবং এর মাধ্যমে আমার খুলে গেছে সৌভাগ্যের দুয়ার' আল-হামদুলিল্লাহ। কিন্তু আমি ইয়ামামা থেকে বেরিয়েছিলাম উমরা পালনের উদ্দেশ্যে। এ ব্যাপারে আমার জন্য আপনার নির্দেশ কি? আমি কি উমরা পালন করতে পারব?'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে নির্দেশ দিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, তুমি উমরা আদায় করতে পারবে, তবে আল্লাহর আদেশ ও রাসূলের শেখানো পন্থায়।' এরপর তাকে উমরা পালনের ইসলামী রীতি-নীতি শিখিয়ে দেওয়া হলো।

* * *

সুমামা যখন কাবার প্রবেশ পথ পর্যন্ত পৌঁছলেন, সেখানে ঢুকতে ঢুকতে আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত করে পড়তে থাকলেন,

'লাব্বাইক, আল্লাহুম্মা লাব্বাইক...
লাব্বাইক লা-শারীকা লাকা লাব্বাইক...
ইন্নাল হামদা ওয়ান্নিমাতা লাকা ওয়াল মুলক...
লা-শারীকা লাক...'

পৃথিবীর বুকে তিনিই সেই প্রথম গর্বিত মুসলিম যিনি 'লাব্বাইক' পড়তে পড়তে বাইতুল্লাহ-তে প্রবেশ করেছেন।

* * *

কুরাইশের লোকেরা লাব্বাইকের ধ্বনি শুনতে পেয়ে ভীত ও ক্রুদ্ধ হয়ে ছুটে এল। সকলেই তরবারিগুলো খাপ থেকে বের করে আওয়াজের উৎস খুঁজতে থাকল। সেই আওয়াজ তারা চিরতরে স্তব্ধ করে দিতে চায় যা তাদের প্রতিষ্ঠিত রীতি-নীতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে।

মুশরিক কুরাইশের লোকেরা যখন এগিয়ে এল সুমামার দিকে, তিনি তখন গর্বিত দৃষ্টিতে তাদের দিকে তাকিয়ে আরও উঁচু আওয়াজে 'লাব্বাইক' পড়তে থাকলেন। এতে কুরাইশী এক তরুণ এগিয়ে গেল তাকে তীর ছুঁড়ে হত্যার উদ্দেশ্যে। কয়েকজন নেতা তার দুই হাত চেপে ধরে বলল,

'আরে গাধা, জানো এটা কে?!

তিনিই হচ্ছেন ইয়ামামার বাদশা সুমামা ইবনে উসাল।

তার সঙ্গে যদি সামান্যতম দুর্ব্যবহার কেউ করো, তাহলে আমাদের খাদ্য-রসদ সব বন্ধ হবে। না খেয়ে আমাদের ধুঁকে ধুঁকে মরতে হবে।'

একথা শুনে সকলেই তরবারি খাপবদ্ধ করে সম্ভ্রমের সঙ্গে সুমামার কাছে এগিয়ে গেল। বিস্ময়ের সুরে জিজ্ঞাসা করল,

'কী হলো তোমার হে সুমামা?

তুমি কি নিজের আর বাপ-দাদার ধর্ম ত্যাগ করে বিধর্মী হয়ে গেলে?'

'বিধর্মী হইনি, পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম—মুহাম্মাদের ধর্মের অনুসারী হয়েছি।' এরপর তিনি একটু দম নিয়ে বললেন, 'তোমরা সবাই ভালো করে শুনে রাখো..

এই পবিত্র ঘরের প্রভুর কসম খেয়ে বলছি, আমি ইয়ামামা ফিরে যাওয়ার পর তোমরা গমের একটি দানা কিংবা একটি খাদ্য কণাও পাবে না, যতক্ষণ তোমাদের প্রথম থেকে শেষ ব্যক্তিটি পর্যন্ত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ না করবে।'

* * *

সুমামা ইবনে উসাল কুরাইশের সকলের চোখের সামনে দাপটের সঙ্গে ইসলামের নিয়মে উমরা করলেন..

কুরবানী করলেন আল্লাহর নামে, দেব-দেবীর নামে নয়। এরপর ফিরে গেলেন নিজ দেশ ইয়ামামায়। তিনি সকলকে আহ্বান জানালেন, কুরাইশের খাদ্য-রসদ বন্ধ করে দিতে। বাদশার এই আহ্বান দেশময় প্রচার হলে ইয়ামামার জনগণ প্রিয় বাদশার নির্দেশ মেনে মক্কাবাসীর খাদ্য-রসদ বন্ধ করে দিল।

* * *

সুমামা ইবনে উসাল কুরাইশের বিরুদ্ধে যে অবরোধ আরোপ করলেন তা ধীরে ধীরে ভয়ঙ্কর রূপ নিল। দ্রব্যমূল্য অস্বাভাবিক বেড়ে গেল। মানুষের মাঝে ক্ষুধা ও দুর্ভিক্ষ ছড়িয়ে পড়ল। ক্ষুধার যাতনা এবং ভবিষ্যতের চিত্র ভেবে তারা অস্থির হয়ে পড়ল। অনাহারে যখন নিজেদের ও সন্তানদের মৃত্যুর শোচনীয় আলামত দেখা যেতে লাগল, তখন তারা সকলে মিলে শলা-পরামর্শ করে রাসূলের নিকট পত্র লিখল,

'হে মুহাম্মাদ! আমরা জানি যে তুমি নিজে আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রেখে চলো এবং অন্যকেও সেই মহৎ আদর্শের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে থাক..

কিন্তু তোমার এ কেমন মহৎ আচরণ হলো যে আমাদের সঙ্গে তোমার রক্তের সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলছ। যুদ্ধের ময়দানে আমাদের বাপ-দাদাকে তো তরবারির আঘাতে নিঃশেষ করেছ আর এখন আমাদের সন্তানদের দুর্ভিক্ষ আর অনাহারে মারার আয়োজন সম্পন্ন করেছ।

তোমার অনুগত সুমামা ইবনে উসাল কতদিন থেকে আমাদের খাদ্য রপ্তানির ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে আমাদেরকে চরম দুর্ভিক্ষের মধ্যে ঠেলে দিয়েছে। তোমার যদি উচিৎ মনে হয়, তাহলে তাকে লিখে দাও যেন এই নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয় এবং অবিলম্বে আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য সরবরাহ চালু করে দেয়।'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের অনুরোধ রক্ষা করে সুমামার কাছে মক্কাবাসীর বিরুদ্ধে আরোপিত অবরোধ তুলে নেওয়ার অনুরোধ করলেন। সুমামাও প্রিয় নবীর নির্দেশে দ্রুত অবরোধ তুলে নিয়ে মক্কায় প্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরাহের নির্দেশ জারি করে দিলেন।

* * *

সুমামা ইবনে উসাল জীবনভর ছিলেন দীনের প্রতি বিশ্বস্ত ও নিষ্ঠাবান। প্রিয় নবীর সঙ্গে কৃত সকল অঙ্গিকার পালনে আজীবন ছিলেন বদ্ধপরিকর। প্রিয় নবীর ওফাত হয়ে গেলে একে একে এবং দলে দলে আরবের লোকেরা যখন ইসলাম ত্যাগ করে মুরতাদ হতে লাগল এবং হানীফা গোত্রের ভণ্ড-প্রতারক 'মুসায়লামাতুল কাযযাব' মিথ্যা নবুওয়াতের দাবী নিয়ে তাকে নবী মেনে নেওয়ার আহ্বান জানাতে থাকল। তখন সুমামা দাঁড়িয়ে গেলেন এর বিরুদ্ধে। কঠোর প্রতিরোধ গড়ে তুললেন গজিয়ে ওঠা ঐ ফেৎনার বিরুদ্ধে। তিনি তার কওমের লোকজনকে বললেন,

'হে হানীফা গোত্রের লোকেরা! খবরদার! এই বিভেদ-বিশৃঙ্খলার দাওয়াত কবুল করো না, এর মধ্যে কোথাও হিদায়াতের নূর নেই।

আল্লাহর কসম! যারা এই দাওয়াত কবুল করেছে, তাদের কপালে দুর্ভোগ অবধারিত। আর যারা এ দাওয়াত গ্রহণ করেনি তাদের জন্য এটা এক অগ্নি পরীক্ষা।'

এরপর তিনি যুক্তি দিয়ে বললেন,

'হে হানীফা গোত্রের লোকেরা! একই সময়ে দু'জন নবী হতে পারে না। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বশেষ নবী, তাঁর পরে আর কোনো নবীর আগমন সম্ভব নয়, তাঁর কোনো সহযোগী-নবী হওয়াও সম্ভব নয়।'

তিনি কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করলেন,

حٰمٓ ﴿۱﴾ تَنْزِیْلُ الْکِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِیْزِ الْعَلِیْمِ ﴿۲﴾ غَافِرِ الذَّنْۢبِ وَ قَابِلِ التَّوْبِ شَدِیْدِ الْعِقَابِ ۙ ذِی الطَّوْلِ ؕ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ؕ اِلَیْهِ الْمَصِیْرُ ﴿۳﴾

'হা-মীম, এ কিতাব আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ, যিনি পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ। পাপ ক্ষমাকারী, তওবা কবুলকারী, কঠোর শাস্তিদাতা, সামর্থ্যবান। তিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। তাঁরই নিকট হবে প্রত্যাবর্তন।' –সূরা মুমিন : ১-৩

এ হলো মহান প্রভুর মহিমাপূর্ণ বাণী। আর পাশাপাশি ভণ্ড ও প্রতারক নবী মুসায়লামার প্রলাপ একটু ভেবে দেখুন,

يَاضِفْدَعُ نَقِّيْ مَا تُنَقِّيْنَ، لَا الشَّرَابَ تَمْنَعِيْنَ، وَلَا الْمَاءَ تُكَدِّرِيْنَ

'হে ব্যাঙ! যত পারো ঘ্যা-ঘু করে ডেকে নাও, কিন্তু এই ডাকাডাকি করে তুমি পারবে না মানুষকে পানি পান করা থেকে ঠেকাতে এবং পারবে না পানিকে নোংরা করতে।'

সুমামা ঈমানের ওপর অবিচল সত্যিকার মুমিনদের সঙ্গে নিয়ে মুরতাদদের বিরুদ্ধে অবিরাম লড়তে থাকলেন। আল্লাহর দীনকে জমিনে প্রতিষ্ঠিত করা, আল্লাহর কালিমাকে সমুন্নত করার সংগ্রাম ও প্রচেষ্টা চালাতে থাকলেন মৃত্যু পর্যন্ত অবিরাম।

* * *

সুমামা ইবনে উসালকে আল্লাহ তাআলা ইসলাম ও মুসলিমজাতির পক্ষ থেকে উত্তম বিনিময় দান করুন এবং মুত্তাকীদের জন্য প্রতিশ্রুত জান্নাতে তাকে সম্মানিত করুন।

আবু আইয়ূব আল-আনসারী

যাকে দাফন করা হয়েছে কনস্টান্টিনোপল
এর নগর-প্রাচীরের পাদদেশে।

প্রিয় নবীর বিখ্যাত এই সাহাবীর প্রকৃত নাম খালিদ ইবনে যায়েদ ইবনে কুলাইব। মদীনার বিখ্যাত 'নাজ্জার' তাঁর বংশের নাম। মক্কা থেকে হিজরত করে আসা প্রিয় নবী ও অন্যান্য সাহাবীকে সকল প্রকার সাহায্যদানকারী আনসারদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কারণে এই সাহাবীর পরিচিত ডাক নাম 'আবু আইয়ূব আল-আনসারী'।

মুসলিমজাতির মাঝে এমন কে আছে যে আবু আইয়ূব আল-আনসারীর নাম জানে না?

আল্লাহ তাআলা তাঁর সুনাম ও খ্যাতি সমুন্নত করেছেন পূর্ব ও পশ্চিমে। তাঁর মর্যাদা উঁচু করেছেন সমগ্র বিশ্বে। কারণ, আল্লাহ তাআলা অন্য কোনো মুসলিমের নয়, তাঁরই গৃহকে নির্বাচন করেছিলেন প্রিয় নবীর বসবাসের জন্য, যখন তিনি হিজরত করে মক্কা থেকে এসে পৌঁছেছিলেন মদীনায়। এই সাহাবী আবু আইয়ূবের গৌরবের জন্য শুধু এতটুকুই যথেষ্ট।

আবু আইয়ূবের গৃহ প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বসবাসের জন্য কিভাবে নির্বাচিত হলো—এ ব্যাপারে রয়েছে এক চমৎকার কাহিনী, যার আলোচনা ভারি মিষ্টি ও মজাদার।

ঘটনাটি ছিল এরকম : যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনায় পৌঁছলেন, তখন মদীনার লোকেরা তাঁকে সর্বোচ্চ মর্যাদা ও সম্মান দিয়ে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানালেন।

প্রেমাস্পদের আবেগঘন হৃদয়াবেগ আর প্রেমপূর্ণ দৃষ্টি তারা বিছিয়ে দিলেন তাঁর আগমন পথে...

তারা খুলে দিলেন নিজেদের হৃদয়ের দুয়ারগুলো যেন তিনি প্রবেশ করেন তাদের হৃদয়ের গভীরে...

তারা উন্মুক্ত করে দিলেন নিজেদের গৃহের দুয়ারগুলো যেন তিনি গ্রহণ করেন সর্বাধিক আরামদায়ক গৃহটি।

কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনার উপকণ্ঠে 'কুবা'য় কাটালেন চারদিন, এই সময়ে তিনি সেই প্রথম মসজিদ স্থাপন করলেন যার ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে তাকওয়ার বুনিয়াদের ওপর।

কুবা থেকে উটের পিঠে সওয়ার হয়ে যখন তিনি বের হলেন, তখন সেই পথে 'ইয়াসরিব' (মদীনা)-এর নেতৃবৃন্দ দাঁড়িয়ে গেলেন সারিবদ্ধ হয়ে। প্রত্যেকের কামনা,

আমার গৃহটিই হোক নবী অবতরণের গৌরবে গর্বিত...

একের পর এক প্রত্যেক সরদার উটনীর সম্মুখে এসে নিবেদন করল,

'ইয়া রাসূলাল্লাহ! দয়া করে আমাদের কাছে থাকুন, আমাদের জনবল, অস্ত্রবল আর সকল প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাসহ আপনার সেবায় নিয়োজিত থাকব।'

তিনি তাদের জবাব দেন,

'তোমরা উটনীর পথ ছেড়ে দাও, ওর চলাফেরা ও গতিবিধি আল্লাহর হুকুমে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে।'

উটনীটি চলতে থাকল আপন গতিতে, অনেক জোড়া চোখ অনুসরণ করতে থাকল তাকে। হৃদয়গুলো ভেবে অস্থির— আজ কার ভাগ্য খুলবে কে জানে!

যে বাড়িটি পার হয়ে যাচ্ছিল, তার বসবাসকারীদের অন্তর ভেঙ্গে যাচ্ছিল, তারা হয়ে পড়ছিলেন হতাশ, সঙ্গে সঙ্গে পরবর্তী বাড়িওয়ালাদের বুকে জ্বলে উঠছিল আশার আলো।

এভাবেই উটনীটি এগিয়ে যাচ্ছিল আর লোকেরাও তার পিছে পিছে আফসোস ও পরিতাপ বুকে নিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন 'আজকের সৌভাগ্যবান লোকটি কে' দেখার জন্য। অবশেষে উটনীটি আবু আইয়ূব আল-আনসারীর বাড়ির সম্মুখে খোলা ময়দানে গিয়ে পৌঁছল, সেখানেই বসে পড়ল।

কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামলেন না।

সামান্য একটু পরেই উটনীটি উঠে পড়ল এবং আবারও চলতে শুরু করল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঢিল দিয়ে রাখলেন তার লাগামে। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে আবার একই পথে ফিরতে লাগল এবং প্রথম স্থানটিতেই এসে বসে পড়ল।

তখন আবু আইয়ূব আল-আনসারীর হৃদয়ে আনন্দ ও খুশি উপচে পড়ল। তিনি ছুটে গিয়ে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শুভেচ্ছা ও স্বাগতম জানালেন। 'মারহাবা' 'মারহাবা' বলে তাঁর সামান বহন করতে লাগলেন যেন তিনি সারা দুনিয়ার সকল সম্পদের মালিক হয়ে গেছেন—যা তিনি বহন করে নিচ্ছেন নিজ বাড়িতে।

* * *

আবু আইয়ূবের বাড়িটি ছিল দোতলা, তিনি উপরের তলাটি খালি করে ফেললেন রাসূলকে সেখানে রাখার জন্য...

কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওপর তলার চেয়ে নিচের তলাকেই নিজের জন্য প্রাধান্য দিলেন। আবু আইয়ূব মেনে নিলেন তাঁর হুকুম এবং তাঁর থাকার জন্য সে স্থানটিই নির্ধারণ করলেন যা তাঁর পছন্দ।

রাত যখন ঘনিয়ে এল, প্রিয় নবী চলে গেলেন বিছানায়। আবু আইয়ূব এবং তার স্ত্রী উপরের তলায় চড়ে বসলেন। দরজা বন্ধ করতে না করতেই নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে তিনি স্ত্রীকে ডেকে বললেন,

'ছি: ছি: ছি: এটা কী সর্বনাশা কাণ্ড করলাম আমরা বলো তো?
আল্লাহর রাসূল নিচে আর আমরা থাকব তাঁর ওপরে?!
আমরা আল্লাহর রাসূলের ওপর দিয়ে হাঁটব, চলব?!

আমরা হব নবী ও ওহীর মাঝে অন্তরায়?! এমন হলে আমাদের সর্বনাশ হতে বাকি থাকল কী?'

স্বামী-স্ত্রী পড়ে গেলেন মহাদুশ্চিন্তায়, যার কোনো সমাধান তাদের জানা নেই। তারা এখন কী করবেন কিছুই বুঝতে পারছেন না।

তারা সামান্য স্বস্তি পেলেন যখন এই সিদ্ধান্ত নিলেন যে আমরা একেবারে সেই পার্শ্বে চলে যাই যা সোজাসুজি রাসূলের ওপরে নয়। তারা আরও সিদ্ধান্ত নিলেন, মধ্যখান থেকে দূরে শুধুমাত্র পাশ দিয়েই তারা চলাফেরা করবেন।

আবু আইয়ূব রাযিয়াল্লাহু আনহু সকাল বেলা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গিয়ে বললেন,

'আল্লাহর কসম! আজ রাতে আমাদের একটুও ঘুম হয়নি বরং দু'চোখের পাতাও আমি এবং উম্মে আইয়ূব (আইয়ূবের মা) এক করতে পারিনি।'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞাসা করলেন,
'কী কারণে এমন হলো হে আবু আইয়ূব?'

'আমার মনে হলো আমি এমন এক ঘরের ওপর তলায় রয়েছি, যার নিচে রয়েছেন আপনি। আমি যদি সেখানে হাঁটা-চলা করি তাহলে আপনার ওপর ধুলাবালি পড়ে আপনার কষ্টের কারণ হয়ে যাবে। তা ছাড়া এটাও মনে হয়েছে, আমি হয়ে গেছি ওহী এবং আপনার মাঝখানে অন্তরায়।'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন,
'হে আইয়ূবের পিতা! বিষয়টিকে সহজভাবে গ্রহণ করো। আমার নিকট বহু মানুষ আসা-যাওয়া করতে থাকে বলে নিচে থাকাটাই আমার জন্য সহজ।'

* * *

আবু আইয়ূব বলেন :
'আমি আল্লাহর রাসূলের আদেশ মেনে নিয়ে ওপর তলাতেই বসবাস চালাতে থাকলাম। ভীষণ শীতের এক রাতে হঠাৎ ঘটল এক দুর্ঘটনা। পানির কলস ভেঙ্গে দোতলার মেঝে একেবারে ভেসে গেল। আমি এবং উম্মে আইয়ূব একেবারে অস্থির হয়ে গেলাম। হায়! এই পানি এই শীতে যদি গড়িয়ে গিয়ে রাসূলের কষ্টের কারণ হয়ে যায়! আমাদের কাছে সেই পানি শোষণের কোনো ব্যবস্থাও নেই। অবশেষে আমরা পাগলের মতো শীত নিবারণের একমাত্র কম্বলটি দিয়ে সব পানি শোষণের কাজ করতে শুরু করলাম। যেন এক ফোটা পানিও রাসূলের মুবারক গায়ে না পড়ে।

যখন সকাল হলো আমি চলে গেলাম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট। বললাম, 'আপনার জন্য আমার মা-বাবা উৎসর্গিত, আমি আপনার উপরে থাকা এবং আপনি আমার নিচে থাকা আমার ভালো লাগছে না। রাতের ঘটনা খুলে বললাম ফলে তিনি আমার আবদার মেনে নিয়ে ওপর তলায় থাকতে রাজি হলেন। আমি এবং উম্মে আইয়ূব নেমে এলাম নিচ তলায়।

* * *

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবী আবু আইয়ূব আল-আনসারী রাযিয়াল্লাহু আনহুর বাড়িতে অবস্থান করেছিলেন প্রায় সাত মাস। এক সময় সেই খোলা ময়দানে নবীজীর মসজিদ নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়ে গেল যেখানে এসে উটনী বসেছিল। এরপর তিনি চলে

গেলেন সেই কামরাগুলোতে যা মসজিদের পাশে নির্মাণ করা হয়েছিল তাঁর ও তাঁর স্ত্রীদের জন্য। যার ফলে এবার তিনি হয়ে গেলেন আবু আইয়ূব আনসারী রাযিয়াল্লাহু আনহুর প্রতিবেশী। কী চমৎকার দুই প্রতিবেশী!

* * *

আবু আইয়ূব আনসারী রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এত বেশি ভালোবাসতেন, যে ভালোবাসা তাঁর হৃদয় ও বিবেকের দাবিকেও অতিক্রম করেছিল। আবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও আবু আইয়ূবকে এত ভালোবাসতেন, যা তাদের পরস্পরের মাঝের লৌকিকতাকে দূর করে দিয়েছিল এবং সেই ভালোবাসার কারণেই তিনি আবু আইয়ূবের বাড়িকে নিজের বাড়ির মতোই মনে করতেন।

* * *

সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, প্রচণ্ড গ্রীষ্মের এক দুপুরে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু বাড়ি থেকে বের হয়ে চলে এলেন মসজিদে নববীতে। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন,

'হে আবু বকর! এমন অসময়ে বাড়ি থেকে বের হওয়ার উদ্দেশ্য কী?'

'প্রচণ্ড ক্ষুধার কষ্টে বাড়িতে থাকা দায় হয়ে পড়েছিল।'

একথা শুনে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন,
'আল্লাহর কসম! আমিও বের হয়েছি একই কারণে।'

তাদের দু'জনের এই কথাবার্তার মাঝে ঘর থেকে বের হলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তিনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন,

'এই অসময়ে কে তোমাদের ঘর থেকে বের করে আনল?'

'আল্লাহর কসম! তীব্র ক্ষুধার যন্ত্রণাই আমাদের বের করে এনেছে।'

প্রিয় নবী বললেন, 'আল্লাহর কসম! আমারও তো একই অবস্থা। প্রচণ্ড ক্ষুধা আমাকেও ঘর থেকে বের করে এনেছে। এক কাজ করো, তোমরা দু'জনেই আমার সঙ্গে এসো।'

তারা উভয়ে রাসূলের সঙ্গী হলেন। এরপর একসঙ্গে সকলে গিয়ে হাজির হলেন আবু আইয়ূব আনসারী রাযিয়াল্লাহু আনহুর দরজায়।

আবু আইয়ূব রাযিয়াল্লাহু আনহুর অভ্যাস ছিল, প্রতিদিনই তিনি রাসূলের জন্য খাবার প্রস্তুত করে রাখতেন। অপেক্ষা করে করে শেষ সময়ে যখন নিশ্চিত হতেন যে আজ তিনি আসবেন না, তখন সেই খাবার পরিবারের সকলে মিলে খেয়ে ফেলতেন।

যখন তারা তিনজন দরজায় পৌঁছলেন, আইয়ূবের মা তাঁদের অভ্যর্থনা জানিয়ে বললেন,
'আল্লাহর নবী ও তাঁর সঙ্গীদের সকলকেই শুভেচ্ছা ও স্বাগতম।'

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন,
'আইয়ূবের বাবা (আবু আইয়ূব) কোথায়?'

আবু আইয়ূব সন্নিকটে তারই খেজুর বাগানে কাজ করছিলেন। তিনি রাসূলের আওয়াজ শুনে ছুটতে ছুটতে সেখানে হাজির হয়ে বললেন,

مَرْحَبًا بِرَسُوْلِ اللهِ وَبِمَنْ مَعَه

'আল্লাহর প্রিয় রাসূল ও তাঁর সঙ্গীদের সকলকেই স্বাগতম।'

এরপর তিনি আরও বললেন,
'ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইতিপূর্বে আর কখনো আপনি এমন সময়ে আসেননি। যে কারণে পূর্বক্ষণেই আমি খেদমতে হাজির থাকতে পারিনি।'

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ওজর কবুল করে বললেন, 'তুমি ঠিকই বলেছ, এমন অসময়ে তোমার বাড়িতে আর কখনো আসা হয়নি।'

আবু আইয়ূব আনসারী রাযিয়াল্লাহু আনহু ইতিমধ্যে তাঁদের চেহারায় ক্ষুধার কষ্ট পড়তে পারলেন। ফলে তিনি খেজুরের বাগানে ছুটে গিয়ে একটি কাঁদি কেটে আনলেন যাতে ছিল সম্পূর্ণ পাকা, আধাপাকা এবং একেবারে টসটসে তাজা মিষ্টি খেজুর।

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,
'পুরো খেজুরের কাদিটা কেটে আনার কী প্রয়োজন ছিল? শুধু 'তামার' (পূর্ণ পাকা)গুলো ছিঁড়ে আনলেই তো হতো।'

উত্তরে তিনি বললেন,
'আমার যে খুব ইচ্ছা হলো আপনাকে বাগানের পাকা, তাজাপাকা, তাজা সবরকমের খেজুর খাওয়াতে। তাই কাদি ধরে কেটে এনেছি। এছাড়া আপনাদের জন্য এখনই ছাগল জবাই করব।'

তিনি বললেন, 'দুধাল বকরী জবাই করবে না।'

আবু আইয়ূব একটি খাশি জবাই করে স্ত্রীকে বললেন,
'আটা খামির করো এবং সুন্দর করে রুটি বানাও। তুমি তো রুটি চমৎকার বানিয়ে থাক।'

উম্মে আইয়ূব অর্ধেক ছাগল ছানা দিয়ে ঝোল রান্না করলেন আর বাকি অর্ধেক ভুনা করলেন। রান্না করা শেষ হলে যখন সেগুলো নবীজী এবং সঙ্গীদের সামনে রাখা হলো, প্রিয় নবী এক টুকরা গোশত রুটির ওপর রেখে আবু আইয়ূবকে বললেন, 'তাড়াতাড়ি এটা ফাতেমাকে পৌছে দিয়ে এসো.. অনেকদিন থেকেই সে এমন খাবার খায়নি।'

তাঁরা সকলে খেয়ে দেয়ে পরিতৃপ্ত হলে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'আহা! এত চমৎকার খাবার! রুটি, গোশত, খেজুর,

পাকা ও তাজা খেজুর...' বলতে বলতে তাঁর দু'চোখ ভিজে গেল। এরপর তিনি বললেন,

'কসম সেই মহান আল্লাহর যাঁর নিয়ন্ত্রণে রয়েছে আমার জীবন। এসব হলো সেই নেয়ামত যার সম্পর্কে কেয়ামতের ময়দানে তোমাদের জিজ্ঞাসা করা হবে। এধরনের সুস্বাদু খাবার অথবা যেকোনো খাবার যখনই গ্রহণ করবে, শুরুতে বলবে বিসমিল্লাহ। শেষ হলে বলবে, আলহামদুলিল্লাহ (প্রশংসা সেই মহান আল্লাহর যিনি আমাদের খাওয়ালেন এবং পরিতৃপ্ত করলেন।)'

এরপর প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উঠতে উঠতে আবু আইয়ূবকে বললেন, 'তুমি আগামীকাল এসো..'

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অভ্যাস ছিল এরকম, কেউ তাঁর সঙ্গে কোনো সদাচরণ করলেই তিনি তার প্রতিদান দিতে চাইতেন। সে কারণেই তিনি আবু আইয়ূবকে পরের দিন দেখা করার নির্দেশ দিলেন। কিন্তু তিনি রাসূলের কথাটি বুঝতে পারলেন না। ফলে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু কথাটি তাকে বুঝিয়ে দিয়ে বললেন, 'প্রিয় নবী তোমাকে আগামীকাল যেতে বললেন হে আবু আইয়ূব।'

তিনি তখন বললেন, 'প্রিয় নবীর আদেশ শিরোধার্য।'

পরের দিন যখন আবু আইয়ূব প্রিয় নবীর কাছে গেলেন, তিনি তাকে একটি ছোট কিশোরী দাসী দান করলেন এবং বললেন,

'হে আবু আইয়ূব! এর সঙ্গে ভালো ব্যবহার কোরো। কারণ সে যতদিন থেকে আমাদের কাছে রয়েছে তার মাঝে আমরা শুধু ভালো স্বভাবই পেয়েছি।'

* * *

আবু আইয়ূব আল-আনসারী রাযিয়াল্লাহু আনহু কিশোরী দাসীটিকে নিয়ে নিজ বাড়িতে ফিরে এলেন, উম্মে আইয়ূব তাকে জিজ্ঞাসা করলেন,

'কার মেয়ে এটা?'

'আমাদেরই, আল্লাহর রাসূল একে আমাদের জন্য দান করেছেন।'

'কী মহান দাতা! কী চমৎকার দান!!'

'তিনি আমাদেরকে তার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করতে নির্দেশ দিয়েছেন।'

'কেমন ব্যবহার তার সঙ্গে করলে রাসূলের নির্দেশ যথার্থ পালিত হবে?'

'আমার মনে হয়, রাসূলের নির্দেশ পালনের সর্বোত্তম পন্থা হতে পারে তাকে স্বাধীন করে দেওয়াই।'

'তুমি একদম ঠিক কথাটাই বলেছ, আল্লাহ তাওফিক দান করুন। তারা তাকে মুক্ত ও স্বাধীন করে দিলেন।'

* * *

এত ছিল আবু আইয়ূব আল-আনসারী রাযিয়াল্লাহু আনহুর জীবনের কিছু শান্তির চিত্র। আর যদি তাঁর জীবনে কিছু জিহাদী চিত্র দেখতে পান, তাহলে প্রিয় পাঠক! বুঝবেন কত রকমের বিস্ময়কর ব্যাপার রয়েছে সেখানে।

আবু আইয়ূব আল-আনসারী রাযিয়াল্লাহু আনহু জীবনের দীর্ঘসময় কাটিয়েছেন গাজী হিসাবে। এমনকি মানুষের মুখে মুখে প্রচারিত ছিল, মুসলিমবাহিনী নবীযুগ থেকে মুআবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহুর যুগ পর্যন্ত যত জিহাদ করেছে, তার কোনোটা থেকেই তিনি দূরে থাকেননি।

তার সর্বশেষ জিহাদ ছিল মুআবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহুর পুত্র ইয়াযীদের নেতৃত্বে কনস্টান্টিনোপল (ইস্তাম্বুল) বিজয়ের অভিযান। আবু আইয়ূব ছিলেন সে সময় প্রায় আশি বছর বয়সী এক বৃদ্ধ। কিন্তু এই বৃদ্ধ বয়স আর দুর্বল দেহ তাঁকে ফেরাতে পারল না ইয়াযীদের পতাকা তলে শামিল হওয়া থেকে এবং সাগরের বিক্ষুব্ধ তরঙ্গমালা চিরে আল্লাহর পথে জিহাদে এগিয়ে যাওয়া থেকে।

কিন্তু শত্রুবাহিনীর বিরুদ্ধে সজ্ঘাত খুব বেশিদূর এগুতে পারল না, এরই মধ্যে আবু আইয়ূব আনসারী রাযিয়াল্লাহু আনহু ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়লেন—যা তাকে লড়াই চালিয়ে যাওয়া থেকে অপারগ করে দিল। সেনাপতি ইয়াযীদ তার শুশ্রূষার উদ্দেশ্যে এসে জিজ্ঞাসা করলেন,

'হে আবু আইয়ূব! আপনার কী খেদমত করতে পারি বলুন।'

তিনি বললেন,

'মুসলিমসৈনিকদের আমার সালাম জানিয়ে বলুন, আবু আইয়ূব তোমাদের অসিয়ত করছে তোমরা কোনো অবস্থাতেই জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ থেকে নিবৃত্ত হবে না। আল্লাহর ওপর ভরসা করে শত্রুভূমির শেষপ্রান্ত পর্যন্ত জয় করে তবেই থামবে। আমার লাশ নিয়ে হলেও তোমরা ইস্তাম্বুলের শেষ সীমা পর্যন্ত এগিয়ে যেয়ো এবং সেখানেই আমার কবর দিয়ো।'

একথা বলেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

* * *

মুসলিমসৈনিকেরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই সাহাবীর অন্তিম ইচ্ছা পূরণে লাফিয়ে পড়লেন ময়দানে। শত্রুবাহিনীর বিরুদ্ধে মরণপণ করে আক্রমণ চালালেন এবং শেষ পর্যন্ত আবু আইয়ূব আল-আনসারী রাযিয়াল্লাহু আনহুর লাশ কাঁধে নিয়ে তারা ইস্তাম্বুলের নগর-প্রাচীর পর্যন্ত পৌঁছে গেলেন এবং সেই নগর-প্রাচীরের পাদদেশেই তাঁকে দাফন করলেন।

* * *

আল্লাহ তাআলা রহম করুন আবু আইয়ূব আল-আনসারীর প্রতি। কারণ, আল্লাহর পথে ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে লড়াই করতে করতে লাভ হয় যে মরণ, নিজের জন্য তিনি তাই কামনা করেছেন। আশি বছরের বার্ধক্যও তাঁকে এই সংকল্প থেকে টলাতে পারেনি।

তথ্যসূত্র :

১. *আল-ইসাবা*, ১ম খণ্ড, ৪০৫ পৃষ্ঠা। *আত্তারজামা*, ২১৬৩।
২. *খুলাসাতু তাহযীবি তাহযীবিন কামাল*, ১০০-১০১ পৃষ্ঠা।
৩. *তারীখুল ইসলাম লিযযাহাবী*, ২য় খণ্ড, ৩২৭-৩২৮ পৃষ্ঠা।
৪. *ইবনে খাইয়্যাত*, ৭৯, ১৪০, ১৯০, ৩০৩ পৃষ্ঠা।
৫. দাইরাতুল মাআরিফ আল-ইসলামিয়া, ১ম খণ্ড, ৩০৯-৩১০ পৃষ্ঠা।
৬. *আল-জামউ বাইনা রিজালিস সহীহাইন*, ১ম খণ্ড, ১১৮-১১৯ পৃষ্ঠা।
৭. *মিন-আবতালিনাল্লাযীনা সানাউত তারীখ লিআবিল ফুতূহ আত-তিউনিসী*, ১০৫-১১০ পৃষ্ঠা।
৮. *আল-ইসতীআব*, ১ম খণ্ড, ৪০৩ পৃষ্ঠা।
৯. *আবতাবাকাতুল কুবরা*, ৩য় খণ্ড, ৪৮৪-৪৮৫ পৃষ্ঠা।
১০. *সিফাতুস সফওয়া*, ১ম খণ্ড, ১৮৬-১৮৭ পৃষ্ঠা।
১১. *আল-জারহু ওয়াত-তাদীল*, ১ম খণ্ড, ১৩১ পৃষ্ঠা।
১২. *আল-ইবার*, ১ম খণ্ড, ৫৬ পৃষ্ঠা।
১৩. *উসদুল গাবাহ*, ৫ম খণ্ড, ১৪৩-১৪৪ পৃষ্ঠা।
১৪. *তাহযীবুত তাহযীব*, ৩য় খণ্ড, ৯০-৯১ পৃষ্ঠা।
১৫. *তাকরীবুত তাহযীব*, ১ম খণ্ড, ২১৩ পৃষ্ঠা।
১৬. *শাযারাতুয যাহাব*, ১ম খণ্ড, ৫৭ পৃষ্ঠা।
১৭. *তাজরীদু আসমাইস সাহাবা*, ১ম খণ্ড, ১৬১ পৃষ্ঠা।
১৮. *সিলসিলাতু আলামিল মুসলিমীন*, রাকাম ৪।
১৯. *আল-আলাম*, ২য় খণ্ড, ৩৩৬ পৃষ্ঠা।

আমর ইবনুল জামূহ

যে বৃদ্ধ নিজের খোঁড়া পা নিয়েই জান্নাতে যাওয়ার সংকল্প করেছিলেন।

আমর ইবনুল জামূহ জাহেলী যুগে 'ইয়াসরিব' (মদীনা)-এর একজন বিখ্যাত নেতা। সালামা গোত্রের অবিসংবাদিত সরদার এবং অন্যতম দানবীর ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিত্ব।

জাহেলী যুগে বড় বড় নেতার বৈশিষ্ট্য ছিল তারা প্রত্যেকে নিজ বাড়িতে নিজের জন্য একটি আলাদা দেবী-মূর্তি রাখত—সকাল-বিকাল তার আশীর্বাদ নেওয়া... বিভিন্ন মওসুমে তার নামে পশু বলি দেওয়া এবং বিপদ-আপদে তার কাছে মুক্তি চাওয়ার উদ্দেশ্যে।

আমর ইবনুল জামূহের দেবী-মূর্তিটির নাম ছিল 'মানাত'। যা তিনি তৈরি করিয়েছিলেন দামী, উত্তম কাঠ দিয়ে। এই দেবীর জন্য তিনি ছিলেন খুব উদার হস্ত। তিনি নিজে এই দেবী মানাতের বিশেষ যত্ন নিতেন। রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করতেন। তেল, চন্দন, আতর-সুগন্ধি দিয়ে তার আশে-পাশে এক আধ্যাত্মিক পরিবেশ বানিয়ে রাখতেন।

* * *

তখন আমর ইবনুল জামূহ জীবনের ষাট বসন্ত অতিক্রম করছিলেন, যখন ইসলামের দাওয়াত পেয়ে প্রথম সুসংবাদবাহী মুসআব ইবনে উমায়ের রাযিয়াল্লাহু আনহুর হাতে ইয়াসরিবের বাড়ি-ঘরগুলো একে একে ঈমানের আলোকে জ্বলে উঠতে শুর করেছিল, তাঁর হাতে ঈমান গ্রহণ করেছিলেন আমর ইবনে জামূহের তিন পুত্র মুআওয়ায, মুআয ও খাল্লাদ আর তাদেরই এক খেলার সঙ্গী মুআয ইবনে জাবাল... আর তিন পুত্রের সঙ্গে ঈমান গ্রহণ করলেন তাদের মা হিনদ। কিন্তু আমর ইবনুল জামূহ এ সবের কিছুই জানতেন না।

* * *

আমর ইবনুল জামূহের স্ত্রী হিনদ ভাবছিলেন, ইয়াসরিবের বেশিরভাগ মানুষই ইসলাম গ্রহণ করেছেন। শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দের মধ্যে তার স্বামী এবং অল্প কয়েকজন ছাড়া এখন আর কোনো মুশরিক খুঁজে পাওয়া যায় না। স্বামীকে তিনি খুব ভালোবাসতেন, শ্রদ্ধাও করতেন। সে কারণেই তিনি আশঙ্কা করতেন, কুফরের ওপরেই যদি তার মৃত্যু হয় তাহলে জাহান্নাম থেকে বাঁচার কোনো উপায়ই তো তার থাকবে না।

অপরদিকে আমর ইবনুল জামূহ মনে মনে আশঙ্কা করছিলেন নিজের পুত্রদের ধর্মচ্যুতি নিয়ে। তার আশঙ্কা হচ্ছিল তারা হয়তো বাপ-দাদার ধর্ম ছেড়ে এই দাঈ মুসআব ইবনে উমায়েরের অনুসরণ শুরু করে দেবে—যিনি অল্প সময়ের মধ্যেই বহু মানুষকে নিজ ধর্ম থেকে বের করে মুহাম্মাদের ধর্মে দীক্ষিত করতে সক্ষম হয়েছেন।

ফলে তিনি স্ত্রীকে ডেকে বললেন,

'হিনদ! তোমার পুত্রদের ব্যাপারে একটু সাবধান থেক, সতর্ক দৃষ্টি রেখো। তারা যেন এই মুসআব ইবনে উমায়েরের সঙ্গে কোনো সম্পর্কে না জড়ায়। যতদিন পর্যন্ত আমি তার বিষয়ে কোনো স্পষ্ট সিদ্ধান্ত না নেব, ততদিন তুমি একটু বিশেষভাবে সতর্ক থেক।'

স্ত্রী জবাব দিলেন, 'ঠিক আছে আমি সাবধান থাকব। তবে তুমি কি লোকটির দু'একটি কথা একটু শুনে দেখবে, যা তোমার পুত্র মুআয শোনায়?'

'আরে সর্বনাশী! তুই বলিস কি! মুআয কি আমার অজান্তেই বিধর্মী হয়ে গেছে?'

নেককার স্ত্রী স্বামীর কথায় উদ্বিগ্ন হয়ে বললেন :

'না-না তা হবে কেন! সে ঐ দাঈর দু'একটা মজলিসে হাজির হয়েছিল বলে তাঁর দু'চারটা কথা মুখস্থ হয়ে গেছে।'

তিনি বললেন,

'ঠিক আছে.. ওকে ডেকে দাও আমার কাছে।'

পুত্র এসে হাজির হলে তিনি বললেন,

'ঐ লোকটার দু'একটা কথা শোনাও তো দেখি।'

সে তখন মধুর সুরে পড়ল,

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰهِ رَبِّ الۡعٰلَمِیۡنَ ﴿۱﴾ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ﴿۲﴾ مٰلِکِ یَوۡمِ الدِّیۡنِ ﴿۳﴾ اِیَّاکَ نَعۡبُدُ وَ اِیَّاکَ نَسۡتَعِیۡنُ ﴿۴﴾ اِهۡدِنَا الصِّرَاطَ الۡمُسۡتَقِیۡمَ ﴿۵﴾ صِرَاطَ الَّذِیۡنَ اَنۡعَمۡتَ عَلَیۡهِمۡ غَیۡرِ الۡمَغۡضُوۡبِ عَلَیۡهِمۡ وَ لَا الضَّآلِّیۡنَ ﴿۷﴾

'পরম কুরণাময় অত্যন্ত দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি। সকল প্রশংসা আল্লাহর যিনি নিখিল বিশ্বের মালিক-প্রতিপালক। যিনি দয়ালু দয়াময়। যিনি বিচার দিবসের মালিক। আমরা তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই নিকট সাহায্য চাই। তুমি আমাদের সঠিক পথ প্রদর্শন করো। তাদের পথ যাদের তুমি পুরস্কৃত করেছ। যারা অভিশপ্ত নয়, যারা পথভ্রষ্ট নয়।'

আমর ইবনুল জামূহ বললেন,

'কী দারুন কথা! কী চমৎকার আর মধুময় কথা! আহা! কী তাৎপর্যপূর্ণ বাণী! তাঁর সবকথাই কি এরকম?'

মুআয বললেন,

'বাবা! এর চাইতেও চমৎকার তাঁর অন্যান্য কথা।'

পিতার ভাবান্তর ও কোমলতার আভাস পেয়ে পুত্র বলল, 'বাবা! তুমি কি তাঁর কাছে বাইয়াত নেবে? তোমার কওমের প্রায় সকলেই ইতিমধ্যে বাইয়াত নিয়ে ফেলেছে।'

বৃদ্ধ কিছুক্ষণ নীরব থেকে বললেন :

'আমি আগে দেবী মানাতের সঙ্গে পরামর্শ করে দেখব, সে কী বলে! তারপর যা করার করব।'

মুআয এবার সুযোগ বুঝে বলে বসল,

'সে কী বলবে বাবা! ওর কি কোনো ক্ষমতা আছে? না কিছু বলার, না শোনার, না ভাবার। কোনো কিছুরই ক্ষমতা নেই তার। কাঠের মূর্তিমাত্র।'

বৃদ্ধ এবার রাগের সঙ্গে বললেন,

'বললাম না তোমাকে, ওর পরামর্শ ছাড়া আমি কোনো সিদ্ধান্ত নেব না!'

* * *

আমর ইবনুল জামূহ চলে গেলেন দেবী মানাতের মন্দিরে। জাহেলী যুগের প্রথা মতে তারা যখন দেবীদের সঙ্গে পরামর্শ করতে চাইতেন, তার পেছনে বসাতেন কোনো বৃদ্ধাকে। পূজারীরা যে উপদেশ বা পরামর্শ চাইত, (তাদের ধারণা হিসাবে) দেবতারা সেই উপদেশ বা পরামর্শ বৃদ্ধার অন্তরে উদয় করে দিত—যা বৃদ্ধা নিজের ভাষায় পূজারীকে শুনিয়ে দিত।

একই নিয়মে আমর ইবনুল জামূহ দেবী মানাতের পরামর্শ গ্রহণের উদ্দেশ্যে এক বৃদ্ধাকে পেছনে দাঁড় করিয়ে নিজে দাঁড়িয়ে গেলেন দেবীর সম্মুখে। নিজের খোড়া পা লম্বা করে বিছিয়ে সুস্থ পায়ের ওপর পূর্ণ দেহের ভর দিয়ে অত্যন্ত কষ্টে বিনয়ের সঙ্গে দাঁড়ালেন। ইনিয়ে বিনিয়ে মানাতের নানা রকমের প্রশংসা করে নিজের উদ্দেশ্য তুলে ধরে বললেন :

'হে মানাত! সন্দেহ নেই ইতিমধ্যে তুমি জেনে গেছ, এই আহ্বানকারী লোকটি—যে মক্কা থেকে এসেছে... সে লোকটি তুমি ছাড়া আর কারোর ক্ষতি করতে আসেনি। সে শুধু আমাকে তোমার পূজা থেকে নিবৃত্ত রাখার জন্য এসেছে।

আমি তার অতি উত্তম ও চমৎকার কথা শোনার পরও তোমার সঙ্গে পরামর্শ না করে তার হাতে বাইয়াত নিতে পছন্দ করিনি। অতএব তুমি এ বিষয়ে আমাকে সঠিক দিক-নির্দেশনা দাও। কোনো জবাবই মানাতের কাছ থেকে এল না। (বৃদ্ধা মহিলা নীরব রইলেন।)'

আমর ইবনুল জামূহ আবার বললেন,

'মানাত হে! সম্ভবত তুমি আমার ওপর রাগ করেছ। এরপর আমি এমন কিছুই আর করব না যাতে তুমি কষ্ট পাও। আমার তাড়াহুড়া নেই। তোমাকে কয়েকদিনের সুযোগ দিচ্ছি, তোমার রাগ পড়ে যাক তারপর আবার পরামর্শ করব কেমন?'

* * *

আমর ইবনুল জামূহের পুত্ররা দেবী মানাতের সঙ্গে তাদের পিতার সম্পর্কের গভীরতার কথা জানত। তারা জানত যুগ-যুগান্তরের পূজা ও ভক্তি-শ্রদ্ধার বদৌলতে ঐ দেবী পিতার বিশ্বাসের অংশে পরিণত হয়েছে। তবে তাদের উপলব্ধিতে এটাও ধরা পড়েছিল যে, পিতার অন্তরে দেবীর জন্য বদ্ধমূল ভক্তি-শ্রদ্ধার স্থানটি সন্দেহ ও দোদুল্যমানতার ঝাপটায় দুলতে শুরু করেছে। এখন তাদের কর্তব্য হলো দোদুল্যমান সেই

বিশ্বাসটিকে পিতার অন্তর থেকে একেবারে নির্মূল করে দেওয়া, তার ঈমান অর্জনের একমাত্র পথ হবে সেটাই।

* * *

পরিকল্পনা মতো আমর ইবনুল জামূহের পুত্ররা তাদের বন্ধু মুআয ইবনে জাবালকে সঙ্গে নিয়ে রাতের বেলা প্রবেশ করল দেবী মানাতের মন্দিরে। দেবীকে তুলে নিয়ে চলে গেল বনি সালামার (সালামা গোত্রের) নোংরা-আবর্জনা ফেলার একটি গর্তের কাছে। সেখানে ঐ আবর্জনার মধ্যেই দেবীকে নিক্ষেপ করল। এবার তারা যার যার বাড়িতে ফিরে এল—তাদের ব্যাপারে কেউ কিছু জানার পূর্বেই। সকাল হলে আমর ইবনুল জামূহ ধীর পায়ে এগিয়ে গেলেন মন্দিরের দিকে পূজার উদ্দেশ্যে। সেখানে দেবী মানাতকে না পেয়ে তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। সকলকে গালাগাল দিয়ে বলতে শুরু করলেন :

'তোমরা সব গোল্লায় যাও, রাতের অন্ধকারে কে আমার দেবীকে অপহরণ করল? এতবড় স্পর্ধা কার?'

কেউই এর দায়-দায়িত্ব স্বীকার করল না।

বাড়ির ভেতরে, বাহিরে হন্যে হয়ে তিনি খুঁজতে শুরু করলেন। রাগে, ক্ষোভে ফেটে পড়ার মতো নিজে নিজেই হুমকি, ধমকি আর শাসানির বাক্য উচ্চারণ করতে করতে দেবীকে হঠাৎ আবিষ্কার করলেন আবর্জনার গর্তের মধ্যে। উপুড় হয়ে পড়ে থাকা দেবীকে তিনি অতি যত্নের সঙ্গে ভক্তি ভরে তুলে এনে গোসল করালেন। তেল-চন্দন মেখে তাকে আবার যথাস্থানে প্রতিষ্ঠিত করে আবেগের সঙ্গে বললেন :

'আল্লাহর কসম! যদি জানতে পারতাম এমন বেয়াদবি কে করল তোমার সঙ্গে, তাহলে আমি অবশ্যই তার সর্বনাশ করে ছাড়তাম।'

দ্বিতীয় রাত এল। সেই তরুণ দল আবারও দেবী মানাতকে অপহরণ করল। আগের মতো একইভাবে তারা সালামা গোত্রের আবর্জনার গর্তে

নিয়ে দেবী মানাতকে নিক্ষেপ করল এবং যথারীতি সকল মানুষের অজ্ঞাতসারে যার যার বাড়ি চলে গেল। সকালে বৃদ্ধ গিয়ে দেখলেন দেবী যথাস্থানে নেই। তিনি খুঁজতে খুঁজতে আবর্জনা ফেলানোর সেই গর্তে গিয়ে দেখলেন দেবী মানাত আবর্জনা আর মল-মূত্র মাখামাখি হয়ে পড়ে আছে। তিনি ভীষণ ভক্তি ও শ্রদ্ধার সঙ্গে তাকে ওঠালেন। গোসল করিয়ে সুগন্ধি মেখে আবার তাকে নিজ স্থানে রেখে দিলেন।

পুত্ররা দেবী মানাতের সঙ্গে এই কাজ প্রতি রাতেই করতে থাকল, আর আমর ইবনুল জামূহও একইভাবে প্রতিদিন সকালে আবর্জনার স্তুপ থেকে তাকে উদ্ধার করে আনতে থাকলেন। এভাবেই যেদিন তিনি একেবারে অতিষ্ঠ হয়ে পড়লেন, সেদিন রাতে ঘুমাতে যাবার পূর্বে গেলেন দেবীর মন্দিরে। নিজের তরবারি তার গলায় ঝুলিয়ে দিয়ে আবেগের সঙ্গে বললেন :

'হে মানাত! আল্লাহর কসম আমি জানি না কে করছে তোমার সঙ্গে এইসব অপকর্ম। তোমার কাছে আজ আমার জন্য কোনো সাহায্য চাচ্ছি না। আজ আমার একটাই মিনতি, তোমার যদি কোনো শক্তি-সামর্থ্য থেকে থাকে, তাহলে নিজেকে এই দুর্গতি থেকে রক্ষা করো। এই যে আমার তরবারি তোমাকে দিয়ে গেলাম... এই বলে তিনি নিজের বিছানায় গিয়ে ঘুমিয়ে গেলেন।'

যুবকেরা যখন নিশ্চিত হলো বৃদ্ধ ঘুমের রাজ্যে হারিয়ে গেছে তারা ছুটে গেল মূর্তির কাছে। তার গর্দান থেকে তরবারি বের করে রাখল এবং তাকে বাড়ির বাহিরে এনে একটি মরা কুকুরের সঙ্গে রশি দিয়ে বাঁধল এবং বনি সালামার সেই আবর্জনার ভাগাড়ে নিক্ষেপ করল যেখানে পেশাব-পায়খানা সব ভেসে এসে জমা হতো।

সকালে যখন বৃদ্ধের ঘুম ভাঙল এবং দেবীর ঘরে গিয়ে দেখলেন যে আজও দেবী উধাও, আবারও তিনি খুঁজতে বের হলেন। খুঁজতে খুঁজতে গিয়ে দেখলেন আবর্জনার মধ্যে উপুড় হয়ে পড়ে আছে মরা একটি

কুকুরের সঙ্গে বাঁধা এবং তার তরবারিটি গলা থেকে খুলে ফেলা হয়েছে। এবার তিনি আর মানাতকে তুললেন না ঐ ভাগাড় থেকে, সেখানেই ফেলে রেখে চলে এলেন এবং আবৃত্তি করলেন আক্ষেপের সুরে :

وَاللّٰهِ لَوْ كُنْتَ اِلٰهًا لَمْ تَكُنْ - اَنْتَ وَكَلْبٌ وَسَطَ بِئْرٍ فِيْ قَرْنٍ

'আল্লাহর কসম! তুমি যদি সত্যিকারের কোনো মাবুদ হতে তাহলে মরা কুকুরের সঙ্গে এক রশিতে বাঁধা অবস্থায় আবর্জনার মধ্যে এভাবে তোমাকে পড়ে থাকতে হতো না।'

এরপর আর বিলম্ব না করে তিনি আল্লাহর দীন ইসলাম কবুল করে নিলেন।

* * *

আমর ইবনুল জামূহ রাযিয়াল্লাহু আনহু ঈমানের এমন মিষ্টি স্বাদ পেলেন, যা তাকে শিরকের বিশ্বাস নিয়ে কাটানো অতীতের প্রতিটি মুহূর্তের জন্য অনুশোচনা ও অনুতাপের আগুনে দগ্ধ করতে থাকল। ফলে তিনি নতুন দীনের প্রতি ঝুঁকে পড়লেন মন-প্রাণ ও দেহের সবকিছু উজার করে। আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্যের জন্য উৎসর্গ করলেন নিজের জীবন, সন্তান ও সম্পদ।

* * *

তাঁর এই মানসিকতা ও আবেগের কালে অল্পদিনের মধ্যেই ওহুদ যুদ্ধের দামামা বেজে উঠল। আমর ইবনুল জামূহ রাযিয়াল্লাহু আনহু দেখলেন নিজের তিন পুত্র কিভাবে আল্লাহর দুশমনদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে প্রস্তুত হচ্ছে। তিনি দেখলেন তারা আল্লাহর সন্তুষ্টি ও শাহাদাতের মর্যাদা লাভের আকাঙ্ক্ষায় ব্যাকুল হয়ে সিংহের মতো একবার আসছে আবার যাচ্ছে। ফলে তার ঈমানী চেতনা জ্বলে উঠল এবং তিনি চূড়ান্ত

সংকল্প করে ফেললেন, তাদের সঙ্গে তিনিও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পতাকাতলে জিহাদে শরীক হবেন।

কিন্তু তরুণ পুত্ররা একমত হয়ে সিদ্ধান্ত নিল পিতাকে তাঁর সংকল্প থেকে ফিরিয়ে রাখতে হবে। কারণ, তিনি বয়সের ভারে জীর্ণ একজন অতিবৃদ্ধ মানুষ, উপরন্তু তিনি অত্যন্ত খোঁড়া এক ব্যক্তি। আল্লাহ তাআলা তাঁর ওজর কবুল করে নিয়েছেন। তিনি মাযূর ব্যক্তি। এজন্য পুত্ররা তাকে বলল :

'হে পিতা! আল্লাহ আপনাকে মাযূর বানিয়েছেন। তাহলে কেন আপনি নিজেকে সেই ঝুঁকিতে ঠেলে দেবেন, যা থেকে আল্লাহ আপনাকে অব্যাহতি দিয়েছেন?'

বৃদ্ধ তাদের কথায় ভীষণ রেগে গেলেন এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গিয়ে পুত্রদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বললেন :

'হে আল্লাহর নবী! আমার এই পুত্ররা 'খোঁড়া' বলে জিহাদের মর্যাদা থেকে আমাকে বঞ্চিত করতে চায়। আল্লাহর কসম! আমি আমার এই খোঁড়া পা নিয়েই শহীদ হয়ে জান্নাতে যেতে চাই।'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পুত্রদের বললেন,
'তাকে বাঁধা দিয়ো না, হয়তো আল্লাহ তাআলা তাকে শাহাদাতের মর্যাদা দান করবেন।'

রাসূলের নির্দেশ মেনে নিয়ে তারা আর পিতার পথ আটকাল না।

* * *

জিহাদের উদ্দেশ্যে বের হবার সময় ঘনিয়ে এলে আমর ইবনুল জামূহ স্ত্রীকে চিরতরে বিদায়ী ব্যক্তির মতো বিদায় জানালেন। এরপর কিবলামুখী হয়ে আসমানের দিকে দু'হাত উঁচু করে বললেন,

اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِيْ الشَّهَادَةَ وَلَا تَرُدَّنِيْ اِلٰى اَهْلِيْ خَائِبًا

'হে আল্লাহ! আমাকে তুমি শাহাদাতের মৃত্যু দিয়ো, নিরাশ করে পরিবারের কাছে ফেরৎ দিয়ো না।'

তিনি চলতে শুরু করলেন... তাকে বেষ্টন করে রাখল তিন পুত্র এবং সালামা গোত্রের বিরাট একদল মানুষ।

ওহুদের যুদ্ধ যখন প্রচণ্ড রূপ নিল। মুশরিকবাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমণে মুসলিমবাহিনী এলোমেলো ও বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ল। রাসূলকে যুদ্ধের ময়দানে ফেলে রেখে তারা যখন বিশৃঙ্খলভাবে এদিক-সেদিক ছুটছিল, ঠিক সেই চরম মুহূর্তে দেখা গেল আমর ইবনুল জামূহ আর পেছনে পুত্র খাল্লাদ দু'জনে প্রতিপক্ষ কুরাইশী বাহিনীর বিরুদ্ধে জীবন-মরণপণ করে আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছেন। নিজের সুস্থ পায়ের ওপর লাফিয়ে লাফিয়ে এগুচ্ছিলেন আর চিৎকার করে বলছিলেন,

إِنِّيْ لَمُشْتَاقٌ إِلَى الْجَنَّةِ – إِنِّيْ لَمُشْتَاقٌ إِلَى الْجَنَّةِ

'আমি জান্নাত চাই... আমি জান্নাত চাই...'

পিতা ও পুত্র রাসূলের দিকে ছুটে আসা আক্রমণ প্রতিহত করতে করতে এক সময় শহীদ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। মাত্র কয়েক মুহূর্তের ব্যবধানে পিতা ও পুত্র উভয়েরই শাহাদাতের তামান্না পূরণ হয়ে গেল।

ওহুদের যুদ্ধ যখন শেষ হলো, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখানে শাহাদাত বরণকারীদের দাফন কাজ সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে সাহাবীদের বললেন :

خَلُّوْا بِدِمَائِهِمْ وَجِرَاحِهِمْ، فَأَنَا الشَّهِيْدُ عَلَيْهِمْ- مَامِنْ مُسْلِمٍ يُكْلَمُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَسِيْلُ دَمًا- اَللَّوْنُ كَلَوْنِ الزَّعْفَرَانِ وَالرِّيْحُ كَرِيْحِ الْمِسْكِ

‘এই শহীদদের রক্তমাখা ক্ষত-বিক্ষত দেহগুলো ঐভাবেই দাফন করে দাও। কিয়ামতের ময়দানে আমি নিজেই এদের শাহাদাতের ব্যাপারে সাক্ষী হব। কোনো মুসলিম আল্লাহর পথে আঘাতপ্রাপ্ত হলে কিয়ামতের ময়দানে সে এমনভাবে উত্থিত হবে যে, তার সেই আঘাত থেকে রক্ত ঝরতে থাকবে। সেই রক্তের রঙ হবে জাফরানের মতো আর সুঘ্রাণ হবে মেশক আম্বরের মতো।’

তারপর বললেন :

‘আমর ইবনুল জামূহকে আবদুল্লাহ ইবনে আমরের সঙ্গে একই কবরে দাফন করো। তারা ছিলেন এ দুনিয়ায় নির্ভেজাল আল্লাহর ওয়াস্তে একে অপরকে মুহাব্বতকারী।’

* * *

আল্লাহ তাআলা আমর ইবনে জামূহ এবং ওহুদের সকল শহীদের প্রতি সন্তুষ্ট হোন, তাঁদের কবরকে করুন আলোকিত।

তথ্যসূত্র :

১. *আল-ইসাবা*, ২য় খণ্ড, ৫২৯ পৃষ্ঠা অথবা *আত্তারজামা*, ৫৭৯৭।
২. *সিফাতুস সফওয়া*, ১ম খণ্ড, ২৬৫ পৃষ্ঠা।

আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ

সর্বপ্রথম 'আমীরুল মুমিনীন' (মুমিনদের প্রধান) বলে ঘোষিত ব্যক্তি।

মহান সাহাবী—যাঁর সম্পর্কে আমরা এখন কথা বলতে যাচ্ছি, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একজন ঘনিষ্ঠ আত্মীয় এবং তাঁর আস্থাভাজন ব্যক্তিত্ব। একেবারে সূচনাকালে ইসলাম গ্রহণকারীদের অন্যতম।

তিনি ছিলেন প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফুফুর পুত্র (ফুফাতো ভাই), কারণ তার মা আবদুল মুত্তালিবের কন্যা উমায়মা ছিলেন নবীজীর ফুফু।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতার ছিল আরও একটি বিরল দিক, সেটা এই যে, তাঁর বোন যায়নাব বিনতে জাহাশ ছিলেন প্রিয় নবীর স্ত্রী এবং উম্মুল মুমিনীন (মুমিনদের মা)।

তিনি সেই ব্যক্তি যাঁর হাতে সর্বপ্রথম ইসলামের পতাকা তুলে দেওয়া হয়েছিল...

তা ছাড়া সর্বপ্রথম তাঁকেই ডাকা হয়েছিল 'আমীরুল মুমিনীন'।

তিনিই হচ্ছেন আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ আল-আসাদী।

* * *

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'দারুল আরকাম' (ইসলাম গ্রহণকারীদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র)-এর কার্যক্রম শুরু করার পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেন আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ রাযিয়াল্লাহু আনহু। সুতরাং তিনি একেবারে সূচনায় ইসলাম কবুলকারীদের অন্যতম।

নবীজী যখন তাঁর সাহাবীদের কুরাইশের নির্যাতন থেকে আত্মরক্ষা এবং নিজেদের দীন হেফাজতের উদ্দেশ্যে মদীনায় হিজরত করার অনুমতি দিলেন—আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ রাযিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন দ্বিতীয় হিজরতকারী। তাঁর পূর্বে এই (হিজরতের) গৌরব ও মর্যাদার অধিকারী একমাত্র আবু সালামা রাযিয়াল্লাহু আনহু।

তবে আল্লাহর জন্য স্বদেশ, স্বজনের বিচ্ছেদ সহ্য করা, আল্লাহর পথে এ-সবের মায়া ত্যাগ করা আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশের জন্য নতুন কিছু ছিল না। তিনি ইতিপূর্বে আত্মীয়-স্বজনসহ হাবশায় হিজরত করেছিলেন।

কিন্তু তার এবারের হিজরত ছিল ব্যাপক ও পূর্ণাঙ্গ। মদীনার এই হিজরতের সময় তার সঙ্গে হিজরত করেছিলেন ছেলে-মেয়ে, ভাই-বোন, শিশু-কিশোর, তরুণ-তরুণী, ছোট-বড় নারী-পুরুষ, স্ত্রী-পরিজনসহ সকল আত্মীয়-স্বজন। তাঁর গোটা পরিবারটিই ছিল ইসলামের পরিবার, তাঁর বংশটি ছিল ঈমানী বংশ।

তাঁরা যখন বেরিয়ে পড়লেন মক্কা ছেড়ে, তাঁদের দীর্ঘ আবাসের এই ঘর-বাড়িগুলো হয়ে পড়ল জনমানবহীন-বিরান, বিষণ্ন। এই জনশূন্য ও ফাঁকা ঘর-দুয়ার দেখে মনে হচ্ছিল এখানে কখনো কেউ বসবাস করেনি। কখনো কোনোদিন সন্ধ্যা ও রাতে এখানে আড্ডা জমেনি। যেন এখানে রাতের খোশ আলাপে কখনো কারও ভোর হয়ে যায়নি।

আবদুল্লাহ ও তাঁর সঙ্গীদের মক্কা থেকে বেরিয়ে পড়ার পরপরই আবু জাহল ও উতবা ইবনে রবীআর নেতৃত্বে কুরাইশের প্রধান প্রধান ব্যক্তিবর্গ মক্কার বিভিন্ন মহল্লায় অনুসন্ধানে বের হলো, মক্কা ছেড়ে মুসলিমদের মধ্য থেকে কারা মদীনায় চলে গেল আর কারা রয়ে গেল।

উতবা দেখল, জাহাশ পরিবারের ঘর-বাড়িগুলোর ওপর দিয়ে মরুর দমকা হাওয়া দৌড়ে চলেছে এদিক থেকে ওদিক। তারই ঝাপটায় দরজা-জানালাগুলো একটি অন্যটির সঙ্গে বাড়ি খেয়ে আওয়াজ তুলছে। এই অবস্থা দেখে উতবা বলে উঠল, 'জাহাশ পরিবারের পরিত্যক্ত ঘর-বাড়িগুলো যেন মালিকদের বিচ্ছেদে বিলাপ করে কাঁদছে।'

একথা শুনে আবু জাহল বলল,

'এরা আজ কোথায় হারিয়ে গেল যে ঘর-বাড়িগুলো তাদের বিচ্ছেদে কেঁদে মরছে?!'

আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশের বাড়িটি দখল করে নিল আবু জাহল। কারণ, পরিত্যক্ত বাড়িগুলোর মধ্যে সেটাই ছিল সবচেয়ে উত্তম। চমৎকার সব আসবাবপত্রে ঠাসা এবং দামী ও মনোরম সরঞ্জামের কারণে সবচেয়ে সুন্দর। যার লোভ সামলানো তার পক্ষে সম্ভব হলো না। অতএব সে এই বাড়ি দখল করে এতে হস্তক্ষেপ শুরু করে দিল যেমন করে থাকে কোনো মালিক নিজের মালিকানার বস্তুতে।

মদীনায় আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ যখন শুনলেন, আবু জাহল তার মক্কার বাড়িটি দখল করে নিয়েছে তখন তিনি অত্যন্ত ব্যথিত হৃদয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সংবাদটি শোনালেন। প্রিয় নবী তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন,

أَلَا تَرْضَى يَا عَبْدَاللهِ اَنْ يُعْطِيَكَ اللهُ بِهَا دَارًا فِي الْجَنَّةِ

'হে আবদুল্লাহ! তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে ঐ বাড়িটির বিনিময়ে আল্লাহ তোমাকে জান্নাতের মধ্যে দান করবেন একটি বিশেষ বাড়ি।'

তিনি বললেন, 'কেন নয় ইয়া রাসূলাল্লাহ! সেটাতো অবশ্যই পছন্দ করব।'

নবীজী বললেন, 'ঠিক আছে তাহলে তোমার জন্য তাই হবে।'

আবদুল্লাহ খুশি হলেন এবং তাঁর হৃদয় প্রশান্তিতে ভরে উঠল।

আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ রাযিয়াল্লাহু আনহু প্রথমবার হাবশার হিজরত এবং দ্বিতীয়বার মদীনায় হিজরতের চরম কষ্ট ও ক্লান্তির পর মাত্রই একটু স্থির হতে গিয়েছিলেন...

কুরাইশী জালিমদের হাতে চরম নির্যাতন ভোগ করার পর আনসারীদের চূড়ান্ত সহযোগিতায় মাত্রই তিনি সুখ ও স্বস্তির কিছুটা পরশ পেতে গিয়েছিলেন। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছায় এরই মধ্যে তিনি মুখোমুখি হলেন জীবনের সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষার। ইসলাম গ্রহণের পর থেকে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ও বিপদজনক তিক্ততার মধ্যে পড়তে হলো তাকে। চলুন প্রিয় পাঠক! সেই তিক্ত ও কঠিন অভিজ্ঞতার কাহিনী শুনি মন ও কান লাগিয়ে।

* * *

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসলামের প্রথম সামরিক কার্যক্রম পরিচালনা করার উদ্দেশ্যে আটজন সাহাবীকে দিয়ে একটি ছোট দল গঠন করলেন, সেই ছোট দলটিতে শামিল রাখলেন আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ এবং সাদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস রাযিয়াল্লাহু আনহুমাকে।

ছোট্ট এই দলটি গঠনের পর প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

'আমি এমনই একজনকে তোমাদের আমীর ও দলপতি মনোনীত করব যিনি নিজের কর্তব্যে সবচেয়ে বেশি অবিচল, ক্ষুধা ও পিপাসায় সবচেয়ে বেশি ধৈর্যশীল।'

এরপর তিনি আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশের হাতে পতাকা তুলে দিয়ে তাকেই বানিয়ে দিলেন আমীর ও দলপতি। তিনিই হলেন প্রথম আমীর যাকে একদল মুমিনের নেতৃত্বের ভার দিলেন খোদ রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

* * *

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পথ ও গন্তব্য সম্পর্কে দিক-নির্দেশনা দেওয়ার পর আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশের হাতে অর্পণ করলেন একটি চিঠি। এই চিঠি সম্পর্কে নির্দেশ দিয়ে বললেন, 'দুইদিন পথ চলার পরেই কেবল এই চিঠি খুলে পড়বে।'

দলটিকে সঙ্গে নিয়ে দুইদিন বিরামহীন পথ চলার পর আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ নবীজীর চিঠিটা খুললেন, দেখলেন সেখানে তাঁর নির্দেশ রয়েছে,

إِذَا نَظَرْتَ فِيْ كِتَابِيْ هٰذَا فَامْضِ حَتّٰى تَنْزِلَ نَخْلَةً بَيْنَ الطَّائِفِ وَمَكَّةَ، فَتَرَصَّدْ بِهَا قُرَيْشًا، وَقِفْ لَنَا عَلىٰ اَخْبَارِهِمْ...

'আমার এই চিঠি যখন পড়বে, তখন আরও সামনে চলতে থাকবে। মক্কা এবং তায়েফের মধ্যবর্তী 'নাখলা'য় গিয়ে থামবে। সেদিক দিয়ে কুরাইশের লোকজনের চলাফেরা ও গতিবিধির ওপর তীক্ষ্ণ নজর রাখবে এবং আমার কাছে প্রতিটা তথ্য সরবরাহ করবে।'

চিঠি পড়া শেষ করে আবদুল্লাহ বললেন, 'আল্লাহর নবীর আদেশ শিরোধার্য।' এরপর সঙ্গীদের বললেন :

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে 'নাখলা'য় যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। এবং সেখানে গিয়ে কুরাইশের গতিবিধির প্রতি নজর রেখে তাঁকে তথ্য সরবরাহ করতে বলেছেন। এই চরম ঝুঁকিপূর্ণ কাজে তোমাদের কাউকে আমার সঙ্গে যাওয়ার জন্য বাধ্য করতে স্পষ্ট ভাষায় নিষেধ করে দিয়েছেন। সুতরাং যে শাহাদাতের প্রত্যাশী হয়ে এই ঝুঁকিপূর্ণ কাজে যেতে আগ্রহী সে যেন আমার সঙ্গী হয়। আর যে এতে অনাগ্রহী সে ফিরে যেতে পারে, এতে তাকে কোনোরূপ তিরস্কার করা হবে না।'

একথার প্রতিক্রিয়ায় সকলে একসঙ্গে বলে উঠলেন :

'আল্লাহর রাসূলের নির্দেশের সামনে আমাদের আনুগত্যের মাথা অবনমিত। নিশ্চয় আমরা তোমার সঙ্গে সেখানেই যাব, আল্লাহর নবী যেখানে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।'

এরপর সকলে 'নাখলা'র উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লেন। সেখানে পৌছার পর পথে-পথে ঘুরে ঘুরে তারা কুরাইশের সংবাদ সংগ্রহে লেগে পড়লেন।

এই দায়িত্বপালন করতে করতে তারা বহু দূরে দেখতে পেলেন একটি কুরাইশী কাফেলা, যাদের মধ্যে শামিল ছিল চারজন ব্যক্তি—আমর ইবনুল হাযরামী, হাকাম ইবনে কায়সান, উসমান ইবনে আবদুল্লাহ এবং তার ভাই মুগীরা। এদের সঙ্গে ছিল চামড়া, কিসমিস এবং কুরাইশের অন্যান্য ব্যবসায়িক পণ্য, যেসব পণ্যের ব্যবসা তারা মক্কায় করত।

সাহাবায়ে কেরাম এই বাণিজ্য কাফেলার ব্যাপারে পরস্পর পরামর্শ করলেন কী করা যায়? কারণ ঐ দিনটি ছিল যুদ্ধ-নিষিদ্ধ মাসগুলোর (জিলকদ, জিলহজ্জ, মুহাররম ও রজব) সর্বশেষ দিন। তাঁরা বলাবলি করলেন যে, 'আজ যদি আমরা তাদের ওপর হামলা করি, তাহলে সেটা হবে নিষিদ্ধ মাসে হামলা। আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ হবে যে, আমরা নিষিদ্ধ ও পবিত্র মাসের মর্যাদা ভূলুণ্ঠিত করেছি এবং গোটা আরবসমাজে আমাদের বিরুদ্ধে ছিঃ ছিঃ পড়ে যাবে।

আর যদি আমরা আজকের দিনটি পেরিয়ে যাওয়ার অপেক্ষায় থাকি, তাহলে ততক্ষণে ওরা পৌঁছে যাবে হারামের পবিত্র সীমানায়। যেখানে আমরা তাদের বিরুদ্ধে কোনো আক্রমণ চালাতে পারব না। তারা হয়ে যাবে নিরাপদ।'

দীর্ঘ পরামর্শ করে তারা হামলা করার ব্যাপারে একমত হলেন এবং সিদ্ধান্ত মুতাবেক আক্রমণ করে একজনকে হত্যা করলেন, দু'জনকে করলেন বন্দী, চতুর্থ ব্যক্তি ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে যেতে সক্ষম হলো। মালামাল বোঝাই উটের বহর গনিমত হিসাবে গৃহীত হলো।

আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ এবং তার সঙ্গীরা গনিমতের মালসহ বন্দী দু'জনকে টানতে টানতে নিয়ে গেলেন মদীনায়। তারা যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে হাজির হলেন এবং তাঁকে তাদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে জানালেন, নবীজী ভীষণ ক্ষুব্ধ হলেন। অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে বললেন,

وَاللهِ مَاأَمَرْتُكُمْ بِقِتَالٍ، وَإِنَّمَا أَمَرْتُكُمْ أَنْ تَقِفُوْا عَلٰى أَخْبَارِقُرَيْشٍ، وَأَنْ تَرْصُدُوْا حَرَكَتَهَا

'আল্লাহর কসম! আমি তোমাদের হামলা করার নির্দেশ দেইনি। আমি শুধু কুরাইশের তথ্য সংগ্রহ করতে এবং তাদের গতিবিধি পর্যবেক্ষণের নির্দেশ দিয়েছিলাম।'

বন্দী দু'জনের বিষয়টিও মওকুফ রেখে দিলেন, কিছুই বললেন না। তাদের ব্যাপারে করণীয় সম্পর্কে ভাবতে থাকলেন। বাণিজ্যপণ্য সম্পর্কেও কোনো সিদ্ধান্ত না দিয়ে সম্পূর্ণরূপে এড়িয়ে গেলেন। কোনো কিছু ছুঁয়েও দেখলেন না।

আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ এবং সঙ্গীরা ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়লেন এবং নিশ্চিত হলেন যে রাসূলের নির্দেশের বিপরীত কাজ করে তারা নিজেদের ধ্বংস ডেকে এনেছেন।

বিষয়টি তাদের জন্য আরও বেশি দুর্বিসহ হয়ে পড়ল যখন অন্যান্য মুসলিম ভাইয়েরা তাদের তিরস্কার করতে থাকল। পথে-ঘাটে তাদের এড়িয়ে, পাশ কাটিয়ে যেতে যেতে মন্তব্য করতে লাগল 'এরা আল্লাহর রাসূলের হুকুম অমান্য করেছে।'

তাদের এই দুর্বিসহ জীবনের কষ্ট আরও কয়েকগুণ বেড়ে গেল যখন তারা জানতে পারলেন কুরাইশের লোকেরা এই দুর্ঘটনাকে প্রিয় নবীর বিরুদ্ধে কাজে লাগানোর সুযোগ হিসাবে ব্যবহার করছে। তারা গোটা আরবের মধ্যে অপপ্রচার শুরু করেছে যে,

'মুহাম্মাদ হারাম ও নিষিদ্ধ মাসকে হালাল বানিয়ে নিয়েছে। এই মাসে সে মানুষকে হত্যা করেছে, ধন-সম্পদ লুট করেছে, আমাদের লোকজনকে বন্দী করেছে।'

আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং তার সঙ্গীদের ভুলের ফলে প্রিয় নবী কর্তৃক তাদের তিরস্কার, মুহাজির, আনসারসহ ভাই-বন্ধুর মতো প্রিয় সকল সাহাবীর উপেক্ষা, সর্বপরি তাদেরই ভুলের অজুহাতে কুরাইশীদের অপপ্রচারে প্রাণের চেয়ে প্রিয় নবীর কষ্ট পাওয়া—তাদের জন্য যে কতখানি অন্তর্জালা ও মর্মবেদনার কারণ ছিল তা একেবারেই অবর্ণনীয় ও অকল্পনীয়।

* * *

এভাবেই তাদের মর্মজ্বালা বাড়তে বাড়তে, বিপদের বোঝা ভারী হতে হতে একদিন তাদের সুদিন এল। সুসংবাদ বহনকারী তাদের সংবাদ শোনাল যে, দয়াময় আল্লাহ তাদের কৃতকর্মে অসন্তুষ্ট নন। সন্তোষ প্রকাশ করে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি আয়াত নাজিল করেছেন।

এবার তাদের আনন্দ ও খুশি দেখে কে! সাহাবায়ে কেরাম ছুটে আসতে থাকলেন তাদের কাছে। আনন্দে মুআনাকা ও গলায় গলা মেলাতে থাকলেন। সুসংবাদ ও অভিনন্দন জানাতে থাকলেন আর তেলাওয়াত করতে থাকলেন কুরআনের সেই আয়াত—যা নাজিল হয়েছে তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি নাজিল হলো মহান আল্লাহর এই বাণী :

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ

'তারা আপনাকে পবিত্র মাসে যুদ্ধ করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। আপনি বলে দিন, এমাসে যুদ্ধ করা ভীষণ পাপ। আর আল্লাহর পথে বাধা প্রদান করা, আল্লাহর সঙ্গে কুফরী করা, হারামের অধিবাসীদের সেখান থেকে বের করে দেওয়া, আল্লাহর নিকট তার চেয়ে বড় পাপ। আর ফিৎনা ও ত্রাস সৃষ্টি করা নর হত্যার চেয়ে মহাপাপ।' -বাকারা : ২১৭

* * *

যখন এই পবিত্র আয়াত নাজিল হলো, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও খুশি হলেন, তাঁর মন ভালো হয়ে গেল। পণ্য সামগ্রী গ্রহণ করলেন, বন্দী দু'জনকে পণ নিয়ে মুক্ত করে দিলেন।

আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ এবং তার বাহিনীর সকলের প্রতিও সন্তুষ্ট হলেন। কেননা, তাদের এই অভিযানের বিরাট অবদান রয়েছে মুসলিমজাতির জীবনে...

ইসলামের ইতিহাসে সর্বপ্রথম গনিমত এই বাহিনী অর্জন করে...
সর্বপ্রথম শত্রু হত্যার গৌরব অর্জন করে এই বাহিনী...
সর্বপ্রথম দুই শত্রুকে বন্দী করার গৌরবও এই বাহিনীরই...

এই বাহিনীর পতাকাই রাসূলের মুবারক হাতে প্রতিষ্ঠিত প্রথম পতাকা...

এই বাহিনীর আমীর আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশকেই সর্বপ্রথম ভূষিত করা হয় 'আমীরুল মুমিনীন'।

এরপর ঘটল বদরের যুদ্ধ। যেখানে আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ তাঁর ঈমানী জোশ ও আবেগের মিশ্রণে প্রদর্শন করেছিলেন বীরত্ব ও বাহাদুরির অপূর্ব দৃষ্টান্ত।

* * *

এরপর এল ওহুদের যুদ্ধ। এই যুদ্ধে আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ এবং তার সঙ্গী সাদ ইবনে আবী ওয়াক্কাসের রয়েছে এমন এক কাহিনী, যা কখনোই ভোলা যায় না। আমরা এখন সাদেরই শরণাপন্ন হচ্ছি তাঁর ও তাঁর সঙ্গীর অপূর্ব সেই কাহিনীটি শোনার জন্য ।

সাদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন :

'ওহুদ যুদ্ধের দিন আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হলো। তিনি আমার কাছে প্রস্তাব করলেন, চলো... আমরা দু'জনে মিলে আল্লাহর দরবারে একটু প্রার্থনা করি। আমি খুশির সঙ্গে রাজি হয়ে গেলাম। এরপর একটি নিরিবিলি স্থান খুঁজে নিয়ে প্রথমে আমার প্রার্থনা আল্লাহর দরবারে তুলে ধরার জন্য বলতে শুরু করলাম,

يَارَبِّ اِذَا لَقِيْتُ الْعَدُوَّ فَلَقِّنِيْ رَجُلًا شَدِيْدًا بأسُه، شَدِيْدًا حَرَدُه أُقَاتِلُه وَيُقَاتِلُنِيْ ثُمَّ ارْزُقْنِيْ الظَّفْرَ عَلَيْهِ حَتّٰى اَقْتُلَه وَآخُذَ سَلَبَه-

'হে আল্লাহ! যখন আমি শত্রুবাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করতে যাব, তখন আমাকে এমন এক শত্রুর মুখোমুখি করে দিয়ো, যে হবে সর্বাধিক শক্তিশালী এবং যার আক্রমণ অত্যন্ত তীব্র। সর্বশক্তিতে আমি তার ওপর হামলা করব আর সেও হামলা করবে আমার ওপর। এক পর্যায়ে আমাকে প্রবল করে দিয়ো তার ওপর, যেন আমি তাকে হত্যা করে তার সকল যুদ্ধাস্ত্র ছিনিয়ে নিতে পারি।'

আমার এই দুআয় আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ আমীন বললেন। এরপর তিনি দুআ করলেন,

اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِيْ رَجُلًا شَدِيْدًا حَرَدُه شَدِيْدًا بَأْسُه أُقَاتِلُه فِيْكَ وَيُقَاتِلُنِيْ، ثُمَّ يَأخُذُنِيْ فَيَجْدَعُ اَنْفِيْ وَاُذُنِيْ، فَاِذَا لَقِيْتُكَ غَدًا قُلْتَ فِيْمَ جُدِعَ اَنْفُكَ وَاُذُنَكَ فَاَقُوْلُ فِيْكَ وَفِيْ رَسُوْلِكَ فَتَقُوْلُ- صَدَقْتَ

'হে আল্লাহ! যুদ্ধের ময়দানে প্রতিপক্ষ হিসাবে আমাকে দিয়ো এক ভয়াবহ যোদ্ধা যার আক্রমণ ক্ষমতা তীব্র। আমি তোমার জন্য তার ওপর আক্রমণ করব সেও আমার ওপর আক্রমণ করবে। অবশেষে সে আমাকে হত্যা করবে, এরপর সে আমার নাক কাটবে, কান কাটবে। কিয়ামতের ময়দানে যখন আমি তোমার সম্মুখে দাঁড়াব তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করবে কেন তোমার নাক-কান কাটা হয়েছিল? আমি জবাব দেব, হে আল্লাহ! তোমার এবং তোমার রাসূলের জন্য। তখন তুমি বলবে, ঠিক বলেছ।'

সাআদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস বলেন :

'আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশের দুআ ছিল আমার দুআর চেয়ে অনেক উত্তম। সেদিন যুদ্ধ শেষে আমি তাঁকে দেখলাম, তাঁকে হত্যা করা হয়েছে। তাঁর নাক, কান কাটা হয়েছে। তাঁর কর্তিত নাক ও কান পাশের একটি গাছে সুঁতা দিয়ে ঝোলানো ছিল।'

* * *

আল্লাহ তাআলা আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশের দুআ কবুল করেছেন। তাই তাঁকে দান করেছেন শাহাদাতের বিরল মর্যাদা। যেমন শহীদীমৃত্যুর মর্যাদা দিয়েছেন আল্লাহ তার মামা সাইয়্যেদুশ শুহাদা হামযা ইবনে আবদুল মুত্তালিবকে।

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের দু'জনকে দাফন করলেন একই কবরের মধ্যে রক্ত মাখা, ক্ষত-বিক্ষত দেহে। আর তাঁর দু'চোখ থেকে অশ্রু ঝরে কবরের মাটিকে দিচ্ছিল ভিজিয়ে—যে মাটি ছিল দুই শহীদের রক্তে পূর্বেই সিক্ত। আর শাহাদাতের সৌরভে সুরভিত।

তথ্যসূত্র :

১. *আল-ইসাবা*, ২য় খণ্ড, ২৮৬ পৃষ্ঠা অথবা *আত্তারজামা*, ৪৫৮৩।
২. *ইমতাউল আসমা*, ১ম খণ্ড, ৫৫ পৃষ্ঠা।
৩. *হুলইয়াতুল আউলিয়া*, ১ম খণ্ড, ১০৮ পৃষ্ঠা।
৪. *হুসনুস সাহাবা*, ৩০০ পৃষ্ঠা।
৫. *মাজমূআতুল ওয়াসাইক্বিস সিয়াসিয়্যা*, ৮ পৃষ্ঠা।

আবু উবায়দাহ ইবনুল জাররাহ

> প্রত্যেক উম্মতেরই একজন 'আমীন' থাকে, আমার উম্মতের 'আমীন' আবু উবায়দাহ।
>
> –মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ

তিনি ছিলেন উজ্জ্বল চেহারার, প্রসন্ন ললাটের, ছিপছিপে হালকা দেহী দীর্ঘগড়নের অতি চমৎকার, সুন্দর, আকর্ষণীয় আর অমায়িক মানুষ, যাকে দেখলে চোখ জুড়িয়ে যেত। যার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলে হৃদয়ে প্রশান্তি মিলত। যার সংস্পর্শে মন ভালো হয়ে যেত।

এছাড়াও তিনি ছিলেন অসম্ভব বিনয়ী আর ভীষণ লাজুক, আবার তিনিই যুদ্ধের ময়দানে লড়াই তীব্র হলে হয়ে উঠতেন প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়া সিংহের মতো ভয়ঙ্কর এবং শত্রুর বিরুদ্ধে গর্জে ওঠা সাহসী এক যোদ্ধা।

উজ্জ্বল ও তীক্ষ্ম তরবারিই ছিল তার একমাত্র তুলনা, প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে ধারালো তরবারির মতোই তিনি ঝলসে উঠতেন।

তিনি হচ্ছেন উম্মতে মুহাম্মাদীর 'আমীন' (বিশ্বাসভাজন)—আমের ইবনে আবদুল্লাহ ইবনুল জাররাহ আল-ফেহরী আল-কুরাইশী। সকলেই যাকে চেনে 'আবু উবায়দাহ ইবনুল জাররাহ' নামে।

আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাঁর সম্পর্কে বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন :

'কুরাইশের তিন ব্যক্তি মানুষের মধ্যে সর্বাধিক উজ্জ্বল ও নির্মল ব্যক্তিত্বের অধিকারী, সর্বশ্রেষ্ঠ চরিত্র এবং সর্বাধিক লজ্জাশীল। যদি তারা তোমার সঙ্গে কথা বলেন তবে কিছুতেই মিথ্যা বলবেন না, আর তুমি যদি তাদের সঙ্গে কথা বলো তবে তারা কিছুতেই তোমাকে অবিশ্বাস করবেন না। তারা হলেন, আবু বকর সিদ্দীক, উসমান ইবনে আফফান এবং আবু উবায়দাহ ইবনুল জাররাহ রাযিয়াল্লাহু আনহুম।'

* * *

আবু উবায়দা ছিলেন একেবারে শুরুতে ইসলাম গ্রহণকারীদের অন্যতম। আবু বকর সিদ্দীকের ইসলাম গ্রহণের পরের দিনেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তার ইসলাম গ্রহণের কাজ সম্পন্ন হয়েছিল খোদ আবু বকর সিদ্দীকেরই হাতে। ইসলাম গ্রহণের পর আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে, আবদুর রহমান ইবনে আউফ, উসমান ইবনে মাযউন এবং আরকাম ইবনে আরকামকে সঙ্গে নিয়ে হাজির হলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে। তারা প্রিয় নবীর সম্মুখে হকের কালিমা উচ্চারণ করলেন। তারাই হলেন সর্বপ্রথম ভিত্তিপ্রস্তর—যার ওপর ইসলামের বিশাল প্রাসাদ প্রতিষ্ঠা করা হয়।

* * *

আবু উবায়দা মক্কার জীবনে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণকারীদের সকল তিক্ত অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়েছেন। প্রথম সারির মুসলিমদের সঙ্গে সেখানে ভোগ করেছেন এমন সকল সহিংসতা, নির্দয়তা, কষ্ট ও বেদনা যা ভোগ করতে হয়নি পৃথিবীর বুকে আর কোনো দীন-ধর্মের অনুসারীকেই। আবু উবায়দা প্রতিটি পরীক্ষার সামনে পাহাড়ের মতো অটল থেকেছেন। আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি অবিচল আস্থা রেখে প্রতিটি পদক্ষেপে ইসলামী আদর্শকে সমুন্নত করেছেন।

কিন্তু বদর যুদ্ধের ময়দানে তিনি যে পরীক্ষার মুখোমুখি হয়েছিলেন, তা সকল হিসাব-নিকাশকে এমনকি কল্পনাকারীদের কল্পনাশক্তিকেও অতিক্রম করেছিল।

* * *

বদর যুদ্ধের দিন আবু উবায়দা শত্রুবাহিনীর সারি ভেদ করে উপুর্যপরি আক্রমণ করে এগিয়ে যাচ্ছেন। মৃত্যুর কোনো পরোয়াই তিনি করছেন না। মুশরিকগণ তার এরূপ ভয়াবহ আক্রমণ দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়ল। কুরাইশের অশ্বারোহী-বাহিনী তাকে সাক্ষাৎ বিপদ ভেবে তার সামনে থেকে নিজেদেরকে সরিয়ে সরিয়ে, বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে চলতে থাকল...

পক্ষান্তরে তাদেরই এক সৈনিকের আচরণ ছিল ব্যতিক্রমী, সে বারবার এদিক-সেদিক থেকে আবু উবায়দার সামনে গিয়ে দাঁড়াচ্ছিল। পক্ষান্তরে আবু উবায়দা নিজে এই সৈনিককে দেখামাত্র দূরে সরে পড়ছিলেন। তিনি স্বেচ্ছায় তার ওপর আক্রমণ করতে চাচ্ছিলেন না বলেই বারবার দূরে সরে যাচ্ছিলেন।

কিন্তু প্রতিপক্ষের সেই সৈনিক লোকটি সুযোগ পেয়ে ভয়াবহ আক্রমণ চালাল আবু উবায়দার ওপর। আবু উবায়দা সে আক্রমণ থেকে নিজেকে রক্ষা করে তার থেকে আরও বেশি দূরে সরতে চাইলেন। কিন্তু নাছোড়বান্দা লোকটি এবার আবু উবায়দার পথ আগলে দাঁড়াল। ঐ লোকটির কারণে তিনি নিজের ও আল্লাহর দুশমনদের ওপর আক্রমণ চালাতে অপারগ হয়ে পড়লেন।

এভাবে আবু উবায়দা চরম বিরক্ত হয়ে সামনে দাঁড়ানো লোকটির মাথায় এক আঘাত করলেন যাতে তার মাথা দু'ভাগ হয়ে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গেই তার সম্মুখে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

প্রিয় পাঠক! ভূপাতিত এই লোকটি কে হতে পারে—সেটা অনুমান করতে চেষ্টা করবেন না।

আমি কি পূর্বেই বলে আসিনি 'আবু উবায়দা যে ঈমানী পরীক্ষার মুখোমুখি হয়েছিলেন তা সকল হিসাব-নিকাশকে এমনকি কল্পনাকারীদের কল্পনা শক্তিকেও অতিক্রম করেছিল।'

পাঠকের বুদ্ধি-বিবেক নিশ্চয় থমকে যাবে যখন জানবেন যে ভূপাতিত এই লোকটি অন্য কেউ নয়, খোদ আবু উবায়দার পিতা আবদুল্লাহ ইবনুল জাররাহ।

* * *

আবু উবায়দা রাযিয়াল্লাহু আনহু আসলে নিজ পিতাকে হত্যা করেননি, তিনি হত্যা করেছিলেন ব্যক্তি পিতার মধ্যকার শিরকী অপশক্তিকে।

এরই ফলে পরম পবিত্র আল্লাহ তাআলা আবু উবায়দা এবং তার পিতার ব্যাপারে নাজিল করেছেন কুরআনী আয়াত :

ইরশাদ করেছেন,

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَٰئِكَ حِزْبُ اللهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

'যারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে, তাদের আপনি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণকারীদের সঙ্গে বন্ধুত্বস্থাপন করতে দেখবেন না। যদিও তাঁরা তাদের পিতা, পুত্র, ভাই বা বংশের লোক হয়। তাদের অন্তরে আল্লাহ ঈমান লিখে দিয়েছেন এবং তাদেরকে তাঁর অদৃশ্য শক্তি দ্বারা শক্তিশালী করেছেন। তিনি তাদের জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার পাদদেশ দিয়ে নির্ঝরমালা প্রবাহিত। তাঁরা সেখানে চিরকাল থাকবেন। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারা আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। তারাই

আল্লাহর দল। জেনে রাখো আল্লাহর দলই সফলকাম হবে।' -সূরা মুজাদালা-২২

* * *

আবু উবায়দা রাযিয়াল্লাহু আনহুর কাছ থেকে এরূপ ঘটনা ঘটা আশ্চর্যজনক কিছুই ছিল না। কেননা, আল্লাহর প্রতি তাঁর গভীর ঈমানী শক্তি এবং দীন ইসলামের জন্য তাঁর শুভ কামনা আর উম্মতে মুহাম্মাদীর 'আমীন' বা বিশ্বাসভাজন হওয়ার ব্যাপারে তিনি এতটাই ঈর্ষণীয় মর্যাদার অধিকারী হয়েছিলেন—যার জন্য লালায়িত ছিলেন আল্লাহর নিকট মর্যাদাবান অনেকেই।

মুহাম্মাদ ইবনে জাফর বর্ণনা করেন :

'খ্রিস্টানদের একটি প্রতিনিধি দল রাসূলের দরবারে এসে নিবেদন করল, হে আবুল কাসেম! আপনার আস্থাভাজন একজন সাহাবীকে আমাদের সঙ্গে পাঠান, যিনি আমাদের পরস্পরের বিরোধপূর্ণ মালামালের মধ্যে ন্যায়ানুগ মীমাংসা করে দেবেন। আপনারা মুসলিমসমাজের মানুষজন আমাদের নিকট খুবই গ্রহণযোগ্য হিসাবে বিবেচিত।'

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন :

'তোমরা এখন যাও, বিকালে এসো। তখন আমি তোমাদের সঙ্গে শক্তিশালী ও আমানতদার কাউকে পাঠাব।'

উমর ইবনুল খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন :

'যোহরের নামাযের সময় আমি আগে আগেই মসজিদে হাজির হলাম, জীবনে কখনোই আমি নেতৃত্ব পছন্দ করিনি কিন্তু সেইদিন আগ্রহী হয়েছিলাম যেন প্রিয় নবীর পবিত্র মুখ-নিঃসৃত ঐ দুটো গুণের অধিকারী আমি হতে পারি।'

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যোহরের নামায আদায়ের পর ডানে-বামে তাকাতে লাগলেন আর আমি ঘার উঁচু করতে থাকলাম

তাঁর চোখে পড়ার জন্য। তিনি দৃষ্টি ঘোরাতেই থাকলেন। অবশেষে আবু উবায়দাকে দেখতে পেয়ে তাকে কাছে ডেকে বললেন,

'তুমি তাদের সঙ্গে যাও এবং তাদের বিরোধের ন্যায়সঙ্গত মীমাংসা করে দাও।'

আমি মনে মনে বললাম, 'আবু উবায়দাই গুণ দুটোর অধিকারী হয়ে গেল।'

* * *

আবু উবায়দা কেবল 'আমীন' (বিশ্বস্ত/আস্থাভাজন) ছিলেন তাই নয়, বিশ্বস্ততার পাশাপাশি তিনি ছিলেন অসাধারণ ঈমানী শক্তির অধিকারী। যা প্রকাশ পেয়েছে একাধিক স্থানে।

এই ঈমানী শক্তিমত্তার প্রকাশ ঘটেছিল সেইদিন যেদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর একদল সাহাবীকে কুরাইশী এক বাণিজ্য কাফেলার পিছু ধাওয়া করার জন্য পাঠিয়েছিলেন। এই ছোট দলটির আমীর মনোনীত করেছিলেন আবু উবায়দা রাযিয়াল্লাহু আনহুকে। রসদ হিসাবে প্রিয় নবী তাদের হাতে তুলে দিলেন মাত্র এক ঝুড়ি খেজুর। এছাড়া তিনি তাদের আর কোনো কিছুই দিতে পারেননি।

এই অভিযান পরিচালনা-কালে আবু উবায়দা রাদিয়াল্লাহ আনহু প্রত্যেক সদস্যকে প্রতিদিন একটি করে খেজুর খেতে দিতেন। তাঁরা প্রত্যেকে সেই খেজুরটি দুগ্ধপোষ্য শিশুর মতো করে চুষতেন। এরপর পানি খেয়ে তাই দিয়ে পুরা দিন পার করে দিতেন। এতে বুঝা যায় তিনি কত বেশি শারীরিক ও ঈমানী শক্তির অধিকারী ছিলেন।

* * *

তাঁর শারীরিক ও ঈমানী শক্তির প্রকাশ ঘটেছিল ওহুদ যুদ্ধের দিনেও। যখন মুসলিমবাহিনী পরাজয়ের মুখে পড়ে এবং শত্রুবাহিনীর এক মুশরিক চিৎকার করে বলতে থাকে,

'কোথায় মুহাম্মাদ?' 'বলে দাও মুহাম্মাদ কোথায়?'

সেই চরম মুহূর্তে আবু উবায়দা ছিলেন সেই দশ সৈনিকের অন্যতম যারা প্রিয় নবীকে ঘিরে রেখেছিলেন এবং মুশরিকদের অগণিত বর্শার আঘাত নিজেদের বুক পেতে গ্রহণ করে সুরক্ষা দিয়েছিলেন প্রাণের চেয়ে প্রিয় নবীকে।

যুদ্ধ যখন শেষ হলো, দেখা গেল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখের একটি মুবারক দাঁত শহীদ হয়ে গেছে। তাঁর কপাল মুবারক ছিল আঘাতপ্রাপ্ত, রক্তাক্ত। লৌহ শিরস্ত্রাণের দুইটি পেরেক ছিল তাঁর মুবারক গালে বিদ্ধ। সেই পেরেক দুটো উঠানোর জন্য আবু বকর সিদ্দীক এগিয়ে এলে আবু উবায়দা তাঁকে বললেন :

'আল্লাহর নামের কসম দিয়ে বলছি, একাজটি আমাকে করার সুযোগ দিন।' আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু সরে গিয়ে তাকেই সুযোগ করে দিলেন। আবু উবায়দা রাযিয়াল্লাহু আনহুর আশঙ্কা হলো, ছোট্ট পেরেক হাত দিয়ে তুলতে গেলে বারবার ছুটবে এবং তাতে নবীজীর কষ্ট হবে। সুতরাং তিনি নিজের সামনের উপরের ও নিচের দুটো দাঁত দিয়ে মজবুত করে একটি পেরেক ধরে টান দিলেন। সেটা বের হয়ে এল তবে তাঁর উপরের সেই দাঁতটি ভেঙ্গে গেল। এবার তিনি দ্বিতীয় পেরেকটিকে ওপরের অন্য দাঁত এবং সোজাসুজি নিচের দাঁতটি দিয়ে শক্তভাবে ধরে টান দিলে সেটাও বেরিয়ে এল এবং তাঁর উপরের দ্বিতীয় দাঁতটিও ভেঙ্গে গেল।

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন :
'যাদের সামনের দাঁত নেই তাদের মধ্যে দেখতে সর্বাধিক সুন্দর মানুষ আবু উবায়দা।'

* * *

আবু উবায়দা রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুবারক হাতে ইসলাম গ্রহণের পর থেকে তাঁর ইন্তেকাল পর্যন্ত প্রত্যেক জিহাদেই তাঁর সঙ্গী হয়েছেন।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের পর যখন আবু বকরের হাতে খলীফা হিসাবে বাইআত গ্রহণের দিন (সাকীফায়ে বনী সায়েদার দিন, যেখানে তাঁর হাতে বাইআত নেওয়া হয়েছিল) এল, উমর ইবনুল খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহু আবু উবায়দা রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বললেন :

'আপনার হাত বাড়ান, আমি আপনার হাতে বাইআত নেব। কারণ, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি,

'প্রত্যেক উম্মতেরই একজন আমীন থাকে, আর তুমি হচ্ছ এই উম্মতের আমীন।'

তখন আবু উবায়দা বললেন,

'এমন মানুষ বিদ্যমান থাকতে আমি সম্মুখে আসার সাহস দেখাতে পারি না, যাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে আমাদের নামাযে ইমামতি করার নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং তিনিই তাঁর ইন্তেকাল পর্যন্ত আমাদের ইমামতি করেছিলেন।'

এরপর আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহুর হাতেই খলীফা হিসাবে বাইআত গ্রহণ করা হলো। আবু উবায়দা ছিলেন সত্য ও কল্যাণের ক্ষেত্রে তাঁর সর্বোত্তম শুভাকাঙ্ক্ষী এবং শ্রেষ্ঠতম সহযোগিতা দানকারী।

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু ইন্তেকালের পূর্বে তাঁর পরবর্তী খলীফা হিসাবে উমর ফারূক রাযিয়াল্লাহু আনহুর নাম ঘোষণা করে গেলেন। আবু উবায়দা রাযিয়াল্লাহু আনহু পরিপূর্ণরূপে তারও আনুগত্যে নিয়োজিত থাকলেন। জীবনে কখনো কোনো কাজেই তাঁর নির্দেশ অমান্য করেননি শুধুমাত্র একটি ক্ষেত্র ছাড়া।

কী ছিল সেই ব্যাপারটি, যেখানে আবু উবায়দা খলীফাতুল মুসলিমীনের নির্দেশ অমান্য করেছিলেন?

সে ঘটনাটি যখন ঘটেছিল, সে সময় আবু উবায়দা ছিলেন শাম দেশে। তাঁর নেতৃত্বে তখন মুসলিমবাহিনী দুর্বার গতিতে এগিয়ে

যাচ্ছিল। আল্লাহ তাআলা একের পর এক তাঁর হাতে বিজয় দান করছিলেন। গোটা শাম দেশ হয়ে গেল তাঁর পদানত। পূর্বে ফুরাত নদী উত্তরে এশিয়া মাইনর পর্যন্ত বিস্তৃত হলো তাঁর বিজয়ের গতিধারা। অব্যাহত এই বিজয়ধারা চলতে চলতেই হঠাৎ শাম দেশে দেখা দিল এক নজির বিহীন মহামারি—যাতে ধ্বংস হতে থাকল অগণিত মানব প্রাণ।

উমর ইবনুল খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহু এতে ভীষণ চিন্তিত ও অস্থির হয়ে পড়লেন এবং নিরূপায় হয়ে আবু উবায়দার প্রতি চিঠি দিয়ে একজন দূত পাঠালেন। চিঠিতে তিনি লিখলেন,

اِنِّيْ بَدَتْ لِيْ إِلَيْكَ حَاجَةٌ لَا غِنَى لِيْ عَنْكَ فِيْهَا– فَإِنْ آتَاكَ كِتَابِيْ لَيْلًا فَإِنِّيْ اَعْزِمُ عَلَيْكَ اَلَّا تُصْبِحَ حَتّٰى تَرْكَبَ اِلَيَّ وَاِنْ آتَاكَ نَهَارًا فَإِنِّيْ اَعْزِمُ عَلَيْكَ اَلَّا تُمْسِيَ حَتّٰى تَرْكَبَ اِلَيَّ

'আপনাকে আমার এ মুহূর্তেই একান্ত প্রয়োজন, অন্য কোনো বিকল্প না থাকায় বাধ্য হয়ে আমি এই পত্র মারফত আপনাকে তলব করছি। আমার এই জরুরি পত্র যদি রাতের বেলা আপনার হাতে পৌঁছে, তবে আল্লাহর কসম আপনি সকাল হওয়ার অপেক্ষা না করে সঙ্গে সঙ্গে সফর শুরু করবেন মদীনার উদ্দেশ্যে। আর যদি পত্রটি দিনের বেলা আপনার হাতে পৌঁছে, তবে সন্ধ্যার অপেক্ষা না করে অবিলম্বে আমার নির্দেশ মেনে নিয়ে মদীনার উদ্দেশ্যে রওনা করবেন।'

আবু উবায়দা যখন উমর ফারুক রাযিয়াল্লাহু আনহুর পত্র হাতে পেলেন, তিনি বললেন,

قَدْ عَلِمْتُ حَاجَةَ اَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِلَيَّ– فَهُوَ يُرِيْدُ اَنْ يَّسْتَبْقِيَ مَنْ لَيْسَ بِبَاقٍ

'আমি তো জানি আমার কাছে আমীরুল মুমিনীনের সেই প্রয়োজনটা কী? তিনি এমন এক ব্যক্তিকে বাঁচিয়ে রাখতে চান যার বেঁচে থাকা সম্ভব নয়।'

তিনি খলীফার কাছে জবাবী পত্রে লিখলেন,

يَا أَمِيْرَالْمُؤْمِنِيْنَ! إِنِّيْ قَدْ عَرَفْتُ حَاجَتَكَ إِلَيَّ، وَإِنِّيْ فِيْ جُنْدٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَلَا أَجِدُ بِنَفْسِيْ رَغْبَةً عَنِ الَّذِيْ يُصِيْبُهُمْ- وَلَا أُرِيْدُ فِرَاقَهُمْ حَتّٰى يَقْضِيَ اللهُ فِيَّ وَفِيْهِمْ أَمْرَهُ... فَإِذَا أَتَاكَ كِتَابِيْ هٰذَا فَحَلِّلْنِيْ مِنْ عَزْمِكَ، وَائْذَنْ لِيْ بِالْبَقَاءِ

'হে আমীরুল মুমিনীন! আমি বুঝতে পেরেছি আমার কাছে আপনার প্রয়োজনটা কী? আমি এ মুহূর্তে মহামারিতে আক্রান্ত একটি মুসলিমসেনাদলের খেদমতে নিয়োজিত আছি। যে রোগে তারা আক্রান্ত আমি নিজেকে তা থেকে নিরাপদ রাখতে আগ্রহবোধ করছি না। আমি আমার নিজের ব্যাপারে এবং তাদের ব্যাপারে আল্লাহর ফয়সালা না আসা পর্যন্ত তাদের ফেলে রেখে কোথাও যেতে চাই না।

অতএব, আমার এই জবাব আপনার হাতে পৌঁছামাত্র দয়া করে আমাকে আপনার কসম থেকে মুক্ত করে দেবেন এবং আমাকে এখানে থেকে যাবার অনুমতি দিয়ে দেবেন।'

উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু যখন এই চিঠি পড়লেন, তাঁর দু'চোখ ছাপিয়ে অশ্রু ঝড়তে লাগল। আশ-পাশের সকলে তাঁর তীব্র কান্না দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, 'হে আমীরুল মুমিনীন! আবু উবায়দার কি মৃত্যু হয়ে গেছে?'

তিনি বললেন,
'না, মৃত্যু হয়নি বটে কিন্তু মৃত্যু তাঁর খুবই নিকটবর্তী।'

উমর ফারুক রাযিয়াল্লাহু আনহুর এই ধারণা মিথ্যা হয়নি। এরপরই আবু উবায়দা রাযিয়াল্লাহু আনহু মহামারিতে আক্রান্ত হন। মৃত্যু যখন ঘনিয়ে এল, তিনি তাঁর সৈনিকদের উদ্দেশ্যে অসিয়ত করলেন,

'আমি তোমাদের উদ্দেশ্যে এমন অসিয়ত করছি, যা মেনে চললে তোমরা চিরকাল কল্যাণ পেতে থাকবে।

নামায কায়েম করবে, যাকাত প্রদান করবে, রমযান মাসে রোযা রাখবে, আল্লাহর পথে দান করবে, হজ্জ ও উমরা পালন করবে, পরস্পর কল্যাণ কামনা করে অসিয়ত করবে, শাসকদের শুভ কামনা করবে, তাদের সঙ্গে প্রতারণা করো না। দুনিয়ার ব্যস্ততার কারণে মৃত্যু ও আখেরাতকে ভুলে যেয়ো না। ভুলে যেয়ো না, কোনো মানুষকে যদি হাজার বছরের দীর্ঘ হায়াত দান করা হয়, সেটাও একদিন ফুরাবেই। আমার এই পরিণতি যা তোমরা দেখতে পাচ্ছ, এতে উপনীত হওয়া ছাড়া তারও কোনো গতি থাকবে না। মৃত্যুর পরিণতি অবশ্যই ভোগ করতে হবে।

নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা আদম সন্তানের জন্য মৃত্যুকে অবধারিত করে দিয়েছেন। সুতরাং তারা মৃত্যুবরণ করবেই। বিচক্ষণ ব্যক্তি সেই, যে তার রব ও প্রতিপালকের আনুগত্য করে চলে এবং আখেরাতের প্রস্তুতি গ্রহণ করে।

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ।'

এরপর তিনি মুআয ইবনে জাবালের প্রতি মনোযোগী হলেন এবং বললেন, 'হে মুআয! নামাযের ইমামতি করো।' একথা বলার পরই তার প্রাণ বেরিয়ে গেল। মুআয রাযিয়াল্লাহু আনহু তখন সবার উদ্দেশ্যে ঘোষণা করলেন,

'হে লোক সকল! আমরা আজ এমন এক মহান ব্যক্তিকে হারানোর বেদনায় আহত হয়েছি যাঁর চেয়ে অধিক প্রশস্ত হৃদয়ের অধিকারী, যাঁর চেয়ে বেশি হিংসা-বিদ্বেষ পরিহারকারী এবং যাঁর চেয়ে অধিক আখেরাতের প্রতি মনোযোগী এবং জনসাধারণের অধিক কল্যাণকামী আমি আর কাউকে দেখিনি। সুতরাং আল্লাহ তোমাদের প্রতি দয়া করুন, তোমরা তাঁর প্রতি আল্লাহর রহমত কামনা করো।

তথ্যসূত্র :

১. *তাবাকাতে ইবনে সাদ*, সূচিপত্র দ্রষ্টব্য।
২. *আল-ইসাবা*, ২য় খণ্ড, ২৫২ পৃষ্ঠা অথবা *আত্তারজামা*, ৪৪০০।
৩. *হুলয়াতুল আউলিয়া*, ১ম খণ্ড, ১০০ পৃষ্ঠা।
৪. *আল-বাদউ ওয়াত-তারীখ*, ৫ম খণ্ড, ৮৭ পৃষ্ঠা।
৫. *ইবনু আসাকির*, ৭ম খণ্ড, ১৫৭ পৃষ্ঠা।
৬. *সিফাতুস সফওয়া*, ১ম খণ্ড, ১৪২ পৃষ্ঠা।
৭. *আশহারু মাশাহীরিল ইসলাম*, ৫০৪ পৃষ্ঠা।
৮. *তারীখুল খামীস*, ২য় খণ্ড, ২৪৪ পৃষ্ঠা।
৯. *আল-ইসতীআব*, ৩য় খণ্ড, ২ পৃষ্ঠা।
১০. *আর-রিয়াযুন নাযিরাহ*, ৩০৭ পৃষ্ঠা।

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ

কেউ যদি সরস কুরআন পাঠ করে আনন্দিত হতে চায়—যেরূপ তা নাজিল হয়েছে, তবে সে যেন 'ইবনে উম্মে আবদ' অর্থাৎ আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের কেরাতে পাঠ করে।

-মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ

তখন সে ছিল এক নিষ্পাপ বালক, তারুণ্যেও পদার্পণ করেনি। মক্কা নগরীর লোকালয় থেকে দূরে, জনৈক কুরাইশী সর্দার উকবা ইবনে আবু মুআইতের বকরির পাল চড়িয়ে বেড়াত পাহাড়ের আঁকা-বাঁকা আর সরু পথ-ঘাটে।

লোকেরা তাকে 'ইবনে উম্মে আবদ' বলে ডাকত। তবে তার আসল নাম ছিল আবদুল্লাহ আর পিতার নাম মাসউদ।

* * *

কিশোর বালক নতুন নবীর নানান খবর শুনতে পেত। শুনত যে, শেষ নবী নিজ বংশে আত্মপ্রকাশ করে নবুওয়াতের দাবি করেছেন। তবে নিজের বয়সস্বল্পতা এবং মক্কার লোকালয় থেকে দূরে থাকার কারণে ওইসব সংবাদকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। এর কারণ তাকে অতি

প্রভাতে সকালের আলো ছড়িয়ে না পড়তেই বকরির পাল নিয়ে বেরিয়ে পড়তে হয় আবার সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলেই ফিরে আসতে হয়—এই ছিল তার নিত্যদিনের কাজ।

* * *

একদিন বকরি চড়াতে চড়াতে মক্কাবাসী এই বালক আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ দেখতে পেল দূর থেকে গাম্ভীর্যপূর্ণ বয়োজ্যেষ্ঠ দুই ব্যক্তি তার দিকেই এগিয়ে আসছেন। দু'জনই ভীষণ ক্লান্ত, খুবই তৃষ্ণার্ত। তাদের ঠোঁট আর গলা যেন শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে!

লোক দু'জন এসে তাকে সালাম দিলেন এবং বললেন :

'হে বালক! আমাদের জন্য একটি বকরির দুধ দোহন করে আনো, যা দিয়ে আমরা তৃষ্ণা মেটাব, গলা ভেজাব।'

বালক জবাব দিল, 'সেটা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কেননা, আমি বকরির মালিক নই, বরং আমি এগুলোর রাখাল মাত্র।'

লোক দু'জন এই জবাবে রাগ করলেন না বরং তাদের মুখ দেখে বুঝা গেল তারা একথা শুনে খুশি হয়েছেন। এরপর একজন তাকে বললেন :

'ঠিক আছে.. তাহলে এমন একটি বকরি দেখিয়ে দাও, যার ওপর এখনো কোনো পাঁঠা লাফিয়ে ওঠেনি।'

বালকটি এবার নিকটবর্তী একটি বকরির ছোট্ট বাচ্চাকে দেখিয়ে দিল। লোকটি সেই বাচ্চা বকরিটিকে ধরে 'বিসমিল্লাহ' বলে তার ওলান নাড়তে লাগলেন। কিশোর বালকটি বিস্ময় ভরা দৃষ্টিতে সেদিকে তাকিয়ে থেকে মনে মনে প্রশ্ন করল, 'যে বকরির ওপর পাঁঠা চড়েনি, সেকি কখনো দুধ দিতে পারে?'

কিন্তু কী আশ্চর্য! কিশোর বালকটি দেখতে পাচ্ছে বকরিটির ওলান ধীরে ধীরে ঐ লোকটির স্পর্শে স্ফীত হয়ে উঠল এবং প্রবল ধারায় পর্যাপ্ত পরিমাণে সেখান থেকে দুধ বের হয়ে আসতে থাকল। অন্য লোকটি

তখন মাটি থেকে কুড়িয়ে নিলেন একটি মধ্যখানে ফাঁকা পাথর এবং সেখানে ধরার সঙ্গে সঙ্গে সেটা দুধে পূর্ণ হয়ে গেল। তারা দু'জনেই সেই দুধ পান করলেন এবং আমাকেও তাদের সঙ্গে পান করালেন। কিন্তু আমি তখনো বিশ্বাসই করতে পারছিলাম না—যা দেখলাম তা সত্যি কি না!

যখন আমরা সকলেই দুধ পান করে পরিতৃপ্ত হলাম, তখন সেই বরকতময় লোকটি বকরির ওলানকে নির্দেশ দিয়ে বললেন :

'সঙ্কুচিত হয়ে যাও'...

অমনি সেই ওলান সঙ্কুচিত হতে থাকল, হতে হতে একেবারে আগের মতো স্বাভাবিক হয়ে গেল।

আমি এসব দেখে-শুনে লোকটিকে বললাম, 'যে দুআ পড়ে আপনি এ কাজ করলেন, আমাকে দয়া করে সেইটি শিখিয়ে দিন।'

একথা শুনে তিনি আমাকে বললেন,
'তুমি এমন সৌভাগ্যবান কিশোর, ভবিষ্যতে যে সবকিছুই শিখতে পারবে।'

* * *

এটা ছিল আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের ইসলামের সঙ্গে পরিচয়ের সূত্রপাতের কাহিনী।

বরকতময় সেই লোকটি অন্য কেউ ছিলেন না, তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আর তাঁর সঙ্গীটিও অন্য কেউ ছিলেন না, তিনি ছিলেন আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহু।

তাঁরা দু'জনে সেদিন মক্কার পাহাড়ি পথে বেরিয়ে পড়েছিলেন তীব্র বিপদ এবং কুরাইশের প্রচণ্ড নির্যাতনের কারণে।

* * *

যেভাবে কিশোর বালকটির রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সঙ্গীকে প্রচণ্ড ভালো লেগে গেল এবং সে যেভাবে তাদের দু'জনের ভক্ত হয়ে গেল, একইভাবে নবীজী এবং তাঁর সঙ্গী আবু বকরও বালকটির প্রতি মুগ্ধ হলেন। তার আমানতদারী ও সংকল্পে খুবই প্রীত হলেন এবং এগুলোকে তার কল্যাণকর ও উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আভাস মনে করলেন।

* * *

এরপর অল্প কয়েকটি দিন পেরুতে না পেরুতেই ইসলাম কবুল করলেন আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং তিনি নিজেকে প্রিয় নবীর কাছে সঁপে দিলেন তাঁর খেদমতের জন্য। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তার আন্তরিক ইচ্ছাকে কবুল করে নিজের খেদমতে নিয়োজিত করলেন।

সেইদিন থেকে ভাগ্যবান বালক আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ বকরির সেবা ছেড়ে সকল জাতি ও সকল সৃষ্টির সরদারের সেবায় নিয়োজিত হলেন।

* * *

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু সর্বদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ছায়ার মতো লেগে থাকতেন। বাড়িতে অথবা সফরে সবস্থানেই তিনি হতেন তাঁর সঙ্গী। এমনকি বাড়ির ভেতরে এবং বাহিরে উভয় ক্ষেত্রেই তিনি তাঁর সঙ্গে থাকতেন।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘুমালে সময়মতো তিনিই তাঁকে জাগিয়ে দিতেন। তাঁর গোসলের সময় তিনিই পর্দা ও আড়াল করার ব্যবস্থা করতেন। বাড়ির বাহিরে যাওয়ার সময় তিনিই তাঁকে জুতা পরিয়ে দিতেন এবং ঘরে প্রবেশের মুহূর্তে তিনিই তাঁর জুতা খুলে দিতেন। তিনিই তাঁর লাঠি এবং মেসওয়াক এগিয়ে দিতেন। নবীজী

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ কামরায় প্রবেশ করতে চাইলে তিনিই প্রথমে সেখানে ঢুকতেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদকে তাঁর গৃহে অবারিত প্রবেশের জন্য অনুমতি দিয়ে রেখেছিলেন। তাকে আরও বিশেষ অনুমতি দিয়েছিলেন নিঃসংকোচে তাঁর গোপনীয় বিষয়ে অবগতি লাভের। এ কারণেই তাকে বলা হতো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 'রহস্য বিশারদ'।

* * *

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বেড়ে উঠতে থাকলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গৃহে। হলেন তাঁরই জীবনাদর্শের অনুসারী। গ্রহণ করলেন তাঁর স্বভাব, তাঁর চরিত্র ও গুণাবলী। জীবন-যাপনের প্রতিটা ক্ষেত্রে তিনি তাঁরই পদাঙ্কের অনুসরণ করলেন। যে কারণে তাঁর সম্পর্কে মন্তব্য করা হতো 'আকৃতি-প্রকৃতিতে, চাল-চলনে, আচার-আচরণে প্রিয় নবীর সর্বাধিক নিকটতম সাহাবী তিনিই।'

* * *

ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূলের মাদরাসায় সরাসরি তাঁর কাছে কুরআনের শিক্ষা লাভ করেন, ফলে সাহাবীদের মাঝে তিনি হয়ে ওঠেন সর্বশ্রেষ্ঠ বিশুদ্ধ তেলাওয়াতকারী। কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যা সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞাত, আল্লাহর দীন ও শরীয়তের জ্ঞানে সর্বাধিক বিজ্ঞ।

এ বিষয়ের সর্বাপেক্ষা প্রামাণ্য ঘটনা হলো, উমর ইবনুল খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহু আরাফায় অবস্থানকালে তাঁর কাছে কূফা অঞ্চলের জনৈক ব্যক্তি এসে বলল—

'হে আমীরুল মুমিনীন! আমি কূফা থেকে এসেছি, সেখানে এমন একজন মানুষকে দেখে এসেছি যিনি কুরআনের কপি তৈরি করে থাকেন—না দেখে। শুধু স্মৃতি থেকেই তিনি লিপিবদ্ধ করেন। একথা শুনে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু এত বেশি রাগান্বিত হলেন—যা তিনি খুব কম সময়ই হয়ে থাকেন। তিনি ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন,

'আরে সর্বনাশা! কে সেই লোক?'

'আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ।'

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের নাম শুনতেই তাঁর ক্রোধের আগুন নিভতে থাকল, তিনি স্বাভাবিক হতে থাকলেন। এক সময় আপন অবস্থায় ফিরে এলেন এবং বললেন,

'আফসোস তোমার প্রতি, তুমি তাঁর ব্যাপারে জানো না! অথচ এই কাজের জন্য তার চেয়ে বেশি যোগ্য আর কেউ আছে বলে আমার জানা নেই। ঠিক আছে দাঁড়াও, এ বিষয়ে আমি তোমাকে কিছু কথা শোনাচ্ছি।'

উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলতে থাকলেন,

'কোনো এক রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলিমজাতির ব্যাপারে আবু বকরের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ কিছু আলোচনা করছিলেন। আমিও ছিলাম তাঁদের সঙ্গে। কথাবার্তা শেষ হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বের হয়ে পড়লেন, আমরা দু'জনও তাঁর সঙ্গে বের হলাম। হঠাৎ আমাদের নজরে পড়ল, এক অজ্ঞাত ব্যক্তি মসজিদে দাঁড়িয়ে নামায আদায় করছে। আমরা বুঝতে পারলাম না কে সে? তবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে তার তেলাওয়াত শুনতে লাগলেন। তিনি সেই তেলাওয়াতে মুগ্ধ হয়ে তার পরিচয় বুঝতে পেরে বললেন,

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَطْبًا كَمَا نَزَلَ فَلْيَقْرَأْهُ عَلىٰ قِرَاءَةِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ

'কুরআন যেরূপ সরস ও প্রাণবন্ত রূপে নাজিল হয়েছে, ঠিক সেরকম পড়ে যদি কেউ আনন্দ পেতে চায়, তাহলে তার উচিৎ ইবনে উম্মে আবদ অর্থাৎ আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের কেরাতে তা পড়া।'

এরপর আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু দুআ করতে শুরু করলেন, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

سَلْ تُعْطَهْ... سَلْ تُعْطَهْ...

'চাও... তুমি চাও... তোমার চাওয়া পূরণ করা হবে, তুমি দুআ করো, তোমার দুআ কবুল করা হবে।'

উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন :

'তখন আমি মনে মনে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলাম, অবশ্যই আমি তাকে তার দুআ শুনে রাসূলের 'আমীন' বলার সুসংবাদ শোনাব। সেই হিসাবে সকালে আমি গেলাম এবং তাকে সুসংবাদটি দিলাম। আর তখনই বুঝতে পারলাম, আবু বকর আমার পূর্বেই এসে কাজটি সেরে চলে গেছেন।

আল্লাহর কসম! কখনো কোনো নেক কাজের প্রতিযোগিতায় আমি আবু বকরের আগে যেতে পারিনি। তিনিই সকল সময় আমাকে পেছনে ফেলে দিয়েছেন।'

* * *

আল্লাহর কিতাব কুরআনের ব্যাপারে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য এমন পর্যায়ে উপনীত ছিল যে তিনি বলতেন,

'সেই মহান আল্লাহর কসম যিনি ছাড়া কোনো মাবূদ নেই, কুরআনের যে আয়াতই নাজিল হয়েছে আমি জানি যে, সেটা কোথায় নাজিল হয়েছে এবং কার ব্যাপারে নাজিল হয়েছে। আমি যদি জানতে পারি যে, কুরআনের বিষয়ে আমার চেয়ে অধিক জ্ঞানী কেউ আছেন যার কাছে যাওয়া সম্ভব, তবে অবশ্যই তার কাছে পৌঁছে যাই।

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু নিজের ব্যাপারে যা বলেছেন, তাতে কোনো অতিরঞ্জন নেই। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর এই ঘটনায় রয়েছে তারই উৎকৃষ্ট প্রমাণ। কোনো এক সফরে তিনি এক মুসাফির দলের সাক্ষাৎ পেলেন! রাতের গভীর অন্ধকার কাফেলাকে ঢেকে রেখেছিল আঁধারের কালো পর্দায়।

ঐ মুসাফির দলের মাঝে শামিল ছিলেন আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু একজনকে নির্দেশ দিয়ে বললেন, 'ওদের ডেকে জিজ্ঞাসা করো... কোথাকার এই কাফেলা?'

উত্তরে কাফেলা থেকে কুরআনের আয়াত ব্যবহার করে বলা হলো,

مِنَ الْفَجِّ الْعَمِيْقِ

'আল ফাজ্জুল আমীক' (বহূদূর প্রান্ত) থেকে আগত।

উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু জিজ্ঞাসা করলেন,
'তোমাদের গন্তব্য কী?'

الْبَيْتِ الْعَتِيقِ

'আল-বায়তুল আতীক' (প্রাচীন ঘর—মক্কার কাবা ঘর)

উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'নিশ্চয় তাদের মধ্যে বড় কোনো জ্ঞানী রয়েছেন। তিনি কাফেলার লোকদের প্রশ্ন করতে বললেন,
'কুরআনের কোন আয়াতটি সর্বশ্রেষ্ঠ?'

উত্তরে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ তাঁর লোক মাধ্যমে জবাব দিলেন,

اللّٰهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ

'আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবূদ নেই। তিনি চিরঞ্জীব, সবকিছুর ধারক। তাঁকে তন্দ্রা স্পর্শ করে না, নিদ্রাও না।'

উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন জিজ্ঞাসা করো...
'কুরআনের কোন আয়াতটি সর্বাধিক হিকমত ও প্রজ্ঞাপূর্ণ?'

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ

'আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচারণ ও আত্মীয়-স্বজনকে দান করার নির্দেশ দেন।'

তিনি বললেন ওদের জিজ্ঞাসা করো..
'কুরআনের কোন আয়াতটি ব্যাপকতর?'

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ তাঁর লোক মাধ্যমে জবাব দিলেন,

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ - وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ

'কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করলে তা দেখতে পাবে এবং কেউ অণু পরিমাণ অসৎকর্ম করলে তাও দেখতে পাবে।'

উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন তাদের ডেকে বলো,
'কুরআনের কোন আয়াতটিতে সর্বাধিক ভীতির সঞ্চার হয়?'

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু উত্তরে বলতে বললেন,

لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا

'তোমাদের আশার ওপর ভিত্তি নয় এবং আহলে কিতাবদের আশার ওপরও নয়। যে মন্দ কাজ করবে, সে তার শাস্তি পাবে এবং সে আল্লাহ ছাড়া নিজের কোনো সমর্থক ও সাহায্যকারী পাবে না।'

উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু আবার জিজ্ঞাসা করতে বললেন,
'কুরআনের কোন আয়াতটি সর্বাধিক আশা জাগায়?'

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু উত্তরে বলতে বললেন,

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

'বলুন! হে আমার বান্দারা! যারা নিজেদের ওপর জুলুম করেছ, তোমরা আল্লাহর রহমত হতে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ সমস্ত গোনাহ মাফ করবেন। নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।'

হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু কুরআনের বিষয়ে এই রকমের পারদির্শতা জানতে পেরে জিজ্ঞাসা করতে বললেন,

'তোমাদের এই কাফেলার মাঝে কি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ আছেন?'

তখন কাফেলার সকলে মিলে জবাব দিল, 'হ্যাঁ, আল্লাহর মেহেরবানীতে তিনি আমাদের মাঝে আছেন।'

* * *

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু শুধু কেবল একজন শ্রেষ্ঠ বিশুদ্ধ তেলাওয়াতকারী, কুরআনী জ্ঞানে পারদর্শী, আবেদ ও যাহেদই ছিলেন না, বরং এরই সঙ্গে তিনি ছিলেন শক্তিশালী, আত্মপ্রত্যয়ী এবং যুদ্ধের ময়দানে সর্বাগ্রে ঝাঁপিয়ে পড়া একজন নির্ভিক মুজাহিদও।

এটার প্রমাণ হিসাবে এটুকু জেনে রাখাই যথেষ্ট যে, তিনিই সর্বপ্রথম মুসলিম যিনি রাসূলের পর পৃথিবীর বুকে উচ্চ আওয়াজে কুরআন পড়েছেন।

ঘটনাটি ঘটেছিল মক্কায়.. যে সময় মুসলিমদের সংখ্যা ছিল সামান্য এবং শক্তিতে তাঁরা ছিলেন দুর্বল। সেই সময় একদিন কয়েকজন সাহাবী একত্রিত হয়ে আফসোস করে বলতে লাগলেন :

'সত্যিই খুব বেদনার কথা যে আজও পর্যন্ত কুরাইশের লোকদের উচ্চ আওয়াজে কুরআন পড়ে শোনানো গেল না! কে আছে এমন যে এই কাজটি করবে?'

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'আমিই তাদের উচ্চ আওয়াজে কুরআন পড়ে শোনাব।'

তারা সকলে বলে উঠলেন, 'আপনার ব্যাপারে আমরা ভরসা পাই না, আমাদের প্রয়োজন এমন একজন মানুষ—যার বংশ বড় এবং জনবলও বেশি। যারা তার হেফাজত করবে এবং কুরাইশের ক্ষতি থেকে তাকে সুরক্ষা দেবে।'

তিনি বললেন, 'ঠিক আছে.. তোমরা দ্যাখো কাজটি আমিই করব এবং আল্লাহ আমার হেফাজত করবেন এবং ওদের ক্ষতি থেকে তিনিই আমাকে বাঁচাবেন'

তিনি চলে গেলেন মসজিদে। দুপুরের সময় তিনি মাকামে ইবরাহীমে উপস্থিত হলেন। কুরাইশের লোকজন কাবার আশপাশে বসা ছিল। তিনি সেখানে দাঁড়িয়ে পড়া শুরু করলেন,

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الرَّحْمٰنُ ﴿١﴾ عَلَّمَ الْقُرْآنَ ﴿٢﴾ خَلَقَ الْإِنْسَانَ ﴿٣﴾ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ

'পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু। আল্লাহ দয়াময়। তিনি শিক্ষা দিয়েছেন কুরআন। সৃষ্টি করেছেন মানুষ। তিনিই তাকে শিখিয়েছেন বর্ণনা।'

তিনি তেলাওয়াত করতেই থাকলেন। কুরাইশের লোকেরা প্রথমে একটু চিন্তা করে বলল, 'আরে আশ্চর্য ব্যাপার! এই ইবনে উম্মে আবদ বলে কী? চুলোয় যাক সে.. সে তো দেখছি মুহাম্মাদেরই আনিত বাণী পড়ছে...'

তারা সকলেই মারমুখী হয়ে ছুটল তাঁর কাছে এবং আঘাতে আঘাতে তাঁকে রক্তে রঞ্জিত করে ফেলল কিন্তু তিনি তাদের মার খেতে খেতেও তেলাওয়াত অব্যাহত রাখলেন। আল্লাহর ইচ্ছায় এক পর্যায়ে গিয়ে তাঁর তেলাওয়াত শেষ হলে তিনি রক্তাক্ত অবস্থায় সাহাবীদের মাঝে ফিরে এলেন। তাঁরা এ অবস্থা দেখে বললেন,

'এটাই আমাদের আশঙ্কা ছিল।'

তিনি বললেন, 'আল্লাহর কসম! এই মুহূর্তে আল্লাহর দুশমনরা আমার চোখে যে পরিমাণ তুচ্ছ, ইতিপূর্বে আর কখনো তারা এত তুচ্ছ ছিল না। তোমরা চাইলে আগামীকাল আমি আবারও একই কাজ করব।'

একথা শুনে সাহাবায়ে কেরাম বললেন,

'না না আপনাকে আর এ কাজ করতে হবে না। আপনি তো তাদের শুনিয়েই এসেছেন যা তারা শুনতে চায় না।'

* * *

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু তৃতীয় খলীফা উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফত (শাসন) কাল পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন। যখন তিনি অসুস্থ হয়ে মৃত্যুশয্যায় উপনীত, তাঁকে দেখতে এলেন উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ইবনে মাসউদকে,

'আপনার সমস্যা কী?'

'আমার সমস্যা হলো আমার গুনাহ।'

'আপনি কী চান?'

'আমার রবের 'রহমত' ও করুণা চাই।'

'আপনি বাইতুল মাল থেকে বেশ কয়েক বছরের নাগরিক ভাতা গ্রহণ করছেন না.. তা কি আপনার কাছে পৌঁছে দিতে বলব?'

'আমার সেগুলোর কোনো প্রয়োজন নেই।'

'আপনার পরে সেগুলো আপনার মেয়েদের কাজে লাগবে।'

খলীফার উপর্যুক্ত প্রস্তাবের ফলে তিনি খলীফাকে সরাসরি জিজ্ঞাসা করলেন,

'আপনি কি আমার মেয়েদের ব্যাপারে অভাব ও দারিদ্রের আশঙ্কা করছেন? আমি তো তাদের প্রত্যেক রাতে সূরা ওয়াকিয়া পড়ার নির্দেশ দিয়েছি। কারণ, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, 'যে প্রত্যেক রাতে সূরা ওয়াকিয়া পড়বে, সে কখনো ক্ষুধা ও দারিদ্রে পড়বে না।'

* * *

যখন রাত হলো, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু মহান প্রভুর সান্নিধ্যে চলে গেলেন। তাঁর জিহ্বা ছিল আল্লাহর যিকিরে সিক্ত এবং কুরআনের আয়াত তেলাওয়াতে সজীব ও প্রাণবন্ত।

তাঁর জানাযা নামাযে শরীক হলেন বিরাট একদল মুসলিম—যাঁদের মাঝে শামিল ছিলেন যুবাইর ইবনুল আওয়াম রাযিয়াল্লাহু আনহু।

তাঁকে দাফন করা হলো মসজিদে নববীর সন্নিকটবর্তী 'বাকী' গোরস্তানে।

আল্লাহ তাঁর কবরকে সার্বক্ষণিক রহমত ও করুণায় সিক্ত করে রাখুন।

তথ্যসূত্র :

১. *আল-ইসাবা*, ২য় খণ্ড, ৩৬৮ পৃষ্ঠা অথবা *আত্তারজামা*, ৪৯৫৪।
২. *আল-ইসতীআব*, ২য় খণ্ড, ৩১৬ পৃষ্ঠা।
৩. *তারীখুল ইসলাম লিযযাহাবী*, ২য় খণ্ড, ১০০-১০৪ পৃষ্ঠা।
৪. *তাযকিরাতুল হুফফায*, ১ম খণ্ড, ১২-১৫ পৃষ্ঠা।
৫. *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, ৭ম খণ্ড, ১৬২-১৬৩ পৃষ্ঠা।
৬. *তাবাকাতুশ শারানী*, ২৯-৩০ পৃষ্ঠা।
৭. *শাযারাতুয যাহাব*, ১ম খণ্ড, ৩৮-৩৯ পৃষ্ঠা।
৮. *উসদুল গাবাহ*, ৩য় খণ্ড, ৩৮৪-৩৯০ পৃষ্ঠা।
৯. *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, ১ম খণ্ড, ৪৬১-৫০০ পৃষ্ঠা।
১০. *সিফাতুস সফওয়াহ*, ১ম খণ্ড, ১৫৪-১৬৬ পৃষ্ঠা।
১১. *মুসনাদুল ইমাম আহমাদ*, ৫ম খণ্ড, ২১০ পৃষ্ঠা।
১২. *দালাইলুন নবুওওয়াহ*, ২৭৩ পৃষ্ঠা।

সালমান আল-ফারসী

> ঈমান যদি সুরাইয়া নক্ষত্রের জগতে থাকত, তবে এর মতো লোকেরা সেখান থেকেও তা হাসিল করে ছাড়ত।
>
> –সালমানের কাঁধে হাত রেখে প্রিয় নবীর উক্তি।

এ কাহিনী এমন একজন মানুষের—যিনি মহাসত্যের সন্ধানে, প্রকৃত দীন ও সর্বশেষ নবীর খোঁজে অবিরাম ছুটেছেন একস্থান থেকে অন্যস্থানে। যিনি মাসের পর মাস, বছরের পর বছর ভীষণ ব্যাকুলতা বুকে নিয়ে খুঁজে বেড়িয়েছেন মহান প্রভুর সন্তুষ্টি লাভের সরল ও সোজা পথ। এ কাহিনী সালমান আল-ফারসীর শ্বাসরুদ্ধকর জীবন যুদ্ধের। আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন এবং তাঁকে সন্তুষ্ট করুন।

আমরা তাঁর ওপরই ছেড়ে দিচ্ছি নিজ জীবনের নানা ঘাত-প্রতিঘাতময় এই কাহিনী তিনি নিজেই বর্ণনা করুন। এ বিষয়ে তাঁর অনুভূতিই হবে সবচেয়ে বেশি শক্তিশালী এবং তাঁর বর্ণনাই হবে সর্বাধিক সত্যাশ্রয়ী।

সালমান আল-ফারসী রাযিয়াল্লাহু আনহু আপন কাহিনীর সূচনায় বলেন :

'আমি ছিলাম এক পারস্য তরুণ। মধ্য ইরানের ইস্পাহান নগরীতে 'জাইয়্যান' গ্রামে ছিল আমার বাস। আমার পিতা ছিলেন সেই গ্রামের

সবচেয়ে বড় ধনী, সবচেয়ে বেশি সম্পদশালী। তিনিই ছিলেন সেখানের প্রধান ব্যক্তি। সম্মান ও নেতৃত্বের সর্বোচ্চ আসনটি ছিল তারই দখলে। আমার যেদিন জন্ম হয়, সেদিন থেকেই তিনি আমাকে ভালোবাসতে থাকেন পাগলের মতো। তার এই ভালোবাসা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বাড়তেই থাকে। এমনকি এক সময় কাল্পনিক বিপদ-আপদের আশঙ্কায় কুমারী তরুনীদের মতো আমার জন্য বাড়ির বাহিরে বের হওয়া নিষিদ্ধ করে দিলেন।

বাপ-দাদার ধর্মের অনুসারী হিসাবে 'অগ্নি উপাসনা'র ধর্মীয় জ্ঞানার্জনে আমি প্রচুর সাধনা ও পরিশ্রম করি। সেই ধর্মের বিধি-বিধান আগ্রহের সঙ্গে মেনে চলায় চারদিকে আমার প্রচুর সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে এবং উন্নতির ধারাবাহিকতায় এক সময় উপাসনালয়ের প্রধান হিসাবে পূজার অগ্নি দিন-রাত প্রজ্জলিত রাখা, এক মুহূর্তের জন্যও নিভতে না দেওয়ার গুরুদায়িত্ব আমার কাঁধেই ন্যস্ত করা হয়।

আমার পিতার ছিল বিশাল ভূ-সম্পত্তি—যা থেকে আমরা প্রচুর ফসল পেতাম। সেই ফসল ও জমিনের দেখা-শোনা ও ব্যবস্থাপনার সকল কাজ তিনি নিজে নিজেই করতেন।

একবার জরুরি এক ব্যস্ততার কারণে পিতার পক্ষে ফসলের ক্ষেতে যাওয়া সম্ভব হচ্ছিল না দেখে তিনি আমাকে বললেন, 'বেটা! দেখতেই পাচ্ছ ব্যস্ততার কারণে আজ আমার পক্ষে কোথাও যাওয়া সম্ভব হবে না। সুতরাং তুমিই আজ কাজটি সেরে এসো।' তার নির্দেশনা মতো আমি ক্ষেত-খামার দেখা-শোনার উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বের হলাম। কিছুদূর পথ চলার পর সামনে পড়ল খ্রিস্টানদের একটি গির্জা। সেখানে তখন তাদের নামায ও প্রার্থনা চলছিল। সেই আওয়াজ আমার কানে আসতেই আমি ভীষণভাবে সেদিকে আকৃষ্ট হয়ে পড়লাম।

* * *

দীর্ঘকাল যেহেতু পিতার স্নেহবন্ধন আমাকে বাড়ির চার দেয়ালের মাঝে এমনভাবে বেঁধে রেখেছিল যে, খ্রিস্টানদের ব্যাপারে তাদের ধর্মীয়

আচার-অনুষ্ঠান, নামায ও প্রার্থনার কোনো কিছুই আমার জানা ছিল না। জানতাম না অন্য কোনো ধর্মের কথাও। তাই তাদের প্রার্থনার আওয়াজ শুনতেই আমি ঢুকে পরলাম সেখানে—তারা কী করছে দেখতে।

আমি গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করে বুঝতে পারলাম, তাদের নামায ও প্রার্থনার ভঙ্গি আমার মনে ভীষণ দাগ কেটেছে এবং তাদের ধর্মের প্রতি জন্ম নিয়েছে আমার গভীর অনুরাগ ও প্রীতি। আমি মনে মনে বললাম,

'তাদের ধর্ম আমাদের ধর্মের চেয়ে ভালো।' ঐ মুগ্ধতা নিয়ে তাদের মাঝেই আমার সারাটা দিন কেটে গেল। দিন শেষ হয়ে গেল কিন্তু ফসলের ক্ষেতে আমার আর যাওয়া হলো না। আমার ভেতরের চিন্তা-ভাবনার বদল হতে থাকল। আমি তাদের জিজ্ঞাসা করলাম,

'এই ধর্মের মূল কেন্দ্র কোথায়?'

তারা বলল, 'সিরিয়ায়।'

রাত ঘনিয়ে এলে এখান থেকে আমি সরাসরি বাড়ি ফিরে গেলাম। বাবা আমার কাছে এসে জানতে চাইলেন, 'ফসলের কী অবস্থা? কর্মচারীরা সবাই ঠিকঠাক কাজ করছিল কিনা?'

আমি বললাম,

'বাবা! আমি ক্ষেতের উদ্দেশ্যে রওনা করেছিলাম। যাওয়ার পথে কিছু মানুষকে গির্জায় উপাসনা করতে দেখে সেখানে প্রবেশ করেছিলাম, তাদের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান দেখে-শুনে আমি এতটাই মুগ্ধ হয়ে পড়েছিলাম—সূর্যাস্ত পর্যন্ত আমি তাদের মাঝেই আটকে ছিলাম, ফসলের জমিন দেখতে যাওয়ার কোনো সুযোগই হয়নি।'

আমার এসব কৃতকর্মের কথা শুনে বাবা আতঙ্কিত হয়ে পড়লেন এবং বললেন :

'বেটা! হঠাৎ জেনেছ বলে ঐ ধর্মের প্রতি তুমি একটু বেশিই মুগ্ধ হয়ে পড়েছ। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঐ ধর্মের মধ্যে মুগ্ধ হয়ে যাওয়ার মতো কিছু

নেই। আর আসল সত্য এটাই যে তোমার ও তোমার পূর্বপুরুষের ধর্ম ওটার চেয়ে হাজার গুণ শ্রেষ্ঠ।'

আমি খুব দৃঢ়তার সঙ্গে বাবার বক্তব্য প্রত্যাখ্যান করে বললাম,

'তোমার কথা একেবারেই অবাস্তব বাবা! আমি আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি, তাদের ধর্ম ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান আমাদের ধর্মের (অগ্নিপূজার) চেয়ে অনেক অনেক ভালো।' আমার এই কথায় পিতা ভয়ে মুষড়ে গেলেন এবং আমার ব্যাপারে 'ধর্মদ্রোহী' হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় দু'পায়ে বেড়ি পরিয়ে আমাকে ঘরে বন্দী করে রাখলেন।

* * *

এরপর সুযোগ পাওয়া মাত্রই আমি খ্রিস্টানদের কাছে সংবাদ পাঠালাম,

'সিরিয়াগামী কোনো কাফেলা এলে দয়া করে আমাকে সংবাদ দিও।'

সৌভাগ্যক্রমে অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই সিরিয়াগামী একটি কাফেলা তাদের কাছে এলে তারা অবিলম্বে আমাকে সংবাদটি জানাল। বহু কষ্ট ও সাধনা করে আমি বেড়িমুক্ত হলাম। গোপনে তাদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে অবিরাম সফর করে একদিন সিরিয়ায় পৌঁছে গেলাম। সেখানে পৌঁছার পর আমি লোকজনের কাছে জানতে চাইলাম,

'খ্রিস্টধর্মের প্রধান ও শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি বর্তমানে কে?'

তারা জানাল, 'গির্জার দায়িত্বে নিয়োজিত বর্তমান বিশপই খ্রিস্টধর্মের প্রধান ও শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি।'

আমি তার কাছে হাজির হয়ে নিবেদন করলাম,

'আমি খ্রিস্টধর্মের আকর্ষণে বহুদূর থেকে এখানে ছুটে এসেছি। আপনি অনুমতি দিলে আমি আপনার সার্বক্ষণিক শিষ্য হতে চাই। আপনার খেদমত করে আপনার নিকট থেকে এই ধর্মের শিক্ষা অর্জন করতে চাই। আমি চাই আপনার সঙ্গে প্রার্থনা করতে এবং আপনার সঙ্গে নামায পড়তে।'

আমাকে তিনি সাদরে গ্রহণ করলেন। আমি তার সার্বক্ষণিক সেবক হয়ে গেলাম। এরপর অল্পদিনের মধ্যেই আমি বুঝে গেলাম, জীবন, কর্ম এবং স্বভাব-চরিত্রের বিচারে এই বিশপ ভালো মানুষ নন। কারণ, লোকটি নিজের অনুসারীদের দান-খয়রাতের জন্য উদ্বুদ্ধ করেন, তাদের শোনান সওয়াবের সুসংবাদ। কিন্তু ভক্ত-অনুরাগীরা যখন তার হাতে নিজেদের দান-খয়রাতের অর্থ-সম্পদ তুলে দেয় গরিবদের মাঝে বিলিয়ে দেওয়ার জন্য, তিনি সেগুলো গরিব-দুঃখীদের না দিয়ে নিজের জন্য সঞ্চয় করে রাখেন। এভাবে মানুষের দান-খয়রাতের সোনা-রুপা দিয়ে তিনি বড় বড় সাতটি কলস পূর্ণ করে ফেলেছেন। তার এ সকল অপকীর্তি দেখে আমার অন্তরের সকল শ্রদ্ধা ক্রোধ ও ঘৃণায় পরিণত হলো। যখন তার ইন্তেকাল হলো এবং তার দাফন-কাফনের উদ্দেশ্যে খ্রিস্টধর্মীয় বহু গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি সমবেত হলেন, আমি তাদের বললাম,

'আপনাদের এই পাদ্রি ছিলেন পুরোদস্তুর একজন ভণ্ড ও প্রতারক। তিনি আপনাদের দান-খয়রাতের জন্য উদ্বুদ্ধ করতেন কিন্তু আপনাদের দানের অর্থ-কড়ি সম্পূর্ণটাই তিনি আত্মসাৎ করে নিজের জন্য রেখে দিতেন। একটি পয়সাও গরিব-দুঃখীদের দিতেন না।'

তারা আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন,
'তুমি এসব জানলে কিভাবে?'

তাদের সন্দেহ দূর করার জন্য আমি বললাম,
'আপনারা চাইলে আমি তার সঞ্চিত ধন-ভাণ্ডার আপনাদের দেখাতে পারি।'

তারা বললেন, 'ঠিক আছে, সেটাই করো।'

একথা শুনে আমি তার সঞ্চিত ধন-ভাণ্ডার সকলকে দেখিয়ে দিলাম। তারা সেখান থেকে বড় বড় সেই সাতটি কলস বের করে আনলেন—যা ছিল সোনা-রূপায় ভর্তি। এসব দেখে-শুনে তারা ঐ পাদ্রির ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার পর আল্লাহর নামে শপথ নিয়ে বললেন,

'আমরা তাকে দাফন করব না।'

এরপর তার মৃতদেহ শূলে চড়িয়ে পাথর ছুঁড়ে মারতে থাকলেন।

এর অল্পদিন পরেই তারা নতুন একজন পাদ্রিকে তার স্থানে নিয়োগ করলেন। আমি তার সেবায় আত্মনিয়োগ করলাম। আমি দেখলাম, এই নতুন পাদ্রি দিন-রাত ইবাদতে মগ্ন হয়ে থাকেন। দুনিয়ার কোনো ব্যাপারেই তার লোভ নেই, মোহ নেই। আখেরাতের ব্যাপারে তিনি অতি আগ্রহী। এত ভালো ও খাঁটি ধর্মপ্রাণ মানুষ আমি সারাজীবনে আর একটিও দেখিনি। ফলে আমি মন-প্রাণ উজাড় করে তাকে সীমাহীন ভালোবেসে তার সেবা করতে থাকলাম। একটি উল্লেখযোগ্য পরিমাণ সময় তার সাহচর্যে থাকার সৌভাগ্য আমার হলো। যখন তার মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এল আমি তার কাছে নিবেদন করলাম,

'জনাব! আপনার ইন্তেকালের পর আমি কার কাছে যাব, কার সাহচর্য অবলম্বন করব? এ ব্যাপারে আমি আপনার উপদেশ ও পরামর্শ চাই।'

তিনি বললেন,

'বেটা! খ্রিস্টধর্মের যে মৌলিক নীতি-আদর্শের ওপর আমি প্রতিষ্ঠিত ছিলাম, 'মাওছেল'-এর এক ব্যক্তি ছাড়া আর কেউ সে রকম আছে বলে আমার জানা নেই। তিনিও আমার মতো ধর্মের কোনো বিকৃতি ঘটাননি, সুতরাং তুমি তার কাছে চলে যেও।'

এই পাদ্রির ইন্তেকাল হয়ে গেলে আমি তার নিদের্শনা মতে মাওছেলের লোকটির নিকট চলে গেলাম। তাকে আমার বিষয়ে সকল তথ্য জানিয়ে বললাম,

'মৃত্যুর পূর্বক্ষণে একজন পাদ্রি আমাকে উপদেশ দিয়ে গেছেন আপনার সাহচর্য অবলম্বন করতে। তিনি আমাকে বলেছিলেন, তার মতো আপনিও প্রকৃত খিস্টধর্ম আঁকড়ে ধরে আছেন।'

সবকথা শুনে তিনি আমাকে নিজের সাহচর্যে কবুল করলেন। ধীরে ধীরে আমি বুঝতে পারলাম তিনি অতি উত্তম একজন ধর্মপ্রাণ মানুষ।

তারও মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এল। আমি তার কাছে আবেদন করলাম,

'হে মহান ব্যক্তি! আপনার সামনে আল্লাহ তাআলার অনিবার্য হুকুম (মৃত্যু) এসে গেছে যা আপনি বুঝতে পারছেন। আমার সম্পর্কে তো আপনার সবই জানা। এখন আমি কার কাছে যাব, সে বিষয়ে আমি আপনার সুপরামর্শ ও নিদের্শনা চাই।'

তিনি স্নেহশীল পিতার মতো বললেন,

'হে পুত্র! 'নাছিবাইন'-এর এক ব্যক্তি ছাড়া আর কেউ আমাদের মতো দীনের ওপর সঠিকভাবে প্রতিষ্ঠিত আছে বলে আমার জানা নেই। সুতরাং তুমি সেখানে চলে যেও এবং তার কাছে থেকো।'

তার কাফন-দাফনের পর আমি নাছিবাইনের সেই বুযুর্গ মানুষটির নিকট হাজির হলাম, তাকে নিজের পূর্ববর্তী সকল অবস্থা, বিশেষভাবে মুর্শিদের নির্দেশনা সম্পর্কে সবকথা জানালাম। সবশুনে তিনি আমাকে নিজের কাছে থাকার অনুমতি দিলেন। আমি তার সান্নিধ্যে থেকে গেলাম। অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই বুঝতে পারলাম যে, পূর্বের দু'জনের মতো এই বুযুর্গও খুবই সৎ ও ধর্মপ্রাণ মানুষ। তবে তার কাছ থেকে আমি খুব বেশি উপকৃত হতে পারলাম না। অল্পদিনের মধ্যেই তারও মৃত্যুর সময় এসে গেল। তখন আমি তার নিকট গিয়ে বললাম,

'আমার সম্পর্কে আপনার তো সবই জানা আছে আমার লক্ষ্য কী? কিসের জন্য আমি ধর্না দিয়ে বেড়াচ্ছি এখান থেকে ওখানে? সুতরাং আপনার মৃত্যুর পরে আমি কার কাছে যাব, এ বিষয়ে কিছু বলে যান।'

আমার নিবেদন শুনে তিনি দরদভরা কণ্ঠে বললেন,

'বেটা! 'আম্মুরিয়া'র এক বুযুর্গ ছাড়া আর কেউ আমাদের মতো সত্যকে আঁকড়ে ধরে আছে বলে আমার জানা নেই। তিনি সেই লোকটির নাম উল্লেখ করে বললেন, আমার মৃত্যুর পর তুমি তার কাছে চলে যেও।'

তার পরামর্শ মতো আমি আম্মুরিয়াতে পৌঁছে গেলাম। আমার সকল খবর তাকে খুলে বললাম এবং পূর্বের বুযুর্গের অন্তিম অসিয়তের কথা জানিয়ে আমাকে তার কাছে থাকার অনমুতি দেওয়ার আবেদন করলাম। তিনি অনুমতি প্রদান করলেন এবং আমি তার সঙ্গে থাকা শুরু করলাম। দেখলাম পূর্বের দেখে আসা বুযুর্গদের মতো ইনিও নীতি-আদর্শে অবিচল আর খুবই ধর্মপ্রাণ ও মহৎ মানুষ। আমি তার ধর্মভীরুতা, নীতি ও ব্যক্তিত্ব দ্বারা উপকৃত হতে থাকলাম। তার কাছে থাকাকালীন আমি কয়েকটি গাভী ও বেশ কিছু বকরীর মালিক হয়ে গেলাম। এরপর পূর্ববর্তীদের মতো একসময় তারও মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এল। যথারীতি অন্তিম মুহূর্তে আমি তার নিকট গিয়ে বললাম,

'আমার পূর্বের সকল খবরই আপনি জানেন। এবার আমি কার কাছে যাব? কী করব? দয়া করে এ বিষয়ে আমাকে কিছু বলে যান।'

তিনি অত্যন্ত স্নেহের সঙ্গে বললেন,

'বেটা! আল্লাহর শপথ, আমার জানা মতে বিশাল এই পৃথিবীর বুকে এখন এমন কেউ বেঁচে নেই যিনি আমাদেরই মতো সত্য ধর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত। তবে আশার কথা এই যে, খুব শিগগিরই আরবভূমিতে আত্মপ্রকাশ করবেন ইবরাহিমী ধর্মের অনুসারী এক মহান নবী, যিনি নিজ জন্মভূমি থেকে হিজরত করবেন খেজুর বাগান শোভিত অঞ্চলে। যা হবে কালো কালো পাথরে ঘেরা দুই প্রান্তরের মাঝে অবস্থিত। তাঁর নবুওয়াতের বেশ কিছু সুস্পষ্ট নিদর্শন থাকবে।

যেমন : তিনি নিজের জন্য হাদিয়া-তোহ্ফা গ্রহণ করবেন। খাবেন।

কিন্তু সাদাকা-যাকাত নিজের জন্য গ্রহণ করবেন না। খাবেন না।

তাঁর মুবারক দুই কাঁধের মধ্যখানে শোভা পাবে মহরে নবুওয়াত।'

পাদ্রী তার কথা শেষ করলেন এই বলে,

'বেটা! যদি তোমার পক্ষে সম্ভব হয় তাহলে আমার মৃত্যুর পর সেই অঞ্চলে গিয়ে তাঁর সঙ্গে মিলিত হয়ো।'

তার মৃত্যু হয়ে গেল। আমি বেশ কিছুদিন আম্মুরিয়াতেই থেকে গেলাম। এরই মধ্যে আরবের 'কালব' গোত্রের এক বাণিজ্য কাফেলার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হলো। আমার জন্য বিরাট সুবর্ণ সুযোগ। আমি তাদের কাছে প্রস্তাব দিলাম,

'তোমরা যদি আমাকে আরব দেশে পৌঁছে দিতে রাজি হও, তাহলে আমার এইসব গাভী ও বকরী তোমাদের দিয়ে দেব।' তারা সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেল। আমিও সঙ্গে সঙ্গে সেগুলো তাদের হাতে তুলে দিলাম। আমাকে সঙ্গী বানিয়ে তারা চলতে শুরু করল। 'ওয়াদিল কুরা'য় (মদীনা ও সিরিয়ার মধ্যবর্তী স্থানে) পৌঁছার পর তারা আমার সঙ্গে গাদ্দারী করে বসল। জনৈক ইহুদীর নিকট আমাকে বিক্রি করে দিল। ক্রীতদাস হিসাবে আমি ইহুদীর চাকরি করতে থাকলাম।

একদিন তার কুরাইযা বংশীয় এক চাচাতো ভাই তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এল। তিনি ঐ মালিক এর নিকট থেকে আমাকে কিনে নিলেন এবং সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন ইয়াসরিবে। সেখানে পৌঁছার পর আমি দেখলাম সেই খেজুর বাগানের দৃশ্য—যার কথা আমাকে বলেছিলেন 'আম্মুরিয়া'র পাদ্রি। তার বর্ণনা অনুসারে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য মিলিয়ে মদীনাকে চিনতে আমার একটুও ভুল হলো না। তখন থেকে নতুন ইহুদী মালিকের সঙ্গে মদীনাতেই আমার বসবাস শুরু হলো।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ততদিনে মক্কাতে মানুষকে আল্লাহর পথে দাওয়াত দেওয়া শুরু করে দিয়েছিলেন। কিন্তু গোলামীর জীবনের দুর্ভাগ্য আর দিন-রাত মুনিবের কাজে ব্যস্ততার দরুন নবীজীর কোনো খবরই আমি জানতে পারলাম না। তাঁর সম্পর্কে আমি অন্ধকারেই থেকে গেলাম।

* * *

এরপর তিনি মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনায় পৌঁছে গেলেন। একদিন আমি মুনিবের খেজুর বাগানে একটি গাছের ওপর চড়ে কাজ

করছিলাম। আমার মুনিব সেই গাছের নিচেই বসা ছিলেন, এমনি মুহূর্তে তার কাছে এলেন তার এক চাচাতো ভাই এবং বললেন,

'আল্লাহ তাআলা মদীনার আউস ও খাযরাজ গোত্রকে ধ্বংস করুন। তারা এখন কুবাতে সমবেত হয়েছে একটি লোককে কেন্দ্র করে— যিনি আজই মক্কা থেকে এসেছেন এবং যিনি নিজেকে নবী বলে দাবি করে থাকেন।'

দীর্ঘ প্রতিক্ষিত এই সংবাদ আমার কানে ঢোকামাত্রই আমার শরীরে যেন জ্বর এসে গেল। সারা দেহে প্রচণ্ড কাঁপুনি শুরু হলো, আমি ব্যাকুল ও অস্থির হয়ে পড়লাম। আমার আশঙ্কা হলো হয়তো এখনই মুনিবের মাথার ওপর পড়ে যাব। অতি দ্রুত গাছ থেকে নেমে ঐ লোকটিকে জিজ্ঞাসা করলাম,

'আপনি কী যেন বলছিলেন, আরেকবার বলুন তো!'

আমার মুনিব ভীষণ ক্ষেপে গেলেন এবং খুব জোরে আমাকে একটি ঘুসি মেরে বললেন,

'আরে! এটা নিয়ে তোর মাথা ব্যথা কেন? যা, তোর কাজে যা।'

সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলে আমি নিজের জমানো কিছু খেজুর নিয়ে রাসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লাম। তাঁর সম্মুখে হাজির হয়ে বললাম,

'আমি জেনেছি আপনি খুবই ভালো মানুষ, আপনার সঙ্গী-সাথীরা দেশ ছেড়ে এসে খাদ্য ও অর্থের অভাবে পড়ে গেছেন। আমার কাছে এই সাদাকার খেজুরগুলো ছিল। আমার মনে হলো আপনারাই এর বেশি হকদার।'

এই বলে আমি তাঁর সম্মুখে খেজুরগুলো রেখে দিলাম। তিনি সাহাবীদের বললেন,

'এই নাও.. তোমরা এগুলো খাও।'

নিজে তিনি একটি খেজুরও খেলেন না, সবই সঙ্গীদের দিয়ে দিলেন।

এটা দেখে আমি মনে মনে বললাম, যাক.. একটি আলামত মিলে গেল। এরপর আমি ফিরে এলাম। আবার খেজুর জমানো শুরু করলাম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন 'কুবা' থেকে মদীনায় এসে গেলেন, আমি তাঁর খেদমতে হাজির হয়ে বললাম,

'প্রথমবার বুঝতে পেরেছি আপনি সাদাকার খাদ্য-খাবার নিজে গ্রহণ করেন না। এজন্য আপনার প্রতি ভক্তি ও ভালোবাসার নিদর্শন স্বরূপ হাদিয়া হিসাবে এই খেজুরগুলো এনেছি...'

এবার তিনি নিজেও খেলেন এবং সঙ্গীদেরও নিজের সঙ্গে খেতে বললেন।

আমি মনে মনে বললাম, দ্বিতীয় আলামতটাও মিলে গেল। এরপর আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম মদীনার বিখ্যাত কবরস্থান 'বাকীউল গারকাদ'[১]এ। সেখানে তিনি একজন সাহাবীর দাফন কাজে অংশগ্রহণ করছিলেন। আমি দেখলাম তিনি বসে আছেন, তাঁর শরীরে ছিল মোটা দুইটি চাদর। আমি প্রথমে তাঁকে সালাম দিলাম, তারপর তাঁর মুবারক পিঠের দিকে তাকিয়ে পেছনে এসে দাঁড়ালাম যেন আম্মুরিয়ার পাদ্রি বর্ণিত সেই মোহরে নবুওয়াত দেখতে পাই।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আমাকে বারবার তার পিঠ মুবারকের দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখলেন, তিনি আমার মতলব বুঝে ফেললেন। তিনি পিঠ মুবারক থেকে চাদর ফেলে দিলেন। এবার তাকাতেই আমি নবুওয়াতের মোহরটি দেখতে পেলাম। সকল নিদর্শন মিলে যাওয়ার ফলে সব-সংশয় দূর হয়ে গেল। আমি নবীকে চিনে ফেললাম এবং নিচু হয়ে সেখানে চুমু দিয়ে আনন্দে কাঁদতে থাকলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার অবস্থা দেখে বিস্ময়ের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলেন,

---

১.'বাকীউল গারকাদ' আমাদের দেশে 'জান্নাতুল বাকী' নামে পরিচিত। মসজিদে নববীর নিকটবর্তী গোরস্থানটির প্রকৃত নাম এটাই।

'তোমার ব্যাপার কী বলোতো?'

আমার পুরো কাহিনী তাঁকে শোনালাম। সত্যের জন্য আমার দীর্ঘ সংগ্রামের কাহিনী শুনে তিনি মুগ্ধ হলেন। তাঁর আগ্রহের কারণে তাঁর সাহাবীদেরও নিজ মুখে আবারও আমার কাহিনী শোনাতে হলো। তারাও শুনে ভীষণ বিস্মিত এবং মহাখুশি হলেন।

* * *

সালাম ও অভিবাদন সালমান আল-ফারসীর প্রতি যেদিন তিনি সত্য সন্ধানের অবিরাম সাধনা ও সংগ্রামের দৃঢ় সংকল্প করেছিলেন।

সালাম ও অভিবাদন সালমান আল-ফারসীর প্রতি যেদিন তিনি সত্যকে চিনে তার প্রতি সুদৃঢ় ঈমান এনেছিলেন।

সালাম ও অভিবাদন তাঁর প্রতি যেদিন তাঁর ইন্তেকাল হয়েছে এবং পরকালে যেদিন তাঁর পুনরুজ্জীবন হবে।

তথ্যসূত্র :

১. *আল-ইসাবা*, ২য় খণ্ড, ৬২ পৃষ্ঠা অথবা *আত্তারজামা*, ৩৩৫৭।
২. *আল-ইসতীআব*, ২য় খণ্ড, ৫৬ পৃষ্ঠা।
৩. *আল-জারাহ ওয়াত-তাদীল*, ২য় খণ্ড, ২৯৬-২৯৭ পৃষ্ঠা।
৪. *আল-জামউ বাইনা রিজালিস সহীহাইন*, ১ম খণ্ড, ১৯৩ পৃষ্ঠা।
৫. *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, ১ম খণ্ড, ৩৬২-৪০৫ পৃষ্ঠা।
৬. *তারীখুল ইসলাম লিযযাহাবী*, ২য় খণ্ড, ১৫৮-১৬৩ পৃষ্ঠা।
৭. *উসদুল গাবাহ*, ২য় খণ্ড, ৩২৮-৩৩২ পৃষ্ঠা।
৮. *তাবাকাতুশ শারানী*, ৩০-৩১ পৃষ্ঠা।
৯. *সিফাতুস সফওয়া*, ১ম খণ্ড, ২১০-২২৫ পৃষ্ঠা।
১০. *শাযারাতুয যাহাব*, ১ম খণ্ড, ৩১৫ পৃষ্ঠা।
১১. *তাকরীবুত তাহযীব*, ১ম খণ্ড, ৩১৫ পৃষ্ঠা।
১২. *তাহযীবুত তাহযীব*, ৪র্থ খণ্ড, ১৩৭-১৩৯ পৃষ্ঠা।

ইকরিমা ইবনে আবী জাহল

ইকরিমা ইবনে আবী জাহল মক্কা ছেড়ে ইয়েমেনে পালানোর পরিকল্পনা ত্যাগ করে মুমিন হয়ে তোমাদের মাঝে আসছে, তোমরা তার (কাফের ও মৃত) পিতাকে গালি দিও না। কারণ মৃতকে দেওয়া গালি শুধু জীবিত পুত্রকেই কষ্ট দেবে, মৃত পিতার কান পর্যন্ত পৌঁছবে না।

–মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ

মারহাবা! হিজরতকারী অশ্বারোহীকে ঈমান ও ইসলামের পথে অভিনন্দন।

–ইকরিমার আগমনে প্রিয় নবীর স্বাগতবাণী

দয়ার নবী যে সময় প্রকাশ্যে মানুষকে হক ও হিদায়াতের পথে আহ্বান জানান, সে সময় ইকরিমা ছিলেন জীবনের তৃতীয় দশকের শেষ দিকে (চল্লিশের কাছাকাছি)।

বংশ মর্যাদা ও ধন-সম্পদে তিনি ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ কুরাইশী, মান-মর্যাদায়ও তিনিই ছিলেন সর্বোচ্চ আসনে।

দয়ার নবীর সেই প্রকাশ্য আহ্বান কবুল করে মুসলিম হয়ে যাওয়াটাই ছিল তার জন্য স্বাভাবিক। যেমন, তার সমবয়স্ক সাদ ইবনে আবি

ওয়াক্কাস, মুসআব ইবনে উমাইর রাযিয়াল্লাহু আনহুমা এবং মক্কার অন্যান্য যুবকেরা করেছিলেন। অন্য যুবকদের মতো সেও হয়তো একইভাবে ইসলাম গ্রহণ করত যদি তার সামনে তার পিতা না থাকত।

তাহলে কে সেই নরাধম পিতা?

সে হচ্ছে মক্কার সবচেয়ে বড় দুর্বিনীত জালিম সরদার, কাফের-মুশরিকদের প্রধানকর্তা, দুর্দান্ত সন্ত্রাসের হোতা, যার মহাদাপুটে অপতৎপরতা দ্বারা আল্লাহ মুমিনদের ঈমানকে পরীক্ষা করেছেন, যে পরীক্ষায় তাঁরা ঈমানের দৃঢ়তা প্রমাণ করেছেন...

যার চক্রান্তজাল দ্বারা আল্লাহ বিশ্বাসীদের সততা ও সত্যতা যাচাই করেছেন আর তাঁরা প্রতিবারই সততার প্রমাণ দিয়ে সফলতা লাভ করেছেন...

সেই নরাধম পিতা আর কেউ নয় আবু জাহল। ব্যাস, তার নামটুকুই যথেষ্ট...

এ ছিল তার পিতার কথা, আর তার নিজের কথা? ইকরিমা ইবনে আবী জাহল আল-মাখযূমী। অর্থাৎ তার নাম : ইকরিমা, পিতা আবু জাহল। বংশীয় পরিচয় হিসাবে তিনি একজন মাখযূমী। কুরাইশের সীমিত শক্তিধর নেতৃবৃন্দের অন্যতম এবং তাদের হাতে গোনা সেরা অশ্বারোহীদের প্রধানতম।

* * *

ইকরিমা ইবনে আবী জাহল নিজেকে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে ঘোর শত্রুতায় সঁপে দিল পিতার নেতৃত্বের প্রতি আনুগত্য দেখিয়ে। তাই জীবনভর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে শত্রুতা করতে থাকল। তাঁর সাহাবীদের অবর্ণনীয় কষ্ট দিয়ে অতিষ্ঠ করে তুলল। ইসলামের বিরুদ্ধে ইসলামের অনুসারী

মুসলিমদের বিরুদ্ধে নানা ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তের জাল এমনভাবে বিস্তার করল—যা দেখে পুত্রগর্বে কাফের দলপতি পিতার বুক ফুলে উঠল।

তার পিতা যখন বদর প্রান্তরের প্রথম লড়াইয়ে মুশরিকবাহিনীর নেতৃত্ব দিচ্ছিল। লড়াইয়ের তিনদিন পূর্বেই রণাঙ্গনে অবস্থান নিয়ে উট জবাই করে, মদপান করে, নর্তকীদের সঙ্গীত ও নৃত্যে আমোদিত হয়ে লাত ও উযযার কসম খেয়ে অঙ্গীকার করেছিল,

'মুহাম্মাদকে পরাজিত না করে সে কিছুতেই মক্কায় ফিরে যাবে না।'

এই রণাঙ্গনে নেতৃত্ব প্রদানকালে পুত্র ইকরিমা ছিল পিতার বাহু ও হাতের মতো শক্তি ও বল প্রয়োগের মাধ্যম।

তবে দেবী লাত ও উয্যা আবু জাহলের কসমে কোনোই সাড়া দেয়নি। কী করে সাড়া দেবে? ওরা তো বধির, শুনতেই পায় না।

এই রণক্ষেত্রে 'লাত-উয্যা' কোনোভাবেই সাহায্য করল না। কী করে সাহায্য করবে? ওরা তো পাথরের মূর্তিমাত্র। অক্ষম, অপারগ।

বদরের রণাঙ্গনে আবু জাহলকে চরম লজ্জা ও অপমানজনক মৃত্যু বরণ করতে হলো। তার পুত্র ইকরিমা অসহায় চোখে পিতার ভূপাতিতদেহ তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল। দেখল মুসলিমবাহিনীর বর্শাগুলো তার পিতার রক্তপান করে তৃষ্ণা মেটাচ্ছে। সে নিজ কানে শুনতে পেল দাম্ভিক পিতার পরাজিত ও অসহায় কণ্ঠের শেষ আর্ত-চিৎকার।

* * *

ইকরিমা মক্কায় ফিরল পিতার লাশ বদরে ফেলে রেখে। ক্ষুদ্র, অসহায় ও অপ্রস্তুত মুসলিমবাহিনীর হাতে তাদের বিশাল অস্ত্রসাজে সজ্জিত বাহিনীর এমন জঘন্য পরাজয়ের গ্লানি তাকে অসহায় করে দিল। মক্কায় দাফনের জন্য তার লাশ নিয়ে যাওয়ার কথা সে কল্পনাও করতে পারল না। পরিস্থিতি এতই ভয়ানক আকার ধারণ করল যে লাশের চিন্তা বাদ

দিয়ে কোনোরকমে পালিয়ে নিজের প্রাণ বাঁচাতে সে বাধ্য হলো। নিরুপায় মুসলিমবাহিনী বদরে নিহত অগণিত বেওয়ারিশ লাশের সঙ্গে আবু জাহলের লাশটিও 'কালিব' জলাশয়ে নিক্ষেপ করল এবং বালি ফেলে সেগুলো ঢেকে দিল।

* * *

সেদিন থেকে ইসলামের সঙ্গে ইকরিমা ইবনে আবী জাহলের আচরণে এক নতুন মাত্রা যোগ হলো।

কারণ এতদিন সে ইসলামের বিরোধিতা করত পিতার প্রতি আনুগত্যবশত, আর এখন থেকে সে ইসলামের বিরোধিতা করবে পিতৃহত্যার প্রতিশোধবশত।

ইকরিমা একদল সঙ্গী জোটাল যাদের আত্মীয়-স্বজন বদর যুদ্ধে নিহত হয়েছিল এবং যাদের অন্তরে প্রতিশোধের আগুন জ্বলছিল। ইকরিমার এই দলের সকলে মিলে মক্কার কাফের-মুশরিকদের অন্তরে মুহাম্মাদের বিরুদ্ধে নতুনভাবে শত্রুতা ও প্রতিশোধের আগুন উস্কাতে শুরু করল। বিশেষভাবে বদরে নিহত কুরাইশীদের জীবিত স্বজনদের মনে তারা প্রতিশোধের অগ্নিশিখা জ্বালিয়ে দিল—যার পরিণতিতে বেজে উঠল ওহুদ যুদ্ধের দামামা।

* * *

ইকরিমা ওহুদ যুদ্ধে স্ত্রী উম্মে হাকীমকে সঙ্গে নিয়ে বের হলো যেন বদর যুদ্ধে স্বামী হারানো মহিলাদের সঙ্গে সেও শামিল হতে পারে। যোদ্ধা পুরুষদের পেছন সারিতে দাঁড়িয়ে তারা যেন দফ বাজিয়ে শোকগাঁথা গেয়ে কুরাইশী অশ্বারোহী ও যোদ্ধাদের শত্রু হত্যায় প্ররোচনা দিতে পারে এবং পলায়নপর সৈনিকদের ময়দানে ফেরৎ পাঠাতে পারে।

* * *

কুরাইশী অশ্বারোহী দলের ডানদিকে সেনাপতি নিযুক্ত করা হলো খালিদ ইবনে ওয়ালীদকে আর বামদিকে ইকরিমা ইবনে আবী জাহলকে। সেদিন এই দুই বীরযোদ্ধার তুখোর রণকৌশল আর মরণপণ লড়াই মুহাম্মাদ ও তাঁর সঙ্গী বাহিনীর বিরুদ্ধে কুরাইশীদের পাল্লা ভারী করে তুলল এবং মুশরিকবাহিনীর বিশাল বিজয় নিশ্চিত করে দিল। যা দেখে আবু সুফিয়ান মন্তব্য করে বসল, 'এটা হলো বদরের প্রতিশোধ।'

* * *

খন্দকের যুদ্ধে মুশরিকবাহিনী মদীনা শহরের ওপর দীর্ঘ অবরোধ চাপিয়ে বসেছিল। দীর্ঘদিন বসে থাকতে থাকতে ইকরিমার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেল। সে খন্দকের এক জায়গায় সামান্য সরু রাস্তা দেখে সেদিক দিয়ে পার হয়ে গেল। তাকে দেখে একই পথ ধরে আরও কয়েকজন সৈনিক জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সেখানে প্রবেশ করল, যার খেসারত হিসাবে আমর ইবনে আবদে উদ্দ আল-আমেরী নামের এক বিখ্যাত অশ্বারোহীকে মুখোমুখি যুদ্ধে হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর হাতে জীবন দিতে হলো।

তবে ইকরিমা কোনোরকমে পালিয়ে জীবন বাঁচাতে সক্ষম হলো।

* * *

মক্কা বিজয়ের দিন কুরাইশের লোকেরা যখন বুঝতে পারল, মুহাম্মাদ ও তাঁর সঙ্গীদেরকে প্রতিরোধের কোনো শক্তি তাদের নেই, তখন তারা সিদ্ধান্ত নিল, তাঁকে মক্কায় প্রবেশের ক্ষেত্রে কোনো বাধা দেবে না। এই সিদ্ধান্তের কারণ, তারা জানতে পেরেছিল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর প্রধান প্রধান সেনানায়কদের নির্দেশ দিয়েছেন, যে সকল মক্কাবাসী প্রতিরোধ করতে আসবে, তাদের ছাড়া আর কাউকেই যেন হত্যা না করা হয়।

* * *

কিন্তু ইকরিমা ইবনে আবী জাহল এবং তার সমমনা কয়েকজন কুরাইশের সর্বসম্মত ঐ সিদ্ধান্তকে প্রত্যাখ্যান করে বিশাল ইসলামী বাহিনীর বিরুদ্ধে আক্রমণ করে বসল। খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ সামান্য এক ঝটকায় তাদের পরাজিত করে দিলেন। কয়েকজন নিহত হলো আর কয়েকজন পালিয়ে জান বাঁচাল। পলায়নকারীদেরই একজন ছিলেন ইকরিমা ইবনে আবী জাহল।

* * *

ইকরিমা এইবার বেশ চিন্তায় পড়ে গেল। তার মধ্যে অনুশোচনা, হতাশা ও বিস্ময় জাগতে শুরু করল।

মক্কাতে আশ্রয় নেওয়ার মতো কোনো স্থান তার নেই, সেটা তো মুসলিমরা জয় করেই নিয়েছে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরাইশদের সকল অন্যায় ও দুর্ব্যবহারের সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা দিলেন। তবে পাশাপাশি সুনির্দিষ্ট কয়েকজন ব্যক্তি সম্পর্কে জানানো হলো– 'অমুক অমুক ক্ষমার অযোগ্য।' এরা কাবার গেলাফের মধ্যে আশ্রয় নিলেও তাদের হত্যা করা হবে।

ব্যতিক্রমী ঐ কয়েকজনের তালিকার শীর্ষে ছিল ইকরিমা ইবনে আবী জাহলের নাম। এজন্যই সে মক্কা থেকে লুকিয়ে ইয়ামেনের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েছিল। কারণ, সেটা ছাড়া তার আর কোনো আশ্রয় নেওয়ার জায়গা ছিল না।

* * *

এমন সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তাঁবুতে হাজির হলো ইকরিমার স্ত্রী উম্মে হাকীম এবং উতবার মেয়ে হিন্দ। তাদের সঙ্গে ছিল আরও দশ মহিলা, সকলেই নবীজীর হাতে ইসলাম কবুলের বাইয়াত

নিতে হাজির হয়েছিল। রাসূলের গৃহে সেই মুহূর্তে উপস্থিত ছিলেন তাঁর দুই স্ত্রী, মেয়ে ফাতিমা এবং আবদুল মুত্তালিবের বংশের আরও কয়েকজন মহিলা। প্রথমে বোরকার আবরণে চেহারা লুকিয়ে কথা শুরু করল হিন্দ বিনতে উতবা। সে বলল,

'হে আল্লাহর রাসুল! সকল প্রশংসা সেই আল্লাহর যিনি তাঁর মনোনীত ও পছন্দনীয় দীন অর্থাৎ ইসলামকে আজ বিজয়ী করে দিয়েছেন। আমি আপনার দরবারে এই মিনতি নিয়ে এসেছি, আপনার সঙ্গে আমার যে গভীর আত্মীয়তার বন্ধন রয়েছে তার উসিলায় আমার প্রতি সদয় আচরণ করুন। আমি একজন মুমিন—আপনার নবুওয়াতের প্রতি বিশ্বাসী মহিলা। এরপর তিনি বোরকার আবরণ সরিয়ে পরিচয় প্রকাশ করে বললেন, হে আল্লাহর রাসুল! আমি হিন্দ বিনতে উতবা।'

প্রিয় নবী তার ইসলাম গ্রহণে আনন্দ প্রকাশ করে বললেন,
'তোমাকে অভিনন্দন।'

এরপর হিন্দ বললেন,
'হে আল্লাহর রাসূল! এতদিন পর্যন্ত আমার কাছে আপনার বাড়ির চেয়ে বেশি ঘৃণিত আর কোনো বাড়ি ছিল না অথচ আজকের এই শুভক্ষণ থেকে আমার নিকট আপনার বাড়ির চেয়ে বেশি মর্যাদাপূর্ণ বাড়ি আর একটিও নেই।'

এরপর ইকরিমা ইবনে আবী জাহলের স্ত্রী উম্মে হাকীম দাঁড়িয়ে ইসলাম কবুলের ঘোষণা দিয়ে বললেন,

'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি হত্যা করবেন সেই ভয়ে আপনার হাত থেকে বাঁচার জন্য ইকরিমা ইয়ামেনের উদ্দেশ্যে পালিয়ে গেছে। দয়া করে তার অপরাধ ক্ষমা করে তার প্রাণ ভিক্ষা দিন এবং তাকে নিরাপত্তা দান করুন, আল্লাহ আপনার নিরাপত্তা দেবেন।'

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

'ঠিক আছে, তাকে নিরাপত্তা দেওয়া হলো।'

সঙ্গে সঙ্গে উম্মে হাকীম স্বামীর খোঁজে পথে বেরিয়ে পড়লেন। তার সঙ্গে ছিল এক রোমানক্রীতদাস। বেশ কিছু পথ পারি দেওয়ার পর ক্রীতদাসটি তাকে কু-কর্মের জন্য ফুঁসলাতে লাগল। তিনি তাকে আশা-নিরাশার দো-টানায় ফেলে কাল বিলম্ব করতে করতে এক আরব জন-বসতিতে পৌঁছে গেলেন। সেখানের লোকদের কাছে তিনি গোলামের ব্যাপারে সাহায্য চাইলেন। তারা তাকে বন্দী করে নিজেদের কাছে রেখে দিল। গোলামকে ওদের কাছে ফেলে রেখে এবার তিনি একাই স্বামীর খোঁজে ছুটতে থাকলেন। অবশেষে তিনি তাকে দেখতে পেলেন তিহামা অঞ্চলে সাগরের কূলে। ইকরিমা তখন একজন মুসলিম-মাঝিকে অনুরোধ করছিলেন দ্রুত তাকে সাগর পার করে দেওয়ার জন্য। মাঝি তাকে বলছিল, 'আমি আপনাকে পার করে দেব, তার আগে আপনি নিজের ভালো ও খাঁটি মানুষ হওয়া প্রমাণ করুন।'

ইকরিমা জিজ্ঞাসা করল,
'কিভাবে সেটা প্রমাণ করব?'

মাঝি বলল, 'শুধু আপনাকে বলতে হবে,
'আশহাদু আল্লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ ওয়া আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ, ব্যাস এতটুকুই...'

ইকরিমা হতাশ হয়ে তাকে বলল,
'আরে এই কালিমার হাত থেকে বাঁচার জন্যই তো পালাচ্ছি...'

তাদের দু'জনের এমন আলোচনার মাঝে ইকরিমার সম্মুখে এসে দাঁড়িয়ে উম্মে হাকীম বললেন,

'হে আমার চাচাতো ভাই ও আমার প্রাণের স্বামী! আমি সর্বাধিক আত্মীয়তা রক্ষাকারী, সর্বাধিক সৎকর্মশীল এবং মানবজাতির শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহর নিকট থেকে এসেছি...

তাঁর কাছে আমি তোমার নিরাপত্তা চেয়েছি এবং তিনি তা মঞ্জুর করেছেন। অতএব তুমি নিজের জীবনকে বিপন্ন করো না। স্বদেশ-স্বজন ত্যাগ করে ইয়ামেনের নিঃসঙ্গ জীবনের পথে আর অগ্রসর হয়ো না।'

ইকরিমা জিজ্ঞাসা করল,
'তুমি নিজেই কি তাঁর সঙ্গে কথা বলেছ?'

'হাঁ হাঁ, আমি নিজে তাঁর কাছে তোমার নিরাপত্তা চেয়েছি এবং তিনি তোমাকে সেটা দিয়েছেন।'

এভাবে তিনি বারবার বলে বলে স্বামীকে আশ্বস্ত করে নিজের সঙ্গে ফিরে আসতে রাজি করলেন। ফেরার পথে তিনি স্বামীকে রোমানক্রীতদাসের ব্যাপারটি জানালে ইকরিমা ইসলাম কবুল করার পূর্বে সেখানে গিয়ে তাকে হত্যা করে ফেলল।

মক্কার উদ্দেশ্যে ফেরার পথে তারা যখন একটি মনজিলে যাত্রা বিরতি করছিলেন, সেখানে ইকরিমা স্ত্রীকে একান্ত সান্নিধ্যে নিতে ইচ্ছা প্রকাশ করল কিন্তু স্ত্রী অত্যন্ত কঠোরভাবে তাকে বাধা দিয়ে বললেন,

'আমি এখন একজন মুসলিম-নারী আর তুমি একজন মুশরিক-পুরুষ...'

স্বামী বিস্ময়ে হতবাক হয়ে বলল,
'তোমার আর আমার মাঝে যদি কোনো কিছু অন্তরায় সৃষ্টি করতে পারে, তাহলে সেটা নিশ্চয় তুচ্ছ নয়, অনেক বড় বিষয়।'

ইকরিমা যখন মক্কার নিকবর্তী হলো, প্রিয় নবী সাহাবীদের তার আসার আগাম সংবাদ জানিয়ে নির্দেশনা দিলেন,

'ইকরিমা ইবনে আবী জাহল ইয়ামেনে পালানোর পরিকল্পনা ত্যাগ করে একজন মুমিন হিসাবে তোমাদের মাঝে আসছে, তোমরা তার মৃত পিতাকে গালি দিও না। কারণ, মৃতকে দেওয়া গালি শুধু জীবিত পুত্রকেই কষ্ট দেবে। মৃত ব্যক্তির কানে যাবে না।'

অল্পক্ষণের মধ্যেই ইকরিমা এবং তার স্ত্রী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মজলিসে পৌঁছে গেলেন। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে দেখামাত্রই তীব্র আনন্দে তার দিকে ছুটে চলে গেলেন চাদর শরীরে না জড়িয়েই। ফিরে এসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নিজের জায়গায় বসলেন, তার সম্মুখে এসে দাঁড়িয়ে ইকরিমা জানতে চাইল,

'হে মুহাম্মাদ! উম্মে হাকীম আমাকে জানিয়েছে আপনি তার কাছে আমাকে নিরাপত্তা দানের ঘোষণা দিয়েছেন...

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাবে বললেন,
'হ্যাঁ, সে ভুল বলেনি। তোমাকে সে ঠিক সংবাদই দিয়েছে। তুমি নিশ্চিন্ত নিরাপদ।'

ইকরিমা এবার জানতে চাইল,
'হে মুহাম্মাদ! আপনি কিসের দিকে আহ্বান করেন?'

তিনি বললেন,
'আমি তোমাকে আহ্বান করছি এটা সাক্ষ্য দিতে যে, আল্লাহ ছাড়া ইবাদত-আনুগত্যের উপযুক্ত আর কোনো মাবুদ নেই এবং আমি আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল। এবং আমি তোমাকে আহ্বান করছি এ কথার প্রতি যে তুমি নামায কায়েম করবে এবং যাকাত প্রদান করবে... এবং...'

এভাবে তিনি একটি একটি করে ইসলামের আরকান উল্লেখ করলেন। সবশুনে ইকরিমা বললেন,

'আল্লাহর কসম! সত্য ছাড়া অন্য কিছুর প্রতি আপনি আহ্বান করেননি এবং ভালো ও কল্যাণ ছাড়া অন্য কিছুর আদেশ আপনি দেননি।'

ইকরিমা বলতে থাকলেন,

'আপনি মানুষকে সৎ ও সত্য পথে যেদিন থেকে আহ্বান করছেন, তার পূর্বেও আপনিই ছিলেন আমাদের সমাজে সত্যবাদী ও সৎকর্মশীল। আপনার মতো এত ভালো মানুষ আগেও ছিল না এখনো নেই।'

এরপর তিনি হাত বাড়িয়ে দিয়ে আবেগমথিত কণ্ঠে বললেন,
'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, একমাত্র আল্লাহ ছাড়া ইবাদত-আনুগত্যের উপযুক্ত আর কেউ নেই। আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আপনি তাঁর বান্দা ও রাসূল।'

তিনি আবার বললেন,
'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার পূর্বাপর বিবেচনা করে এমন কিছু আমাকে শিখিয়ে দিন যা বলা আমার জন্য হবে সর্বশ্রেষ্ঠ।'

প্রিয় নবী তাকে কালিমা-ই শাহাদাত শিখিয়ে দিলেন,

اَشْهَدُ اَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ، وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ

তিনি বললেন, 'তুমি একথা বলবে যে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া ইবাদত-আনুগত্যের উপযুক্ত আর কোনো মাবুদ নেই এবং মুহাম্মাদ তাঁরই বান্দা ও রাসূল।'

ইকরিমা বললেন,
'আর কী বলতে হবে?'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,
'এবার তুমি বলো আমি আল্লাহকে সাক্ষী রেখে, উপস্থিত সকলকে সাক্ষী রেখে বলছি, আমি আজ থেকে একজন মুসলিম, মুজাহিদ এবং মুহাজির।'

ইকরিমা সবকথার পুনরাবৃত্তি করলেন।

তখন প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন,

'আজ তুমি আমার কাছে যা চাইবে, দেওয়ার মতো হলে সবকিছু তোমাকে দিয়ে দেব।'

এত বড় আশ্বাস পেয়ে ইকরিমা রাযিয়াল্লাহু আনহু নবীজীর কাছে অনুনয় করে বললেন,

'আমার চাওয়া শুধু এতটুকু, আমি আপনার বিরুদ্ধে যত শত্রুতা করেছি, যত পদক্ষেপ নিয়েছি, যত যুদ্ধ করেছি অথবা যত সমালোচনা করেছি সাক্ষাতে কিংবা অসাক্ষাতে, আল্লাহ যেন আমার সেই সকল অপরাধ ক্ষমা করে দেন। সে উদ্দেশ্যে আপনি আমার জন্য দুআ করুন।'

তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهُ كُلَّ عَدَاوَةٍ عَادَانِيْهَا، وَكُلَّ مَسِيْرٍ سَارَ فِيْهِ إِلىٰ مَوْضِعٍ يُرِيْدُ بِهِ إِطْفَاءَ نُوْرِكَ، وَاغْفِرْ لَهُ مَا نَالَ مِنْ عِرْضِىْ فِىْ وَجْهِىْ اَوْ اَنَا غَائِبٌ عَنْهُ

'হে আল্লাহ! তুমি তার সেই সকল শত্রুতার অপরাধ ক্ষমা করে দাও—যা সে আমার বিরুদ্ধে করেছে এবং ক্ষমা করো তার সেই সকল অপতৎপরতার পাপ—যা সে দীনের আলো নিভিয়ে দেওয়ার জন্য চালিয়েছে এবং তুমি ক্ষমা করে দাও তার সেই সকল সমালোচনার পাপ—যা সে করত আমার সামনে কিংবা পেছনে।'

প্রিয় নবীর মুবারক জবানের এই চমৎকার দুআ শোনার পর ইকরিমা রাযিয়াল্লাহু আনহুর চেহারা খুশিতে ঝলমল করে উঠল পূর্ণিমা চাঁদের মতো। তিনি বলে উঠলেন,

'আমি আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি ইয়া রাসূলাল্লাহ! এতদিন আমি যত অর্থ-সম্পদ খরচ করেছি মানুষকে ইসলাম থেকে দূরে রাখার জন্য, এখন থেকে তার দ্বিগুণ খরচ করব ইসলামের পক্ষে। এতদিন যত লড়াই-সংগ্রাম করেছি ইসলামের অগ্রযাত্রাকে ঠেকানোর উদ্দেশ্যে এখন থেকে দ্বিগুণ লড়াই করব আল্লাহর দীনকে বিজয়ী রাখার জন্য।'

সেদিন থেকে ইসলামের প্রচার-প্রসারের মিছিলে শামিল হলেন এক নতুন সদস্য—যিনি ছিলেন যুদ্ধের ময়দানে সিংহহৃদয়ের এক অসম সাহসী বীরযোদ্ধা, আবার মসজিদে রাতভর ইবাদতকারী কুরআনের পাগল প্রেমিক। তিনি ঠোঁটে, কপালে ও চোখে কুরআন স্পর্শ করে চুমু খেয়ে আল্লাহর ভয়ে চোখের পানিতে বুক ভাসিয়ে আবেগে আপ্লুত হয়ে বলতেন, 'এ আমার রবের কিতাব, এ আমার প্রভুর কালাম...'

* * *

ইকরিমা রাযিয়াল্লাহু আনহু সে অঙ্গীকারের পূর্ণ বাস্তবায়ন ঘটিয়েছিলেন যা তিনি চূড়ান্ত করেছিলেন প্রিয় নবীর সামনে। সে জন্যই তাঁর ইসলাম গ্রহণের পর মুসলিমবাহিনী ও কাফেরদের মাঝে যত যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে, ইকরিমা রাযিয়াল্লাহু আনহু তার প্রতিটিতেই অংশ নিয়েছিলেন একজন সাচ্চা মুজাহিদ হিসাবে। মুসলিমবাহিনী যেখানে যে কোনো জরুরি কাজে বের হতো তাঁর নাম থাকত তালিকার একেবারে শীর্ষে।

ইয়ারমুকের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল তাঁর ইসলাম গ্রহণের পর। এই যুদ্ধে তিনি ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন যেমন গ্রীষ্মের প্রচণ্ড তাপদাহে ঠাণ্ডা পানির জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ে তৃষ্ণার্ত ব্যক্তি।

যুদ্ধের একটি পর্যায়ে মুসলিমবাহিনীর বিরুদ্ধে আক্রমণের তীব্রতা যখন ভয়াবহ রূপ নিল। ইকরিমা রাযিয়াল্লাহু আনহু নিজের দামি ঘোড়া থেকে নেমে পড়লেন, নিজ তরবারির খাপ ভেঙ্গে নষ্ট করে ফেললেন, যেন আর কখনো তরবারি খাপে ঢুকাতে না হয়। এরপর শত্রু সৈন্য রোমানদের কাতারের বহু ভেতরে ঢুকে পড়লেন। সেনাপতি খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ আতঙ্কিত হয়ে ছুটে গেলেন তাঁর কাছে। অনুনয়ের সুরে বললেন,

'ইকরিমা! এমন ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করো না। তোমার জীবন গেলে মুসলিমবাহিনীর জন্য হবে অপূরণীয় ক্ষতি এবং অসহনীয় ব্যথার কারণ।'

ইকরিমা বললেন,

'খালিদ! ছেড়ে দাও আমার পথ, যেতে দাও আমাকে। খালিদ! তুমি বড়ই ভাগ্যবান, দু'জনেই আমরা একসঙ্গে বেড়ে উঠলেও সৌভাগ্যের পথে আমাকে তুমি অনেক পিছে ফেলে দিয়েছ। রাসূলের সোনার পরশ তুমি অনেক পূর্বে পেয়ে নিজেকে ধন্য করেছ। অথচ কী পোড়া কপাল আমার! আল্লাহর রাসূলের সবচেয়ে বড় দুশমন ছিলাম আমি আর আমার বাবা। অতএব আমাকে ইসলাম ও নবীজীর অতীত বিরোধিতা ও শত্রুতার কাফফারা করতে দাও।'

একটু পরে তিনি আবার বললেন,

'আমি বহু অন্যায় যুদ্ধে দৃঢ়তার সঙ্গে রাসূলুল্লাহর বিরুদ্ধে লড়াই করেছি, সেই আমি আজ ন্যায় যুদ্ধে রোমবাহিনীকে ভয় পেয়ে পিছু হটব?

অসম্ভব, এটা কিছুতেই হতে পারে না।'

এরপর তিনি ঘোষণা দিলেন, 'কে আছে শহীদ হওয়ার শপথ নেবে?' ইকরিমা রাযিয়াল্লাহু আনহুর চাচা হারিছ ইবনে হিশাম এবং যিরার ইবনুল আযওয়ারসহ চারশো মুসলিমসেনিক সেই শপথে অংশ নিলেন। এই বিশেষ বাহিনী প্রধান সেনাপতির সেনা পরিচালনা কেন্দ্রের সামনে, পেছনে ও আশ-পাশে মরণপণ লড়াই করলেন এবং শত্রুপক্ষের আক্রমণ শক্ত হাতে প্রতিরোধ করে সেনাপতির প্রতিরক্ষা দিলেন।

ইয়ারমুকের যুদ্ধ যখন শেষ হলো মুসলিমবাহিনীর বিশাল বিজয়ের মাধ্যমে, তখন দেখা গেল ইয়ারমুকের প্রান্তরে পড়ে আছেন তিনজন মুজাহিদ ভীষণ আহত, দুর্বল ও ক্লান্ত দেহে। তারা হলেন :

১. হারিস ইবনে হিশাম ২. আইয়্যাশ ইবনে আবী রবীআ এবং ৩. ইকরিমা ইবনে আবী জাহল। তৃষ্ণায় ছটফট করতে করতে প্রথমে হারিস রাযিয়াল্লাহু আনহু পানি পানি বলে কাতরাতে লাগলেন। তার কাছে যখন পানি নিয়ে যাওয়া হলো, ইকরিমা রাযিয়াল্লাহু আনহু তৃষ্ণার্ত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালেন। সেটা দেখে হারিস ইবনে হিশাম বললেন,

‘আগে ইকরিমার কাছে পানি নিয়ে যাও...’

ইকরিমা রাযিয়াল্লাহু আনহুর কাছে যখন পানি নিয়ে যাওয়া হলো, আইয়্যাশ রাযিয়াল্লাহু আনহু তৃষ্ণায় ছটফট করে সে দিকে তাকালেন। যার ফলে ইকরিমা ইবনে আবী জাহল বললেন,

‘আমার পূর্বের আইয়্যাশকে পান করাও।’

যখন আইয়্যাশের কাছে পানি নিয়ে যাওয়া হলো, দেখা গেল তিনি দুনিয়া ছেড়ে চলে গেছেন। দৌড়ে ইকরিমার কাছে পানি নিয়ে গেলে দেখা গেল, তিনিও প্রভুর দরবারে পৌঁছে গেছেন। এরপর হারিস ইবনে হিশামের কাছে গিয়েও দেখা গেল আল্লাহ তাকেও নিজের কাছে তুলে নিয়েছেন।

তাদের সকলের প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট হোন। আল্লাহ তাদের হাউজে কাউসারের পানি পান করিয়ে দিন—যা পান করার পর আর কখনোই তারা তৃষ্ণার্ত হবেন না।

হে আল্লাহ! তাদেরকে জান্নাতুল ফেরদাউসের সবুজ শ্যামল বাগ-বাগিচার অতিথি করে দাও, যেখানে তাঁরা অনন্তকাল অকল্পনীয় আনন্দ-উল্লাস করতে থাকবেন।

তথ্যসূত্র :

১. *আল-ইসাবা*, ২য় খণ্ড, ৪৯৬ পৃষ্ঠা অথবা *আত্তারজামা*, ৫৬৩৮।
২. *তাহযীবুল আসমা*, ১ম খণ্ড, ৩৩৮ পৃষ্ঠা।
৩. *খুলাসাতুত তাহযীব*, ২২৮ পৃষ্ঠা।
৪. *যাইলুল মুযীল*, ৪৫ পৃষ্ঠা।
৫. *তারীখুল ইসলাম* লিয-যাহাবী, ১ম খণ্ড, ৩৮০ পৃষ্ঠা।
৬. *রাগবাতুল আমল*, ৭ম খণ্ড, ২২৪ পৃষ্ঠা।
৭. *আল-মুসতাদরাক*, ৩য় খণ্ড, ২৪১ পৃষ্ঠা।

যায়েদ আল-খাইর

> সাবাশ! কী দারুন বুদ্ধি ও সাহস তোমার হে যায়েদ! তোমার সাহস ও সংকল্প দেখে সত্যিই আমি মুগ্ধ
>
> –মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ

মানবজাতি খনিজ সম্পদ সমতূল্য, যারা জাহেলী যুগে উত্তম মানুষ ছিলেন ইসলাম গ্রহণের পরও তারাই হয়েছেন সর্বোত্তম মানুষ ও সর্বোত্তম মুসলিম। একজন বিখ্যাত সাহাবীর দুইটি ভিন্ন ভিন্ন জীবনের চিত্র তুলে ধরা হচ্ছে এখানে, এর প্রথমটি এঁকেছে জাহেলিয়াতের হাত আর দ্বিতীয়টি তাঁর ইসলামী যুগের আঙ্গুলের অনবদ্য সৃষ্টি।

সেই সাহাবীর নাম 'যায়েদুল খাইল'—ঘোড়াওয়ালা যায়েদ। প্রচুর ঘোড়ার মালিক হওয়ার কারণে জাহেলী যুগে মানুষ তাকে এ নামেই ডাকত... পক্ষান্তরে ইসলাম গ্রহণ করার পর প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার নাম (খাইল) পরিবর্তন করে রাখেন যায়েদুল খাইর। প্রচুর কল্যাণওয়ালা যায়েদ।

তার প্রথম জীবনের চিত্রটির বর্ণনা পাওয়া যায় আরবী সাহিত্যের বিভিন্ন কিতাবে। শাইবানী বর্ণনা করেছেন, আমের গোত্রের জনৈক প্রবীনের নিকট থেকে.. তিনি (সেই প্রবীন) বলেন,

'একবার আমরা (আমের গোত্রের মানুষ) আক্রান্ত হলাম ভীষণ খরা আর দুর্ভিক্ষে। অনাবৃষ্টির ফলে জমিনের ফসল ও শস্য সব শুকিয়ে গেল। এমনকি ঘাস-পাতার অভাবে না খেয়ে আমাদের পশুপালের ওলানগুলোও হয়ে গেল দুধশূন্য। এই রকম ভয়াবহ দুর্দিনে আমাদের এক ব্যক্তি এলাকা ছেড়ে পরিবারবর্গকে নিয়ে পাড়ি জমাল ইরাকের 'হীরা' অঞ্চলে। স্ত্রী ও সন্তানদের সেখানে রেখে তাদের নির্দেশ দিল, 'আমি না ফেরা পর্যন্ত তোমরা এখানেই আমার অপেক্ষা করবে।'

নিজে সে এই মর্মে শপথ করল যে, সম্পদ অর্জন না করে কিছুতেই সে ফিরে আসবে না। প্রয়োজন পড়লে জীবন বিলিয়ে দেবে। এরপর সে আবশ্যক পাথেয় হিসাবে কিছু খাদ্য পানি নিয়ে বেড়িয়ে পড়ল এবং পুরোদিন হাঁটতে থাকল। সন্ধ্যা যখন ঘনিয়ে এল সামনে দেখতে পেল একটি তাঁবু আর নিকটেই বাঁধা একটি ঘোড়ার বাচ্চা। সে মনে মনে বলল, এইটাই হবে আমার প্রথম গনীমত। সে ঘোড়াটির কাছে এগিয়ে গেল এবং তার বাঁধন খুলে ফেলল। ঘোড়ার পিঠে যেই চড়তে যাবে এমন সময় একটি কণ্ঠস্বর শুনে সে থমকে দাঁড়াল। তাকেই বলা হচ্ছে,

'ঘোড়াটি রেখে ভালোয় ভালোয় কেটে পড়ো। জানে মারলাম না, এটাকেই গনীমত মনে করো।' বেচারা ঘোড়া ফেলে জান বাঁচানোর চিন্তায় তাড়াতাড়ি সরে পড়ল।

এরপর সে আবারও হাঁটতে শুরু করল। সাতদিন হাঁটতে হাঁটতে যেখানে গিয়ে থামল সেখানে ছিল একটি উটের খোয়াড়। তার পাশে বিরাট এক তাঁবু যার মধ্যে দেখা যাচ্ছিল চামড়ার তৈরি দামী ও গোলাকার আরও একটি ছোট তাঁবু—যা মালিকের সম্পদশালী ও ধনী হওয়ার ইঙ্গিত করে। লোকটি মনে মনে ভাবল–

এই যে এতবড় খোয়ার এখানে তৈরি করা হয়েছে, নিশ্চয় এখানে অনেক উটও থাকে এবং এই যে বিশাল ও দামী তাঁবু, অবশ্যই এখানে অনেক লোকও থাকে।

সে তাঁবুর ভেতরের দিকে তাকাল, সূর্য তখন ডুবি ডুবি করছিল, ফলে আবছা আলো ও আঁধারের মাঝে ভেতরে দেখতে পেল অতিবৃদ্ধ একজন মানুষকে। বৃদ্ধ যেন কিছুই আঁচ করতে না পারে এমন সন্তর্পণে তার পেছনে গিয়ে সে চুপচাপ বসে গেল। অল্পক্ষণের মধ্যেই সূর্য ডুবে গেল। তখনই উত্তম ও অনেক উঁচু এক ঘোড়ার পিঠে চড়ে এক ব্যক্তি সেখানে হাজির হলো—এমন উঁচু, লম্বা ও বিশাল দেহের অশ্বারোহী ইতিপূর্বে আর একটিও তার চোখে পড়েনি। তার ডানে-বামে পায়ে হেঁটে এল দু'জন গোলাম। সঙ্গে ছিল শ-খানেক উটের এক বিশাল পাল যার সম্মুখে ছিল বিরাট একটি মর্দা সরদার উট। এই সরদার উটটি বসে পড়লে তাকে দেখে তার আশ-পাশের সকল উটনীই বসে পড়ল... তখন সেই লোকটি এক গোলামকে একটি মোটা উটনীর দিকে ইশারা করে বলল,

'এর দুধ দোয়াও এবং মুরুব্বীকে পান করাও।'

নির্দেশমতো গোলাম সেই উটনীটির দুধ দোয়াল এবং দুধে পূর্ণ পাত্রটি বৃদ্ধের সামনে রেখে সরে পড়ল। বৃদ্ধলোকটি এক বা দুই ঢোক দুধ পান করে পাত্রটি রেখে দিল। লোকটি বলে,

'আমি তখন হামাগুড়ি দিয়ে চুপিচুপি এগিয়ে গেলাম এবং পাত্রটি নিয়ে সবটুকু দুধ সাবাড় করে দিলাম। কিছুক্ষণের মধ্যে গোলাম এসে পাত্র খালি দেখে সেটা নিয়ে গেল এবং আশ্বারোহী সেই লোকটিকে উদ্দেশ্যে করে বলল,

'হে আমার মুনিব! মুরুব্বী তো সব দুধ পান করে পাত্র খালি করে ফেলেছে।'

শুনে খুব খুশি হয়ে লোকটি গোলামকে অন্য একটি উটনী দেখিয়ে বলল, 'এবার এইটার দুধ দোয়াও এবং আবার মুরুব্বীর সামনে রেখে এসো।'

গোলামটি নির্দেশমতোই সবকাজ করল। মুরুব্বী লোকটি এক ঢোক দুধ পান করে অমনি রেখে দিল। আমি সেই দুধে চুমুক লাগালাম এবং

অর্ধেকটা শেষ করে ফেললাম। সবটুকু পান করে অশ্বারোহীর মনে সন্দেহ জাগানো আমার ঠিক মনে হলো না। এবার অশ্বারোহী অন্য গোলামকে নির্দেশ দিল একটি বকরি জবাই করতে। জবাই করা হয়ে গেলে লোকটি নিজেই সেটার এক অংশ ভুনা করে নিজ হাতে বৃদ্ধকে খাওয়ালেন। বৃদ্ধ খেয়ে পরিতৃপ্ত হয়ে গেলে তিনি নিজে দুই গোলামকে সঙ্গে নিয়ে খাওয়া শুরু করলেন।

খাওয়া শেষ হয়ে গেলে অল্পক্ষণের মধ্যে সবাই বিছানায় চলে গেল এবং গভীর ঘুমে বিভোর হয়ে নাক ডাকাতে থাকল।

আমি উঠে সেই বড়সড় মর্দা সর্দার উটটির রশি খুলে তার পিঠে চড়ে বসলে সঙ্গে সঙ্গেই সে চলতে শুরু করল। আর তাকে দেখে তার পিছে পিছে চলতে থাকল পুরা উটের পাল। সারারাত অবিরাম চলতে থাকলাম, যখন দিনের আলো ফুটে উঠলে আমি চতুর্দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখার চেষ্টা করলাম কেউ আমার অনুসরণ করছে কিনা, কাউকেই দেখতে পেলাম না। আমি চলার গতি অব্যাহত রাখলাম। প্রায় দুপুর হয়ে এল।

আবার চতুর্দিকে দৃষ্টি ফেরালাম, হঠাৎ বহুদূরে একটি শকুন, ঈগল অথবা অন্য কোনো বড় পাখীর মতো কিছু একটা দেখতে পেলাম। সেটা এগুতে থাকল আর বড় হতে থাকল। এক সময় আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠল যে সেটা কোনো পাখী নয় বরং কোনো এক ঘোড়সওয়ার—আমার উদ্দেশ্যেই ছুটে আসছে। এক সময় আমি তাকে চিনতে পারলাম, সেই উঁচু লম্বা মোটা-সোটা লোকটি। উটের পালের খোঁজে এতদূর ছুটতে ছুটতে এসেছে।

সবকিছু যখন আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে গেল। আমি সর্দার উটের পিট থেকে নেমে তাকে বেঁধে ফেললাম। আমার তীরের থলে (তূণীর) থেকে তীর বের করে ধনুকে লাগালাম। উটটিকে পেছন দিকে রেখে তীর নিক্ষেপের প্রস্তুতি নিলাম। আমার এসব কীর্তিকলাপ দেখে লোকটি একটু দূরে থেমে গিয়ে বললেন,

'সর্দার উটটির রশি খুলে দাও।'

আমি বললাম,

'সেটা কিছুতেই সম্ভব নয়। আমি হীরা অঞ্চলে অসহায়, ক্ষুধার্ত, বিপদগ্রস্ত সন্তান ও স্ত্রীদের রেখে এসেছি। আমি শপথ করে বের হয়েছি যে ধন-সম্পদ না নিয়ে খালি হাতে কিছুতেই ফিরে যাব না। দরকার হলে আমি জীবন দিয়ে দেব।'

তিনি অত্যন্ত রাগ ও ধমকের সুরে বললেন,

'সর্দার উটের রশি খুলে দে। নইলে তোকে এখানেই জীবন দিতে হবে বেজন্মা।'

আমিও রাগের সঙ্গে জবাব দিলাম,

'কিছুতেই খুলব না।'

তিনি এবার নরম সুরে বললেন,

'আরে বোকা! আমার সম্পর্কে তুমি ভুল ধারণায় আছ...'

এরপর তিনি বললেন,

'তুমি এক কাজ করো.. সর্দার উটের রশিটা ঝুলিয়ে ধরো। ওর মধ্যে তিনটে গিরা আছে। তুমি বলে দাও কোনটাতে তীর ছুঁড়ব?'

আমি মাঝেরটাতে ছুঁড়তে বললাম। তিনি এমন নিখুঁত ভাবে লক্ষ্য ভেদ করলেন, যা দেখে মনে হবে কেউ একজন হাত দিয়ে তীরটা মাঝের গিরাটিতে ঢুকিয়ে দিয়েছে। এরপর দ্বিতীয় এবং তৃতীয় গিরাতেও একইভাবে লক্ষ্য ভেদ করে দেখিয়ে দিলেন যে তিনি কত দক্ষ তীরন্দাজ।

তার এ দক্ষতা দেখে আমি হতাশ হয়ে তুণিরে তীর রেখে দিলাম। আত্ম সমর্পণ করলাম। লোকটি এগিয়ে এসে আমার তরবারি ও তীর ধনুক নিয়ে নিলেন। তিনি বললেন,

'আমার পেছনে ঘোড়ার চড়ে বসো।' আমি তার নির্দেশ পালন করলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন,

'তোমার সঙ্গে কেমন আচরণ করব বলে তোমার ধারণা হচ্ছে?'

আমি বললাম,
'আমার মনে হচ্ছে খুব খারাপ কিছু করবেন।'

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন,
'এমন মনে হওয়ার কারণ কী?'

আমি বললাম,
'যে অপকর্ম আমি করেছি—এতবড় উটের পাল চুরি করে পালিয়েছি। ঐগুলোর খোঁজে আপনাকে এত পথ পাড়ি দিয়ে কষ্ট করতে হয়েছে। এত কষ্ট করে যখন আমাকে ধরে ফেলেছেন, তখন আমার কপালে ভালো কিছু জুটবে বলে আমি ভাবতে পারছি না।'

তিনি বললেন,
'তুমি ভাবছ আমি তোমার সঙ্গে খারাপ আচরণ করব। কিন্তু আমার পক্ষে এটা কিরূপে সম্ভব! যেখানে ঐ রাতে তুমি আমার পিতা মুহালহিলের সঙ্গে এক পাত্রে খাবার খেয়েছিলে, রাতে কিছু সময় তার সঙ্গী হয়েছিলে।'

মুহালহিলের নাম শুনতেই আমি জিজ্ঞাসা করে বসলাম,
'আপনি কি তাহলে যায়েদুল খাইল?'

তিনি বললেন,
'হাঁ, আমিই যায়েদুল খাইল।'

আমি বললাম,
'আপনি যেহেতু মানুষ হিসাবে খুব ভালো, তাই এখন আশা জাগছে যে কয়েদকারী হিসাবেও ভালোই হবেন।'

তিনি বললেন,
'ভয়ের কিছু নেই।' তারপর আমাকে সঙ্গে নিয়ে তিনি নিজের ঠিকানায় পৌছে গেলেন এবং বললেন,

'আল্লাহর কসম! এই উটগুলো যদি আমার হতো, তাহলে সব তোমাকে দিয়ে দিতাম। কিন্তু এগুলো আমার এক বোনের আমানত। তবে তুমি এক কাজ করো। আমার এখানে কয়েকটা দিন থেকে যাও। শিগগির আমি একটি অভিযানে বের হব, সেখান থেকে বেশ গনীমত পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।'

এরপর তিনদিন পার হতে না হতেই তিনি নুমাইর গোত্রের ওপর হামলা করে বসলেন। সেখান থেকে প্রায় একশো উটনী গনীমত হিসাবে পেলেন। সবই তিনি দিয়ে দিলেন আমাকে। শুধু তাই নয় তার দুই গোলামকেও আমার সঙ্গে দিলেন হীরা পর্যন্ত নিরাপদে পৌঁছে দেওয়ার জন্য।'

* * *

ঐ বর্ণনা ছিল যায়েদুল খাইলে'র জাহেলী যুগের ছবি। সেই যুগে তাঁর জীবন, চরিত্র ও বৈশিষ্ট্যের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী। তাঁর ইসলামী যুগের ছবিটি কেমন ছিল সেটা সীরাত বা জীবন চরিতের বিভিন্ন গ্রন্থ নিম্নরূপে ফুটিয়ে তুলেছে :

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সংবাদ যখন যায়েদুল খাইলের কানে পৌঁছল এবং যে সকল বিষয়ের প্রতি তিনি মানুষকে আহ্বান করেন, যে সকল শিক্ষা তিনি মানুষকে দান করেন, সে সকল ব্যাপারে যখন তিনি অবগত হলেন, তখন তিনি নিজের বাহন তৈরি করে নিলেন। নিজ কওমের বড় বড় নেতাকে ইয়াসরিবে যাওয়ার এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য আহ্বান জানালেন। সে আহ্বানে সাড়া দিয়ে তাঈ গোত্রের বিরাট এক প্রতিনিধি দল তার সঙ্গে মদীনায় রওনা করল। যাদের মধ্যে যুর ইবনে সাদুস, মালেক ইবনে জুবাইর এবং আমের ইবনে জুওয়াইন প্রমূখ ছিলেন উল্লেখযোগ্য। তারা যখন মদীনায় পৌঁছলেন, মসজিদে নববীতে হাজির হয়ে নিজ নিজ বাহনগুলো দরজার কাছে বাঁধলেন।

মসজিদে প্রবেশ করেই তারা দেখতে পেলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমবেত মুসলিমজনতার উদ্দেশ্যে মিম্বরে বসে বক্তব্য রাখছেন। তাঁর অসাধারণ বক্তব্য শুনে তারা মুগ্ধ হয়ে গেলেন। তাঁর সঙ্গে সাহাবীদের অকৃত্রিম ও গভীর সম্পর্ক দেখে, তাঁর কথার প্রতি তাদের এমন মন, প্রাণ ও কান লাগিয়ে তন্ময় হয়ে শোনা দেখে, তাদের এমন নজিরবিহীন প্রভাবিত হওয়া দেখে, তারা অভিভূত হয়ে পড়লেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাদের দেখলেন, তখন তিনি উপস্থিত সকল মুসলিমকে সম্বোধন করে বললেন,

إِنِّيْ خَيْرٌ لَكُمْ مِنَ الْعُزَّىٰ وَ مِن كُلِّ مَا تَعْبُدُوْنَ...

إِنِّيْ خَيْرٌ لَكُمْ مِنَ الْجَمَلِ الْأَسْوَدِ الَّذِيْ تَعْبُدُوْنَهُ مِنْ دُوْنِ اللهِ

‘নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য অনেক উত্তম, অনেক বেশি কল্যাণকর দেবী উযযার চেয়ে এবং সেই সকল বাতিল মাবূদের চেয়ে যাদের তোমরা পূজা করে থাক। আমিই তোমাদের জন্য সেই কালো উটের চেয়ে উত্তম যার উপাসনা তোমরা করো আল্লাহকে ছেড়ে।

* * *

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা যায়েদুল খাইল এবং তার সঙ্গীদের অন্তরে দু’ধরনের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করল। একদল সত্যের ডাক শুনে দীন কবুল করল আর অন্যদল অহঙ্কার দেখিয়ে মুখ ফিরিয়ে নিল। মহান আল্লাহর নিম্নোক্ত শাশ্বত বাণীর বাস্তব রূপায়ন ঘটল,

فَرِيْقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيْقٌ فِي السَّعِيْرِ.

‘একদল হবে জান্নাতের যাত্রী অন্য দল জাহান্নামের।’

ঐ দলের এক সদস্য যুর ইবনে সাদুস রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখছিল, যত দেখছিল বিস্ময়ে অভিভূত হচ্ছিল। মুমিনদের বিশ্বাসদীপ্ত অন্তরগুলো কী অপূর্ব ভক্তিতে তাঁকে সারাক্ষণ ঘিরে

রাখে! তাদের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা মেশানো দৃষ্টিগুলো কীভাবে তাকে বেষ্টন করে থাকে! এসব দেখে তার অন্তরে হিংসার আগুন জ্বলে উঠল, ভয়ে তার হৃদয় অস্থির হলো। তার সঙ্গীকে ভেতরের অনুভূতি জানিয়ে বলল,

إِنِّيْ لَأَرَىٰ رَجُلًا لَيَمْلِكَنَّ رِقَابَ الْعَرَبِ، وَاللهِ لَا أَجْعَلَنَّهُ يَمْلِكُ رَقَبَتِي أَبَدًا..

'আমি দেখতে পাচ্ছি একজন মানুষ গোটা আরব জাতির ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে বসবে। আল্লাহর কসম! আমার ওপর তাকে কিছুতেই কর্তৃত্ব করতে দেব না।'

এরপর সে চলে গেল শাম দেশে। মাথার চুল ন্যাড়া করে খ্রিস্টান হয়ে গেল।

পক্ষান্তরে যায়েদুল খাইল এবং তার অন্য সঙ্গীদের অবস্থা হলো ভিন্নরূপ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেইমাত্র বক্তব্য শেষ করলেন, অমনি যায়েদুল খাইল সকলের মাঝে দাঁড়িয়ে গেলেন। যিনি ছিলেন অন্যতম সুদর্শন ও সুস্বাস্থ্যের অধিকারী, ছিলেন এত লম্বা যে উঁচু ঘোড়ায় চড়লেও তার পা মাটিতেই ঠেকে থাকত, যেমন অন্যদের বেলায় ঘটে শুধুমাত্র গাধায় চড়লে।

তিনি লম্বা চওড়া নজরকাড়া দেহ নিয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং স্পষ্ট ও উঁচু আওয়াজে ডেকে বললেন,

'হে মুহাম্মাদ! আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ ছাড়া ইবাদত-আনুগত্যের উপযুক্ত আর কোনো মাবুদ নেই আর এটাও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আপনি আল্লাহর মনোনীত রাসূল।'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার পরিচয় কী?'

তিনি বললেন,

'আমি মুহালহিলের পুত্র, আমার নাম যায়েদুল খাইল।'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

'না, তোমার নাম যায়েদুল খাইল (ঘোড়াওয়ালা যায়েদ) নয়, আজ থেকে তোমার নাম যায়েদুল খাইর (কল্যাণওয়ালা যায়েদ)। সকল প্রশংসা সেই আল্লাহর যিনি তোমাকে তোমার সমতল ও পাহাড়ঘেড়া অঞ্চল থেকে এতদূর টেনে এনেছেন এবং ইসলাম গ্রহণ করার জন্য তোমার হৃদয়কে কোমল করেছেন।'

সেদিন থেকেই তিনি পরিচিত হলেন নবীজীর দেওয়া নাম, যায়েদুল খাইর-এর পরিচয়ে।

এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তাকে নিয়ে গেলেন নিজের বাড়িতে। সেখানে উপস্থিত ছিলেন উমর ইবনুল খাত্তাব এবং আরও কয়েকজন সাহাবী। বাড়িতে পৌঁছার পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যায়েদের জন্য হেলান দেওয়ার একমাত্র তাকিয়াটি এগিয়ে দিলেন। রাসূলের সম্মুখে হেলান দিয়ে বসা তার কাছে চরম বেয়াদবি মনে হওয়ায় তিনি সেটা রাসূলের দিকেই ফিরিয়ে দিলেন। নবীজী তিনবার যায়েদের দিকে তাকিয়াটি এগিয়ে দিলেন এবং যায়েদও তিনবারই তা ফিরিয়ে দিলেন।

যখন সকলেই নিজ নিজ স্থানে বসে পড়লেন, তখন যায়েদুল খাইরকে লক্ষ্য করে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

'হে যায়েদ! আমি লোক মুখে যত মানুষেরই বর্ণনা শুনেছি, পরে সাক্ষাৎ হলে দেখেছি মানুষের বর্ণনা বাস্তবের চেয়ে অতিরঞ্জিত। একমাত্র ব্যতিক্রম তুমি। তোমার সম্পর্কে যেমন শুনেছি তুমি ঠিক তেমনই। একটুও কম নও।'

এরপর প্রিয় নবী তাকে জিজ্ঞাসা করলেন,

'হে যায়েদ এখন ইসলাম কবুল করার পর তোমার অনুভূতি কী?'

যায়েদ বললেন,

'এখন অন্য কিছুর প্রতি নয়, আমার মধ্যে ভালোবাসা জন্ম নিয়েছে ভালো মানুষের প্রতি—যারা ভালো কাজ করে, ভালো পথে চলে...

আমি নিজে যদি ভালো কাজ করতে পারি তবে তার প্রতিদান আমি অবশ্যই পাব—এই বিশ্বাস আমার মধ্যে জন্ম নিয়েছে। কোনো ভালো কাজ আমার থেকে ছুটে গেলে আমি সেটার জন্য ব্যাকূল থাকব।'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

'আল্লাহ তাআলা যাদের পছন্দ করেন তাদের মাঝে এই আলামত দান করেন।'

একথা শুনে যায়েদ খুশি হয়ে বললেন,

'সকল প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য যিনি আমাকে আল্লাহ ও রাসূলের পছন্দনীয় পথে পরিচালিত করেছেন।'

এরপর তিনি প্রিয় নবীর নিকট প্রস্তাব করলেন,

'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি মাত্র তিনশো অশ্বারোহী যোদ্ধা আমাকে দিন। তাদের নিয়ে রোমসাম্রাজ্য জয় করার দায়িত্ব আমার ওপর ছেড়ে দিন।'

তার এই হিম্মত ও সাহস দেখে প্রিয় নবী চমৎকৃত হয়ে বললেন,

'সাবাশ! কী দারুন বুদ্ধি ও সাহস তোমার হে যায়েদ! তোমার এই সাহস ও সংকল্প দেখে সত্যিই আমি মুগ্ধ হলাম।'

এরপর যায়েদের সঙ্গে আসা তার কওমের প্রত্যেক প্রতিনিধি ইসলাম কবুল করলেন। যায়েদ এবং সকল সঙ্গী যখন নিজেদের এলাকা নজদে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা ব্যক্ত করলেন, তখন প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের বিদায় জানাতে এসে যায়েদ সম্পর্কে বললেন-

'আহা! কত ভালো মানুষ সে...

সে যদি মদীনার এই মহামারি জ্বর থেকে বাঁচতে পারে, তাহলে অদূর ভবিষ্যতে তার প্রভাব ও গুরুত্ব কত যে বাড়বে!'

সেই সময় মদীনা মুনাওয়ারাতে মহামারি জ্বরের প্রকোপ ছড়িয়ে পড়েছিল, যে কারণে প্রিয় নবী ঐ আশঙ্কার কথাটি বলেছিলেন। যায়েদুল খাইর মদীনার সীমানা ছাড়ার পূর্বেই সেই জ্বরে আক্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন। তিনি সেটা বুঝতে পেরে পথিমধ্যে সঙ্গীদের বললেন,

'বনি কায়েসের এলাকা থেকে তাড়াতাড়ি আমাকে সরিয়ে নাও। কারণ, জাহেলী যুগে নির্বুদ্ধিতাবশত তাদের সঙ্গে আমাদের অনেক যুদ্ধ হয়েছে। নতুন করে আর কোনো সজ্ঘাত চাই না। আমি আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি, জীবন থাকতে কোনো মুসলিমের বিরুদ্ধে লড়াই করব না।'

* * *

নজদে নিজের পরিবার ও নিজ কওমের উদ্দেশ্যে অবিরাম চলতে থাকল যায়েদের পথচলা। যদিও জ্বরের মারাত্মক প্রকোপ প্রতি মুহূর্তেই তীব্র থেকে আরও তীব্র হচ্ছিল। বুকে কত স্বপ্ন—নিজ কওমের লোকদের সঙ্গে মিলিত হবেন এবং নিজে তাদের ইসলাম কবুল করাবেন।

কিন্তু এখন গন্তব্য আর মৃত্যু মুখোমুখি। মৃত্যুই আগে পৌঁছে গেল। তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন পথিমধ্যেই। তাঁর ইসলাম গ্রহণ ও মৃত্যুবরণ এই দুটোর মধ্যবর্তী সামান্য সময়ে কোনো গুনাহ তাকে স্পর্শ করতে পারেনি। ইসলাম গ্রহণ করে নিষ্পাপ হলেন, মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে সোজা জান্নাতী হলেন।

তথ্যসূত্র :

১. *আল-ইসাবা*, ১ম খণ্ড, ৫৭২ পৃষ্ঠা, অথবা *আত্তারজামা*, ২৯৪১।
২. *আল-ইসতীআব*, ১ম খণ্ড, ৫৬৩ পৃষ্ঠা।
৩. *আল-আগানী*, সূচিপত্র দ্রষ্টব্য।
৫. *সিমতুল লাআলী*, সূচিপত্র দ্রষ্টব্য।
৬. *খাযানাতুল আদব* লিলবাগদাদী, ২য় খণ্ড, ৪৪৮।
৭. *যাইলুল মুযীল*, ৩৩ পৃষ্ঠা।
৮. *সিমারুল কুলূব*, ৭৮ পৃষ্ঠা।
৯. *আশ-শিরু ওয়াশ-শুআরাউ*, ৯৫ পৃষ্ঠা।
১০. *হুলইয়াতুল আউলিয়া*, ১ম খণ্ড, ৩৭৬ পৃষ্ঠা।
১১. *হুসনুস সাহাবা*, ২৪৮ পৃষ্ঠা।

আদিই ইবনে হাতিম আত-তাঈ

> যখন তারা কুফরীর পথে অবিচল ছিল তখন তুমি ঈমান এনেছিলে, তারা যখন প্রত্যাখ্যান করেছিল, তখন তুমি গ্রহণ করেছিলে, তারা যখন গাদ্দারী করেছিল তুমি তখন বিশ্বাস করেছিলে আর তারা যখন পিছপা হয়েছিল তুমি তখন এগিয়ে এসেছিলে।
>
> –উমর ইবনুল খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহু

হিজরতের নবমবর্ষে আরবের একজন বিখ্যাত বাদশা দূরে দূরে পালিয়ে পালিয়ে অবশেষে ইসলামের সম্মুখে নত হয়ে আনুগত্য স্বীকার করেন, বিশ্বাসের পথ উপেক্ষা করে করে অবশেষে নমনীয় হয়ে ঈমান কবুল করেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বারবার প্রত্যাখ্যান করার পর অবশেষে তাঁর বশ্যতা মেনে নিয়ে তাঁর অনুসারী হয়ে যান। তিনি হলেন আদিই ইবনে হাতিম আত-তাঈ। অর্থাৎ সেই হাতেম তাঈর পুত্র যার দানশীলতার কথা প্রবাদ হিসাবে চালু রয়েছে মানুষের মুখে মুখে।

* * *

আদিই নেতৃত্ব পেয়েছিলেন পিতার উত্তরাধিকার থেকে। 'তাঈ' অঞ্চলের জনগণ পিতার পরে তাকেই নিজেদের বাদশা মনোনীত

করেছিল। তার জন্য তারা যুদ্ধলব্ধ ও লুটতরাজকৃত সম্পদে বরাদ্ধ করে দিয়েছিল এক চতুর্থাংশ, নিজেদের আনুগত্যের বাগডোর তুলে দিয়েছিল তারই হাতে।

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হক ও হিদায়াতের প্রতি প্রকাশ্য আহ্বান শুরু করলেন এবং আরবের লোকেরা একের পর এক গোত্রের পর গোত্র তাঁর অনুগত হয়ে ইসলাম কবুল করতে থাকল, তখন আদিই তাঁর সেই আহ্বানের মাঝে দেখতে পেল এমন এক শক্তি যা অল্পদিনের মধ্যেই ধ্বংস করে দেবে তার নেতৃত্বকে। দেখতে পেল এমন এক কর্তৃত্ব যা খুব শিগগির তার কর্তৃত্বকে ধুলিস্মাৎ করে দেবে। ফলে না-জেনে না-বুঝে সে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড শত্রুতা পোষণ করতে শুরু করল। তাঁকে দেখার পূর্বেই সে তীব্রভাবে তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্বেষী হয়ে উঠল। এভাবে প্রায় বিশ বছর ইসলামের বিরুদ্ধে চরম শত্রুতা করে কাটিয়ে দিল সে। অবশেষে মহান আল্লাহ হক ও হিদায়াতের আহ্বানের প্রতি তার হৃদয়ের দুয়ার খুলে দিলেন। তিনি ইসলাম কবুল করলেন।

* * *

হাতেম তাঈর পুত্র আদিই-এর ইসলাম গ্রহণের রয়েছে এক চমৎকার কাহিনী। খোদ আদিই-এর জবানীতেই আমরা শুনব সেই অবিস্মরণীয় কাহিনী। কারণ, এ কাহিনী বলার জন্য তিনিই সর্বোত্তম ও সর্বাধিক যোগ্য।

আদিই বলেন :

'যখন আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যাপারে শুনেছি, তখন থেকেই তাকে আমি এত বেশি অপছন্দ করতাম যেমনটি আরব জাতির মধ্যে আর কেউই করত না। এমনিতে আমি একজন খ্রিস্টান ধর্মানুসারী ভদ্র ও সম্ভ্রান্ত যুবক ছিলাম। আমি আমার কওমের লোকদের

সঙ্গে এক চতুর্থাংশের আচরণ চালু রেখেছিলাম। আরবের অন্য রাজা বাদশাদের মতো আমিও নিজ কওমের যুদ্ধলব্ধ ও লুটতরাজকৃত সম্পদের চারভাগের এক ভাগ গ্রহণ করতাম। এভাবে চিন্তাহীন জীবন ভালোই কাটছিল।

যখন আল্লাহর রাসূলের নানান খবর শুনতে পেলাম, আমার ভালো লাগল না। খবরাখবর মোতাবেক তাঁকে আমার পছন্দ হলো না।

যখন তাঁর অনুসারীদের দল বড় হলো এবং তাঁর শক্তি বেড়ে গেল, তাঁর পাঠানো সৈনিকদের ছোট-বড় দল আরবভূমির পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তসহ সর্বত্র বিজয় অভিযান চালাতে থাকল। সে সময় আমি একদিন আমার উটপালের রাখাল গোলামটিকে বললাম,

'বেটা! আমার উটপাল থেকে কয়েকটা মোটা-তাজা ও শান্ত উটনী বাছাই করে আমার কাছাকাছি বেঁধে রাখবে। যদি শুনতে পাও যে মুহাম্মাদের সৈন্যবাহিনী অথবা তাঁর কোনো ছোট সেনাদল এই অঞ্চলে পা রেখেছে, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে আমাকে জানাবে। সাবধান! এতে যেন কোনোরূপ বিলম্ব না হয়।'

এর কিছুদিন পরে এক সকালে সেই গোলাম এসে জানাল,

'হে আমার মুনিব! আপনি আমাকে বলে রেখেছিলেন মুহাম্মাদের সৈন্য আপনার অঞ্চলে প্রবেশ করলে কী যেন করবেন, এখনই সেটা করুন।'

আমি বললাম,

'সর্বনাশ করলি! কেন? কী হয়েছে?'

সে বলল,

'আমি এলাকার ভেতরে বিভিন্নস্থানে বেশ কিছু পতাকা দেখে সেগুলো সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করলাম লোকজনকে। তারা জানাল, মুহাম্মাদের সেনাদল এসে পড়েছে।'

একথা শুনে আমি তাকে বললাম,

'তোমাকে যে উটনীগুলো তৈরি রাখতে বলেছিলাম, সেগুলো আমার কাছে নিয়ে এসো।'

সঙ্গে সঙ্গে আমি সেখান থেকে উঠে পড়লাম। স্ত্রী ও পুত্র-পরিজন সকলকে পরিস্থিতির ব্যাখ্যা দিয়ে বললাম, 'এখন এই মুহূর্তেই আমাদের এই প্রিয়ভূমি ছেড়ে পালাতে হবে।' তাদের সঙ্গে নিয়ে আমি দ্রুত সিরিয়ার দিকে যাত্রা শুরু করে দিলাম। যেন খ্রিস্টান ধর্মের অনুসারীদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সেখানেই বসবাস করতে পারি। তাড়াহুড়া করতে গিয়ে আমি পরিবারের সকলকেই সঙ্গে নিয়ে আসতে পারলাম না। বিপদজনক স্থানগুলো পার হওয়ার পর খোঁজ করতে গিয়ে বুঝতে পারলাম, আমার এক সহোদর বোনকে মাতৃভূমি নজদ এলাকায় তাঈ গোত্রের কিছু লোকজনসহ ফেলে এসেছি।

তখন আর সেখানে ফিরে যাওয়ার কোনো উপায় ছিল না। সুতরাং নিরুপায় হয়ে যারা সঙ্গে ছিল, তাদের নিয়েই সিরিয়ার উদ্দেশ্যে চলতে লাগলাম। সেখানে গিয়ে সমধর্মীয় খ্রিস্টানদের মাঝেই অবস্থান করতে থাকলাম।

আর ওদিকে আমার বোন—তার কপালে সেটাই জুটল যার ভয় ও আশঙ্কা আমার ছিল।

* * *

সিরিয়াতে অবস্থানকালে জানতে পারলাম মুহাম্মাদের সৈন্যবাহিনী আমাদের ফেলে আসা বাড়ি ঘরে আক্রমণ করে মাল-সামান সবকিছু লুটপাট করে নিয়ে গেছে। অন্য সকল মহিলার সঙ্গে আমার বোনকেও বন্দিনী করে মদীনায় নিয়ে গেছে।

অন্য বন্দিনীদের সঙ্গে তাকেও মসজিদের দুয়ার সংলগ্ন বন্দী শিবিরে রাখা হয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই সংরক্ষিত স্থানের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় আমার বোন তাঁর সম্মুখে দাঁড়িয়ে বলল,

'ইয়া রাসূলাল্লাহ! পিতা নেই, ইন্তেকাল হয়ে গেছে। বাবার অবর্তমানে আমার সাহায্যের জন্য আসা উচিৎ ছিল যে ভাইয়ের— আত্মরক্ষার্থে সে নিজেই পালিয়ে গেছে। এখন আমার কেউ নেই। তাই আপনিই আমার প্রতি অনুগ্রহ করুন, আল্লাহ আপনার প্রতি দয়া করবেন।'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন,
'তোমার সাহায্যের জন্য যার আসা উচিৎ ছিল বলে দাবি করছ, সেটা কে?'

সে জবাব দিল,
'আদিই ইবনে হাতিম।'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,
'আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কাছ থেকে পলায়ন করল?'

এই কথাবার্তার পর কোনো ফয়সালা ছাড়াই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ গন্তব্যের দিকে এগিয়ে গেলেন। পরদিন একই পথ দিয়ে যাবার সময় প্রিয় নবীকে উদ্দেশ্য করে আমার বোন একই আবেদন পেশ করল আর তিনিও তাকে আগের দিনের মতো একই জবাব দিলেন। এর পরদিন যখন নবীজী আবার ঐ পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন, আগের দু'দিনের আবেদনে সাড়া না পাওয়ায় সে হতাশ হয়ে পড়েছিল, ফলে আজ সে কিছুই বলল না। এটা দেখে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পেছন থেকে একটি লোক ইশারায় তাকে আবেদন পেশ করতে বলল, এতে সে আবারও তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে আবেদন করল,

'ইয়া রাসূলাল্লাহ! পিতা নেই, ইন্তেকাল হয়ে গেছে। বাবার অবর্তমানে তার দায়িত্ব নিয়ে আমার সাহায্যে যার এগিয়ে আসা উচিৎ

ছিল, সেই ভাই আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে নিজেই পালিয়ে গেছে। আমার কেউ নেই। সুতরাং, আপনিই আমার প্রতি অনুগ্রহ করুন, আল্লাহ আপনার প্রতি দয়া করবেন।'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,
'ঠিক আছে, দয়া করলাম তোমার প্রতি।'

এবার সে সঙ্গে সঙ্গেই বলল,
'আমি সিরিয়ায় আমার পরিবারের কাছে যেতে চাই।'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,
'অবশ্যই যাবে, তোমাকে কেউই বাধা দেবে না। শুধু তোমাকে সিরিয়াতে পৌঁছে দেওয়ার মতো নিজ কওমের আস্থাভাজন কাউকে না পাওয়া পর্যন্ত একটু ধৈর্য ধরতে হবে। তেমন কাউকে পেলেই আমাকে খবর দেবে।'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সেখান থেকে সরে গেলেন তখন সে ইশারাকারী লোকটির পরিচয় জানতে চাইলে উপস্থিত সকলে জানাল তিনি হলেন আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু।

এরপর একটি কাফেলা এল, যাদের মাঝে আস্থাভাজন লোকও ছিল। আমার বোন গিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে বলল,

'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার কওমের একটি কাফেলা এসেছে। যাদের মাঝে আমার আস্থাভাজন লোক রয়েছেন এবং আমাকে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব নেবেন।'

সব কথা শুনে প্রিয় নবী তাকে বিদায়ের পূর্বে নতুন পোশাক দান করলেন। দীর্ঘপথ পারি দেওয়ার জন্য উপযুক্ত বাহন হিসাবে একটি উটনী দান করলেন। পাথেয় হিসাবে দান করলেন পর্যাপ্ত পরিমাণ খাদ্য ও পানি। এরপর সানন্দে আমার বোন কাফেলার সঙ্গে সিরিয়ায় রওনা হয়ে গেল।

* * *

আদিই বলেন :

'এরপর আমরা একটু একটু করে তার বিভিন্ন সংবাদ শুনতে থাকি এবং তার আসার পথ দেখতে থাকি। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি আমার যে অন্যায় আচরণ তা সত্ত্বেও আমারই বোনের প্রতি তাঁর এত বেশি দয়া ও ভদ্রোচিত আচরণের খবরকে আমি বিশ্বাসই করতে পারছিলাম না।

আমি একদিন পরিবারবর্গের মাঝে বসে আছি, এমন এক মুহূর্তে হঠাৎ দেখতে পেলাম উটনীর পিঠে হাওদায় বসা এক নারী আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। আমি বললাম, 'এটা নিশ্চয়ই আমার বোন।' পরে দেখি সত্যিই সেটা আমার বোনই। যখন সে আমাদের মাঝে এসে বাহন থেকে নেমে দাঁড়াল, তখন সে রাগে-অভিমানে ভীষণ ক্রুদ্ধ বাক্যবানে জর্জরিত করে আমাকে বলতে থাকল,

'হারামি, জালেম, কাপুরুষ। নিজের বউ বাচ্চাদের নিয়ে ভীরুর মতো পালিয়ে এলে। বাপের রেখে যাওয়া কন্যা সন্তানের জান-মাল ও ইজ্জত শত্রুদের মাঝে ফেলে এলে? অথচ বোনের জীবন ও মান রক্ষার জন্য ভাইয়েরা জীবনও বাজি রাখে।'

আমি অসহায়ের মতো বোনকে শান্ত করার জন্য বললাম,

'আমার আদরের ছোট বোন, এমন করে কলিজায় ঘা দিয়ে আর বলো না। বিপদে পড়ে ভুল করে ফেলেছি। তুমি যেহেতু ভালোভাবে আমাদের কাছে পৌঁছে গেছ, এখন আর কোনো অভিযোগ নয়। একটু শান্ত হও।'

আমার এরকম বিভিন্ন কথা শুনে এক সময় সে শান্ত হলো। এবার সে তার সঙ্গে যা কিছু ঘটেছে তার বিশদ বিবরণ দিল। আমি দেখলাম কাহিনীটা হুবহু সেরকমই, যে রকম পূর্বে আমাদের কানে এসেছিল। আমি এ পর্যায়ে তাকে প্রশ্ন করলাম—সে ছিল অত্যন্ত বুদ্ধিমতি ও দৃঢ়সংকল্পের অধিকারিনী—

'লোকটির ব্যাপারে তোমার মনোভাব কী?'

আমার বোন উত্তরে বলল,

'আমি মনে করি খুব শিগগির তোমার উচিৎ তাঁর সঙ্গে যুক্ত হয়ে যাওয়া, কারণ তিনি নবী হলে অগ্রগামী ব্যক্তির হবে বিশেষ মর্যাদা...

আর যদি তিনি হন একজন বাদশামাত্র, তবুও তার কাছে তোমার অমর্যাদা হবে না। যেমন ছিলে তেমনই থাকবে তুমি।'

* * *

আদিই বলেন :

'আমি সফরের সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করে রওনা করলাম। চলতে চলতে এক সময় মাদীনায় রাসূলের খেদমতে উপস্থিত হলাম কোনো লিখিত অঙ্গিকার বা নিরাপত্তা চুক্তি ছাড়াই। কারণ, আমি শুনতে পেয়েছিলাম যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إِنِّيْ لَأَرْجُوْ أَنْ يَجْعَلَ اللهُ يَدَ عَدِيٍّ فِيْ يَدِيْ

'আমি আশা করি আল্লাহ তাআলা আদিইয়ের হাতকে আমার হাতে তুলে দেবেন।'

এর ফলে আমি নিশ্চিন্তে মসজিদের মধ্যে তাঁর সম্মুখে দাঁড়িয়ে সালাম দিলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন,

'কে তুমি? পরিচয় কী তোমার?'

আমি বললাম,

'আমি আদিই ইবনে হাতিম।' তিনি পরিচয় শুনে এগিয়ে এসে আমার হাত ধরলেন। আমাকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ির দিকে রওনা করলেন। আমাকে নিয়ে বাড়ির দিকে যেতে থাকলে হঠাৎ অতিবৃদ্ধ ও দুর্বল এক মহিলা—যার কোলে ছিল ছোট্ট এক শিশুবাচ্চা—নবীজীকে থামতে বললে তিনি থেমে গেলেন। মহিলা নিজ প্রয়োজনের কথা তাঁর কাছে তুলে ধরলে

তিনি শান্তভাবে সবকথা শুনলেন আমাকে পাশে রেখেই। তাদের দু'জনের প্রয়োজন মিটিয়ে দিলেন...

এ আচরণ দেখে আমি মনে মনে বললাম, সন্দেহ নেই যে ইনি নিছক একজন বাদশা নন। এরপর আবার তিনি আমার হাত ধরে হাঁটতে লাগলেন। হাঁটতে হাঁটতে আমরা তাঁর বাড়ি পৌঁছলাম। তিনি ঘাস-পাতা ও আঁশ ভরা একটি চামড়ার গদি আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন,

'এটার ওপর বসো।'

আমি তাঁর সম্মুখে একমাত্র গদিটাতে বসতে লজ্জা পেলাম সুতরাং আমি তাঁর কাছে আবেদন করে বললাম, বরং আপনিই বসুন। তিনি আবারও বললেন, তুমিই বসো। আমি তাঁর আদেশ মাথা পেতে নিয়ে বসে পড়লাম আর নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসলেন মাটিতে। কেননা, বসার জন্য ঐ একটি গদি ছাড়া তাঁর বাড়িতে আর কিছু ছিল না।

আমি মনে মনে বললাম, 'আল্লাহর কসম! এটা কোনো বাদশার আচরণ হতে পারে না।' এরপর তিনি আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন,

'হে আদিই ইবনে হাতিম! তুমি কি 'রুকূসিয়া' ধর্মের অনুসারী ছিলে না, যা খৃস্টধর্ম ও সাবেঈ ধর্মের মাঝামাঝি?'

উত্তরে আমি বললাম, 'হ্যাঁ।'

তখন তিনি বললেন,

'তুমি কি তোমার কওমের (যুদ্ধ ও লুটের সম্পদ থেকে) চারভাগের একভাগ গ্রহণ করতে না—যা ছিল তোমার ধর্মে নিষিদ্ধ?'

আমি অকপটে স্বীকার করে বললাম,

'হ্যাঁ।'

এর মাধ্যমে আমার মধ্যে এই উপলব্ধি জন্ম নিল যে তিনি নিঃসন্দেহে একজন প্রেরিত রাসূল, তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে জানতে পারেন এমন বিষয় যা সাধারণ মানুষের জানার কথা নয়।

তিনি বললেন,

'হে আদিই! নিশ্চই তুমি মুসলিমজাতির অভাব ও দারিদ্র দেখে এই দীন গ্রহণ করতে ভয় পাচ্ছ। যদি সেটাই হয়ে থাকে তাহলে তুমি শুনে নাও, আমি আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি, এমন একটি সময় খুব কাছে এসে গেছে যখন তাদের মাঝে ধন-ঐশ্বর্যের এত প্রাচুর্য হবে যে যাকাত ও সাদাকা নেওয়ার কোনো মানুষ খুঁজে পাওয়া যাবে না।

হে আদিই! মনে হচ্ছে তুমি ইসলামের অনুসারী মুসলিমজাতির সংখ্যা স্বল্পতা এবং বিরোধী ও শত্রুদের অগণিত সংখ্যা দেখে এই দীন ইসলাম গ্রহণে দ্বিধাবোধ করছ। যদি তাই হয় তাহলে মনে রেখো, আমি আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি, খুব শিগগির তুমি শুনতে পাবে সুদূর কাদেসিয়া থেকে উটের পিঠে চড়ে একাকিনী মহিলা আল্লাহর ঘর যিয়ারতে আসবে। একমাত্র আল্লাহর ভয় ছাড়া তার মনে অন্য কোনো ভীতি থাকবে না।

সম্ভবত তোমার ইসলাম গ্রহণের ক্ষেত্রে একটি প্রতিবন্ধকতা এটাও যে তুমি রাষ্ট্র ক্ষমতা ও বাদশাহী দেখতে পাচ্ছ অমুসলিমদের হাতে। আল্লাহর কসম! খুব শিগগির তুমি শুনবে এবং দেখবে যে এ অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। দেখবে ইরাকের বাবেল নগরীর সাদা মহলগুলো (রাজপ্রাসাদ) মুসলিমজাতির নিয়ন্ত্রণে এসে গেছে। পারস্যসম্রাট কিসরা ইবনে হুরমুজের ধনভাণ্ডার তাদেরই কবজায় এসে পড়েছে।'

আমি যেন আকাশ থেকে পড়লাম। অবাক বিস্ময়ে জানতে চাইলাম,

'কিসরা ইবনে হুরমুজের সব ধন-ভাণ্ডার?'

তিনি জবাব দিলেন,

'হ্যাঁ, কিসরা ইবনে হুরমুজের সব ধন-ভাণ্ডার।'

আদিই বলেন, 'তখন আমি কালিমা-ই শাহাদাত পড়ে ইসলাম গ্রহণ করে নিলাম।'

* * *

আদিই ইবনে হাতিম দীর্ঘজীবী হয়েছিলেন। তিনি বলতেন, 'প্রিয় নবীর দুইটি ভবিষ্যত বাণী তো দেখেই ফেলেছি। তৃতীয়টি দেখা বাদ রয়েছে। আল্লাহর কসম করে বলছি সেটাও ঘটবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আমি নিজের চোখে দেখেছি, সদূর কাদেসিয়া থেকে উটে চড়ে একাকিনী মহিলা নির্ভয়ে বাইতুল্লাহর উদ্দেশ্যে আসে...

আমি নিজে সেই সেনাদলের অগ্রভাগে থেকে অভিযানে শরিক হয়েছিলাম, যারা কিসরার ধনভাণ্ডার কবজা করেছিল। আমি আল্লাহর কসম করে বলছি, তৃতীয় ভবিষ্যত বাণীটিও ঘটবেই।'

আল্লাহ তাআলার ইচ্ছায় তাঁর প্রিয় নবীর ঘোষণার বাস্তবায়ন ঘটেছিল, তৃতীয় ঘোষণার বাস্তব রূপায়ন দেখা গেল পঞ্চম খলীফায়ে রাশেদ উমর ইবনে আবদুল আযীযের শাসনামলে। তাঁর আমলে ইসলামী সাম্রাজ্যে ধন-সম্পদের এত প্রাচুর্য দেখা দিল যে তিনি সরকারি লোক মারফত পথে পথে ঘোষণা করিয়েছেন, 'যাকাত গ্রহণকারী কে আছ?' কিন্তু একজন মানুষও খুঁজে পাওয়া যায়নি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বক্তব্যকে আল্লাহ সত্য প্রমাণ করেছেন। আদিই ইবনে হাতিমের কসমকেও আল্লাহ পূর্ণ করে দিয়েছেন।

তথ্যসূত্র :

১. *আল-ইসাবা*, ২য় খণ্ড, ৪৬৮ পৃষ্ঠা অথবা *আত্তারজামা*, ৫৪৭৫।
২. *আল-ইসতীআব*, ৩য় খণ্ড, ১৪০ পৃষ্ঠা।
৩. *তারীখুল ইসলাম লিয-যাহাবী*, ৩য় খণ্ড, ৪৬-৪৮ পৃষ্ঠা।
৪. *তাহযীবুত তাহযীব*, ৭ম খণ্ড, ১৬৬-১৬৭ পৃষ্ঠা।
৫. *আল-জামউ বাইনা রিজালিস সহীহাইন*, ১ম খণ্ড, ৩৯৮ পৃষ্ঠা।
৬. *খুলাসাতু তাযীবি তাযীবিল কামাল*, ২৬৩-২৬৪ পৃষ্ঠা।
৭. *তাজরীদু আসমাইস সাহাবা*, ১ম খণ্ড, ৪০৫ পৃষ্ঠা।
৮. *তাকরীরুত তাহযীব*, ২য় খণ্ড, ১৬ পৃষ্ঠা।
৯. *আল-ইবার*, ১ম খণ্ড, ৭৪ পৃষ্ঠা।
১০. *আত-তারীখুল কাবীর*, ১ম খণ্ড, ৪৩ পৃষ্ঠা।
১১. *উসদুল গাবাহ*, ৩য় খণ্ড, ৩৯২-৩৯৪ পৃষ্ঠা।
১২. *শাযারাতুয যাহাব*, ১ম খণ্ড, ৭৪ পৃষ্ঠা।
১৩. *আল-মাআরিফ*, ১৩৬ পৃষ্ঠা।
১৪. *আল-মুআম্মারূন*, ৪৬ পৃষ্ঠা।
১৫. *ইবনু কাসীর*, ৫ম খণ্ড, ৬৫ পৃষ্ঠা।
১৬. *ফাতহুল বারী*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৬১০ পৃষ্ঠা।
১৭. *দালাইলুন নুবুওওয়াহ*, ৪৭২ পৃষ্ঠা।

আবু যর আল-গিফারী

(জুনদুব ইবনে জুনাদাহ)

আসমানের নিচে জমিনের বুকে আবু যরের চেয়ে বেশি সত্যনিষ্ঠ আর কেউ নেই।

–মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ

'ওয়াদ্দান' উপত্যকা—যা বহির্জগতের সঙ্গে মক্কা নগরীর সংযোগ রক্ষাকারী একমাত্র আঁকা-বাঁকা পাহাড়ী পথ—সেখানেই দল বেঁধে বাস করতেন গিফার গোত্রের লোকজন।

গিফার গোত্রের জীবিকা নির্বাহের একমাত্র ব্যবস্থা ছিল সেই সামান্য দান-দক্ষিণা যা সিরিয়ায় যাওয়া-আসার পথে কুরাইশের ব্যবসা পরিচালনাকারী কাফেলাগুলো তাদের দিত।

আবার কখনো কখনো তারা কাফেলাগুলোর মাঝে ডাকাতি ও ছিনতাই করেও জরুরি জীবনোপকরণ সংগ্রহ করত—যখন কোনো কাফেলা ওদের চাহিদা পূরণ করতে অস্বীকৃতি জানাত।

'জুনদুব ইবনে জুনাদাহ' যার ডাক নাম আবু যর—তিনি ছিলেন এই গোত্রেরই একজন সদস্য কিন্তু তাদের সকলের মাঝে জ্ঞান, বুদ্ধি, সাহসিকতা ও বিচক্ষণতায় তিনি ছিলেন একেবারেই ভিন্ন। ছিলেন একদমই অনন্য।

এই কারণে নিজেদের হাতে গড়া দেব-দেবীর প্রতি তিনি ছিলেন ভীষণ বিরক্ত—কওমের লোকজন আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদের পূজা অর্চনা করত।

তিনি চরম ঘৃণা করতেন আবরজাতির অযৌক্তিক বিশ্বাস ও ভ্রান্ত ধর্মীয় মানসিকতাকে। তিনি বুকভরা কৌতূহল আর প্রত্যাশা নিয়ে তাকিয়ে ছিলেন একজন নতুন নবীর আগমন পথের দিকে—যিনি মানবজাতির জ্ঞান ও হৃদয় রাজ্যের শূন্যতাকে ভরাট করে দেবেন আর তাদের শিরকের অন্ধকার থেকে বের করে পৌঁছে দেবেন বিশ্বাসের আলোর পথে।

* * *

আবু যর তার গ্রামেই ছিলেন। সেখানেই তার কানে এল নতুন নবীর খবর যিনি মক্কায় আবির্ভূত হয়েছেন। এ সংবাদ শোনামাত্রই তিনি নিজ ভাই আনিসকে বললেন,

'ভাই আমার! তুমি মক্কায় যাও। সেখানে গিয়ে সেই মানুষটির তথ্য সংগ্রহ করবে—যিনি নিজেকে নবী দাবি করেন এবং বলেন যে, তাঁর কাছে আসমান থেকে ওহী আসে। তাঁর কিছু আসমানী বাণী মুখস্ত করে আমাকে এসে শোনাবে।'

আনিস মক্কায় চলে গেলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। তাঁর মুখে চমৎকার উপদেশমূলক জীবনমুখী নানা কথা শুনলেন। এরপর ফিরে এলেন নিজ গ্রামে। তখন আবু যর খুব কৌতূহল নিয়ে ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করলেন এবং ব্যাকুল হয়ে নতুন নবীর খবরা-খবর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন।

তিনি জবাবে বললেন,

'আল্লাহর কসম! তাঁর মাঝে আমি এমন এক মহান ব্যক্তিত্ব দেখতে পেয়েছি, যিনি উন্নত স্বভাব ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের শিক্ষা দেন। তিনি অত্যন্ত চমৎকার কথা বলেন, কিন্তু তা কবির কাব্যগাথা নয়।'

আবু যর আবার জানতে চাইলেন,

'তাঁর ব্যাপারে অন্য লোকেরা কী বলে?'

জবাব দিলেন,

'লোকেরা তাঁর সম্পর্কে বলে—তিনি যাদুকর, জ্যোতিষী ও কবি।'

আবু যর বললেন,

'নাহ, তুমি মোটেও আমার কৌতূহল মেটাতে পারলে না। এতদূর পথ গেলে-এলে কিন্তু যে প্রয়োজনে তোমাকে পাঠালাম তা পূরণ করতে পারলে না। তুমি কি কয়েকদিনের জন্য আমার পরিবার-পরিজনের দায়-দায়িত্ব নেবে? যেন আমি নিজে গিয়ে তাঁর ব্যাপারে কৌতূহল মেটাতে পারি?'

তিনি বললেন,

'ঠিক আছে, তুমি যাও। তবে মক্কার লোকদের ব্যাপারে তুমি সাবধানে থেক।'

* * *

আবু যর নিজের জন্য সফরের পাথেয় সংগ্রহ করলেন। নিজের সঙ্গে একটি ছোট্ট পাত্র ভরে পানি নিয়ে পরদিনই মক্কার উদ্দেশ্যে রওনা করলেন। উদ্দেশ্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্পর্কে ভালোভাবে খোঁজ-খবর নিয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করা।

* * *

আবু যর ভীষণ ভয়ে ভয়ে মক্কায় পৌঁছলেন। দেব-দেবীদের বিরুদ্ধে সমালোচনার কারণে মুহাম্মাদের প্রতি কুরাইশদের ক্ষোভের খবর এবং তাঁর যে কোনো অনুসারীর বিরুদ্ধে তাদের চরম নির্যাতনের সংবাদ তিনি পেয়েছিলেন।

এসব কারণে মক্কায় তিনি মুহাম্মাদের ব্যাপারে কাউকে জিজ্ঞাসা করতে ভয় পাচ্ছিলেন। কারণ, তিনি নিশ্চিত হতে পারছিলেন না যে যাকে জিজ্ঞাসা করব সে কি মুহাম্মাদের পক্ষের লোক নাকি শত্রুপক্ষের?

* * *

দিন পেরিয়ে যখন রাত নেমে এল তখন তিনি মসজিদের মধ্যে ঘুমানোর প্রস্তুতি নিতে শুরু করলেন। সে সময় আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু তার পাশ দিয়ে যেতে যেতে বুঝতে পারলেন, নিশ্চয় তিনি ভিনদেশী কোনো পথিক মুসাফির। সুতরাং তাকে বললেন, 'ভাই! চলুন না আমাদের মেহমান হিসাবে আমার বাড়িতে রাত কাটাবেন।' প্রস্তাবে রাজি হয়ে আবু যর চলে এলেন তাঁর সঙ্গে এবং সে রাতটি তাঁর বাড়িতেই কাটিয়ে দিলেন। সকাল হয়ে গেলে তিনি নিজের খাদ্য, পানি ও অন্যান্য সামান নিয়ে আবার মসজিদে ফিরে এলেন। অবাক কাণ্ড! তারা কেউই কাউকে কোনো প্রশ্ন করলেন না।

আবু যরের দ্বিতীয় দিনটিও এভাবেই কেটে গেল—রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে কিছুই না জেনে। দিন শেষে রাত ঘনিয়ে এলে মসজিদেই ঘুমানোর প্রস্তুতি নিতে শুরু করলেন। আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু তার পাশ দিয়ে যেতে যেতে চিন্তা করলেন,

আচ্ছা! ভিনদেশী এই মানুষটি কি আজও তার গন্তব্য খুঁজে পেল না?

এরপর তিনি লোকটিকে আজও সঙ্গে নিয়ে গেলেন। লোকটি দ্বিতীয় রাতও তার বাড়িতে কাটাল কিন্তু মেহমান ও মেজবান কেউ কাউকে কিছুই জিজ্ঞাসা করল না।

তৃতীয় দিনও রাতে একই ঘটনার পর আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু মেহমানকে বললেন,

'আপনি কী উদ্দেশ্য নিয়ে মক্কায় এসেছেন, সেটা কি আমাকে বলবেন না?'

আবু যর জবাব দিলেন,

'আমার আকাঙ্ক্ষা পূরণে সহযোগিতা করবে—এই ওয়াদা যদি করতে পারো তাহলে তোমাকে বলব।'

আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু তার উদ্দেশ্য পূরণে সহযোগিতা করার ওয়াদা করলেন। তখন আবু যর বললেন,

'আমি বহু পথ পারি দিয়ে মক্কায় এসেছি নতুন নবীর সাক্ষাৎ লাভের উদ্দেশ্যে এবং তাঁর প্রতি অবতীর্ণ ওহীর বাণী শোনার আকাঙ্ক্ষায়।'

একথা শুনে আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর চোখে-মুখে আনন্দ ও খুশির ঝিলিক খেলে গেল। তিনি বললেন,

'আল্লাহর কসম! তিনি একজন সত্য নবী তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

সকাল হলে আমরা একসঙ্গে বের হব। আমি যেখানেই যাব তুমি আমার পিছে পিছে আসবে। তোমার জন্য আশঙ্কাজনক কোনো কিছু আমার চোখে পড়লে আমি একটু থেমে যাব থুথু ফেলানো ও নাক ঝাড়ার মতো করে। আবার হাঁটা শুরু করলে তুমি আমার অনুসরণ করবে। আমি যেখানে ঢুকব তুমিও সেখানে ঢুকে পড়বে।'

অপেক্ষার সেই দীর্ঘ রাত আবু যরকে বিছানায় স্থির হতে দিল না। নবীজীকে দেখা এবং ওহীর বাণী শোনার জন্য ব্যাকুল হয়ে তিনি সারারাত ছটফট করতে থাকলেন।

প্রভাতে আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু মেহমানকে নিয়ে নবীগৃহের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। আবু যর এক মনে শুধু তাঁকে অনুসরণ করে তাঁর পিছে পিছে হাঁটতে লাগলেন। এক সময় তাঁরা নবীজীর সম্মুখে হাজির হলেন। আবু যর আবেগভরা কণ্ঠে বললেন,

'আস্‌সালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ!'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিলেন, 'ওয়া আলাইকা সালামুল্লাহি ওয়া রহমাতুহু ওয়া বারাকাতুহু।'

আবু যর ছিলেন রাসূলকে সর্বপ্রথম ইসলামী পদ্ধতির সালাম দানকারী। পরবর্তীতে সেই পদ্ধতিই ব্যাপক প্রচার ও প্রসার লাভ করে।

* * *

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু যরের দিকে মনোযোগ দিলেন। তাকে ইসলামের পথে আহ্বান জানালেন, কুরআন শোনালেন। স্থানত্যাগ করার পূর্বেই আবু যর অবিলম্বে ইসলামের কালিমা পড়ে নতুন ধর্মে প্রবেশ করলেন। তিনিই হলেন ইসলাম গ্রহণকারী চতুর্থ অথবা পঞ্চম ব্যক্তি।

এবার নিজের জীবনের পরবর্তী কাহিনী শোনানোর দায়িত্ব ছেড়ে দিচ্ছি খোদ আবু যরের ওপর। তিনি শুরু করলেন এভাবে,

'এরপর আমি মক্কাতে রাসূলের নিকট অবস্থান করতে থাকলাম আর তিনিও এই অবসরে আমাকে ইসলামের শিক্ষা দিতে থাকলেন। আমাকে তিনি কিছুটা কুরআন পড়াও শেখালেন। তারপর বললেন,

لَاتُخْبِرْ بِإِسْلَامِكَ أَحَدًا فِيْ مَكَّةَ، فَإِنِّيْ أَخَافُ عَلَيْكَ أَنْ يَقْتُلُوْكَ...

'মক্কায় কারোর কাছেই তোমার ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ করো না। আমার আশঙ্কা হচ্ছে, এটা জানতে পারলে ওরা তোমাকে খুন করে ফেলবে।'

আমি তখন দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে বললাম, 'শপথ সেই মহাশক্তিধর আল্লাহর! যাঁর নিয়ন্ত্রণে রয়েছে আমার জীবন। আমি মসজিদুল হারামে গিয়ে যতক্ষণ কুরাইশী দলবলের সম্মুখে সত্য ধর্ম ইসলামের প্রকাশ্য প্রচার না করতে পারব ততক্ষণ মক্কা ছেড়ে যাব না।' একথা শুনে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নীরব হয়ে রইলেন, কিছুই বললেন না।

কুরাইশের লোকেরা যখন দল বেঁধে মসজিদুল হারামের মধ্যে বসে গল্পে মেতেছিল, সেই মুহূর্তে আমি গিয়ে তাদের মাঝখানে দাঁড়ালাম এবং

আমার শরীরের সর্বশক্তি ব্যয় করে চিৎকার করে ডাক দিলাম, 'ওহে কুরাইশের লোকেরা! আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি যে আল্লাহ ছাড়া ইবাদতের উপযুক্ত কোনো মাবুদ নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল।'

আমার কথা তাদের কানে যেতে না যেতেই তারা ভয়ে আঁতকে উঠল। তারা বসা থেকে এমনভাবে নড়ে উঠল যেন কোনো দুঃস্বপ্ন দেখে আতঙ্কে ঘুম ভেঙ্গেছে। তারা হৈ চৈ করে বলে উঠল, ধর...ধর... এই বেটা ধর্মত্যাগীকে ধর।' একসঙ্গে সকলে ছুটে এসে আমাকে মারতে মারতে আধমরা করে ফেলল। মনে হলো যে, আমার বেঁচে থাকাই কঠিন। সেই মরণাপন্ন অবস্থায় আমাকে দেখতে পেলেন নবীজীর চাচা আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব। তাদের হাত থেকে আমাকে বাঁচানোর জন্য তিনি ঝুঁকে আমাকে ভালোভাবে দেখার পর তাদের শাসিয়ে বললেন,

'তোমরা নিজেদের এমন সর্বনাশ করতে যাচ্ছ! গিফার গোত্রের একজন লোককে এভাবে মেরে ফেলতে চাচ্ছ অথচ তোমাদের সকল বাণিজ্য কাফেলার যাওয়া-আসা করতে হয় তাদের চোখের সামনে দিয়ে?!...' এই ধমকে তারা আমাকে ছেড়ে দিয়ে সেখান থেকে কেটে পড়ল।

জ্ঞান ফিরে পাওয়ার পর আমি রাসূলের কাছে ফিরে এলাম। আমার দুরবস্থা দেখে তিনি বললেন,

'আমি তো আগেই বলেছিলাম, ইসলাম গ্রহণের কথা কারোর কাছে প্রকাশ কোরো না।'

আমি বিনীত ভাবে বললাম,
'ইয়া রাসূলাল্লাহ! গোপনে ইসলাম গ্রহণের পর জন সম্মুখে তা প্রচার করার এক প্রবল ভাবাবেগ জেগে উঠল আমার অন্তরে। যাকে আমি দমাতে পারলাম না কোনোভাবেই।'

তিনি বললেন,

'যাই হোক, এবার তুমি নিজের কওমের মাঝে ফিরে যাও। এখানে আমার পাশে থেকে যা দেখলে-শুনলে এবং বুঝলে সেগুলো তাদের মাঝে প্রচার করো। তাদের আল্লাহর পথে আহ্বান করো, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তোমার দ্বারা তাদের কল্যাণ করবেন এবং তাদের সকল নেক কাজের সাওয়াব তোমাকেও দেবেন। পরবর্তীতে যখন শুনতে পাবে আমি বিজয়ী হয়েছি, তখন তুমি আমার নিকট চলে এসো।'

আবু যর বলেন :

'আমি সেখান থেকে রওনা করে আমার কওমের মাঝে ফিরে এলাম। প্রথমে আমার ভাই আনিস জিজ্ঞাসা করল,

'ভাই! তুমি কী করেছ?'

আমি তাকে বললাম,

'বেশি কিছু না, শুধু ইসলাম কবুল করেছি। নবীকে সত্য বলে স্বীকার করে নিয়েছি।'

আর একটুও বিলম্ব হলো না আল্লাহ তার হৃদয়ের দুয়ার হিদায়াতের জন্য খুলে দিলেন। সে বলে উঠল,

'তোমার দীনের ব্যাপারে আমার কোনো আপত্তি নেই, সুতরাং আমিও ইসলাম কবুল করলাম এবং নবীজীকে সত্য বলে মেনে নিলাম।'

এবার আমরা দু'জনে মিলে মায়ের কাছে গিয়ে তাকেও ইসলাম গ্রহণের আহ্বান করলাম। আমাদের কথা শুনে তিনি বললেন,

'তোমাদের দু'জনের দীনের ব্যাপারে আমার কোনো অনাগ্রহ নেই।' একথা বলে তিনিও ইসলাম গ্রহণ করলেন।

সেই দিন থেকে অবিরাম ও অক্লান্তভাবে এই মুমিন পরিবার গিফার গোত্রের লোকজনকে আল্লাহর পথে আহ্বান জানাতে থাকল। আহ্বানের ফলে তাদের মাঝে বহু মানুষ ইসলাম গ্রহণ করে নামায আদায় করতে লাগলেন।

তাদের ভেতরের কিছু সংখ্যক মানুষ বলল, 'আমরা এখনই ইসলাম গ্রহণ করব না বরং রাসূল যখন মদীনায় আসবেন আমরা তখনই তাঁর কাছে গিয়ে ইসলাম গ্রহণ করব।'

তারা তাদের কথা রেখেছিল। রাসূল মদীনায় আগমন করলে তারা সকলে মিলে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। নবীজী খুশি হয়ে বলেছিলেন,

'গিফার গোত্রকে আল্লাহ মাগফিরাত দান করুন আর আসলাম গোত্রকে সালামতে (নিরাপদে) রাখুন।'

* * *

আবু যর রাযিয়াল্লাহু আনহু নিজ গ্রামেই থেকে গেলেন। এরই মধ্যে বদর, ওহুদ ও খন্দকের মতো ঐতিহাসিক জিহাদের ঘটনাগুলো পার হয়ে গেল। এরপর তিনি মদীনায় এসে নিজের জীবনকে তুলে দিলেন প্রিয় নবীর হাতে। তাঁর কাছে তাঁর খেদমতে নিয়োজিত থাকার অনুমতি চাইলে তিনি তাকে অনুমতি প্রদান করলেন। তিনি হয়ে গেলেন তাঁর সোহবত ও খেদমতের বিরল সুখ ও সৌভাগ্যের অধিকারী।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বদা তাকে গুরুত্ব দিতেন, মর্যাদাপূর্ণ আচরণ করতেন। এজন্যই যতবার তার সঙ্গে দেখা হতো ততবারই তিনি হাসি মুখে তার সঙ্গে মুসাফাহা করতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যখন ওফাত হয়ে গেল আবু যর রাযিয়াল্লাহু আনহুর পক্ষে মদীনা মুনাওয়ারায় অবস্থান করা সম্ভব হলো না। নবী ছাড়া এবং নবীজীর মুবারক মজলিস ছাড়া সোনার মদীনার শূন্যতার বেদনা তিনি কিছুতেই সহ্য করতে পারলেন না। ফলে তিনি সিরিয়ার গ্রামাঞ্চলে চলে গেলেন এবং প্রথম খলীফা ও দ্বিতীয় খলীফার শাসন আমল সেখানেই কাটিয়ে দিলেন।

* * *

তৃতীয় খলীফা উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহুর শাসনামলে একবার তিনি দামেস্ক নগরীতে এলেন। সেখানে মুসলিমদের দুনিয়ার প্রতি ঝোঁক এবং সুখ-সম্ভোগে তাদের মগ্নতা দেখে তিনি বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে পড়লেন এবং জনসাধারণের বিরুদ্ধে তিনি তীব্র প্রতিবাদী ও বিদ্রোহী হয়ে উঠলেন। খলীফা উসমান ইবনে আফফান বিশৃঙ্খলার আশঙ্কায় তাঁকে মদীনায় ডেকে পাঠালেন। তিনি অবিলম্বে খলীফার ডাকে সাড়া দিয়ে মদীনায় হাজির হলেন। কিন্তু এখানে এসেও অল্প সময়ের মধ্যেই দুনিয়ার সম্পদ সঞ্চয় ও সম্ভোগের প্রতি মানুষের মোহ ও মায়া দেখে তিনি বিতৃষ্ণায় কঠোর ও তীব্র ভাষায় প্রতিবাদ করতে থাকলেন। যার ফলে মানুষ তাঁর ব্যাপারে বিরক্ত হয়ে পড়ে। খলীফা উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে মদীনার এক জনশূন্য নিঝুম পল্লী রাবযায় গিয়ে বাস করার নির্দেশ দেন। তিনি সেখানেই চলে যান এবং মানুষের সংশ্রব থেকে দূরে একাকী জীবন কাটাতে থাকেন। মানুষের হস্তগত দুনিয়ার মাল-আসবাবের ব্যাপারে নির্মোহ ও নিরাসক্ত হয়ে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর প্রথম দুই খলীফার আদর্শ অর্থাৎ দুনিয়ার ওপর আখেরাতকে প্রাধান্য দেওয়ার নীতিকে আঁকড়ে ধরে এখানেই কাটিয়ে দিলেন নিজের জীবন।

* * *

একবার কোনো এক ব্যক্তি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এল। তাঁর ঘরে ঢুকে লোকটি বারবার এদিক সেদিক তাকাতে লাগল। ঘরের মধ্যে কোনো রকমের কোনো আসবাব দেখতে না পেয়ে সে জিজ্ঞাসা করে বসল,

‘হে আবু যর! আপনার ঘরের আসবাবপত্র কোথায় রেখেছেন?’

তিনি উত্তর দিলেন,

‘ওপারে (আখেরাতে) আমাদের একটি বাড়ি আছে, আমাদের ভালো ভালো আসবাব সব সেখানে পাঠিয়ে দেই।’

লোকটি তার কথার মর্ম বুঝে আবার বললেন,
'কিন্তু যতদিন আপনি এই বাড়িতে (দুনিয়ায়) থাকবেন, ততদিন এখানের কিছু আসবাবও তো জরুরি।'

তিনি জবাব দিলেন,
'কিন্তু বাড়ির মালিক তো এখানে থাকতেই দেবেন না। আসবাব দিয়ে কী হবে?'

* * *

সিরিয়ার গভর্নর তার জন্য তিনশো দিনার পাঠিয়ে বলে দিলেন,
'এই মুদ্রাগুলো আপনার প্রয়োজনে খরচ করবেন।'

তিনি সেগুলো গ্রহণ করলেন না। ফেরৎ দিয়ে বললেন,
'সিরিয়ার গভর্নর কি আমার চেয়ে তুচ্ছ ও অপদস্থ কোনো আল্লাহর বান্দা খুঁজে পেলেন না...?'

* * *

হিজরী বত্রিশ সালে এই নিরাসক্ত, নির্মোহ ইবাদতগুজার সাহাবীকে আল্লাহ তাআলা ওফাত দান করলেন—যাঁর ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মন্তব্য করেছিলেন,

مَا أَقَلَّتِ الْغَبْرَاءُ وَلَا أَظَلَّتِ الْخَضْرَاءُ مِنْ رَجُلٍ أَصْدَقَ مِنْ أَبِيْ ذَرٍّ

'আসমানের নিচে জমিনের ওপর আবু যরের চেয়ে বেশি সত্যনিষ্ঠ মানুষ আর নেই।'

তথ্যসূত্র :

১. *আল-ইসাবা*, ৪র্থ খণ্ড, ৬২ পৃষ্ঠা অথবা *আত্তারজামা*, ৩৮৪।
২. *আল-ইসতীআব*, ৪র্থ খণ্ড, ৬১ পৃষ্ঠা।
৩. *তাহযীবুত তাহযীব*, ২য় খণ্ড, ৪২০ পৃষ্ঠা।
৪. *তাজরীদুস সাহাবা*, ২য় খণ্ড, ১৭৫ পৃষ্ঠা।
৫. *তাযকিরাতুল হুফ্ফায*, ১ম খণ্ড, ১৫-১৬ পৃষ্ঠা।
৬. *হুলইয়াতুল আউলিয়া*, ১ম খণ্ড, ১৫৬-১৭০ পৃষ্ঠা।
৭. *সিফাতুস সফওয়াহ*, ১ম খণ্ড, ২৩৮-২৪৫ পৃষ্ঠা।
৮. *তাবাকাতুশ্ শাআরানী*, ৩২ পৃষ্ঠা।
৯. *আল-মাআরিফ*, ১১০-১১১ পৃষ্ঠা।
১০. *শাযারাতুয যাহাব*, ১ম খণ্ড, ৩৯ পৃষ্ঠা।
১১. *আল-ইবার*, ১ম খণ্ড, ৩৩ পৃষ্ঠা।
১২. *যুআমাউন ইসলাম*, ১৬৭-১৭৩ পৃষ্ঠা।

আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম

একজন জন্মান্ধ মানুষ ছিলেন তিনি, যাকে কেন্দ্র করে আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজীদে ধারাবাহিকভাবে ষোলটি আয়াত নাজিল করেছেন। আজ পর্যন্ত যেগুলোর তেলাওয়াত চলছে এবং ততদিন পর্যন্তই চলতে থাকবে যতদিন এই পৃথিবীতে দিন ও রাতের বিবর্তন চলবে।

—তাফসীর বিশারদগণের উক্তি

কে এই ব্যক্তি যার কারণে সাত আসমানের ওপর থেকে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কঠোর ও বেদনাদায়ক ভাষায় সাবধান করা হয়েছিল?!

কে সেই ব্যক্তি জিবরীল আমীন যার ঘটনা সম্বলিত ওহী আল্লাহর নির্দেশে মহান নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্তরে নাজিল করেছিলেন?!

তিনিই তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুআয্যিন আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম রাযিয়াল্লাহু আনহু।

* * *

মক্কা নগরীর কুরাইশ বংশে জন্ম নেওয়া আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম আবদ্ধ ছিলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে

ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার গভীর বন্ধনে। তিনি ছিলেন উম্মুল মুমিনীন খাদীজা বিনতে খুওয়াইলিদের মামাতো ভাই।

তার পিতার নাম কায়েস ইবনে যায়েদা আর মায়ের নাম ছিল আতিকা বিনতে আবদুল্লাহ। কিন্তু তার মাকে সকলে ডাকত উম্মে মাকতূম (অন্ধ সন্তানের মা) বলে। কারণ, তিনি এই ছেলেকে জন্মান্ধ হিসাবে প্রসব করেছিলেন। (এ কারণেই তিনি অন্ধপুত্র-মায়ের ছেলে আবদুল্লাহ অর্থাৎ আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম।)

* * *

আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম রাযিয়াল্লাহু আনহু মক্কায় ইসলামের আলো ছড়ানোর মুহূর্তে হাজির ছিলেন। ফলে তার হৃদয়কে আল্লাহ তাআলা ঈমান কবুলের জন্য খুলে দিলেন। ইসলাম গ্রহণে যারা সর্বাগ্রে তিনি ছিলেন সেই সৌভাগ্যবানদের মাঝে অন্যতম।

আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম রাযিয়াল্লাহু আনহু মক্কায় ইসলামের সূচনাকালে মুসলিমদের বিরুদ্ধে পরিচালিত সকল প্রকার জুলুম ও অত্যাচারের মুখোমুখি হয়েছেন আর প্রদর্শন করেছেন সুদৃঢ় মনোবল, আত্মত্যাগ ও অবিচলতার সর্বোত্তম পরাকাষ্ঠা।

কুরাইশের সকল নির্যাতন মুখ বুজে সহ্য করেছেন, যেমন করেছেন সে সময়ের অন্যান্য সাহাবীরাও। বরদাশত করেছেন তাদের নির্মমতা ও কঠোরতা, যেমন করেছেন অপরাপর সাহাবীগণও। কিন্তু তাঁর সুদৃঢ় মনোবল কখনোই কম্পিত হয়নি, তাঁর সাহসে চিড় ধরেনি, তাঁর ঈমান ও বিশ্বাসে কখনোই দুর্বলতার ছোঁয়া লাগেনি...

বরং ঐ সকল নির্যাতনের ফলে তিনি আরও বেশি করে আল্লাহর দীনকে আঁকড়ে ধরেছেন, কুরআনের সঙ্গে আরও গভীর সম্পর্ক গড়ে তুলেছেন, ইসলামী শরীয়তের আরও গভীর জ্ঞানার্জনে তৎপর হয়েছেন, প্রিয় নবীর প্রতি মুহাব্বত-ভালোবাসা এবং তাঁর দরবারে উপস্থিতি আরও বাড়িয়ে দিয়েছেন।

প্রিয় নবীর প্রতি এবং হিফ্‌যে কুরআনের প্রতি তাঁর ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও ঝোঁক এমন পর্যায়ে উপনীত হয়েছিল যে তিনি সামান্য সুযোগকেও হাতছাড়া হতে দিতেন না। বিন্দুমাত্র অবকাশ পেলেই তিনি ছুটে চলে আসতেন নবীজীর দরবারে কুরআনের শিক্ষা নিতে।

এ ব্যাপারে তাঁর সীমাহীন ব্যাকুলতা কখনো কখনো তাঁকে এতটাই প্ররোচিত করে তুলত যে, তাঁর জন্য প্রিয় নবীর বরাদ্দ সময় নেওয়ার পর অন্যদের সময় নেওয়ারও চেষ্টা চালাতেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসলামের একেবারে সূচনার দিনগুলোতে কুরাইশী নেতৃবৃন্দের ব্যাপারে খুব বেশি তৎপর হয়ে উঠেছিলেন। তাদের ইসলাম কবুল করানোর জন্য যারপরনাই অস্থির হয়ে পড়েছিলেন। সেই প্রচেষ্টারই ধারাবাহিকতায় একবার তিনি উতবা ইবনে রাবীআ, তার ভাই শাইবা ইবনে রাবীআ, আমর ইবনে হিশাম অর্থাৎ আবু জাহল, উমাইয়া ইবনে খাল্‌ফ এবং খালিদ ইবনুল ওয়ালীদের পিতা ওয়ালীদ ইবনুল মুগীরা প্রমুখ কুরাইশী নেতাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চালাচ্ছিলেন। তিনি তাদের ইসলামের পক্ষে টানার জন্য তাদের সামনে ইসলামের সৌন্দর্য উপস্থাপন করছিলেন। তাঁর আশা ছিল যে তারা হয়তো তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে ইসলাম কবুল করবে অথবা কমপক্ষে সাহাবীদের প্রতি নির্যাতন থেকে বিরত থাকবে।

* * *

এমন সময় সেখানে, নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলাপচারিতার মাঝখানে নবীজীর কাছে কুরআন শেখার জন্য হাজির হলেন আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম রাযিয়াল্লাহু আনহু। এসেই তিনি প্রিয় নবীর কাছে আকুতি জানিয়ে বললেন,

'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ আপনাকে যা শিখিয়েছেন তা থেকে দয়া করে আমাকে কিছু শিখিয়ে দিন।'

এতে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা বিরক্তিতে মলিন হয়ে গেল। তিনি তাকে উপেক্ষা করে কুরাইশী নেতাদের প্রতি

মনোযোগ প্রদর্শন করলেন। কারণ, এই নেতারা ইসলাম কবুল করলে তাদের মাধ্যমে আল্লাহর দীন শক্তিশালী হবে। দীনের কাজ সহজ হবে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা শেষ করার পরপরই তাঁর ওপর ওহী নাজিলের আলামত ফুটে উঠল। তিনি অনুভব করলেন, যেন দৃষ্টিশক্তি ঝাপসা হয়ে গেল এবং মাথার মধ্যে আঘাতপ্রাপ্ত হলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁর ওপর অবতীর্ণ হলো সূরা 'আবাসা'র নিম্নবর্ণিত ষোলটি আয়াত :

عَبَسَ وَتَوَلّٰٓی ﴿۱﴾ اَنْ جَآءَهُ الْاَعْمٰی ﴿۲﴾ وَمَا یُدْرِیْکَ لَعَلَّهٗ یَزَّکّٰٓی ﴿۳﴾ اَوْ یَذَّکَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّکْرٰی ﴿۴﴾ اَمَّا مَنِ اسْتَغْنٰی ﴿۵﴾ فَاَنْتَ لَهٗ تَصَدّٰی ﴿۶﴾ وَمَا عَلَیْکَ اَلَّا یَزَّکّٰی ﴿۷﴾ وَاَمَّا مَنْ جَآءَکَ یَسْعٰی ﴿۸﴾ وَهُوَ یَخْشٰی ﴿۹﴾ فَاَنْتَ عَنْهُ تَلَهّٰی ﴿۱۰﴾ کَلَّآ اِنَّهَا تَذْکِرَةٌ ﴿۱۱﴾ فَمَنْ شَآءَ ذَکَرَهٗ ﴿۱۲﴾ فِیْ صُحُفٍ مُّکَرَّمَةٍ ﴿۱۳﴾ مَّرْفُوْعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ ﴿۱۴﴾ بِاَیْدِیْ سَفَرَةٍ ﴿۱۵﴾ کِرَامٍ بَرَرَةٍ ﴿۱۶﴾

'তিনি (নবীজী) ভ্রুকুঞ্চিত করলেন এবং মুখ ফিরিয়ে নিলেন। এ কারণে যে অন্ধলোকটি তার নিকট এল। আপনি কি জানেন হয়তো সে পরিশুদ্ধ হতো অথবা উপদেশ গ্রহণ করত আর সে উপদেশ তার কল্যাণ করত অথচ যে বেপরোয়া—আপনি তার চিন্তায় মশগুল। সে পরিশুদ্ধ না হলে আপনার কোনো দোষ নেই। আর আপনার কাছে যে ছুটে এল ভীত-সন্ত্রস্ত হৃদয়ে—আপনি তাকে অবজ্ঞা করলেন। কখনো এরূপ করবেন না। নিশ্চয় এটা উপদেশ বাণী। অতএব যে ইচ্ছা করবে সে উপদেশ গ্রহণ করবে। এটা লিপিবদ্ধ রয়েছে সম্মানিত, উঁচু পবিত্র পত্রসমূহে। লিপিকারের হাতে। যারা মহৎ ও পূত পবিত্র।' –আবাসা ১-১৬

আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম রাযিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে উক্ত ষোলটি আয়াত জিবরীল আমীন প্রিয় নবীর ওপর নাজিল করলেন। সেই মুহূর্ত থেকে আজ পর্যন্ত আয়াতগুলোর তেলাওয়াত চলছে এবং কেয়ামত পর্যন্ত চলতেই থাকবে।

সেইদিন থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বিশেষভাবে অভ্যর্থনা জানাতেন যখনই তিনি নবীজীর দরবারে আসতেন। তাঁকে নিজের কাছে নিয়ে বসাতেন যখনই তিনি নবীজীর কোনো মজলিসে হাজির হতেন।

এতে বিস্মিত হওয়ার কিছুই নেই। কারণ, এই সাহাবীর প্রতি একটু বিরক্তির কারণে কি নবীজীকে সাত আসমানের ওপর থেকে কঠোর ভাষায় সাবধান করা হয়নি?!

* * *

কুরাইশের লোকজন যখন প্রিয় নবী এবং তাঁর ঈমানদার সঙ্গীদের বিরুদ্ধে নির্যাতনের মাত্রা তীব্র থেকে তীব্রতর করে তুলল, আল্লাহ তাআলা মুসলিমদের হিজরতের অনুমতি প্রদান করলেন। আল্লাহর অনুমতি পাওয়ার পর দীন ও ঈমান রক্ষার উদ্দেশ্যে জন্মভূমি ত্যাগ করতে সর্বাগ্রে এগিয়ে এলেন আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম রাযিয়াল্লাহু আনহু। সর্বপ্রথম তিনি এবং মুসআব ইবনে উমায়ের রাযিয়াল্লাহু আনহুমাই হলেন মদীনায় হিজরতকারী সাহাবী।

তারা দু'জন মদীনায় গিয়েই মানুষের কাছে ঘুরে ঘুরে কুরআনের শিক্ষা দিতে শুরু করলেন। শুরু করে দিলেন আল্লাহর দীন ইসলামের আদর্শ প্রচার করতে।

* * *

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হিজরত করে মদীনায় এলেন, তখন তিনি আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম এবং বিলাল ইবনে রাবাহকে মুসলিমজাতির সর্বপ্রথম মুআযযিন হিসাবে ঘোষণা করলেন। প্রতিদিন পাঁচবার তারা তাওহীদের কালিমা প্রচার করতেন। তারা মানুষকে সর্বশ্রেষ্ঠ আমল নামাযের দিকে আহ্বান করতেন এবং তাদেরকে কল্যাণ ও সফলতার প্রতি উদ্বুদ্ধ করতেন।

বেলাল রাযিয়াল্লাহু আনহু যদি আযান দিতেন, তাহলে আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম রাযিয়াল্লাহু আনহু একামত দিতেন। আবার

কখনো ইবনে উম্মে মাকতূম আযান দিতেন আর বেলাল নামাযের একামত দিতেন।

রমযান মাসে তাদের দু'জনের অবস্থা হতো অন্যরকম। একজন আযান দিলে মানুষ জেগে উঠতেন এবং রোযার প্রস্তুতি—সাহরী খাওয়া, পানি পান ইত্যাদি কাজে মশগুল হয়ে যেতেন। দ্বিতীয় আযান শোনার সঙ্গে সঙ্গে তারা খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করে দিতেন।

বেলাল রাযিয়াল্লাহু আনহু আযান দিতেন গভীর রাতে। তাঁর আযানের অর্থ হতো ঘুম থেকে জেগে উঠার সময় আর ইবনে উম্মে মাকতূম আযান দেওয়ার জন্যে অপেক্ষা করতেন সুবহে সাদিকের। এ ব্যাপারে তিনি কখনো ভুল করতেন না। কেননা, তার আযানের দ্বারা ফজরের নামাযের আহ্বান এবং সাহরীর সময় শেষ হওয়ার ঘোষণাও বুঝে নেওয়া হতো।

ইবনে উম্মে মাকতূমের প্রতি প্রিয় নবীর বিশেষ মর্যাদা প্রদানের প্রকৃষ্ট উদাহরণ এটাই যে, নিজের অনুপস্থিতির সময় দশবারেরও বেশি তাকে নিজের প্রতিনিধি বানিয়ে মদীনাতে রেখে গিয়েছেন, এমনকি মক্কা বিজয়ের উদ্দেশ্যে যখন তিনি মদীনা থেকে বেরিয়ে ছিলেন তখনো তাকেই নিজের জায়গায় রেখে গিয়েছিলেন।

* * *

বদর যুদ্ধের পর আল্লাহ তাআলা মুজাহিদদের উঁচু মর্যাদা সম্পর্কে কিছু আয়াত নাজিল করলেন। সেই আয়াতগুলিতে জিহাদে অংশ না নেওয়া ব্যক্তিদের ওপর অংশগ্রহণকারীদের শ্রেষ্ঠত্বের বর্ণনা দান করা হয়। যেন জিহাদে অংশগ্রহণকারীরা জিহাদে আরও বেশি তৎপর ও উদ্যামী হয় এবং অংশ না নেওয়া লোকেরা নিজেদের এই নিষ্ক্রীয়তাকে পরিহার করে। এ বিষয়টি ইবনে উম্মে মাকতূমের হৃদয়ে গভীর রেখাপাত করে এবং জিহাদের এই ফজিলত থেকে মাহরূম থাকা তার জন্য খুব কষ্টকর ও বেদনাদায়ক হয়ে ওঠে। তাই তিনি রাসূলের কাছে ছুটে গিয়ে বলেন,

'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি প্রতিবন্ধী না হলে তো অবশ্যই জিহাদ করতাম, জিহাদ থেকে কখনোই দূরে থাকতাম না।'

এরপর তিনি কাতর কণ্ঠে আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করলেন, যেন শারীরিক ত্রুটির কারণে জিহাদে অক্ষম ব্যক্তিদের ব্যাপারে কুরআনে সুস্পষ্ট বিধান নাজিল করেন। চোখের পানি ফেলে তিনি দুআ করতে থাকলেন,

اَللّٰهُمَّ أَنْزِلْ عُذْرِىْ... اَللّٰهُمَّ أَنْزِلْ عُذْرِىْ...

'হে আল্লাহ! আমার অপারগতা ক্ষমা করে কোনো আয়াত নাজিল করো। হে আল্লাহ! আমার অপারগতা ক্ষমা করে কোনো বিধান দান করো।'

সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ তার দুআ কবুল করে নিলেন।

* * *

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওহী লিখক সাহাবী যায়েদ ইবনে সাবিত রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন,

'আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাশে বসা ছিলাম। হঠাৎ তাঁকে সাকীনা (আসমানী প্রশান্তি—যা ছিল ওহী নাজিল হওয়ার লক্ষণ) ঢেঁকে নিল। আমার উরুতে হঠাৎ তাঁর উরুর চাপ পড়ল আর তাতে আমার মনে হলো জীবনে রাসূলের উরুর চেয়ে ভারী আর কোনো চাপ আমার উরুতে পড়েনি। এরপর যখন তিনি ওহীর তীব্রভার ও চাপমুক্ত হলেন, আমাকে বললেন, হে যায়েদ! লেখো... আমি তখন লিখে নিলাম,

لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ...

'মুমিনদের মধ্যে থেকে যারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে আর যারা জিহাদ না করে বসে থাকে তারা সমান হতে পারে না।' –সূরা নিসা : ৯৫

ইবনে উম্মে মাকতূম দাঁড়িয়ে বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! যারা অপারগতার কারণে জিহাদে অংশ নিতে পারে না, তাদের ব্যাপারে কী হবে? তারাও কি জিহাদ না করে বসে থাকা মুমিন হিসাবে গণ্য হবে?'

তাঁর কথা শেষ হতে না হতেই রাসূলের ওপর ওহী আসার আভাস পাওয়া গেল, তাঁর উরু মুবারকের চাপ আমার উরুর ওপর পড়তেই প্রথম বারের মতো সেই ভয়াবহ চাপ ও ভার অনুভব করলাম। এই ভার ও চাপ কেটে গেলে তিনি আমাকে বললেন, 'হে যায়েদ! পড়ে শোনাও যেটা লিখেছ।'

আমি শুরু করলাম পড়া,

لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

'মুমিনদের মধ্য থেকে যারা জিহাদ না করে বসে থাকে তারা'

তিনি বললেন এখানে যোগ করে দাও,

غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ

'যারা অপারগ তারা ছাড়া'

যারা অক্ষমতার কারণে জিহাদে অংশ নিতে পারে না তাদের যেন ব্যতিক্রম ধরা হয়। আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূমের এই আকাঙ্ক্ষার পক্ষে আল্লাহ তাআলা বিধান নাজিল করে দিলেন।

আল্লাহ তাআলা ইবনে উম্মে মাকতূম এবং তাঁর মতো অক্ষমদের জিহাদ থেকে অব্যাহতি দেওয়া সত্ত্বেও তিনি জিহাদ থেকে বিরত থাকা লোকদের দলভুক্ত হতে অস্বীকৃতি জানালেন। তিনি দৃঢ়সংকল্প করে বসলেন, জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহতে অংশ গ্রহণ করবেন... কারণ, মহৎপ্রাণ ব্যক্তিরা মহৎকর্ম ছাড়া তৃপ্ত হতে পারেন না।

সেইদিন থেকে তিনি খুবই ব্যাকুল হয়ে থাকলেন যেন আর একটি জিহাদও তার থেকে ছুটতে না পারে। এখন থেকে প্রত্যেকটা জিহাদেই তিনি শরীক থাকবেন। তিনি যুদ্ধের ময়দানগুলিতে নিজের করণীয় ঠিক

করে নিলেন। তিনি সকলকে বলতেন, আমাকে তোমরা উভয় পক্ষের মাঝে দাঁড় করে দিও, আমি মুসলিমবাহিনীর পতাকা বহন করব। আমি ইনশাআল্লাহ ভালোভাবে পতাকার হেফাজত করতে পারব। কারণ, আমি তো অন্ধ কিছুতেই পালিয়ে যেতে পারব না...

* * *

হিজরতের চতুর্দশ বর্ষে খলীফা উমর ইবনুল খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহু এই মর্মে সংকল্প করলেন যে, তিনি পারস্যসাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে এক চূড়ান্ত যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করবেন। যা তাদের সাম্রাজ্যকে উলটপালট করে দেবে। নিঃশ্চিহ্ন করে দেবে তাদের ক্ষমতা এবং মুসলিমবাহিনীর জন্য খুলে দেবে সামনে এগিয়ে যাওয়ার পথ। এ উদ্দেশ্যে তিনি সকল গভর্নরের কাছে লিখিত নির্দেশ পাঠালেন।

'যার কাছে অস্ত্র আছে, ঘোড়া আছে অথবা যুদ্ধ পরিচালনা করার মতো যোগ্যতা আছে এমন সকলকেই আমার কাছে পাঠিয়ে দাও। খবরদার! এতে যেন কোনো বিলম্ব না হয়।'

ফারুকে আযমের আহ্বানে মুসলিমবাহিনী দলে দলে সাড়া দিয়ে সকল প্রান্ত থেকে মদীনায় সমবেত হতে থাকল। সমবেত সেই সকল মুজাহিদের একজন ছিলেন দৃষ্টিশক্তিহীন আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম।

উমর ফারুক রাযিয়াল্লাহু আনহু বিশাল সেনাবাহিনীর আমীর ও সেনাপতি নিযুক্ত করলেন সাদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস রাযিয়াল্লাহু আনহুকে। তাকে বিশেষ উপদেশ ও নির্দেশনা দিয়ে বিদায় জানালেন। এই বাহিনী যখন কাদেসিয়া পৌঁছল, তখন দেখা গেল আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম লৌহবর্ম পরে যুদ্ধের সাজে সেজে একেবারে প্রস্তুত হয়ে এসেছেন। মুসলিমবাহিনীর পতাকা বহন এবং জীবন দিয়ে হলেও তা সমুন্নত রাখার দায়িত্ব পালনের জন্য নিজেকে পেশ করলেন।

* * *

পৃথিবীর সেরা শক্তি গর্বিত পারস্যবাহিনী আর নবগঠিত ইসলামী সাম্রাজ্যের পতাকাবাহী মুসলিমবাহিনী মুখোমুখি হলো। যুদ্ধের ইতিহাসে নজির বিহীন ভয়াবহ লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে দুইদিন পেরিয়ে গেল। জয় পরাজয়ের কোনো মীমাংসা ছাড়াই যুদ্ধ তৃতীয় দিনে গড়াল। অবশেষে তৃতীয় দিনে যুদ্ধের ফলাফল নির্ধারিত হলো মুসলিমবাহিনীর বিশাল বিজয়ের মাধ্যমে। এরই মাধ্যমে তদানিন্তন পৃথিবীর প্রধান পরাশক্তি পারস্যসাম্রাজ্যের পতন ঘটল।

ধ্বসে পড়ল তাদের মূল্যবান ও প্রাচীনতম সিংহাসন।

দেব-দেবী ও মূর্তিপূজার দেশে উড়তে শুরু করল তাওহীদের পতাকা।

এই মহা বিজয় অর্জনের জন্য মূল্য হিসাবে পরিশোধ করতে হয়েছিল শত শত শহীদের অমূল্য জীবন।

তাদের মাঝে ছিল আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূমের জীবনও।

সেদিন যুদ্ধের প্রান্তরে খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল তার রক্তমাখা নিষ্প্রাণ দেহ—যা মুসলিমবাহিনীর পতাকাটিকে তখনো বুকের মাঝে আগলে রেখেছিল।

তথ্যসূত্র :

১. *আল-ইসাবা*, ২য় খণ্ড, ৫২৩ পৃষ্ঠা অথবা *আত্তারজামা*, ৫৭৬৪।
২. *আল-ইসতীআব*, ২য় খণ্ড, ৫০১ পৃষ্ঠা।
৩. *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, ৪র্থ খণ্ড, ২০৫ পৃষ্ঠা।
৪. *সিফাতুস সফওয়া*, ১ম খণ্ড, ২৩৭ পৃষ্ঠা।
৫. *যাইলুল মুযীল*, ৩৬-৪৭ পৃষ্ঠা।
৬. *হায়াতুস সাহাবা*, সূচিপত্র দ্রষ্টব্য।

মাজযাআ ইবনে সাওর আস-সাদূসী

মাজযাআ ইবনে সাওর এমন দুর্দান্ত, দুঃসাহসী যোদ্ধা, যিনি শুধু দ্বন্দ্ব যুদ্ধেই (একজন বনাম একজনের যুদ্ধে) একশো মুশরিক যোদ্ধাকে হত্যা করেছিলেন। তাহলে বিভিন্ন রণক্ষেত্রে তাঁর হাতে নিহতের সংখ্যা কত হতে পারে?

—ঐতিহাসিকদের মন্তব্য

ঐ দ্যাখো মুসলিমবাহিনীর সম্মানিত বীরযোদ্ধারা নিজেদের গা থেকে কাদেসিয়ার ধুলাবালি ঝাড়ছেন, আল্লাহর দেওয়া বিজয়ে খুশি হয়ে...

শহীদ ভাইদের শাহাদাতের সীমাহীন মর্যাদায় ঈর্ষান্বিত হয়ে...

কাদেসিয়ার মতোই ভয়াবহ ও গুরুত্ববহ আরও একটি লড়াইয়ের প্রতি আগ্রহী হয়ে...

পারস্যসম্রাটদের সিংহাসনকে শেকড় থেকে উপড়ে ফেলার লক্ষ্যে খলীফা উমরের জিহাদ অব্যাহত রাখার নির্দেশ আসার প্রতীক্ষা নিয়ে...

* * *

সৌভাগ্যবান মুজাহিদবাহিনীর প্রতীক্ষার সময় খুব বেশি প্রলম্বিত হলো না।

উমর ফারুকের দূত মদীনা থেকে কূফায় এলেন। তার মাধ্যমে খলীফা কূফার গভর্নর 'আবু মুসা আল-আশআরী'র প্রতি নির্দেশ পাঠিয়েছেন, আপনার সেনাদল নিয়ে সামনে অগ্রসর হয়ে বসরা থেকে আগত বাহিনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করুন। এরপর উভয় বাহিনী নিয়ে (ইরানের পশ্চিম উপসাগরে অবস্থিত ভূখণ্ড) আহওয়াজের দিকে রওনা হয়ে যাবেন। পারস্যবাহিনীর প্রধান সেনাপতি হুরমুজানের পিছু নিয়ে তাকে হত্যা করে তুসতার শহরকে—যা কিসরাদের মুকুটের মুক্তা ও পারস্যসাম্রাজ্যের মোতিতুল্য—মুক্ত করতে হবে।'

কূফার গভর্নর আবু মুসার প্রতি খলীফার আরও একটি নির্দেশ ছিল, তিনি যেন এই অভিযানে যুক্ত করেন দুর্দান্ত, দুঃসাহসী যোদ্ধা, বকরগোত্রের সরদার ও অবিসংবাদিত নেতা মাজযাআহ ইবনে সাওর আস-সাদূসীকে।

* * *

আবু মুসা আল-আশআরী রাযিয়াল্লাহু আনহু খলীফাতুল মুসলিমীনের নির্দেশনার আলোকে সেনাদল সাজালেন। তাঁর বাম পার্শ্বস্থ সেনাদের নেতৃত্বের ভার দিলেন মাজযাআহ ইবনে সাওর আস-সাদূসীর হাতে। এই বাহিনী এবং বসরা থেকে আগত মুসলিমসেনাদল মিলিতভাবে এগিয়ে গেল আল্লাহর পথের সৈনিক হিসাবে।

আল্লাহর সৈনিকেরা একের পর এক শহরের পর শহর জয় করতে লাগলেন। আল্লাহদ্রোহী সৈনিকদের নাপাক অবস্থান থেকে দুর্গগুলোকে একটি একটি করে পাক ও পবিত্র করতে থাকলেন। পারস্য-সেনাদলের প্রধান নায়ক হুরমুজান বিপদ আঁচ করতে পেরে পালাতে পালাতে পারস্যের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় ঘেরা তুসতার শহরে গিয়ে উপনীত হলো।

* * *

হুরমুজান পালিয়ে যে তুসতার শহরটিতে আশ্রয় নিল, সেটা ছিল প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার বিচারে পারস্যের সবচেয়ে বেশি শক্তিশালী ও নিরাপদ

শহর। ছিল পারস্যের সর্বাধিক নয়নাভিরাম প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ঘেরা, শিল্প স্থাপত্য ও আধুনিকতায় গড়া শ্রেষ্ঠতম এক নগরী।

এছাড়া ইতিহাস-বাস্তবতার দিক-বিবেচনায় সেটা ছিল এক প্রাচীন সভ্যতার শহর। যাকে জমিনের সাধারণ সমতল থেকে উঁচু করে একটি ঘোড়ার সুদৃশ্য আকৃতি দিয়ে গড়ে তোলা হয়েছিল। কিন্তু সমতল থেকে উঁচু হলেও বিশেষ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এর উর্বরা শক্তি ও সজীবতা ধরে রাখা হয়েছিল বিশাল খরস্রোতা দুজাইল নদীর পানি দ্বারা।

বাদশা সাবূর শহরটির মাটির নিচ দিয়ে তৈরি করেছিলেন গোপন সুড়ঙ্গ পথ, যার মধ্য দিয়ে দুজাইল নদীর সুমিষ্ট পানির সরবরাহ সচল রেখেছিলেন। ভুগর্ভস্থ সেই পানি উপরে ওঠানোর জন্য শহরের দর্শনীয় ও উচুঁস্থানে তৈরি করেছিলেন একটি কৃত্রিম ফোয়ারা।

তুসতার নগরীর ঐ সুড়ঙ্গ ও ফোয়ারা ছিল যেন নির্মাণ ও স্থাপত্যকলার এক বিস্ময়কর সৃষ্টি। ঢালাই দেওয়া হয়েছিল সুদৃঢ় ও সুবিশাল পাথরের। মোটা মোটা লোহার খুঁটি দ্বারা মজবুত করা হয়েছিল। উভয় স্থাপনার মাজাই ও প্লাস্টার করা হয়েছিল সিসা দ্বারা।

বালা যেমন বাহুকে বেষ্টন করে রাখে—সেভাবেই তুসতার নগরীকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে রেখেছিল সুবিশাল ও সুউচ্চ প্রতিরক্ষা প্রাচীর। যার ব্যাপারে ঐতিহাসিকদের মন্তব্য—মাটির পৃথিবীতে নির্মিত সেটাই সর্বপ্রথম ও সর্ববৃহৎ প্রাচীর।

নিরাপত্তার এত উপাদান থাকতেও হুরমুজান উক্ত নগরপ্রাচীরের বাইরে খনন করিয়েছিল এত বিশাল খন্দক যা অতিক্রম করা কোনো শত্রুর পক্ষেই সম্ভব নয়। আর খন্দকের পেছনে নিযুক্ত রেখেছিল পারস্যের সেরা ও দুর্ধর্ষ একদল বাছাই করা সৈনিক।

* * *

ইসলামী সেনাদল তুসতার নগরীর খন্দককে ঘিরে শিবির স্থাপন করল। তাঁবু গাঁড়ার দিন থেকে এক এক করে আঠারোটি মাস পার হয়ে গেল কিন্তু ঐ খন্দক তারা পার হতে পারল না।

এই দীর্ঘ মেয়াদের মধ্যে তারা পারস্য-সেনাদলের সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়েছে আশি বার। এইসব যুদ্ধের প্রত্যেকটিই শুরু হতো উভয় দলের দুই অশ্বারোহীর দ্বন্দ্ব যুদ্ধের মাধ্যমে, এরপর তা রূপান্তরিত হতো ভয়াবহ খণ্ড যুদ্ধে।

ঐ সকল যুদ্ধে মাজযাআহ ইবনে সাওর বিস্ময়কর রণনৈপুণ্যের প্রকাশ ঘটিয়ে একই সঙ্গে শত্রু ও মিত্রবাহিনীকে হতবাক করে দিয়েছেন।

একাই তিনি শতাধিক শত্রুসৈন্যকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে হত্যা করে এমন অবস্থা সৃষ্টি করেছেন যে, তার নাম শুনলেই শত্রুশিবিরে সৃষ্টি হতো আতঙ্ক আর মিত্র মুসলিমসৈনিকদের বুক ফুলে উঠত গৌরব ও আনন্দে।

এই অস্বাভাবিক ঘটনার কারণেই ইতিপূর্বে যারা তাকে চিনত না তারাও বুঝতে পারলেন যে, এই অভিযানে কেন এই বীরযোদ্ধাকে সামিল করার জন্য আমীরুল মুমিনীনের এত ঐকান্তিক আগ্রহ ছিল।

* * *

ঐ আশি বারের সর্বশেষ যুদ্ধে মুসলিমবাহিনী শত্রুদের ওপর এমন ভয়ঙ্কর হামলা চালাল, যাতে টিকতে না পেরে তারা খন্দকের (ওপর দিয়ে পারাপারের) পোল-এর পাহারা ফেলে পালিয়ে গেল। আশ্রয় নিল শহরের ভেতরে। বন্ধ করে দিল সুরক্ষিত দুর্গের দুর্ভেদ্য প্রবেশ দুয়ারগুলো।

* * *

মুসলিমবাহিনী এক দীর্ঘ দুর্বিসহ অবস্থা পারি দিয়ে মুখোমুখি হলেন নতুন এক পরিস্থিতির—যা আরও বেশি বেদনাদায়ক আরও বেশি অসহনীয়। পারস্যবাহিনী দুর্গের নিরাপদ উঁচু উঁচু জায়গাগুলো থেকে বৃষ্টির মতো তীর বর্ষণ করে তাদের হত্যা করতে থাকল...

দুর্গের প্রাচীরের ওপর থেকে তারা লোহার শিকল ঝুলিয়ে মাছ শিকার করার মতো করে মুসলিমসৈনিকদের শিকার করছিল। শিকলগুলোর শেষ প্রান্তে লটকানো ছিল গনগণে আগুনে পোড়ানো দগদগে বড়শি ও আংটা।

কোনো মুসলিমসৈনিক প্রাচীরে চড়া অথবা এই উদ্দেশ্যে প্রাচীরের কাছাকাছি গেলেই তারা সেই আংটাগুলো তাদের গায়ে বিঁধিয়ে উপরে টেনে তুলে নিত। ফলে সেই মুসলিমসৈনিক সঙ্গে সঙ্গে হয় পুড়ে মরে যেত অথবা আগুনের উত্তাপে পুড়ে তার দেহের গোস্ত টুকরো টুকরো হয়ে ঝড়ে পড়ত। এ মৃত্যু হতো আরও বেশি যন্ত্রণাদায়ক উপায়ে আরও বেশি ধুঁকে ধুঁকে।

* * *

মুসলিমবাহিনীর ওপর বিপদের পাহাড় ভেঙ্গে পড়ল। তাঁরা রণক্লান্ত বিনীত ও বিগলিত অন্তরে মহান আল্লাহর দরবারে বিপদ দূর করে দেওয়ার প্রার্থনা জানাতে থাকলেন। তাদের ও আল্লাহর দুশমনদের বিরুদ্ধে তাদেরকে সাহায্য ও বিজয় দান করার জন্য আল্লাহর কাছে তারা দুআ ও মুনাজাত করতে থাকলেন।

* * *

সেনাপতি আবু মুসা আশআরী রাযিয়াল্লাহু আনহু যেই মুহূর্তে 'তুসতারে'র বিশাল নগর প্রাচীর অতিক্রম করার ব্যাপারে গভীর হতাশা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করছিলেন। ঠিক সেই মুহূর্তে তার সামনে এসে পড়ল একটি তীর—যা ছোঁড়া হয়েছিল ঐ প্রাচীরের ওপর থেকে। হঠাৎ তীরের সঙ্গে একটি চিঠি দেখতে পেয়ে তিনি সেটা খুলে পড়তে শুরু করলেন, তাতে লেখা আছে,

لَقَدْ وَثِقْتُ بِكُمْ مَعْشَرَ المسْلِمِيْنَ، وَإِنِّيْ أَسْتَأْ مِنُكُمْ عَلٰى نَفْسِيْ وَمَالِيْ وَأَهْلِيْ وَمَنْ تَبِعَنِيْ، وَلَكُمْ عَلَيَّ أَنْ أَدُلَّكُمْ عَلٰى مَنْفَذٍ تَنْفُذُوْنَ مِنْهُ إِلَى الْمَدِيْنَةِ _

'হে মুসলিমসম্প্রদায়! তোমাদের মধ্যে ওয়াদা অঙ্গীকার রক্ষার বৈশিষ্ট্য আছে জেনে তোমাদের প্রতি গভীর আস্থা রেখে আমি এই চুক্তি করতে আগ্রহী হয়েছি। তোমরা যদি 'আমার জান, মাল, পরিবার ও আমার অনুসারীদের কোনো ক্ষতি করবে না' মর্মে অভয় দাও, তাহলে আমি তোমাদেরকে শহরে প্রবেশ করার গোপন সুড়ঙ্গ পথ চিনিয়ে দেব।'

আবু মুসা তীর নিক্ষেপকারীর জন্য অভয়বাণী লিখে তীর ছুঁড়েই তার কাছে পৌঁছে দিলেন।

লোকটি মুসলিমদের দেওয়া অভয়বাণীতে আস্থা রাখল। কারণ, ওয়াদা পালন ও অঙ্গীকার রক্ষায় মুসলিমদের সততার বিষয়টি সর্বত্রই প্রসিদ্ধ। সে অন্ধকারের আড়াল নিয়ে গোপনে মুসলিমদের কাছে এসে গেল এবং আবু মুসা আশ্‌আরী রাযিয়াল্লাহু আনহুর কাছে নিজের প্রকৃত ব্যাপারটি তুলে ধরে বলল,

'আমি কওমের সম্ভ্রান্ত ও নেতৃস্থানীয় মানুষ। আমার বড় ভাইকে হুরমুজান হত্যা করেছে, তার অর্থ-সম্পদ হাতিয়ে নিয়ে তার পরিবারের লোকদের ওপর বাড়াবাড়ি করেছে। মনে মনে আমার প্রতিও শত্রুতা পোষণ করছে। যে কারণে তাকে আমি নিজের ও আমার সন্তানদের জন্য নিরাপদ ভাবতে পারছি না।

আমি বহু চিন্তা করেছি। তার স্বভাবগত জুলুম ও গাদ্দারীর কাছে নিজেদের তুলে দেওয়ার চেয়ে আপনাদের ইনসাফ ও অঙ্গীকার পালনের স্বভাবকেই আমি পছন্দ করছি। সে কারণে আমি তুসতার শহরে প্রবেশের গোপন সুড়ঙ্গ পথ আপনাদের চিনিয়ে দেওয়ার সংকল্প করেছি...

আমার সঙ্গে আপনাদের একজন বিচক্ষণ ও সাহসী ব্যক্তিকে পাঠান—যিনি সাঁতারেও পারদর্শী হবেন। আমি তাকে পথ চিনিয়ে দেব।'

* * *

আবু মূসা আশ্‌আরী রাযিয়াল্লাহু আনহু মাজযাআহ ইবনে সাওর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে ডেকে চুপি চুপি খবরটি শোনালেন এবং বললেন,

'আমাকে তোমাদের ভেতর থেকে একজন সাহসী, বিচক্ষণ ও ভালো সাঁতারু খুঁজে দাও।'

মাজযাআহ বললেন,

'হে সেনাপতি! যেই কাজের জন্য আপনি সাহসী, বিচক্ষণ ও সাঁতারু খুঁজছেন, সেই কাজটি আমার দায়িত্বে ছেড়ে দিন আর আমাকেই ওইসব যোগ্যতা সম্পন্ন করে নিন।'

আবু মুসা বললেন,

'আরে! সিংহভাগ কাজ তো তুমিই করছ। সেটা ভেবেই তোমাকে সরাসরি হুকুম করলাম না। নতুবা এ কাজের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত ব্যক্তি তো তুমিই। তুমি যখন আগ্রহী তাহলে তো আর কোনো চিন্তাই থাকল না। যাও, আল্লাহ তোমাকে সাহায্য করবেন।'

এরপর তিনি পাঁচটি অসিয়ত করলেন, এক. রাস্তা ভালোভাবে চিনে নেবে। দুই. শহরের প্রবেশদ্বার ভালোভাবে চিনে আসবে। তিন. হুরমুজানের ঠিকানা ঠিকমতো নির্ণয় করে আসবে। চার. ব্যক্তি হুরমুজানকে সঠিকভাবে চিনে আসবে। পাঁচ. এর বাইরে অন্য কোনো ঘটনা বা দুর্ঘটনা কিছুই ঘটাবে না, সাবধান থাকবে।

* * *

মাজযাআহ ইবনে সাওর রাতের গভীর অন্ধকারে পারসিক রাহবারের (পথ প্রদর্শকের) সঙ্গে বেরিয়ে পড়লেন। লোকটি তাকে মাটির নিচে একটি সুড়ঙ্গ পথে ঢুকিয়ে দিল—যা দুজাইল নদী ও তুসতার শহরের মাঝে সংযোগ তৈরি করে রেখেছে।

সুড়ঙ্গ পথটি কখনো এত প্রশস্ত যে সেখানের পানির মধ্যে হেঁটে হেঁটে যাওয়া সম্ভব আবার কখনো এত অপ্রশস্ত যে সাঁতার কাটা ছাড়া সে পথে যাওয়া সম্ভব নয়।

কোথাও রয়েছে বিভ্রান্তিকর অনেক শাখা পথ। কোথাও পথটি গেছে এঁকে বেঁকে, কোথাও একদম সোজা... বহু জটিলতা অতিক্রম করে লোকটি তাকে নিয়ে পৌঁছে গেল সেই দরজার কাছে—যা দিয়ে প্রবেশ করতে হয় শহরে। হুরমুজানকে—যে তার ভাইয়ের হত্যাকারী—দেখিয়ে দিল, দেখাল তার দুর্ভেদ্য বাসগৃহটিও।

হুরমুজানকে দেখামাত্রই মাজযাআহর ইচ্ছা হলো, এক্ষুণি তার গলায় একটি তীর বিঁধিয়ে শেষ করে দেয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই আবু মূসার অসিয়ত মনে পড়ে গেল 'অন্য কোনো ঘটনা বা দুর্ঘটনা ঘটাবে না।' ফলে মনের ইচ্ছাকে কঠোরভাবে দমন করে ফেললেন এবং প্রভাতের আলো ফুটে ওঠার পূর্বেই একই পথ ধরে ফিরে এলেন।

* * *

আবু মুসা আশআরী রাযিয়াল্লাহু আনহু বিশাল মুসলিমসেনাদল থেকে তিনশো মুজাহিদ বাছাই করলেন। দুঃসাহসী দুর্বিনীত, বিপদে অবিচল এবং সাঁতারু এই দুর্দান্ত কমাণ্ডোবাহিনীর আমীরুল মুজাহিদীন বানালেন মাজযাআ ইবনে সাওর আস-সাদূসীকে, তাকে বিশেষ অসিয়ত করে বিদায় জানালেন।

তিনি আল্লাহু আকবারকে সঙ্কেত হিসাবে নির্দিষ্ট করে দিয়ে বললেন, 'ভেতর থেকে তোমাদের সঙ্কেত পাওয়া মাত্রই বাহিরের সৈনিকেরা একযোগে শহরে প্রবেশ করে হামলা শুরু করবে।'

মাজযাআহ তার কমাণ্ডোবাহিনীর প্রতি হুকুম জারি করলেন, 'প্রত্যেককে ভারী পোশাক পরিহার করে যথাসম্ভব হাল্কা ও অল্প পোশাক পরতে হবে, যেন পানিতে ভিজে চলাচলে বাধা সৃষ্টি করতে না পারে।'

তিনি আরও নির্দেশ দিলেন, 'তরবারি ছাড়া আর কোনো অস্ত্র কেউ সঙ্গে বহন করবে না এবং একটিমাত্র তরবারিও পোশাকের নিচে শরীরের সঙ্গে বেঁধে নিতে হবে।' রাতের প্রথম অংশ শেষেই তিনি তাদের নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন।

* * *

মাজযাআহ ইবনে সাওর এবং তার দুঃসাহসী কমাণ্ডোবাহিনীর লোকজন প্রায় দুই ঘণ্টা ধরে বিপদজনক সুড়ঙ্গ পথের নানান জটিলতা অতিক্রম করার অবিরাম চেষ্টা চালাতে থাকলেন। কখনো তারা জটিলতাকে পরাজিত করলেন, কখনো জটিলতাই তাদের ধরাশায়ী করে ফেলল।

এভাবেই যখন তারা শহরের প্রবেশ দ্বারের নিকট পৌঁছলেন, মাজযাআহ দেখে শুনে নিশ্চিত হলেন যে, সুড়ঙ্গ পথ তার দুইশো বিশ কমাণ্ডোকেই গিলে খেয়েছে, বাকি রেখেছে মাত্র আশিজনকে...

* * *

মাজযাআহ এবং তাঁর সকল সঙ্গীর পা শহরের মাটি স্পর্শ করার সঙ্গে সঙ্গে তারা নিজেদের তরবারি মুক্ত করে দুর্গের রক্ষীদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন, তাদের বুকের মধ্যে সেগুলো ঢুকিয়ে দিলেন।

সেখান থেকে লাফ দিয়ে উঠে প্রধান ফটকের কাছে ছুটে গেলেন এবং গগন বিদারি আওয়াজে 'আল্লাহু আকবার' বলতে বলতে সেটা খুলে ফেললেন।

তাদের ভেতর থেকে দেওয়া তাকবীরের আওয়াজ বাহিরের অগণিত আওয়াজের সঙ্গে মিলে আকাশ-বাতাস মুখরিত করে তুলল...

প্রভাতের আলো ফুটতে না ফুটতেই মুসলিমবাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়ল শহরের ওপর...

শত্রুবাহিনীর সঙ্গে তাদের এমন লড়াই হলো—ভীতি, আতঙ্ক ও নিহতের সংখ্যাধিক্যের এরূপ নজির যুদ্ধের ইতিহাস খুব কমই প্রত্যক্ষ করেছে।

* * *

উভয় দলের মাঝে যখন প্রচণ্ড সংঘর্ষ চলমান, সেই মুহূর্তে যুদ্ধের প্রান্তরে মাজযাআহ ইবনে সাওরের চোখে পড়ল হুরমুজান। সঙ্গে সঙ্গে তিনি সেই দিকে মনোযোগ দিলেন এবং তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন তরবারি নিয়ে। কিন্তু কোনো কাজ হলো না। মুহূর্তের মধ্যে অসংখ্য যোদ্ধার ভিড় তাকে গোপন করে দিল মাজযাআর দৃষ্টি থেকে। কিছুক্ষণের মধ্যে আবারও সে ধরা পড়ল তাঁর চোখে। এক মুহূর্তও দেরি না করে তিনি ছুটে গিয়ে আক্রমণ চালিয়ে দিলেন সরাসরি তার ওপর...

একই সময় একই ভঙ্গিতে হুরমুজানও তরবারি চালিয়েছিলেন সরাসরি তার ওপর। তারা দু'জনই দু'জনের ওপর আক্রমণ চালিয়েছিল। মাজযাআর আঘাত ব্যর্থ হলো কিন্তু হুরমুজানের তরবারি নির্ভুলভাবে তাকে আঘাত করল।

দুর্দান্ত দুঃসাহসী এক মহানায়কের দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। তবে তার দু'চোখে বিরাজ করছিল বিজয় সম্ভাবনার স্পষ্ট ইঙ্গিতপূর্ণ হাসি—যা যোদ্ধা জীবনের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা থেকে তিনি 'নিশ্চিত' মনে করছিলেন।

সেনানায়কের আকস্মিক এই শাহাদাতে মুসলিমসেনাদল একটুও থামল না, অবিরাম লড়াই চালিয়ে গেল। মহান আল্লাহর অসীম কৃপায় তারাই বিজয়ী হলেন। হুরমুজানের মতো পৃথিবীর সেরা বীর সেনাপতিকেও আল্লাহ তাদের হাতে বন্দী করে দিলেন।

* * *

মদীনা মুনাওয়ারায় খলীফা উমরের উদ্দেশ্যে এই মহা বিজয়ের সুসংবাদ বহন করে ছুটে চলেছেন একদল মানুষ।

তারা দলের সম্মুখে নিয়ে যাচ্ছেন হুরমুজানকে—যার মাথায় পরানো রয়েছে হিরা-জওহরের কারুকার্য খঁচিত রাজমুকুট। স্বর্ণের প্রলেপ দেওয়া প্রধান সেনাপতির পোশাকেই এই আজগুবি বন্দীকে রাজ মুকুট পরিয়ে নেওয়ার উদ্দেশ্য এই যে, খলীফা যেন তার আসল রূপটা দেখতে পান।

মহা বিজয়ের সুসংবাদবাহী এই দল খলীফার কাছে বয়ে নিয়ে গেল এই শোকাবহ দুঃসংবাদ, 'আপনার পছন্দের দুর্দান্ত সাহসী যোদ্ধা মাজযাআহ ইবনে সাওর শহীদ হয়ে গেছেন।'

তথ্যসূত্র :

১. *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক* লিত-তাবারী, ৪র্থ খণ্ড, ২১৬ পৃষ্ঠা, সপ্তদশ বর্ষের ঘটনাবলী অধ্যায়।
২. *তারীখু খলীফা ইবনে খাইয়্যাত*, ১ম খণ্ড, ১১৭ পৃষ্ঠা এবং পরবর্তী।
৩. *তারীখুল ইসলাম* লিয-যাহাবী, ২য় খণ্ড, ৩০ পৃষ্ঠা।
৪. *মুজামুল বুলদান লিইয়াকূত : ইনদা তুস্তার।*
৫. *আল-ইসাবা*, ৩য় খণ্ড, ৩৬৪ পৃষ্ঠা অথবা *আত্তারজামা*, ৭৭৩।
৬. *উসদুল গাবাহ*, ৪র্থ খণ্ড, ৩০ পৃষ্ঠা।

উসাইদ ইবনুল হুযাইর

হে উসাইদ! ওটা ছিল ফেরেশতাদের দল। ওরা কান পেতে শুনছিল তোমার তেলাওয়াত।

—প্রিয় নবীর উক্তি

ইসলামের ইতিহাস যাকে প্রথম সুসংবাদবাহী দল হিসাবে জানে, মক্কার টগবগে যুবক মুসআব ইবনে উমায়ের রাযিয়াল্লাহু আনহু মদীনায় শুভাগমন করলেন সেই দলের প্রধান হয়ে। মদীনায় আগমনের পর তিনি সেখানের বিখ্যাত খাযরাজ বংশের মাননীয় বীর 'আসআদ ইবনে যুরারাহ'[১]-এর বাড়িতে মেহমান হিসাবে অবস্থান নিলেন। এই বাড়িটিকেই তিনি বানালেন আপন ঠিকানা, বানালেন আল্লাহর দিকে মানুষকে আহ্বানের কেন্দ্র। তরুণ প্রচারক মুসআব ইবনে উমায়ের রাযিয়াল্লাহু আনহুর প্রচার মজলিসগুলো মদীনার তরুণশ্রেণির ব্যাপক অংশগ্রহণে সরগরম হতে থাকল।

---

১. আসআদ ইবনে যুরারাহ আন-নাজ্জারী আল-আনসারী—জাহেলী ও ইসলামী উভয় যুগেই যারা বিখ্যাত বীর, তাদের মধ্যে অন্যতম শীর্ষব্যক্তিত্ব। মক্কার জীবনেই তিনি নবীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তিনি এবং যাকওয়ান ইবনে আবদে কায়েস একসঙ্গে ইসলাম গ্রহণ করে মদীনায় ফিরে যান। এ দু'জনই মদীনাতে সর্বপ্রথম ইসলামের আলো নিয়ে আগমনকারী। আসআদ বদর যুদ্ধের পূর্বেই ইন্তেকাল করেন এবং বাকী কবরস্থানে তাঁকে দফন করা হয়।

তরুণ প্রচারক মুসআবের প্রতি মদীনার যুবকদের আকৃষ্ট করত তাঁর বিশ্বাসদীপ্ত ও আকর্ষণীয় চেহারা, কোমল স্বভাব আর জড়তামুক্ত সুস্পষ্ট, যুক্তিপূর্ণ ও মিষ্টি কথা।

এইসব কিছুর ওপরে তাঁর প্রতি তরুণদেরকে সর্বাধিক আকর্ষণ করত যা—সেটা হলো কুরআন। যার দ্ব্যর্থহীন ও সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ তিনি আলোচনার মাঝে মাঝে আবেগ জাগানিয়া, মিষ্টি-মধুর সুরে তেলাওয়াত করতেন। যা শুনে পাষাণ হৃদয়ও বিগলিত হতো আর অবাধ্য পাপীদের অনুশোচনার অশ্রুও যেন বাঁধ ভেঙ্গে গড়িয়ে পড়ত। তার এসকল ঈমানী মজলিসের কোনোটাই সমাপ্ত হতো না একাধিক মানুষের ঈমান গ্রহণ ও ঈমানী কাফেলায় শামিল হওয়া ছাড়া।

* * *

একদিনের ঘটনা। আসআদ ইবনে যুরারাহ তার মুবাল্লিগ মেহমান মুসআব ইবনে উমায়েরকে সঙ্গে নিয়ে বের হলেন। উদ্দেশ্য আবদুল আশহাল গোত্রের কিছু মানুষের সঙ্গে দেখা করে তাদের কাছে ইসলামের পরিচয় তুলে ধরা। তারা উভয়ে আবদুল আশহাল গোত্রের একটি বাগানে প্রবেশ করলেন এবং খেজুর গাছের ছায়াঘেরা মিষ্টি সুপেয় পানির একটি কূপের সন্নিকটে বসলেন। মুসআব ইবনে উমায়ের রাযিয়াল্লাহু আনহুর আগমনকে কেন্দ্র করে সেখানে সমবেত হলেন পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করা একদল মানুষ। আরও এলেন তাঁর কথা শুনতে আগ্রহী একদল অমুসলিমও। তিনি আলোচনা শুরু করলেন। ইসলামের সৌন্দর্য ফুটিয়ে তুললেন এবং ইসলাম গ্রহণের শুভ পরিণতির কথাও আলোচনা করলেন। উপস্থিত সকলেই সবটুকু মনোযোগ ঢেলে দিয়ে কান পেতে শুনতে থাকলেন। তাঁর চমৎকার কথায় প্রভাবিত হতে থাকলেন।

* * *

পক্ষান্তরে জনৈক ব্যক্তি এই প্রচার-মজলিসের সংবাদ আউসগোত্রের দুই সরদার উসাইদ ইবনুল হুযাইর ও সাআদ ইবনে মুআয[1]-এর কানে দিয়ে বলল, 'আরে! মক্কার প্রচারক তো তোমাদের ঘরের দুয়ারে এসে কাজ শুরু করে দিয়েছে। আর আসআদ ইবনে যুরারাই তাকে এই দুঃসাহসী প্ররোচনা দিয়েছে, এতে কোনো সন্দেহ নেই।'

এই সংবাদে রেগে উঠা উসাইদ ইবনুল হুযাইরকে সাআদ ইবনে মুয়ায বললেন,

'কী সর্বনাশ হলো হে উসাইদ! এক্ষুনি চলো। মক্কা থেকে আগত যুবক—যে আমাদের দেব-দেবীকে মন্দ বলে থাকে এবং আমাদের দুর্বল-অবহেলিত লোকদের ভুলিয়ে ইসলামে দীক্ষিত করছে, তাকে এক্ষুনি সাবধান করে দাও। বলে দিয়ে এসো, আজকের পরে আর কখনোই যেন আমাদের এই এলাকায় পা না ফেলে।'

অবিলম্বে তিনি আবার বলতে লাগলেন,

'তিনি যদি আমারই খালাতো ভাই আসআদ ইবনে যুরারাহ-এর মেহমান হয়ে তারই নিরাপত্তায় না থাকতেন, তাহলে এটুকু কাজের জন্য তোমাকে বলতাম না। আমি একাই তাকে ঠাণ্ডা করে দিতাম।'

* * *

উসাইদ ইবনে হুযাইর বর্শাটি হাতে নিয়ে বাগানের দিকে রওনা করলেন। তাকে ওইদিকে যেতে দেখে আসআদ ইবনে যুরারাহ মুসআবকে বললেন,

'খবরদার মুসআব! ঐ দেখুন! এদিকে যে মানুষটি আসছেন তিনি আপন কওমের সরদার। জ্ঞান-বুদ্ধি ও বিচক্ষণতায়, সম্মান-মর্যাদা ও

---

১. সাআদ ইবনে মুআয ইবনে নুমান ইবনে ইমরুল কায়েস আল-আউসী আল-আনসারী। বিখ্যাত বীর সাহাবী। বদরযুদ্ধে তিনি ছিলেন আপন গোত্রের পতাকাবাহী। ওহুদের যুদ্ধে শরীক হয়েছিলেন এবং মুসলিম সৈনিকদের এলোমেলো অবস্থাতেও তিনি অনড় ও অটল অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন। খন্দকের যুদ্ধে আহত হয়ে এরই প্রভাবে মৃত্যুবরণ করেন।

ব্যক্তিত্বে তিনি অপন বংশের সেরা ব্যক্তি। ইনিই হচ্ছেন উসাইদ ইবনুল হুযাইর। যদি তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন তাহলে তাকে অনুসরণ করে অগণিত মানুষ ইসলাম গ্রহণ করবে। সুতরাং তার কাছে আল্লাহর পরিচয় তুলে ধরুন। দীনের কথা চমৎকার ভাবে উপস্থাপন করুন।'

* * *

উসাইদ ইবনুল হুযাইর সমবেত লোকদের কাছে এসে থেমে গেলেন এবং মুসআব ও তার সঙ্গীর দিকে তাকিয়ে রাগত স্বরে বললেন,

'তোমাদের এত বড় স্পর্ধা হলো কী করে! আমাদের সীমানায় ঢুকে আমাদের অসহায় ও দুর্বল লোকদের প্রতারিত করছ? প্রাণের মায়া থাকলে এক্ষুনি এই এলাকা ত্যাগ করো।'

মুসআব ইবনে উমায়ের রাযিয়াল্লাহু আনহু ঈমানদীপ্ত চেহারা তুলে উসাইদের দিকে তাকালেন এবং আপন স্বভাবের সত্য ও হৃদয়গ্রাহী ভঙ্গিতে তাকে সম্বোধন করে বললেন,

'হে কওমের সুযোগ্য সরদার! এরচেয়েও উত্তম প্রস্তাব আমার কাছে আছে, আপনি কি শুনতে চান?'

'কী প্রস্তাব?'

'এখানে একটু বসে আমার কথা শুনুন। যদি আমার কথা আপনার পছন্দ হয় তাহলে কবুল করে নিন আর যদি তা অপছন্দ হয় তাহলে আমি এই মুহূর্তেই বিদায় হব। জীবনে আর কখনোই এই মুখ দেখাব না।'

'খুবই ন্যায় ও যুক্তিসঙ্গত তোমার এই প্রস্তাব।' এই কথা বলে তিনি বর্শার ফলা মাটিতে গেড়ে বসে পড়লেন।

মক্কার তরুণ ইসলামপ্রচারক মুসআব ইবনে উমায়ের রাযিয়াল্লাহু আনহু সবখানি মনোযোগ তার প্রতি নিবদ্ধ করে ইসলামের হাকীকত আলোচনা করলেন। বিষয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কিছু কিছু কুরআনের আয়াত

তাকে শোনালেন। এতে তার চেহারা থেকে রাগ ও বিরক্তির গুমোট কালো মেঘ কেটে গেল। আলো ঝলমলে চেহারায় খুশি ও আনন্দ নেচে উঠল। সেই খুশির বাঙময় প্রকাশ ঘটল তার কণ্ঠে,

'কী যে চমৎকার তোমার কথা!

কত যে মহৎ তোমার তেলাওয়াতকৃত বাণী!'

ইসলাম গ্রহণ করার জন্য মনে মনে তিনি ব্যাকুল হয়ে পড়েছেন। তাই সরাসরি জিজ্ঞাসা করলেন,

'আচ্ছা! কেউ ইসলাম গ্রহণ করতে চাইলে তোমরা কিভাবে, কী কী করে থাক?'

উত্তরে মুসআব রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন,

'আপনি ইসলাম গ্রহণ করতে চাইলে সর্বপ্রথম গোসল করে শরীর পাক ও পবিত্র করতে হবে। পাক-পবিত্র পোশাক পরতে হবে। 'আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল'–এই ঘোষণা দিতে হবে। এভাবে মুসলিম হয়ে যাওয়ার পর অপনি শুকরিয়া হিসাবে দু'রাকাত নামায আদায় করবেন।'

দৌড়ে তিনি কূপের কাছে চলে গেলেন। গোসল করে নিজের শরীর পবিত্র করলেন। ফিরে এসেই তিনি ঘোষণা দিলেন,

اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰه وَ اَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُه وَ رَسُوْلُه

'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই এবং মুহাম্মাদ তাঁরই বান্দা ও রাসূল।'

এরপর শুকরিয়া হিসাবে দুই রাকাত নামায আদায় করলেন।

ইসলামের আলোর কাফেলায় শমিল হলেন আরবের বিখ্যাত বীর-যোদ্ধাদের অন্যতম আর আউস গোত্রের হাতেগোনা শ্রেষ্ঠ সরদারদের বিশিষ্টতম ব্যক্তিত্ব উসাইদ ইবনে হুযাইর।

তার উঁচু বংশমর্যাদা, জ্ঞান-বুদ্ধি ও বিচক্ষণতার কারণে কওমের লোকেরা তাকে ভূষিত করেছিল 'আল-কামিল' সর্বগুণের আধার (বা অলরাউন্ডার) উপাধিতে। এর কারণ তরবারি ও ঘোড়া পরিচালনা, বর্শাবাজী ও তীরন্দাজীর পারদর্শিতা ছাড়াও তিনি ছিলেন লিখতে-পড়তে জানা এক অনন্য প্রতিভার অধিকারী। অথচ সেই সমাজে লেখা-পড়া জানা মানুষ ছিল একেবারেই দুষ্প্রাপ্য।

তার ইসলাম গ্রহণ সাআদ ইবনে মুআযের ইসলামগ্রহণের কারণ ও উপলক্ষ হয়ে গেল। আর এই দুই শীর্ষ ব্যক্তির ইসলামগ্রহণের সূত্র ধরেই আউস গোত্রের নারী পুরুষ দলে দলে ইসলাম কবুল করে নিল। এরই ধারাবাহিকতায় মদীনা হলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য হিজরতের অনুকূল ভূমি। বিশাল ইসলামী সাম্রাজ্যের কেন্দ্র ও প্রাণভূমি।

* * *

উসাইদ ইবনে হুযাইর রাযিয়াল্লাহু আনহুর অন্তরে ঢেলে দেওয়া হয়েছিল কুরআনের তীব্র ভালোবাসা ও প্রেম। প্রিয় সাহাবী মুসআব ইবনে উমায়ের রাযিয়াল্লাহু আনহুর মুখ থেকে প্রথম যখন কুরআনের আয়াত শুনেছিলেন, সেই মুহূর্ত থেকেই প্রেমাস্পদের জন্য প্রেমিক যেমন হয়, কুরআনের জন্য তিনিও হলেন সেই রকম পাগলপারা। প্রচণ্ড গরমে তৃষ্ণার্ত ব্যক্তি যেমন ঠাণ্ডা পানির জন্য ছুটে যায়, তিনি ঠিক সেভাবেই কুরআনের দিকে এগিয়ে গেলেন আর কুরআনকেই বানিয়ে নিলেন জীবনের প্রধান ব্যস্ততা। প্রধান কর্ম।

ফলে সর্বদা তাকে দেখা যেত, হয় আল্লাহর পথে জিহাদরত অথবা আল্লাহর কুরআন পাঠরত।

তিনি ছিলেন কোমল, সুস্পষ্ট, মিষ্টি ও সুরেলা কণ্ঠের অধিকারী। কুরআনের তেলাওয়াত তার কাছে সবচেয়ে বেশি মজাদার লাগত যখন রাত গভীর আর সমগ্র প্রকৃতি শান্ত হয়ে উঠত। সকল মানুষ ও জীব ঘুমে বিভোর হতো। যেই মুহূর্তে মানুষের অন্তরগুলো হয় নির্মল ও স্বচ্ছ।

তাঁর মধুর তেলাওয়াতের ব্যাপারে ভীষণ কৌতূহল ছিল সাহাবায়ে কেরামের মাঝে। তাঁরা অপেক্ষায় থাকতেন কখন তাঁর তেলাওয়াত শুরু হবে আর প্রতিযোগিতা করে ঐ তেলাওয়াত শুনতে সকলের আগে উপস্থিত হওয়া যাবে!

আহা কি সৌভাগ্য! যিনি তার মুখে সরস ও প্রাণবন্ত কুরআনের তেলাওয়াত শোনার সুযোগ পেয়েছেন, যেমনটি তা নাজিল হয়েছিল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি।

তাঁর মধুর তেলাওয়াতে জগৎবাসী যেমন আকৃষ্ট হতেন একইভাবে আকৃষ্ট হতেন আসমানের ফেরেশতারাও।

কোনো এক নিঝুম রাতের নিঃস্তব্ধ মুহূর্তে। উসাইদ ইবনে হুযাইর ছিলেন নিজ বাড়ির খোলা অঙিনায় বসা। পাশেই পুত্র ইয়াহইয়া ঘুমিয়ে। অদূরেই বাঁধা ছিল জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর উদ্দেশ্যে প্রস্তুত রাখা ঘোড়াটি।

রাতটি ছিল নিঝুম-নিঃস্তব্ধ। মেঘমুক্ত-পরিচ্ছন্ন আকাশের তারকারা ঘুমন্ত পৃথিবীর দিকে তাকিয়েছিল গভীর মমতার দৃষ্টি ফেলে।

উসাইদ ইবনুল হুযাইরের অন্তরে আগ্রহ জাগল এই শিশিরসিক্ত সুন্দর পরিবেশকে কুরআনের (তেলাওয়াতের) সুবাসে সুরভিত করতে। তিনি তেলাওয়াত করতে শুরু করলেন মিষ্টি-মধুর কণ্ঠে,

الٓمّٓ ﴿١﴾ ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ ۛ فِيْهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ﴿٢﴾ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ﴿٣﴾ وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ﴿٤﴾

'আলিফ, লাম, মীম। এটা মহান আল্লাহর কিতাব, যাতে কোনো রকমের সন্দেহ নেই। যা ঐ সকল পরহেজগারের (মুত্তাকীর) জন্য পথ প্রদর্শক। যারা গায়েবের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, নামায কায়েম করে।

আমি তাদের যে রিযিক দান করেছি তা থেকে কিছু অংশ দান করে। আপনার নিকট যা অবতীর্ণ করা হয়েছে এবং আপনার পূর্বে যেগুলো অবতীর্ণ করা হয়েছে— সেগুলোর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং যারা আখেরাতের ব্যাপারে দৃঢ় বিশ্বাস রাখে।' –সূরা বাকারা : ১-৪

তিনি সূরা বাকারার চতুর্থ আয়াত শেষ করতে না করতেই হঠাৎ দেখা গেল তাঁর ঘোড়াটি আতঙ্কে ঘুরতে শুরু করেছে। তার ঘোরাঘুরি ও লাফালাফির কারণে রশি ছিঁড়ে যাওয়ার আশঙ্কা তৈরি হলো। বিষয়টি নিয়ে তিনি নীরবে ভাবলেন। তেলাওয়াতের এই সামান্য বিরতির সময় দেখা গেল ঘোড়াটিও শান্ত-স্থির হয়ে গেল। ঘোড়ার এই পরিবর্তন দেখে আবার তিনি পরের আয়াত পড়া শুরু করলেন,

أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٥﴾

'তারাই সেই লোক যারা তাদের প্রতিপালকের হিদায়াতের ওপর প্রতিষ্ঠিত আর তারাই শুধু সফলকাম।' -সূরা বাকারা : ৫

এই আয়াত পড়ে তিনি তেলাওয়াতের ধারাবাহিকতা পুনরায় চালু করতে চাইলেন। কিন্তু আয়াতটি শেষ হতে না হতেই ঘোড়াটি আরও বেশি বিপদজনক ভাবে আরও বেশি জোরে লাফালাফি শুরু করে দিল। আবারও তিনি পড়া থামিয়ে চিন্তা করতে লাগলেন। আশ্চর্য! তিনি থেমে গেলে সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়াটিও শান্ত ও স্থির হয়ে গেল। বেশ কয়েকবার একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটল। যতবার তিনি কুরআন পড়তে শুরু করেন ততবার ঘোড়াটি উত্তেজিত হয়ে উঠে। লাফালাফি করতে থাকে। যেই তিনি থেমে যান, ঘোড়াটিও শান্ত ও স্থির হয়ে যায়।

এবার তাঁর ঘুমিয়ে থাকা ছেলে ইয়াহইয়ার ব্যাপারে ভয় হতে লাগল, ছেলেটি পাগলা ঘোড়ার পায়ের তলে পিষ্ট হয়ে যায় কি না! তিনি এগিয়ে গেলেন তাকে ডেকে ওঠানোর জন্য। তখনই আকাশের দিকে তার দৃষ্টি পড়ল। তিনি দেখতে পেলেন শামিয়ানার মতো একটি মেঘখণ্ড। এত চমৎকার ও নয়নাভিরাম দৃশ্য তিনি আর কখনো দেখেননি। তিনি

দেখলেন, ঐ মেঘখণ্ডের সঙ্গে ঝুলে আছে ঝাড়বাতির মতো অসংখ্য প্রদীপ। যেগুলোর আলোয় জমিন থেকে আসমান পর্যন্ত দিকদিগন্ত ঝলমলে হয়ে উঠেছে। অপরূপ সৌন্দর্যমাখা এই মেঘখণ্ডটি মহাশূন্যে আকাশের দিকে উঠতে উঠতে একসময় তার দৃষ্টির আড়ালে হারিয়ে গেল।

যখন ভোর হলো তখন তিনি ছুটে গেলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে এবং নিজের চোখে দেখা এই অপূর্ব দৃশ্যের বর্ণনা দিলেন। সবকিছু শুনে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মন্তব্য করলেন,

تِلْكَ الْمَلَائِكَةُ كَانَتْ تَسْتَمِعُ لَكَ يَا أُسَيْدُ ...

'হে উসাইদ! ওটা ছিল ফেরেশতাদের দল। ওরা কান পেতে তোমার তেলাওয়াত শুনছিল। তুমি যদি তেলাওয়াত করতেই থাকতে তাহলে অন্য মানুষও স্বচক্ষে তাদের দেখতে পেত। তারা তাদের দৃষ্টির আড়াল হতো না।

* * *

উসাইদ ইবনুল হুযাইরের হৃদয়ে যেভাবে কুরআনের প্রেম-ভালোবাসা সৃষ্টি হয়েছিল একইভাবে তাঁর অন্তর প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রেমাসক্তিতেও ভরপুর ছিল। তিনি নিজের হৃদয়ের অনুভূতি, প্রেমের আকুতি তুলে ধরেছেন এই ভাষায়,

'আমি হৃদয়ের পরিচ্ছন্নতা আর ঈমানের পূর্ণতা বোধ করি সর্বাধিক পরিমাণে কুরআন পড়া বা শোনার সময়।

আর বক্তব্য দানরত প্রিয় নবীর চেহারা মুবারকের প্রতি তাকিয়ে থাকার সময়।'

তিনি খুব বেশি কামনা করতেন, তার শরীর যেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরীর মোবারকের স্পর্শ লাভ করতে পারে

এবং তিনি যেন তাঁর দিকে ঝুঁকে তাঁর পবিত্র শরীরে চুমু দেওয়ার সৌভাগ্যপ্রাপ্ত হন।

একবার সেই সুযোগ তিনি পেয়েও গেলেন।

কোনো একদিন উসাইদ রাযিয়াল্লাহু আনহু কওমের লোকজনের সঙ্গে খোশগল্প করছিলেন। এটা দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুশি হয়ে রসিকতার ছলে আঙ্গুল মুবারক দিয়ে তার কোমরে খোঁচা মারলেন। লাফিয়ে উঠে তিনি বললেন,

'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আমাকে ব্যথা দিয়েছেন।'

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

'ঠিক আছে! তাহলে তুমি কিসাস নিয়ে নাও। (অর্থাৎ একই রকম একটি খোঁচা আমাকেও মারো। মিটমাট হয়ে যাক)'

উসাইদ বললেন,

'আপনি তো পোশাক পরে আছেন আমাকে খোঁচা মারার সময় আমার গায়ে পোশাক ছিল না।'

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চাঁদর খুলে পিঠ মুবারক উন্মুক্ত করে দিয়ে বললেন,

'নাও, এবার আমার শরীরও পোশাক মুক্ত। তোমার কিসাস (প্রতিশোধ) পূর্ণ করে নাও।'

উসাহাদ তাকে জড়িয়ে ধরলেন, তাঁর পাঁজরে চুমুর পর চুমু দিয়ে বললেন,

'আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য কুরবান হোক ইয়া রাসূলাল্লাহ। হে আমার প্রিয় রাসূল! যখন থেকে আমি আপনাকে চিনেছি, জেনেছি তখন থেকেই আমি মনে মনে আপনাকে চুমু দেওয়ার স্বপ্ন লালন করে এসেছি। আজ আমার দীর্ঘকালের সেই লালিত স্বপ্ন সত্যি হলো।'

* * *

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উসাইদের সঙ্গে সীমাহীন ভালোবাসার বিনিময় করতেন নিজের নিখাঁদ ভালোবাসা দিয়েই। ইসলাম গ্রহণের বেলায় তার অগ্রগামিতাকে সবসময়ই স্মরণ রাখতেন। স্মরণ রাখতের ওহুদ যুদ্ধে শত্রুদের আক্রমণ থেকে তাঁকে বাঁচানোর জন্য উসাইদের শক্ত প্রতিরোধ ব্যবস্থার কথা। সেদিন তিনি কাফেরদের সাতটি মরণ আঘাত বুক পেতে নিয়ে ভালোবাসার প্রিয় মানুষ নবীজীকে নিরাপদ করেছিলেন।

নিজ কওমের মধ্যে উসাইদের মর্যাদা ও অবস্থানের কথা প্রিয় নবী ভালোভাবে জানতেন এবং যথাযথ ভাবে এর মূল্যায়ন করতেন। তাদের কারও ব্যাপারে তিনি সুপারিশ করলে নবীজী তা কবুল করে নিতেন।

উসাইদ রাযিয়াল্লাহু আনহু নিজের সুপারিশ সম্পর্কে নবীজীর মূল্যায়নের বর্ণনা দিয়ে বলেন,

'আমি একবার নবীজীর দরবারে হাজির হয়ে এক আনসারী পরিবারের অবস্থা তুলে ধরলাম। আমি বললাম, ঐ পরিবারটির মধ্যে অনেক দরিদ্র ও অভাবী মানুষ রয়েছে। পরিবারটির অধিকাংশই অসহায় মহিলা। উপার্জন করার মতো তাদের কোনো পুরুষ নেই।'

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবকথা শুনে বললেন,

'হে উসাইদ! অনেক দেরিতে তুমি এলে। আমাদের হাতে গনিমতের অর্থকড়ি যা কিছু ছিল আমরা সব দিয়ে শেষ করে ফেলেছি। আবার আমাদের হাতে গনিমতের কোনো মাল আসার কথা শুনলে তুমি এই পরিবারের লোকদের কথা মনে করে দিও।'

এর কিছুদিন পরেই খায়বার থেকে গনিমতের কিছু মাল এল। নবীজী মুহাজির ও আনসার সকলের মাঝেই তা ভাগ করে দিলেন। আনসারদের বেশি বেশি করে দিলেন এবং আমার সুপারিশ করা সেই আনসার পরিবারকেও প্রচুর ধন-সম্পদ দিলেন।

এ কারণে কৃতজ্ঞতার উদ্দেশ্যে আমি তাঁকে বললাম,

‘ইয়া রাসূলাল্লাহ! ঐ পরিবারের পক্ষ থেকে আপনাকে ধন্যবাদ। আল্লাহ তাআলা আপনাকে সর্বোত্তম প্রতিদানে ভূষিত করুন।’

এর উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

‘তোমরা হে আমার আনসার (সাহায্যকারী) বন্ধুরা! আল্লাহ তোমাদের সর্বোত্তম পুরস্কারে ভূষিত করুন। আমার দীর্ঘ ও নিবীড় সম্পর্কের ভিত্তিতে জানি যে তোমরা নিষ্কলুশ ও নির্মোহ, সহনশীল ও নির্বিবাদী। মনে রেখো, এমন একটি সময় তোমাদের জীবনে আসন্ন, আমি যখন দুনিয়ায় থাকব না। দেখবে তোমাদের বাদ দিয়ে অন্যদের বেশি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। তখন তোমরা কোনো বিবাদে না গিয়ে আমার সঙ্গে সাক্ষাতের অপেক্ষায় থেক। তোমাদের সঙ্গে আমার আবারও সাক্ষাৎ হবে হাউজে কাউসারে।’

উসাইদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

‘মুসলিমজাহানের খেলাফতের গুরুভার যখন অর্পিত হলো উমর ইবনুল খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহুর ওপর। তিনি নিজ শাসনামলে একবার মুসলিম-জনসাধারণের মাঝে প্রচুর ধন-সম্পদ বিতরণ করেন। আমার জন্যও তিনি একখণ্ড কাপড় পাঠালেন। আমি দেখলাম, আমার পোশাক তৈরির জন্য কাপড়টি যথেষ্ট নয়। সেই সময় আমি একদিন মসজিদে অবস্থানকালে দেখতে পেলাম, খলীফার পাঠানো সেই কাপড়েরই একটি বড়সড় পোশাক পরা এক কুরাইশী যুবক আমার পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল। চেয়ে দেখলাম, তার পোশাকটি এতই বড় যে সেটা রীতিমত মাটি ছুঁয়ে যাচ্ছে। আমার তখন রাসূলের সেই কথাটি মনে পড়ে গেল। তাই পাশের লোকটিকে বললাম, ‘দেখো প্রিয় নবী বলেছিলেন, এমন একটি সময় তোমাদের জীবনে আসন্ন, যখন দেখবে তোমাদের বাদ দিয়ে অন্যদের প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে। আল্লাহর রাসূল খুবই সত্য বলেছিলেন।’

আমার কথা শুনে লোকটি ছুটে চলে গেল উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর কাছে এবং আমার মুখে শোনা নবীজীর সেই ভবিষ্যত বক্তব্যটি তুলে ধরলেন। সেটা শুনে খলীফা উমর ছুটতে ছুটতে আমার কাছে

এসে দেখলেন, আমি নামাযে আছি। তিনি বললেন, 'উসাইদ নামায পড়ে নাও।'

আমি যখন নামায শেষ করলাম তিনি আমার কাছে এগিয়ে এসে বললেন,

'উসাইদ তুমি কী মন্তব্য করেছ?'

আমি মসজিদের সেই কুরাইশী যুবকের অবস্থা দেখে মনে পড়ে যাওয়া রাসূলের ভবিষ্যৎবাণী এবং আমার মন্তব্যের কথা সবিস্তারে তাঁকে জানালাম।

তিনি এর জবাবে বললেন,

'হে উসাইদ! আল্লাহ তোমার ভুল ধারণা ক্ষমা করুন। ঐ যুবকের কাপড়টির মূল ব্যাপার এই যে, সেটা বাইতুল মাল থেকে আমি বরাদ্দ করেছি একজন সাহাবীর জন্য। যিনি একেবারে (বড় দুর্দিনের সময় নবীজীর হাতে হাত রেখে) আকাবায় শপথগ্রহণকারী আনসারী—যিনি (ইসলাম ও কুফরী শক্তির গুরুত্বপূর্ণ দুই লড়াই) বদর ও ওহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সৌভাগ্যবানদের অন্যতম। তিনিই ঐ কাপড়ের আসল মালিক। আর সেই কুরাইশী যুবক মালিকের নিকট থেকে সেই কাপড়ের খণ্ডটি কিনে নিয়েছে। হে উসাইদ! তুমি কি মনে করো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমার কাছে যে ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন সেটা আমার শাসন আমলেই ঘটবে?'

উসাইদ রাযিয়াল্লাহু আনহু নির্দ্বিধায় বললেন,

'আল্লাহর কসম হে আমীরুল মুমিনীন! আমার বিশ্বাস ঐ ঘটনা আপনার শাসনকালে ঘটবে না।'

* * *

এরপর উসাইদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বেশিদিন আর জীবিত থাকেননি। আল্লাহ তাআলা হযরত উমর ফারুকের জামানাতেই তাকে নিজের সান্নিধ্যে ডেকে নেন।

তাঁর ইন্তেকালের পর দেখা গেল চার হাজার দিরহামের বিশাল ঋণ রয়েছে তাঁর কাঁধে। তার উত্তরাধিকারীরা ঋণ পরিশোধের উদ্দেশ্যে তাঁর রেখে যাওয়া জমি বিক্রি করার চিন্তা-ভাবনা করছিলেন। খলীফা উমর রাযিয়াল্লাহু এই কথা জানতে পেরে বললেন,

'আমার ভাই উসাইদের পরিবারকে আমি মানুষের বোঝা ও তাদের করুণার পাত্র হয়ে থাকতে দেব না।'

পাওনাদারদের সঙ্গে কথা বলে তিনি তাদের এই চুক্তিতে রাজি করলেন যে, তারা উসাইদের রেখে যাওয়া জমির উৎপাদন থেকে প্রতি বছর এক হাজার দিরহাম মূল্যের ফল ও ফসল গ্রহণ করবেন।

চার বছর পর তাদের ঋণ পরিশোধ হলো আর তার সন্তানরাও নিঃস্ব হওয়া থেকে বেঁচে গেলেন।

তথ্যসূত্র :

১. *বুখারী* ও *মুসলিম*, ফাযায়িলুস সাহাবা অধ্যায়।
২. *জামিউল উসূল*, ৯ম খণ্ড, ৩৭৮ পৃষ্ঠা।
৩. *তাবাকাতু ইবনে সাআদ*, ৩য় খণ্ড, ৬০৩ পৃষ্ঠা।
৪. *তাহযীবুত তাহযীব* : ১ম খণ্ড, ৩৪৭ পৃষ্ঠা।
৫. *উস্‌দুল গাবাহ*, ১ম খণ্ড, ৯২ পৃষ্ঠা।
৬. *হায়াতুস সাহাবা*, ৪র্থ খণ্ড, সূচিপত্র দ্রষ্টব্য।
৭. *আল-আলাম* এবং উৎসগ্রন্থসমূহ, ১ম খণ্ড, ৩৩০ পৃষ্ঠা।
৮. *আল-ইসাবা*, ১ম খণ্ড, ৪৯ পৃষ্ঠা অথবা জীবনী ১৮৫।

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস

(উম্মতে মুহাম্মাদীর জ্ঞানসাগর)

> সন্দেহ নেই বয়সে সে একজন তরুণ। কিন্তু জ্ঞান-বুদ্ধি ও বিচক্ষণতায় সে প্রজ্ঞাবান প্রবীণ। ভীষণ কৌতূহলী ও জিজ্ঞাসু জবানের আর বুদ্ধিদীপ্ত এক হৃদয়ের অধিকারী সে।
>
> –উমর ইবনুল খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহু

এই মহান ও বিখ্যাত সাহাবী ছিলেন মর্যাদার সকল দিকের মালিক। মর্যাদার কোনো দিকেই ছিল না তার কোনো ঘাটতি।

সাহাবী হওয়ার মর্যাদা—বয়সে তরুণ হওয়া সত্ত্বেও তিনি প্রিয় নবীর 'সোহবত' বা সাহাবীত্বের মর্যাদা লাভ করেছিলেন। অথচ তার জন্মকাল আরও কিছু বিলম্ব হলে এই বিরল মর্যাদা লাভ করতে পারতেন না।

নবীজীর আত্মীয় হওয়ার মর্যাদা—নবীজীর আপন চাচাতো ভাই হওয়ার মর্যাদাও লাভ করেছিলেন।

ইলম ও জ্ঞানের মর্যাদা—তিনি লাভ করেছিলেন উম্মতে মুহাম্মাদীর জ্ঞানের সাগর উপাধী।

তাকওয়ার মর্যাদা—দিনে রোযাদার, রাতে ইবাদতগুজার, গভীর রাতে তাওবা ইস্তেগফারকারী, রোনাজারী ও কান্নাকাটি করতে করতে দুইগালে অশ্রুপাতের রেখা সৃষ্টি ইত্যাদি মর্যাদার অধিকারী।

এতক্ষণ যার কথা বলছি তিনি আর কেউ নন—তিনিই আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু। তিনিই উম্মতে মুহাম্মাদীর সর্বসেরা আলেম ও আরিফবিল্লাহ। আল্লাহর কিতাব কুরআনের সকল প্রকার জ্ঞানে, তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে তিনিই ছিলেন সর্বাধিক বিজ্ঞ। তিনিই ছিলেন সর্বাধিক দক্ষ। তিনিই ছিলেন কুরআনী জ্ঞানের জটিল ও গভীরস্তরে পৌঁছতে সর্বাধিক পারঙ্গম আর তার রহস্য ও উদ্দেশ্যসমূহ উপলব্ধির ক্ষেত্রে তিনিই ছিলেন সেরা পারদর্শী।

* * *

হিজরতের তিন বছর পূর্বে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের জন্ম হয়। যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাত হয় তখন তার বয়স ছিল মাত্র তেরো বছর অথচ তিনিই মুসলিমউম্মাহর কল্যাণে নবীজীর হাদীস মুখস্ত করেছিলেন একহাজার ছয়শো ষাটখানা। যেগুলো ইমাম *বুখারী* ও *মুসলিম* তাদের সহীহ হাদীসগ্রন্থ দুটোতে সংযোজন করেছেন।

* * *

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর তাঁর মা তাকে দুধ না দিয়ে সর্বপ্রথম নিয়ে আসেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে। নবীজী নিজের পবিত্র লালা দিয়ে তার 'তাহনীক' করেন। (খেজুর চিবিয়ে শিশু-বাচ্চার মুখে তুলে দেন।) ফলে শিশুটির পেটে সর্বপ্রথম যা প্রবেশ করে তা হলো প্রিয় নবীর পবিত্র ও মুবারক লালা। আর একই সঙ্গে তাঁর অন্তরে প্রবেশ করে তাকওয়া ও হিকমতের অমূল্য দৌলত।

وَمَنْ يُّؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيْرًا

'যাকে হিকমত দান করা হয়, প্রকৃতপক্ষে তাকে দানকরা হয় প্রচুর কল্যাণ'। –সূরা বাকারা : ২৬৯

* * *

শৈশব পেরিয়ে সাত আট বছর বয়সে উপনীত হতে না হতেই এই হাশেমী বালক সারাক্ষণ প্রিয় নবীর নিবিড় সাহচর্যকে আঁকড়ে থাকা সর্বাধিক পছন্দ করে নিলেন।

প্রয়োজনের সময় তিনি প্রিয় নবীর অজুর পানি নিয়ে হাজির হয়ে যেতেন।

নবীজী নামাযে দাঁড়ালে তিনিও তাঁর পেছনে দাঁড়িয়ে নামায শুরু করতেন।

নবীজী সফরে বেরুলে তিনিই হতেন সফরসঙ্গী এবং একই বাহনে তাঁর পেছনে আরোহী।

এভাবেই একসময় তিনি হয়ে পড়লেন প্রিয় নবীর নিত্যসঙ্গী। নবীজী যেখানেই যেতেন তিনিও সেখানেই যেতেন। ছায়ার মতো সারাক্ষণ তাঁকে অনুসরণ করতেন। নবীজী আপন কক্ষপথে (নবুওয়াতের কর্তব্য কাজে) যেভাবে অবর্তিত হতেন তিনিও সেভাবেই অবর্তিত হতেন।

এই সকল অবস্থার ভেতর দিয়ে তিনি প্রিয় নবীর প্রত্যেকটা কথা, কাজ, রুচি-পছন্দ জেনে নিতেন। সর্বাধুনিক রেকর্ডার যন্ত্রের চেয়েও বেশি কার্যকর তার স্মৃতি, নির্মল মেধা ও সংরক্ষণকারী হৃদয়ে সবকিছু আত্মস্থ করে রাখতেন।

* * *

তিনি নিজ জীবনের একটি স্মরণীয় ঘটনার বর্ণনা করেন এভাবে,

'একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অজু করার জন্য মনস্থির করলেন। মুখে কিছু না বললেও আমি তাঁর মনোভাব আঁচ করতে পেরে অতিদ্রুত তাঁর সামনে অজুর পানি হাজির করলাম। আমার এই কাজে তিনি খুব খুশি হলেন।'

তিনি নামাযে দাঁড়ানোর প্রস্তুতি নিলে ইঙ্গিতে আমাকে তাঁর পাশে দাঁড়াতে বললেন। কিন্তু আমি দাঁড়ালাম তাঁর পেছনে।

নামায শেষ করে তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আবদুল্লাহ! আমার পাশে দাঁড়াতে তোমার অসুবিধা কী?'

আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমার দৃষ্টিতে অনেক মহান, অনেক উঁচু মর্যাদার। আমি কিভাবে আপনার পাশে দাঁড়াব! আমার কাছে সেটা বেয়াদবি মনে হলো।'

এসব কিছু শুনে তিনি দু'হাত তুলে দুআ করলেন,

أَللّٰهُمَّ آتِهِ الْحِكْمَةَ

'হে আল্লাহ! তুমি তাকে হিকমত ও প্রজ্ঞা দাও। তাকে বানাও বিচক্ষণ ও দূরদর্শী।'

আল্লাহ তাআলা তাঁর নবীর এই দুআ কবুল করেন। তিনি এই হাশেমী বালককে এত হিকমত দান করেন, যার কারণে তিনি পৌঁছে গেলেন খ্যাতিমান, জ্ঞানী-গুণীর শীর্ষস্থানে।

আমার সন্দেহ নেই যে এবার আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের কিছু হিকমত ও বিচক্ষতার কথা জানতে আপনার খুব ইচ্ছা হচ্ছে। তাহলে চলুন, আপনার ইচ্ছা কিছুটা এখানে পূরণ হোক।

* * *

হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং হযরত মুআবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহুর মাঝে যুদ্ধ ও বিরোধের সময় কিছু মানুষ হযরত আলী

রাযিয়াল্লাহুর পক্ষ ত্যাগ করে চলে গেল। সে সময় হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বললেন,

'হে আমীরুল মুমিনীন! আমাকে ঐ পক্ষত্যাগকারীদের কাছে যাওয়ার এবং কথা বলার অনুমতি দিন।'

আলী রাযিয়াল্লাহু বললেন, 'আমার আশঙ্কা হচ্ছে যে, ওরা তোমার কোনো ক্ষতি করে বসবে।'

ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'ইনশাআল্লাহ তারা কিছুই করতে পারবে না।'

অনুমতি নিয়ে তিনি চলে গেলেন তাদের কাছে। দেখলেন সবাই ইবাদত-বন্দেগীতে অত্যন্ত কঠোর সাধনায় লিপ্ত। ঐ রকম কঠোর সাধনা তিনি আর কাউকে কখনো করতে দেখেননি।

ফারেগ হওয়ার পর তারা তাকে স্বাগতম জানিয়ে বললেন,

'মারহাবা হে ইবনে আব্বাস! বলুন আপনার কী সেবা করতে পারি! কী উদ্দেশ্যে আপনার এই অগমন?'

তিনি সরাসরি উত্তর দিলেন,

'তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করতে এসেছি।'

আলোচনার কথা শুনেই একদল বলে উঠল,

'খবরদার তার সঙ্গে কেউ আলোচনায় যেয়ো না।' কিন্তু এদের কথা গ্রহণযোগ্য হলো না।

অন্যদল বলল, 'বলুন, আপনি কী বলতে চান, আমরা আপনার কথা শুনব।'

তিনি বললেন,

'আমি তোমাদের কাছে জানতে চাই আল্লাহর রাসূলের চাচাতো ভাই, তাঁর মেয়ের স্বামী এবং সর্বপ্রথম তাঁর প্রতি ঈমানগ্রহণকারী ব্যক্তির প্রতি

তোমাদের শত্রুতার কারণ কী? তার অপরাধ কী? কেন তোমরা তাঁকে ত্যাগ করেছ?'

তারা জানাল,
'তিনটি অভিযোগের কারণে আমরা তাঁকে ছেড়ে চলে এসেছি।'

'কী সেই অভিযোগগুলো?'

'তাঁর ও মুআবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহুর বিরোধ মীমাংসার জন্য তিনি দুই ব্যক্তিকে বিচারক মেনে নিয়ে ইসলামের সীমা লঙ্ঘন করেছেন।'

'তিনি আয়েশা ও মুআবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহুমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন। অথচ তিনি এই যুদ্ধ থেকে 'গনিমতের মাল গ্রহণ' এবং পরাজিতদের 'বন্দী বানানো'-কে অবৈধ ঘোষণা করেছেন।'

তিনি নিজের নাম থেকে 'আমীরুল মুমিনীন' উপাধি বর্জন করেছেন। অথচ মুসলিমজাতি তাঁর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেছে এবং তাঁকেই আমীর মনোনীত করেছে।'

তাদের আলোচিত অভিযোগ তিনটি শোনার পর আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু জিজ্ঞাসা করলেন,

'আচ্ছা, আমি যদি কুরআন ও হাদীসের অকাট্য দলিল-প্রমাণ দ্বারা তোমাদের অভিযোগগুলো খণ্ডন করে দিই, তাহলে কি তোমরা শত্রুতা ত্যাগ করে আবার তাঁর দলে যোগ দেবে?'

তারা সবাই সম্মতি জানিয়ে বলল, 'হ্যাঁ।'

তিনি এবার নিজের বক্তব্য ও যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপন শুরু করলেন। তিনি বললেন, তোমরা বলেছ 'তিনি দুই ব্যক্তিকে বিচারক মেনে নিয়ে ইসলামের সীমা লঙ্ঘন করেছেন' আমি তো এতে কোনো সীমা লঙ্ঘন দেখি না। তোমরা সূরা মায়িদার ৯৫ নং আয়াতটি পড়ে দ্যাখো। আল্লাহ তাআলা বলছেন,

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَاَنْتُمْ حُرُمٌ ۭ وَمَنْ قَتَلَهٗ مِنْكُمْ مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاۗءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهٖ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ هَدْيًۢا بٰلِغَ الْكَعْبَةِ...

'হে ঈমানদারগণ! ইহরামের অবস্থায় কোনো শিকার হত্যা করো না। তোমাদের কেউ যদি ইচ্ছাকৃত ভাবে তা হত্যা করে তাহলে সেই শিকারের সমপরিমাণ একটি জন্তু তাকে বিনিময় হিসাবে কুরবানী করতে হবে। সে সম্পর্কে ফয়সালা করবে তোমাদের মধ্য থেকে দু'জন সু-বিচারক ব্যক্তি।' –সূরা মায়িদা : ৯৫

আয়াতের মধ্যে আল্লাহ তাআলা ইহরাম অবস্থায় কোনো শিকার হত্যার ক্ষতিপূরণ নির্ধারণের জন্য দু'জন সু-বিচারকের ফয়সালা নিতে বলেছেন।

আমি আল্লাহর দোহাই দিয়ে তোমাদের কাছে জানতে চাই, 'সিকি দেরহাম মূল্যের কোনো খরগোশের কারণে দু'জন মানুষকে বিচারক মেনে নেওয়া বেশি যুক্তিসঙ্গত নাকি মুসলিম-জনগোষ্ঠির জান-মাল হেফাজত এবং তাদের বিরোধ মীমাংসার উদ্দেশ্যে দু'জন ব্যক্তিকে বিচারক মানা?

তারা স্বীকার করে নিয়ে বললেন, 'অবশ্যই মুসলিম-জনগোষ্ঠীর জান-মাল হেফাজত এবং তাদের বিরোধ মীমাংসার উদ্দেশ্যে বিচারক মেনে নেওয়া বেশি যুক্তিসঙ্গত।'

কুরআনের দলিল দিয়ে তিনি তাদের প্রথম অভিযোগ খণ্ডন করলেন এবং প্রমাণ করলেন যে, দু'জন ব্যক্তিকে বিচারক মেনে নিয়ে আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু ইসলামের সীমা লঙ্ঘন করেননি।

এবার তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'প্রথম অভিযোগ সম্পর্কে আলোচনা কি যথেষ্ট হয়েছে?'

তারা উত্তরে বললেন, 'অবশ্যই এ ব্যাপারে আপনার আলোচনা সন্তোষজনক ও যথেষ্ট।'

তাদের দ্বিতীয় অভিযোগ সম্পর্কে তিনি বলতে শুরু করলেন,

'তোমরা বলেছ, আলী [রাযিয়াল্লাহু আনহু] যুদ্ধ করেছেন কিন্তু পরাজিতদের বন্দী করতে নিষেধ করেছেন। অথচ খোদ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটা করতেন।'

তোমরা কি চেয়েছিলে যে 'তোমাদের মা আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহাকে বন্দী করা হোক আর তোমরা তাঁকে দাসী-বাঁদির মতো হালাল মনে করতে থাক যেমনটি অপরাপর দাসী-বাঁদির সঙ্গে করা হতো রাসূলের যুগে?'

তিনি বললেন, এর উত্তরে তোমরা যদি বলো হ্যাঁ, তাহলে সন্দেহাতীতভাবে তোমরা কাফের হয়ে যাবে আর যদি তোমরা আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহাকে 'মা' মানতে অস্বীকার করো তাহলেও কাফের হয়ে যাবে। কারণ আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেছেন,

اَلنَّبِيُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَاَزْوَاجُهٗۤ اُمَّهٰتُهُمْ

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মুমিনদের কাছে নিজেদের প্রাণের চেয়েও বেশি আপন আর তাঁর স্ত্রীগণ তাদের মা।'

–সূরা আহযাব : ৬

উক্ত দুই উত্তরের কোনটিকে তোমরা গ্রহণ করবে? সকলেই একেবারে লা-জবাব হয়ে রইল। কারও মুখে কোনো কথা জুটল না।

তারা বলল, 'সত্যিই আপনার আলোচনা সন্তোষজনক এবং যথেষ্ঠ।'

এবার তিনি তাদের তৃতীয় অভিযোগ নিয়ে আলোচনা শুরু করলেন। বললেন,

তোমরা বলেছ 'আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু নিজের নাম থেকে 'আমীরুল মুমিনীন' উপাধী বর্জন করেছেন।'

এক্ষেত্রে আমি তোমাদের 'হুদাইবিয়া'-র সন্ধিচুক্তির কথা স্মরণ করতে অনুরোধ করছি। মক্কার কাফের-মুশরিকদের সঙ্গে সম্পাদিত সেই চুক্তিপত্রের ঘোষণায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লিখতে বলেছিলেন 'এই সন্ধিচুক্তি সম্পাদিত হচ্ছে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ এবং...' এই কথার ঘোর বিরোধিতা করে কাফেররা বলল, আমরা যদি আপনাকে 'রাসূলুল্লাহ' বলে বিশ্বাস করতাম তাহলে আপনাকে মক্কায় প্রবেশ করতে বাধা দিতাম না এবং আপনার বিরুদ্ধে লড়াই করতাম না। অতএব 'রাসূলুল্লাহ' শব্দ বাদ দিতে হবে আর সেখানে লিখতে হবে 'মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ...'। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের দাবি মেনে নিলেন। তারা যেমন চাইল তেমনই লিখতে সম্মত হয়ে বললেন,

وَاللهِ إِنِّيْ لَرَسُوْلُ اللهِ وَإِنْ كَذَّبْتُمُوْنِيْ

'আল্লাহর কসম! আমি অবশ্য অবশ্যই আল্লাহর রাসূল তোমরা আমাকে যতই অবিশ্বাস করো না কেন।'

ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু জানতে চাইলেন,

'তোমাদের তৃতীয় অভিযোগ খণ্ডনে দলিল-প্রমাণ কি সন্তোষজনক এবং যথেষ্ঠ হয়েছে?'

তারা বললেন, 'সত্যিই আপনার যুক্তি-প্রমাণ, আলোচনা খুবই সন্তোষজনক এবং যথেষ্ট।'

জ্ঞানসাগর হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুর এই সাক্ষাৎ এবং সাক্ষাৎকালে প্রদর্শিত তাঁর চূড়ান্ত প্রজ্ঞা, বিচক্ষণতার সুফল হলো, বিশ হাজার যোদ্ধা ফিরে এসে আবার যোগ দিলেন আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর সেনাদলে। তবে দুর্ভাগ্যজনক ভাবে জিদ ও একগুঁয়েমি করে আরও চার হাজার সৈনিক থেকে গেল তাঁর শত্রুশিবিরের অন্তর্ভুক্ত হয়ে।

* * *

ইল্‌ম পিপাসু (বিদ্যানুরাগী) তরুণ আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু ইল্‌ম হাসিলের সকল পথ পারি দিয়েছেন। ইল্‌ম ও জ্ঞানার্জন করার জন্য সকল প্রকার চেষ্টা ও সাধনা করেছেন। কোনো কষ্ট ও ক্লেশকেই তিনি ভয় পাননি।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যতদিন বেঁচে ছিলেন ততদিন তিনি ইলমের পিপাসা নিবারণ করেছেন খোদ তাঁরই জ্ঞানের অমিয় সুধা পান করে। যখন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই পৃথিবীর মায়া ছেড়ে পাড়ি জমালেন আপন প্রভুর সান্নিধ্যে তখন তিনি শরণাপন্ন হলেন জীবিত ‘উলামা’ সাহাবায়ে কেরামের। শুরু করলেন তাঁদের কাছ থেকেই জ্ঞানার্জন ও ইল্‌ম হাসিলের ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। তিনি নিজের জ্ঞানার্জনের কাহিনী বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন,

‘আমি জানতে পারলাম, রাসূলুল্লাহর এক সাহাবীর কাছে বিশেষ একটি হাদীস আছে। সঙ্গে সঙ্গে হাদীসটি শেখার উদ্দেশ্যে আমি তাঁর বাড়ির দুয়ারে হাজির হয়ে গেলাম। সময়টি ছিল দুপুরের খাবার শেষে তাঁর বিশ্রাম গ্রহণের। আমি তাঁর ঘরের চৌকাঠের সামনে চাদরকে বালিশ বানিয়ে শুয়ে পড়লাম। মরুর দমকা হাওয়া একটু একটু করে আমার ওপর বালির স্তুপ জমিয়ে ফেলল। আমি যদি তার কাছে ভেতরে প্রবেশের অনুমতি চাইতাম তাহলে অবশ্যই তিনি খুশি হয়ে আমাকে ঘরের মধ্যে নিয়ে বসাতেন। কিন্তু আমি সেটা না করে বাহিরে এভাবে কষ্ট করেছি যেন তিনি নির্বিঘ্নে বিশ্রাম সারতে পারেন এবং শরীর ও মনে প্রফুল্লতা লাভ করেন।

তিনি স্বাভাবিক নিয়মে বাড়ি থেকে বের হয়ে আমাকে এভাবে বালির স্তুপের নিচে শুয়ে থাকতে দেখে ব্যাকুল হয়ে বললেন,

‘হে রাসূলুল্লাহর চাচাতো ভাই! আপনি কী উদ্দেশ্যে এখানে?! কেন আপনি আমাকে সংবাদ পাঠাননি, আমিই চলে আসতাম আপনার কাছে?’

আমি বললাম, 'আমি তো শিখতে এসেছি। সুতরাং আপনার কাছে আমার আসাটাই অধিক সঙ্গত। কারণ ইল্‌ম (এবং ইল্‌মওয়ালা আলেম)এর কাছে তৃষ্ণা নিয়ে হাজির হতে হয়। ইল্‌ম (এবং ইল্‌মওয়ালা আলেম) কখনো কারও কাছে উপযাচক হয়ে যায় না।' এরপর তাঁর কাছ থেকে হাদীসটি শিখে নিলাম।

* * *

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুর যেমন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল ইলমের জন্য নিজেকে একেবারে বিলীন ও তুচ্ছ করে দেওয়া। একইভাবে তাঁর চরিত্রেরই আর এক বৈশিষ্ট্য ছিল আলেমদের সর্বোচ্চ মর্যাদা দেওয়া। মদীনার শ্রেষ্ঠ বিচারক, ফিকাহশাস্ত্রের প্রধান ব্যক্তিত্ব, ইলমে কেরাতের শ্রেষ্ঠ ইমাম, ফারায়েযশাস্ত্রের সর্বশ্রেষ্ঠ শাস্ত্রজ্ঞ এবং 'ওহী লেখক' সাহাবী যায়েদ ইবনে সাবেত রাযিয়াল্লাহু আনহুর সঙ্গে হযরত ইবনে আব্বাসের আচরণ থেকেই বিষয়টি স্পষ্ট ফুটে উঠেছে। যায়েদ ইবনে সাবেত তাঁর বাহনে উঠতে যাবেন এমন সময়ে হাশেমী তরুণ আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস তাঁর বাহনের লাগাম ধরেন আর বাহনে ওঠার রেকাব (পা দানি) শক্ত করে ধরে তার সামনে এমন ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রইলেন যেমন করে গোলাম দাঁড়িয়ে থাকে মনিবের সামনে।

এসব দেখে যায়েদ ইবনে সাবেত বললেন, 'হে রাসূলুল্লাহর চাচাত ভাই! দয়া করে আপনি এসব করবেন না। সরে যান।'

ইবনে আব্বাস বললেন, 'আলেমদের প্রতি এভাবেই সম্মান দেখানোর নির্দেশ রয়েছে আমাদের প্রতি।'

যায়েদ বললেন, 'আপনার হাতখানা একটু দেখি...'

ইবনে আব্বাস নিজের হাত বাড়িয়ে ধরলেন তাঁর সামনে। তখন যায়েদ সেই দিকে ঝুঁকে হাতে চুমু দিয়ে বললেন, 'আমাদের নবীজীর আহলে বাইতদের প্রতি এভাবেই মুহাব্বত দেখানোর নির্দেশ রয়েছে আমাদের প্রতি।'

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু জ্ঞানার্জনের অবিরাম সাধনা চালিয়ে সকল প্রকার জ্ঞানে এমন পাণ্ডিত্য অর্জন করলেন যে বড় বড় জ্ঞানী-গুণী ও পণ্ডিতগণ তাঁর পাণ্ডিত্যে হতবাক হয়ে যেতেন। বিখ্যাত ও শ্রেষ্ঠ তাবেঈদের অন্যতম ব্যক্তিত্ব মাসরূক ইবনুল আজদা তাঁর সম্পর্কে মন্তব্য করেন,

'আমি যখন ইবনে আব্বাসের দৈহিক সৌন্দর্য দেখতাম তখন মনে মনে বলতাম তিনিই এযুগের শ্রেষ্ঠ সুদর্শন মানুষ...

যখন তিনি কোনো বিষয়ে আলোচনা করতেন তা শুনে আমি মনে মনে বলতাম, এ বিষয়ে তিনিই এ যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী। তাঁর মতো জ্ঞানী মানুষ আর একটিও নেই।'

* * *

যখন ইবনে আব্বাসের কাঙ্খিত জ্ঞানার্জনের ধারা পরিপূর্ণ হয়ে গেল তখন তিনি হয়ে গেলেন জ্ঞান বিতরণকারী মহান শিক্ষক। মানুষকে শিক্ষা প্রদানের কাজ শুরু করলেন আপনগৃহেই। এর ফলে তাঁর বাসগৃহ পরিণত হলো মুসলিমজাতির একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে। হ্যাঁ, অতিরঞ্জন নয় আধুনিক যুগে বিশ্ববিদ্যালয় শব্দটি যা বোঝায় তাঁর বাড়িটি তাই হয়ে গেল। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের বিশ্ববিদ্যালয় আর বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মাঝে পার্থক্য একটুকু যে, আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়-গুলোতে বিষয়ভিত্তিক আলাদা আলাদা শিক্ষক থাকেন—যার সংখ্যা হয় কয়েকশো। কিন্তু ইবনে আব্বাসের বিশ্ববিদ্যালয়ে সকল বিষয়ের শিক্ষক ছিলেন মাত্র একজন। আর তিনিই হলেন খোদ ইবনে আব্বাস।

তাঁর এক ছাত্র বর্ণনা করেন,

'একা একজনমাত্র ব্যক্তি ইবনে আব্বাসকে কেন্দ্র করে এত বিশাল শিক্ষার্থী দলের ভিড় এবং একাই তাঁকে এতগুলো বিষয়ে শিক্ষা দিতে দেখেছি যে কুরাইশের লোকেরা চাইলে সকলে মিলে এটাকে তাদের

বংশের গৌরব বলে প্রচার করতে পারত। কারণ, আমি দেখেছি ইবনে আব্বাসের বাড়িতে আসা যাওয়ার সবগুলো পথে শিক্ষার্থীদের ভিড় আর ঠেলাঠেলিতে অন্য মানুষের চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে। আমি ছুটে গিয়ে তাঁকে তাঁর বাড়ির আশপাশে এইরকম লোকারণ্যের সংবাদ দিয়েছি।

সব শুনে তিনি আমাকে বললেন, 'অজুর পানি দাও।' অজু করে নিজের আসনে বসে আমাকে বললেন, 'বাহিরে গিয়ে ঘোষণা দাও—যারা কুরআন এবং কেরাতের শিক্ষার্থী প্রথমে তারা ভেতরে আসুন।' আমি বাহিরে গিয়ে তাঁর ঘোষণা শুনিয়ে দিলাম। এতে এত মানুষ ভেতরে ঢুকল যে তাঁর ঘর-দুয়ার ভেতরের অঙিনাসহ ভরে গেল। শিক্ষার্থীদের যত প্রশ্ন ছিল সকল প্রশ্নের সমাধান দিলেন। পাশাপাশি প্রতিটা বিষয়ে অন্যান্য খুঁটিনাটিসহ সবিস্তারে আলোচনা করলেন। যাতে সকলেই তৃপ্ত হয়ে গেলেন। তখন এই দলকে তিনি অনুরোধের সুরে বললেন, 'এইবার দয়া করে অন্য ভাইদের ভেতরে আসার সুযোগ করে দিন।' সবাই বেরিয়ে গেলেন।

এবার তিনি আমাকে বললেন,

'বাহিরে গিয়ে ঘোষণা দাও—যারা কুরআনের তাফসীর ও তাবীল (ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ) শিক্ষার্থী তারা ভেতরে আসুন।'

আমি বাহিরে গিয়ে ঘোষণা দিলাম। তাতে এত শিক্ষার্থী ভেতরে এলেন যে বাড়ির ভেতরের আঙিনাসহ পূর্ণ হয়ে গেল। তাদের সকল জিজ্ঞাসার জবাব তুলে ধরলেন। উপরন্তু প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলোর বিশদ ব্যাখ্যা যোগ করে দিলেন। যাতে সকলেই সন্তুষ্ট ও তৃপ্ত হয়ে গেলেন। এবার তাদের অনুরোধ করলেন, 'দয়া করে অন্য ভাইদের ভেতরে আসার সুযোগ করে দিন।' তারা চলে গেলে তিনি আবার আমাকে বললেন,

'বাহিরে গিয়ে ঘোষণা দাও—যারা হালাল-হারাম ও ফিকাহশাস্ত্রের শিক্ষার্থী তারা ভেতরে আসুন।' আমি বাহিরে গিয়ে ঘোষণা শোনানোর

পর এতলোক ভেতরে প্রবেশ করলেন যে বাড়ি-ঘর একেবারে আঙিনাসহ পূর্ণ হয়ে গেল। তারা যত প্রশ্ন করলেন, তিনি একে একে প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তর দিলেন। সঙ্গে তিনি আনুষাঙ্গিক আরও অনেক বিষয় যোগ করে শিক্ষার্থীদের জ্ঞানভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করে দিলেন। এরপর তাদের অনুরোধ করলেন, 'দয়া করে অন্য ভাইদের জন্য সুযোগ করে দিন।' তারা সবাই বেরিয়ে গেলেন।

তিনি এবার আমাকে বললেন, 'বাহিরে গিয়ে ঘোষণা দাও—ফরায়েয এবং এ জাতীয় বিষয় নিয়ে যারা এসেছেন তারা যেন ভেতরে প্রবেশ করেন।'

আমি বাহিরে গিয়ে ঘোষণা শুনিয়ে দিলাম। এত মানুষ প্রবেশ করলেন যে ঘর-বাড়ি আঙিনাসহ পূর্ণ হয়ে গেল। তাদের সকল প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার পর এ বিষয়ে নিজস্ব আলোচনা ও বক্তব্য তুলো ধরে তাদেরও বিদায় জানালেন। তারা সবাই বেরিয়ে গেলেন।

এরপর তিনি আমাকে বললেন, 'এবার বাহিরে গিয়ে ঘোষণা দাও—যারা আরবী কাব্য ও কবিতা, আরবী ভাষা ও সাহিত্যের দুর্লভ বিষয়গুলো জানতে চায় তারা ভেতরে আসুন।'

একইভাবে লোকজন কানায় কানায় ভরে গেল ঘর ও বাড়ির আঙিনায়। লোকজন প্রশ্ন করলেন। তিনি সকল প্রশ্নের সন্তোষজনক জবাব দিলেন। নিজের পক্ষ থেকে আলোচনা ও বক্তব্য দিয়ে ক্লাশ শেষ করলেন।

বর্ণনাকারী বলেন,

কুরাইশ বংশের লোকেরা যদি এটা নিয়ে গৌরব করত তাহলে করতেই পারত। কেননা, এটা গৌরব করার মতোই বিষয়।'

* * *

ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু চিন্তা করলেন, এই রকম ভিড় ও ঠেলাঠেলি যেন না হয় সে উদ্দেশ্যে বিশেষ ব্যবস্থা করতে হবে। তিনি

সিদ্ধান্ত নিলেন একেক বিষয় একেক দিনের জন্য নির্ধারিত করে বিষয় ও দিনের সূচি করবেন। সে হিসাবে সপ্তাহে একদিন তিনি শুধু তাফসীরের আলোচনা পেশ করতেন।

একদিনের বিষয় হতো শুধু ইলমে ফিকাহ।

পরেরদিন আলোচনা করতেন শুধু মাগাযী। (রাসূলের জীবদ্দশায় সংঘটিত যুদ্ধগুলো)

একদিন আরবী কবিতা আর একদিন শুধু আরব্য ইতিহাস।

যেকোনো আলেম তাঁর মজলিসে বসলেই তাঁর ভক্তে পরিণত হতেন।

যে কোনো প্রশ্নকারীই তাঁর জবাব শুনলে খুশি ও সন্তুষ্ট হয়ে যেতেন।

* * *

ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বয়সে নবীন হলেও অসাধারণ জ্ঞান, বুদ্ধি, পাণ্ডিত্য ও মেধার গুণে খেলাফতে রাশেদার একজন গুরুত্বপূর্ণ উপদেষ্টা মনোনীত হন।

দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহু যখন কোনো কঠিন ও জটিল সমস্যায় পড়তেন তখন তিনি পরামর্শের জন্য ডেকে পাঠাতেন ইসলামগ্রহণে অগ্রগামী অভিজ্ঞ ও প্রবীণ সাহাবায়ে কেরামকে। আর সেই সঙ্গে ডাকতেন অল্পবয়সী আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুকেও। এ সকল গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ সভায় আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু হাজির হলে খলীফা উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে খুবই সম্মান দেখিয়ে নিজের কাছে নিয়ে বসাতেন আর বলতেন,

'আমি খুবই জটিল সমস্যায় পড়ে গেছি। এই জটিলতা থেকে মুক্তির উপায় হিসাবে তোমার বিশেষ মতামত ও পরামর্শটাও আমি পেতে চাই।'

একবার খলীফা উমরকে সমালোচনার মুখে পড়তে হলো এই তরুণ-বয়েসীকে গুরুত্ব দেওয়া এবং তাকে প্রবীণদের সঙ্গে শামিল করার কারণে। সমালোচকদের জবাবে খলীফা বললেন,

'সন্দেহ নেই বয়সে সে একজন তরুণ। কিন্তু জ্ঞান-বুদ্ধি ও বিচক্ষণতায় সে প্রজ্ঞাবান প্রবীণ। ভীষণ কৌতূহলী আর জিজ্ঞাসু জবান আর বুদ্ধিদীপ্ত এক হৃদয়ের অধিকারী সে।'

* * *

ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বিশিষ্টব্যক্তিবর্গ অর্থাৎ ইল্‌ম ও জ্ঞানপিপাসুদের কুরআন, হাদীস ও ফিকহের শিক্ষাদানে আত্মনিয়োগ করলেও সর্বসাধারণের প্রতি নিজের কর্তব্যের কথা কখনো ভুলে যাননি। তাদের উদ্দেশ্যে তিনি ওয়াজ ও নসীহতের মজলিস কায়েম করতেন।

পাপাসক্তদের জন্য প্রদত্ত তাঁর নসীহতের একটি উদাহরণ :

'হে পাপের প্রতি আসক্ত বন্ধুরা! তোমার পাপের শাস্তি ও পরিণতির ব্যাপারে নিশ্চিন্ত ও নিরাপদ হয়ে যেয়ো না। মনে রেখো, গুনাহ আনুষঙ্গিক যে ব্যাপারগুলো টেনে নিয়ে আসে সেগুলো মূল গুনাহর চেয়েও ভয়ঙ্কর।

গুনাহ্‌র কাজে লিপ্ত থাকার কালে তুমি ডান ও বাম কাঁধের ফেরেশতাদের লজ্জা পাও না। তোমার এই নির্লজ্জতা মূল গুনাহর চেয়েও কম নয়।

তোমার পাপের কারণে তোমার সঙ্গে আল্লাহ কী আচরণ করেবেন (শাস্তি দেবেন না ক্ষমা করবেন?) সেটা না জেনেই তোমার হাসি-তামাশা মূল গুনাহটির চেয়েও ভয়ঙ্কর।

পাপের কাজটি করতে পেরে তোমার আনন্দবোধ করা মূল পাপের চেয়েও মারাত্মক পাপ।

গুনাহর কাজ করতে না পেরে দুঃখবোধ করা মূল গুনাহের চেয়েও মারাত্মক গুনাহ।

পর্দার আড়ালে গুনাহ করার সময়ে বাতাসে পর্দা নড়লে তুমি অতঙ্কিত হও কেউ জেনে গেল কিনা—সেই ভয়ে। অথচ আল্লাহ তাআলা তোমার দিকে তাকিয়ে আছেন—এই কথা ভেবে তোমার হৃদয় এতটুকুও ব্যাকুল হয় না! এই না হওয়া মূল গুনাহর চেয়েও মারাত্মক গুনাহ।

হে পাপাসক্ত বন্ধু! তুমি কি জানো আল্লাহ তাআলা আইয়ূব আলাইহিস সালামকে কেন কঠিন শারীরিক ও আর্থিক বিপদে ফেলে পরীক্ষা নিয়েছিলেন? আল্লাহর কাছে তাঁর ভুল কতটুকু ছিল?

জনৈক অসহায় ব্যক্তি তাঁর কাছে জালেমের বিরুদ্ধে সাহায্য চাইতে এসেছিলেন। তিনি সাহায্য করেননি। এটুকুই ছিল তাঁর ভুল।'

* * *

ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু সেইসব লোকের দলভুক্ত ছিলেন না, যারা অন্যকে ভালো কাজের কথা বলে বেড়ায় কিন্তু নিজে তা করে না। অন্যকে মন্দকাজ করতে নিষেধ করে কিন্তু নিজে তা থেকে বিরত থাকে না। বরং তিনি ছিলেন নিজ আমলের ক্ষেত্রে অনন্য দৃষ্টান্ত। সারাদিন রোযা আর রাতভর নামায ছিল তাঁর সারাজীবনের অভ্যাস।

আবদুল্লাহ ইবনে আবী মূলাইকা তাঁর সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন,

'মক্কা থেকে মদীনায় সফর করার সময় আমি ছিলাম আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের সঙ্গী। আমরা যখন যাত্রা বিরতি দিয়ে কোনো মনযিলে থামতাম, সফরের ভীষণ ক্লান্তি নিয়ে অন্য সকলে যখন গভীর ঘুমে বিভোর থাকত তখন তিনি দীর্ঘ নামাযে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতেই রাত ভোর হয়ে যেত।

কোনো একরাতে দেখলাম তিনি নামাযে তেলাওয়াত করছেন :

وَجَآءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذٰلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيْدُ

'মৃত্যুর যন্ত্রণা চরম সত্য হয়ে হাজির হয়ে গেল। (বলা হবে) এটা তোমার সেই মৃত্যু যা থেকে পালিয়ে বেড়াতে।' –সূরা কাফ : ১৯

বারবার এই আয়াত তেলাওয়াত করছিলেন আর খুব কান্নাকাটি করছিলেন। এই তেলাওয়াত ও কান্নাকাটির মধ্য দিয়েই ফজরের সময় হয়ে গেল।

এতসব আলোচনার পর সংক্ষেপে আমরা তাঁর সম্পর্কে এইটুকু জেনে রাখি যে, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন সেরা সুদর্শন, আকর্ষণীয় চেহারার অধিকারী। কিন্তু রাতভর তিনি আল্লাহর ভয়ে এত বেশি কান্নাকাটি করতেন যে, অবিরাম ধারায় ঝরা অশ্রুমালা তাঁর দুই গালে কালো দুটো দাগ সৃষ্টি করে ফেলেছিল।

ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু ইলমের সর্বোচ্চ মর্যাদার শিখরে পৌছে গিয়েছিলেন। তাঁর এই বিরল মর্যাদা শুধু কেবল নিজ দেশে নয়, ছড়িয়ে পড়েছিল গোটা মুসলিমবিশ্বের সর্বত্র।

মুসলিম-দুনিয়ার খলীফা মুআবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান রাযিয়াল্লাহু আনহুমা একবার হজ পালনের উদ্দেশ্যে মক্কায় এলেন। একই বছর হজ পালন করতে এলেন আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুমাও। তিনি ছিলেন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা, নেতৃত্বের প্রভাববলয় থেকে দূরে অবস্থানকারী সাধারণ জীবন-যাপনে অভ্যস্ত ব্যক্তিমাত্র। খলীফা মুআবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহুর সঙ্গে ছিল রাষ্ট্রক্ষমতার গুরুত্বপূর্ণ ও প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গের এক বিশাল বহর। কিন্তু আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুর কাছে সমবেত ইল্‌ম ও জ্ঞান পিপাসু ভক্তদের সংখ্যা খলীফার বহরকে করে দিয়েছিল ম্লান ও তুচ্ছ।

* * *

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু একাত্তর বছরের হায়াত লাভ করেছিলেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি ইল্ম ও হিকমাহ, শিক্ষা-দীক্ষা আর তাকওয়া-পরহেযগারীতে অপন যুগকে পরিপূর্ণ করে গিয়েছেন।

তাঁর মৃত্যুর পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবিত সাহাবায়ে কেরাম এবং শীর্ষস্থানীয় তাবেঈদের সমবেত জামাতে জানাযার ইমামতি করেন আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর পুত্র মুহম্মাদ ইবনুল হানাফিয়্যা[১]।

সকলে যখন তাঁকে দাফন করছিলেন তখন সকলেই শুনতে পেলেন অদৃশ্য কিন্তু স্পষ্ট কণ্ঠে কেউ তেলাওয়াত করছেন–

يَٰٓأَيَّتُهَا ٱلنَّفْسُ ٱلْمُطْمَئِنَّةُ ﴿٢٧﴾ ٱرْجِعِىٓ إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ﴿٢٨﴾ فَٱدْخُلِى فِى عِبَٰدِى ﴿٢٩﴾ وَٱدْخُلِى جَنَّتِى ﴿٣٠﴾

'হে নফসে মুতমাঈন্নাহ (প্রশান্তআত্মা!) ফিরে চলো তোমার প্রতিপালকের কাছে তাঁর সন্তুষ্টি নিয়ে আনন্দের সঙ্গে। তারপর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও আমার নেক বান্দাদের আর প্রবেশ করো আমার জান্নাতে।' –সূরা ফাজ্র : ২৭-৩০

---

১. মুহাম্মাদ ইবনুল হানাফিয়্যা–হযরত আলীর পুত্র হলেও 'ইবনে আলী' না বলে 'ইবনুল হানাফিয়্যা' বলার কারণ, তিনি হাসান, হুসাইনের মতো নবীকন্যা ফাতিমার সন্তান নন—এটা বুঝানোর জন্য। অর্থাৎ আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর অন্য স্ত্রী হানাফিয়্যার গর্ভের সন্তান। তাঁর সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পড়ুন *তাবেঈদের ঈমানদীপ্ত জীবন* : ২৪১পৃষ্ঠা।

তথ্যসূত্র :

১. *জামিউল উসূল*, ১০ম খণ্ড. ফাযায়িলুস সাহাবা অধ্যায়।
২. *আল-ইসাবাহ*, ২য় খণ্ড, ৩৩০ পৃষ্ঠা অথবা জীবনী ৪৭৮১।
৩. *আল-ইসতীআব*, (*আল-ইসাবার* টীকা) ২য় খণ্ড, ৩৫০ পৃষ্ঠা।
৪. উস্‌দুল *গাবাহ*, ৩য় খণ্ড, ২৯০ পৃষ্ঠা।
৫. *সিফাতুস সফওয়া*, (হালাব মুদ্রণ) ১ম খণ্ড, ৭৪৬ পৃষ্ঠা।
৬. *হায়াতুস সাহাবা*, (৪র্থ খণ্ডের সূচি দ্রষ্টব্য)।
৭. *আল-আলাম* ও তার উৎসসমূহ।

নুমান ইবনে মুকাররিন আল-মুযানী

নিশ্চয় কিছু পরিবার থাকে ঈমান চর্চার জন্য নিবেদিত আবার কিছু কিছু পরিবার থাকে নিফাক চর্চার জন্য উর্বর। নিঃসন্দেহে মুকাররিন গোত্রের পরিবারগুলো ঈমান চর্চার উপযোগী পরিবার।

—আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু

মক্কা থেকে মদীনা পর্যন্ত বিস্তৃত যে সড়কটি—মদীনার কাছাকাছি এই সড়কের পাশেই বাস করত বিখ্যাত 'মুযায়না' গোত্র।

ততদিনে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরত করে মদীনায় এসে গিয়েছেন। তাঁর নানা রকমের খবরাখবর 'মুযায়না'র লোকেরা শুনতে পেত আগমনকারী ও ফেরতযাত্রী দলের লোকজনের মুখে। মুযায়নার লোকেরা কখনো তাঁর কোনো মন্দ খবর পায়নি। যত কথা তারা শুনেছে সবই ভালো ও কল্যাণকর।

এক বিকালের কথা। মুযায়না গোত্রের সরদার নুমান ইবনে মুকাররিন আল-মুযানী তার ভাই ও বন্ধুদের সঙ্গে নিয়ে গোত্রের বয়োজ্যেষ্ঠ প্রবীণদের সঙ্গে অড্ডাখানায় বসে সময় কাটাচ্ছিলেন। হঠাৎ তিনি দৃঢ়স্বরে নিজের মনোভাব ব্যক্ত করে বললেন,

‘হে আমার কওমের লোকেরা! আল্লাহর কসম করে বলছি, এ পর্যন্ত মুহাম্মাদ সম্পর্কে যত কিছু শুনেছি তাতে বোঝা যায় তিনি অবশ্যই একজন মহান মানুষ। কোনো মন্দ সংবাদ তাঁর ব্যাপারে জানতে পারিনি। শুনেছি, তিনি মানুষকে পারস্পরিক সম্প্রীতি, ইনসাফ ও কল্যাণের শিক্ষা দিয়ে থাকেন। মানুষ দলে দলে তাঁর কাছে যাচ্ছে। তাঁর অনুসরণ করছে। তাহলে আমরা কেন অন্যদের থেকে পিছে পড়ে থাকব?’

তিনি বিরতি না দিয়েই নিজের সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দিলেন,

‘আমি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি, আগামীকাল সকালেই তাঁর কাছে গিয়ে হাজির হব। তোমরা কেউ যদি আমার সঙ্গে যেতে চাও তাহলে এই সময়ের মধ্যেই প্রস্তুত হয়ে থেক।’

নুমানের কথাগুলো কওমের লোকদের হৃদয়কে ছুঁয়ে গেল। নাড়িয়ে দিল তাদের আবেগ-অনুভূতিকে। ফলে ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতেই দেখা গেল মুযাইনা গোত্রের চারশো যোদ্ধা আর তার নিজের দশ ভাই মদীনায় রাসূলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আল্লাহর দীনে প্রবেশের জন্য তৈরি হয়ে এসেছে।

তবে নুমান এত বিশাল কাফেলা নিয়ে রাসূলের দরবারে খালি হাতে যেতে লজ্জাবোধ করলেন। তিনি মনে করলেন, রাসূলের জন্য এবং দরিদ্র মুসলমানদের জন্য কোনো উপঢৌকন নিয়ে যাওয়া উচিত।

কিন্তু মুযাইনা গোত্রের লোকজন তখন ছিল এমন চরম অনাবৃষ্টিজনিত অভাবের শিকার যে, তাদের হাতে না-ছিল কোনো ফসল, না-ছিল কোনো পালিত পশু।

তারপরও নুমান ইবনে মুকাররিন নিজের ঘরে ও ভাইদের প্রত্যেকের ঘরে ঘরে বারবার ঘুরে ঘুরে সংগ্রহ করলেন যৎসামান্য খাদ্যশস্য আর গুটিকয়েক ছোট ছোট বকরির বাচ্চা। দুর্ভিক্ষের পরও বেঁচে যাওয়া এই সামান্য সম্বল নিয়েই তিনি রওনা করলেন। রাসূলের দরবারে গিয়ে

হাদিয়া পেশ করলেন। তিনি নিজে এবং সকল সঙ্গী নবীজীর সামনে ইসলাম কবুল করার ঘোষণা দিলেন।

* * *

মদীনার একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত পর্যন্ত আলোড়ন সৃষ্টি হয়ে গেল। নুমান ইবনে মুকাররিন এবং তার সঙ্গীদের বিশাল কাফেলার আগমন ও ইসলাম গ্রহণের আনন্দ সংবাদে গোটা মদীনাবাসীর হৃদয় আন্দোলিত হলো। কারণ, ইতিপূর্বে একই পরিবারের এগারোজন সহোদর ভাই চারশো জন যোদ্ধাসহ একসঙ্গে এভাবে ইসলাম গ্রহণের গৌরব আরবের আর কোনো পরিবার অর্জন করতে পারেনি।

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নুমান ইবনে মুকাররিন রাযিয়াল্লাহু আনহুর ইসলাম গ্রহণের ফলে খুবই আনন্দিত হলেন।

আল্লাহ তাআলা তার উপঢৌকন কবুল করে আয়াত নাজিল করলেন,

وَمِنَ الْاَعْرَابِ مَنْ يُّؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبٰتٍ عِنْدَ اللّٰهِ وَصَلَوٰتِ الرَّسُوْلِ ؕ اَلَاۤ اِنَّهَا قُرْبَةٌ لَّهُمْ ؕ سَيُدْخِلُهُمُ اللّٰهُ فِيْ رَحْمَتِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

'আর মরুবাসীদের মাঝে এমন মানুষও রয়েছে যারা আল্লাহর প্রতি এবং পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে আর নিজেদের ব্যয় (উপঢৌকন)কে গণ্য করে আল্লাহর নৈকট্য এবং রাসূলের দুআ লাভের উপায় হিসাবে। মনে রেখো, সত্যিই তা তাদের জন্য নৈকট্য লাভের উপায়। আল্লাহ তাদের নিজ রহমতের অন্তর্ভুক্ত করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুণাময়।' –সূরা তাওবা : ৯৯

* * *

নুমান ইবনে মুকাররিন আল-মুযানী রাযিয়াল্লাহু আনহু ইসলাম গ্রহণের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সৈনিক হিসাবে তাঁর পতাকাতলে শামিল হয়ে যান এবং তাঁর জীবনকালে সকল জিহাদে উপস্থিত থাকেন। কোনো শিথিলতাকে প্রশ্রয় দেন না।

যখন মুসলিমজাহানের শাসনভার অর্পিত হলো আবু বকর সিদ্দীকের ওপর তখন নুমান ইবনে মুকাররিন রাযিয়াল্লাহু আনুহু তার কওম মুযাইনার সকল যোদ্ধাকে সঙ্গে নিয়ে দৃঢ়তার সঙ্গে অবস্থান নেন খলীফার পক্ষে। তাঁর এই সুদৃঢ় অবস্থান প্রথম খলীফার যুগে সূচিত আরবের বিভিন্ন গোত্রে ইসলাম ছেড়ে দেওয়ার ফিতনাকে সমূলে উৎখাতে ব্যাপক ভূমিকা রেখেছিল।

* * *

এরপর যখন উমর ফারুক রাযিয়াল্লাহু আনহু খলীফা নির্বাচিত হলেন তখন তাঁর শাসনকালেও নুমান ইবনে মুকাররিনের এমন ভূমিকা অব্যাহত ছিল—ইতিহাস আজও যার প্রশংসা ও গুণবর্ণনায় সরব হয়ে আছে।

* * *

কাদেসিয়া (ইরাকের বিখ্যাত অঞ্চল 'নাজাফ'-এর পশ্চিমে অবস্থিত একটি স্থান। যেখানে সাদ ইবনে আবী ওয়াক্কাসের নেতৃত্বে পারস্যবাহিনীর বিরুদ্ধে এক ভয়ঙ্কর যুদ্ধ সংঘটিত হয়।) যুদ্ধের কয়েকদিন পূর্বে মুসলিমবাহিনীর প্রধান সেনানায়ক সাদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস রাযিয়াল্লাহু আনহু পারস্যসম্রাট 'ইয়াযদাজুর্দ'র কাছে একটি প্রতিনিধিদল পাঠালেন। সম্রাটের কাছে ইসলামের আহ্বান পেশ করার উদ্দেশ্যে প্রেরিত এই দলের নেতৃত্বের ভার দিলেন নুমান ইবনে মুকাররিন আল-মুযানীর হাতে।

এই দল পারস্যসম্রাটের রাজধানী 'মাদায়েন'-এ পৌঁছার পর তার সঙ্গে সাক্ষাতের অনুমতি চাইল। সম্রাট তাদের ভেতরে প্রবেশের অনুমতি দিয়ে দোভাষীকে ডেকে নিয়ে বললেন,

'ওদের জিজ্ঞাসা করো, কিসের লোভে তোমরা আমাদের দেশে এসেছ? এতবড় সাহসই বা কোথায় পেলে—যা আমাদের বিরুদ্ধে লড়তে তোমাদের প্ররোচিত করল?! মনে হচ্ছে তোমাদের এই লোভ ও দুঃসাহসের কারণ তোমাদের ওপর আমাদের আঘাত করতে না চাওয়া এবং তোমাদের গণনায় না এনে অন্যদিকে আমাদের ব্যস্ত থাকা।'

নুমান ইবনে মুকাররিন রাযিয়াল্লাহু আনহু সঙ্গীদের বললেন,

'তোমরা চাইলে আমি তার কথার জবাব দেব আর তোমরা কেউ যদি কথা বলতে চাও, বলতে পারো। কোনো সমস্যা নেই।'

সকলেই এক বাক্যে বললেন,

'বরং আপনিই কথা বলুন।'

এরপর তারা সম্রাটকে বললেন,

'আমাদের মুখপাত্র হিসাবে ইনিই আমাদের কথা বলবেন। সুতরাং আপনি মনোযোগ দিয়ে তার কথা শুনুন।'

নুমান ইবনে মুকাররিন আল-মুযানী রাযিয়াল্লাহু আনহু আল্লাহ তাআলার হাম্‌দ ও সানা (প্রশংসা) এবং তাঁর নবীর প্রতি দরূদ ও সালাম পেশ করার পর বললেন,

'আল্লাহ তাআলা আমাদের কল্যাণের পথ দেখিয়েছেন আর সে পথে চলার আদেশ দিয়েছেন। তিনি আমাদের সকল অকল্যাণ চিনিয়ে দিয়ে সে পথে চলতে নিষেধ করেছেন।

তিনি আমাদের কাছে কথা দিয়েছেন যে, তিনি আমাদের দুনিয়া ও আখেরাতের সার্বিক কল্যাণ দান করবেন যদি আমরা তাঁর কথায় সাড়া দেই। তাঁকে মেনে চলি।

আর সত্যিই তাঁর কথায় সাড়া দেওয়ায়, তাঁকে মেনে চলায় অল্পদিনেই আল্লাহ তাআলা আমাদের অবস্থার ব্যাপক পরিবর্তন করে দেন। তিনি আমাদের অভাব দূর করে ঐশ্বর্য দান করেন। জিল্লত-অসম্মানকে ইজ্জত

ও সম্মানে পরিণত করেন। পারস্পারিক বিরোধ ও হানাহানিকে রূপান্তরিত করেছেন ভ্রাতৃত্ব ও সম্প্রীতিতে।

তিনি এর পাশপাশি আরও নির্দেশনা দান করেন, আমরা যেন মানুষকে আহ্বান করি কল্যাণের পথে আর এটা নিকট প্রতিবেশীদের দিয়েই যেন শুরু করি।

সুতরাং আমরা আপনাদেরকে আমাদের দীন ইসলাম ও এর আদর্শগ্রহণ করে নেওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি। দীন ইসলাম এমন এক যুগান্তকারী আদর্শ—যা কল্যাণকর সকল কর্মকাণ্ডকেই কল্যাণ বলে স্বীকার করে নেয় এবং তার প্রতি উদ্বুদ্ধ করে। আর মানব-সমাজের জন্য ক্ষতি ও অকল্যাণকর সকল আদর্শ ও কর্মকাণ্ডকেই ঘৃণা করতে এবং তা থেকে কঠোর ভাবে দূরে থাকতে নির্দেশ দেয়।

দীন ইসলাম তার অনুসরণকারী বিশ্বাসীদের কুফরীর অন্ধকার ও অন্যায় জীবন থেকে মুক্ত করে ন্যায়-ইনসাফ ও ঈমানের আলোর পথে পরিচালিত করে।

আপনারা যদি আমাদের কথা মেনে ইসলাম গ্রহণ করেন তাহলে দিক-নির্দেশনা দানকারী হিসাবে আমরা আপনাদের মাঝে রেখে যাব আল্লাহর কিতাব এবং তার নীতি-আদর্শে আপনাদের জীবনগড়ার শিক্ষা দিয়ে যাব, যেন তার (কুরআনের) আলোকে আপনারাই দেশ চালাতে পারেন। আপনাদেরকে আপনাদের মতো রেখে আমরা আমাদের মতো যেমন এসেছিলাম তেমনই চলে যাব।

আর যদি আপনারা আল্লাহর দীন ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন, তাহলে আমরা আপনাদের থেকে 'জিযিয়া' (অমুসলিম-নাগরিকের নিরাপত্তাপণ) আদায় করব এবং আমরা আপনাদের নিরাপত্তার দায়িত্ব গ্রহণ করব।'

এসব শুনে 'ইয়ায্দাজুর্দ' রাগে ও ক্ষোভে অগ্নিমূর্তি হয়ে বলল,

إِنِّيْ لَا أَعْلَمُ أُمَّةً فِيْ الْأَرْضِ كَانَتْ أَشْقَى مِنْكُمْ وَلَا أَقَلَّ عَدَدًا ، وَلَا أَشَدَّ فُرْقَةً ، وَلَا أَسْوَأَ حَالًا ...

'আমার নিশ্চিত বিশ্বাস—তোমাদের চেয়ে বেশি নিকৃষ্ট-দুর্দশাগ্রস্ত, পরস্পরে খুনখারাবিতে মত্ত, সংখ্যায় নগন্য এত জঘন্যজাতি পৃথিবীতে একটিও নেই।'

'এতদিন পর্যন্ত আমরা তোমাদের শাসনের বিষয়টি ন্যস্ত রেখে ছিলাম আমাদের অনুগত আঞ্চলিক (করদ) রাজ্যশাসকদের ওপর। আমাদের প্রতি তোমাদের বশ্যতা ও অধীনস্থতা এযাবৎকাল তারাই নিশ্চিত করত...'

এতটুকু বলার পর হঠাৎ কণ্ঠের ঝাঁঝ কিছুটা কমিয়ে এনে বললেন,

'যদি অভাব ও দারিদ্র তোমাদেরকে আমাদের দুয়ারে ধর্ণা দিতে বাধ্য করে থাকে তাহলে সেটা মুখ ফুটে বললেই আমরা তোমাদের প্রত্যেকের জন্য পর্যাপ্ত খাদ্য প্রদানের নির্দেশ দিয়ে দেব। এমনকি তোমাদের জন্য আমরা এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করব যে ধীরে ধীরে তোমাদের এলাকা শস্য-শ্যামল ও খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে উঠবে। তোমরা তোমাদের অভাবের কথা জানালে আমরা তোমাদের সর্দার ও নেতৃবর্গকেও উপযুক্ত পোশাকাদি ও কাপড়-চোপড় দেওয়ার ব্যবস্থা করব। সর্বোপরি আমরা তোমাদের জন্য এমন শাসক মনোনীত করব যিনি হবেন তোমাদের ব্যাপারে কোমল ও যত্নশীল।'

প্রতিনিধিদলের একজন তার এসকল অসংলগ্ন কথার উত্তরে এমন কিছু কথা বলে উঠলেন যাতে সম্রাটের ক্রোধের আগুন আবার দাউদাউ করে জ্বলে উঠল এবং রাগের মাথায় তিনি বললেন,

لَوْلَا أَنَّ الرُّسُلَ لَا تُقْتَلُ لَقَتَلْتُكُمْ ......

'দূত হত্যা যদি নিষিদ্ধ না হতো তাহলে আজ তোমাদের মেরে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে ফেলতাম।'

যেহেতু সেটা অসম্ভব সুতরাং এই মুহূর্তেই তোমরা আমার সামনে থেকে বিদায় হও। তোমাদের সেনাপতিকে গিয়ে বলো, আমি তোমাদের শায়েস্তা করতে পারস্যসম্রাটের সেনাপতি 'রুস্তম'কে পাঠাচ্ছি। সে তাকে এবং তোমাদের সকলকে মেরে 'কাদেসিয়া'-র গর্ত ও খানাখন্দে পুঁতে রাখবে।'

এরপর তার নির্দেশে এক ঝুড়ি মাটি আনা হলো। তিনি নিজের লোকদের হুকুম দিয়ে বললেন,

'এদের মধ্যে যে সবচেয়ে বেশি সম্মানী, তার মাথায় এই মাটির ঝুড়ি তুলে দিয়ে জনসম্মুখে ঘুরিয়ে রাজধানীর প্রধান ফটক দিয়ে তেঁড়ে বের করে দাও।'

নির্দেশমতো সম্রাটের লোকেরা প্রতিনিধি দলকে জিজ্ঞাসা করল,

'তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানী ব্যক্তি কে?'

আসেম ইবনে উমর অন্য সকলকে এই অবমাননা থেকে বাঁচানোর জন্যে আগেভাগে সামনে এসে বললেন, 'আমি।'

অতএব, ঐ মাটির ঝুড়ি তারই মাথায় তুলে দেওয়া হলো। তিনি মাটি ভর্তি ঝুড়ি মাথায় করে মাদায়েন থেকে নিজের উটের কাছে পৌঁছে গেলেন। এরপর সেটা বয়ে নিয়ে সেনাপতি সাদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস রাযিয়াল্লাহু আনহুর সামনে হাজির হলেন। নিজেদের মাটি ঝুড়ি ভরে তার মাথায় তুলে দেওয়ার ব্যাখ্যা করে তিনি সেনাপতিকে বললেন, 'এর মধ্যে রয়েছে বিরাট সুসংবাদ। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা মুসলিমসৈনিকদের হাতে পারস্যদেশের বিজয় দেবেন এবং তাদেরকে ঐ মাটির মালিক বানিয়ে দেবেন।'

এরপর মুসলিম ও পারস্যবাহিনীর মাঝে কাদেসিয়ার বিখ্যাত যুদ্ধ সংঘটিত হলো। কাদেসিয়ার গর্ত ও খানাখন্দ হাজার হাজার সৈনিকের লাশে ভরে গেল। তবে সেগুলো মুসলিমদের লাশ ছিল না, ছিল পারস্যসম্রাটের বিশাল বাহিনীর সৈনিকদের লাশ।

কাদেসিয়ায় পরাজিত হয়ে পারস্যবাহিনী মনোবল হারাল না। উল্টো প্রতিশোধের নেশায় নতুন করে সৈন্য সংগ্রহ করে তাদের ট্রেনিং ও নতুন নতুন অস্ত্রে সজ্জিত করে তুলল। অল্প কিছুদিনের চেষ্টায় পারস্যসম্রাট দেড়লাখ সৈনিকের এক বিশালবাহিনীকে নতুন যুদ্ধের জন্য তৈরি করে ফেললেন।

পারস্যসম্রাটের এই বিশাল বাহিনীর (এবং মুসলিমবাহিনীর বিরুদ্ধে তার প্রতিশোধ উন্মাদনার) বিষয়ে যখন খলীফা উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু জানতে পারলেন, তখন তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন যে এই বিপদজনক তৎপরতার মুকাবিলা করতে মুসলিমসেনাদলের নেতৃত্ব দিতে তিনি নিজেই ময়দানে নেমে পড়বেন।

কিন্তু নেতৃস্থানীয় অনেকেই তাঁকে রাজধানী মদীনায় উপস্থিত থাকার আবশ্যকতা বুঝিয়ে ঐ সিদ্ধান্ত থেকে ফিরিয়ে রাখলেন। তাঁরা খলীফাকে পরামর্শ দিয়ে বললেন,

'আপনি বরং এমন কাউকে সেনাপতি মনোনীত করুন—সেনা পরিচালনায় যার দক্ষতা ও নৈপুণ্যের ব্যাপারে আপনি আস্থাশীল।'

খলীফা উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাদের পরামর্শ ও অনুরোধ মেনে নিয়ে বললেন,

'ঠিক আছে, আমি আপনাদের কথা মেনে নিলাম। তবে আপনারা আমাকে পরামর্শ দিন যে সেই লোকটি কে হতে পারে, যাকে ভয়াবহ শত্রু প্রতিরোধের এই গুরুদায়িত্ব দেওয়া যেতে পারে?'

তাঁরা বললেন, 'আমীরুল মুমিনীন! আপনার সেনাদলের মধ্যে কে এই গুরুদায়িত্বের জন্য যোগ্য—সে ব্যাপারে আপনার বিবেচনাটাই হবে যথার্থ।'

উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু চিন্তা-ভাবনা করতে করতে পেয়ে গেলেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই সেটা সকলকে জানানোর জন্য বললেন,

'সত্যিই আমি পারস্যবাহিনীর বিরুদ্ধে অভিযানের জন্য মুসলিম-সেনাদলের সর্বাধিনায়ক হিসাবে এমন একজনকে নিযুক্ত করছি যিনি যুদ্ধের ময়দানে তীর ও বর্শার চেয়েও ক্ষিপ্র গতিসম্পন্ন। শত্রুকে কুপোকাত করে বিজয় ছিনিয়ে আনতে তিনি তীর ও বর্শার চেয়েও অধিক কার্যকর। তিনি হলেন, নুমান ইবনে মুকাররিন আল-মুযানী।'

উপস্থিত সকলেই খলীফার দূরদৃষ্টি ও বিচক্ষণতায় মুগ্ধ হয়ে বললেন, 'প্রকৃতই তিনি (নুমান...) তেমনই যেমনটি আপনি বলেছেন।'

দেরি না করে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু জিহাদের ময়দানে ব্যস্ত নুমান ইবনে মুকাররিন আল-মুযানীর প্রতি সরকারি নির্দেশ পাঠালেন,

مِنْ عَبْدِ اللهِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ إِلى النُّعْمَانِ بْنِ مُقَرِّنٍ

أَمَّا بَعْدُ! فَإِنَّه بَلَغَنِيْ أَنَّ حُمُوْسًا مِنَ الْأَعَاجِمِ كَثِيْرَةً قَدْ جَمَعُوْا لَكُمْ بِمَدِيْنَةِ 'نَهَاوَنْدَ' فَإِذَا أَتَاكَ كِتَابِيْ هذَا فَسِرْ بِأَمْرِ اللهِ 'وَبِعَوْنِ اللهِ' وَبِنَصْرِ اللهِ بِمَنْ مَعَكَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَلَا تُوْطِئْهُمْ وَعْرًا فَتُؤْذِيَهُمْ ....

فَإِنَّ رَجُلًا وَاحِدًا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ مِاْةِ أَلْفِ دِيْنَارٍ . وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ

'এই পত্র আল্লাহর বান্দা উমর ইবনুল খাত্তাবের পক্ষ থেকে নুমান ইবনে মুকাররিনের প্রতি...

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য। জানতে পারলাম যে বিশালসংখ্যক সৈন্য ও ব্যাপক অস্ত্রে সজ্জিত পারস্যের সেনাদল মুসলিমসৈনিকদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য 'নাহাওয়ান্দা'তে সমবেত হয়েছে। আমার এই সরকারি পত্রপাঠমাত্রই আপনি অবিলম্বে আপনার সঙ্গী মুসলিমবাহিনীকে নিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদের হুকুম পালনের উদ্দেশ্যে তাঁর ওপর ভরসা করে তাঁরই নুসরত ও সাহায্য পাওয়ার প্রত্যাশায় রওনা হয়ে যাবেন। খবরদার! মুসলিমবাহিনীকে বিপদজনক কোনো ঝুঁকির দিকে ঠেলে দিয়ে অযৌক্তিক জীবন নাশ ঘটাবেন না। কারণ, আমার কাছে একজন

মুসলিমের জীবনের মূল্য লক্ষ লক্ষ স্বর্ণমুদ্রার চেয়েও বেশি।'
–ওয়াস্‌সালামু আলাইকুম।

* * *

খলীফার লিখিত নির্দেশ পাওয়ার পর অবিলম্বে নুমান ইবনে মুকাররিন তাঁর বাহিনীকে নিয়ে পারস্যসেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনার জন্য ছুটে চললেন। তিনি অশ্ববাহিনী থেকে বাছাই করা কয়েকজনের একটি ক্ষুদ্রদলকে অগ্রগামী বাহিনী হিসাবে পাঠিয়ে দিলেন। 'নাহাওয়ান্দা' শহরে প্রবেশের পথঘাট, অবহাওয়া, পরিবেশ ইত্যাদি সম্পর্কে তাঁকে সকল তথ্য জানানোর উদ্দেশ্যে। এই অশ্বারোহীগণ অনেকটা পথ অতিক্রম করে 'নাহাওয়ান্দা' শহরের কাছাকাছি পৌঁছতেই তাঁদের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ঘোড়াগুলো হঠাৎ থমকে দাঁড়াল। তাঁরা নানাভাবে ঘোড়াগুলোকে সামনে চালানোর চেষ্টা করলেন। চাবুক মারলেন। কিন্তু সেগুলো এক কদমও সামনে বাড়ল না। সামরিক প্রশিক্ষণ ও ময়দানের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন এই ঘোড়াগুলোর অকারণে এমন করার কথা নয়। কিন্তু কী সেই কারণ? ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে তাঁরা অনুসন্ধান করতে লেগে গেলেন। প্রথমেই তাঁরা দেখতে পেলেন ঘোড়াগুলোর খুরের মধ্যে অসংখ্য ধারালো লৌহপেরেক ঢুকে আছে। তাঁরা আরও অবাক দৃষ্টিতে দেখতে পেলেন যে, পারস্যবাহিনী 'নাহাওয়ান্দা'গামী সব অলিগলি, পথঘাট ও প্রান্তরে (মাইন পুতে শত্রু ঠেকানোর মতো) লৌহপেরেকের জাল বিছিয়ে রেখেছে। যেন সকল অশ্বারোহী ও পদাতিকবাহিনীর 'নাহাওয়ান্দা' পৌঁছার চেষ্টাকে রুখে দেওয়া যায়।

* * *

অশ্বারোহীদের এই অগ্রবাহিনী নিজেদের চোখে দেখা পারস্যবাহিনীর অভিনব কৌশল সম্পর্কে সেনাপতি নুমানকে সবিস্তার জানিয়ে দিলেন। একই সঙ্গে এখন তাদের করণীয় কর্তব্য সম্পর্কে সেনাপতির নির্দেশ

জানানোর অবেদন করলেন। সকল খবর ও পরিস্থিতি বিবেচনা করে সেনাপতি দ্রুত তাদের করণীয় বিষয়ে সুনির্দিষ্ট নির্দেশ পাঠালেন।

'এক : তোমরা সেখানেই অবস্থান গ্রহণ করো।

দুই : গভীর অন্ধকার রাতে বহু জায়গা জুড়ে আগুন জ্বালিয়ে তোমাদের অবস্থানের স্থানগুলো একদম আলোকিত করে তুলবে। যেন শত্রুবাহিনী তোমাদের সবকিছু স্পষ্ট দেখতে পায়।

তিন : তখন তোমরা এমন অভিনয় করতে থাকবে যে তাদের আশ্চর্য কৌশলে তোমরা নিশ্চিৎ পরাজয়ের চিন্তায় ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে পালানোর চেষ্টা করছ। যেন তারা নিজেরাই এগিয়ে এসে তোমাদের ওপর আক্রমণে প্রলুব্ধ হয়। আর সর্বপ্রথম নিজেদের বিছিয়ে রাখা লৌহপেরেক রাস্তা থেকে অপসারণের ব্যবস্থা করে।'

পারস্যবাহিনীর ওপর সেনাপতির কৌশল দারুন কাজ করল। তারা মুসলিমবাহিনীর তৎপরতা দেখে যেইমাত্র অনুমান করল যে তাদের কৌশল মুসলিমবাহিনীকে ঠেকিয়ে দিয়েছে এবং এতে তারা মনোবল হারিয়ে পালানোর চিন্তা-ভাবনা করছে, সঙ্গে সঙ্গে তারা লোক পাঠিয়ে দ্রুত রাস্তা পরিষ্কার করিয়ে নিল। এভাবে নিজেরা নিজেদের পথঘাট পেরেকমুক্ত করামাত্রই মুসলিমবাহিনী শত্রুদের দিকে ঘুরে দাঁড়াল। আর ওইসব পথঘাট দখল করে নিল।

* * *

নুমান ইবনে মুকাররিন রাযিয়াল্লাহু আনহু 'নাহাওয়ান্দা' শহরে সেনাশিবির স্থাপন করে শত্রুবাহিনীর ওপর অতর্কিতে আক্রমণ চালাতে সিদ্ধান্ত নিলেন। সৈনিকদের আক্রমণের সংকেত জানিয়ে বললেন,

'আমি তিনবার তাকবীর (আল্লাহু আকবার) ধ্বনি করব।

প্রথমবার 'আল্লাহু আকবার' শোনার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকে প্রস্তুত হয়ে যাবে।

দ্বিতীয় তাকবীরের সঙ্গে সঙ্গে সকলে নিজ নিজ হাতিয়ার আক্রমণের জন্য প্রস্তুত করে নেবে।

তৃতীয় তাকবীরের সঙ্গে সঙ্গে আমি আল্লাহর দুশমনদের ওপর হামলা চালাব। তোমরাও আমার সঙ্গে একযোগে আক্রমণ চালাবে।'

* * *

নুমান ইবনে মুকাররিন রাযিয়াল্লাহু আনহু তিনবার তাকবীর দিলেন এবং শত্রুদের ওপর সিংহের মতো ঝাঁপিয়ে পড়লেন। একই সঙ্গে মুসলিমবাহিনীর সকল সৈনিক একযোগে শত্রুদের ওপর বাঁধভাঙা জোয়ারের মতো ঝাঁপিয়ে পড়লেন। বিবাদমান দুই দলের মাঝে এমন ভয়ঙ্কর ও তুমুল যুদ্ধ শুরু হলো—ইতিহাসের পাতায় যার নজির মেলা ভার। মুসলিমবাহিনীর দুর্দান্ত আক্রমণ পারস্যবাহিনীকে একবারে নাস্তানাবুদ করে ছাড়ল। তাদের অসংখ্য-অগণিত সৈন্য মুসলিমবাহিনীর হাতে প্রাণ হারাল। তাদের অগণিত মৃতদেহ দিয়ে সমতল-অসমতলের সকল জলাশয়, খাল-বিল ও নালা-নর্দমা সব উপচে পড়ল। সকল পথঘাট আর অলিগলি তাদের রক্তে ভিজে পিচ্ছিল হয়ে গেল। যুদ্ধের এক চরম সন্ধিক্ষণে সেনাপতি নুমান ইবনে মুকাররিন রাযিয়াল্লাহু আনহুর ঘোড়া রক্তভেজা পিচ্ছিল পথে পিছলে পড়ে গেল। সেনাপতি মারাত্মক আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে শহীদ হয়ে গেলেন। তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্তেই তাঁর ভাই সেনাপতির পতাকা নিজ হাতে সামলে নিয়ে নিজের চাদর দিয়ে তাঁর মৃতদেহ ঢেকে দিলেন। মুসলিমবাহিনীর কাছে তাঁর শাহাদাতের খবর গোপন রাখলেন। যুদ্ধরত মুসলিমবাহিনী শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সেনাপতির পরিণতি কিছুই জানতে পারল না।

সবশেষে তাদের পক্ষে চূড়ান্ত বিজয় সূচিত হলো—ইতিহাসে যা সর্বকালের সেরা বিজয় নামে আখ্যায়িত হয়েছে।

বিজয়ী মুসলিমসৈনিকগণ এই চূড়ান্ত বিজয় লাভের খুশির মুহূর্তে খোঁজাখুঁজি করতে শুরু করেন তাদের বীর সেনাপতি নুমান ইবনে মুকাররিন রাযিয়াল্লাহু আনহুকে।

তখন তাঁর ভাই চাদরটি শহীদ ভাইয়ের মৃতদেহ থেকে তুলে ধরে বললেন,

'এই যে আপনাদের আমীর! এইখানে আপনাদের সেনাপতি! দেখুন, আল্লাহ তাআলা একই সঙ্গে তাঁকে বিজয় ও শাহাদাতের পুরস্কারে ভূষিত করেছেন। যুদ্ধের বিজয় দ্বারা তাঁর চক্ষু শীতল করেছেন আর শাহাদাতের অমূল্য মর্যাদা দিয়ে ইহজীবনের সমাপ্তি টেনেছেন।'

তথ্যসূত্র :

১. *আল-ইসাবা*, ৩য় খণ্ড, ৫৬৩ পৃষ্ঠা অথবা *আত্তারজামা*, ৮৭৫২।
২. *ইবনুল আসীর*, ২য় খণ্ড, ২১১ পৃষ্ঠা, ৩ ক. ৭ পৃষ্ঠা।
৩. *তাহযীবুত তাহযীব*, ১০ম খণ্ড, ৪৫৬ পৃষ্ঠা।
৪. *ফুতুহুল বুলদান*, ৩১১ পৃষ্ঠা।
৫. *শরহে আলফিয়াতুল ইরাকী*, ৩য় খণ্ড, ৭৬ পৃষ্ঠা।
৬. *আল-আলাম*, ৯ম খণ্ড, ৯ পৃষ্ঠা।
৭. *আল-কাদেসিয়া*, ৬৬-৭৩ দারুন নাফায়িস, বৈরুত।

সুহাইব আর-রূমী

হে আবু ইয়াহইয়া! ভারি লাভজনক ব্যবসা করেছ... লাভের ব্যবসাই করেছ...

—প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

সুহাইব আর-রূমী...

আমাদের মুসলিমসমাজে এমন কে আছে যে সুহাইব আর-রূমীর সম্পর্কে কিছুই জানে না। তাঁর জীবন কাহিনীর কোনো অংশই শোনেনি?

তবে আমাদের বেশিরভাগ মানুষ যে বিষয়টি জানে না, সেটি হলো সুহাইব আর-রূমী (রোমদেশের মানুষ) রূমী ছিলেন না। তিনি ছিলেন খাঁটি আরব বংশীয়। তাঁর পিতা ছিলেন আরবের বিখ্যাত 'নুমাইর' গোত্রীয় আর মা ছিলেন আরও নাম করা 'তামীম' গোত্রীয়া।

প্রশ্ন এসে যায় তাহলে কেন খাঁটি আরব বংশীয় সুহাইবকে 'আর-রূমী' বা 'রোমদেশীয়' বলা হয়?

হ্যাঁ, এই বিখ্যাত সাহাবী সুহাইব রাযিয়াল্লাহু আনহুর নামের সঙ্গে 'আর-রূমী' জুড়ে দেওয়ার পেছনে রয়েছে একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। ইতিহাসের পাতা যুগ যুগ ধরে যা ধারণ করে রয়েছে। ঘটনাটি এ রকম :

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবুওয়াত লাভ করার কুড়ি বছর পূর্বের কথা। পারস্যসম্রাট কিসরার পক্ষ থেকে প্রাচীন বসরার অন্তর্গত 'উবুল্লা'র গভর্নর নিযুক্ত করা হয় সুহাইবের পিতা সিনান ইবনে মালেক আন-নুমাইরীকে।

তার সর্বাধিক প্রিয় সন্তান ছিল পাঁচ বছর বয়সী শিশু সুহাইব।

* * *

শিশু সুহাইব ছিল মিষ্টি, উজ্জ্বল চেহারা আর মাথাভর্তি লালচুলের অধিকারী। স্বভাবে ছিল চটপটে। তার ডাগর ডাগর চোখ দুটো থেকে বুদ্ধি আর অভিজাত্যের দ্যুতি যেন ঠিকরে বেরুত।

হৃদয়কাড়া, আদুরে এই নিষ্পাপ চেহারা পিতার অন্তরে আনন্দ ও খুশির জোয়ার তুলত। ঐ মিষ্টি চেহারার দিকে তাকালে মুছে যেত তার সকল ক্লান্তি ও চিন্তা।

* * *

একবার কোলের এই শিশু সুহাইবকে নিয়ে তাঁর মা ঘনিষ্ঠ নিকটাত্মীয়, উচ্চপদস্থ রাষ্ট্রীয় ব্যক্তিবর্গের পরিবার ও চাকর-চাকরানীদের সঙ্গে ইরাকের 'আস-সানিই' গ্রামে গেলেন অবকাশ যাপন ও আনন্দ-বিনোদনের উদ্দেশ্যে। সেই গ্রামেই রোমানবাহিনীর একটি দল রাতে অতর্কিতে আক্রমণ করে বসল। তারা হত্যা করে ফেলল নিরাপত্তারক্ষীদের। লুটে নিল সম্পদ। গ্রামের সকলকে বন্দী করে বানিয়ে ফেলল দাস ও দাসী।

সুহাইব ছিলেন সেই রাতে লুটেরাবাহিনীর হাতে বন্দীদের একজন।

* * *

রোমসাম্রাজ্যের দাস-দাসী কেনাবেচার হাটে বিক্রি করে দেওয়া হলো সুহাইবকে। একের পর এক হাতবদল হতে থাকলেন তিনি। অন্যসব

ক্রীতদাসের মতো কিছুদিন এক মুনিবের খেদমত করার পর আবার নতুন কোনো মুনিবের খেদমতে নিয়োজিত হতে থাকলেন বালক সুহাইব।

* * *

দাস হিসাবে জীবন-যাপনের ফলে সুহাইবের সামনে অবারিত সুযোগ এসে গেল রোমানসমাজের একেবারে গভীরে প্রবেশ করার এবং ঐ সমাজের একেবারে অন্দর মহলের নানা খবর প্রত্যক্ষভাবে পর্যবেক্ষণ করার। তিনি রোমসম্রাটসহ বড় বড় পদস্থ কর্মকর্তাদের বিনোদনকেন্দ্রগুলোর নিকৃষ্ট অনৈতিক কর্মকাণ্ড নিজের দুই চোখে প্রত্যক্ষ করেন। নিজের দুই কানে শোনেন সেখানের নানা অমানবিক, অনৈতিক পাপাচারের কাহিনী। এসব কারণে সুহাইব ঐ সমাজেকে চরম ঘৃণা করতেন আর খুবই ধিক্কার জানাতেন ঐ সমাজব্যবস্থার প্রতি। ঐ সমাজব্যবস্থার প্রতি তার অন্তরে ছিল একরাশ বিতৃষ্ণা। সেজন্যই তিনি মনে মনে বললেন,

إِنَّ مُجْتَمَعًا كَهَذَا لَا يُطَهِّرُهُ إِلَّا الطُّوْفَانُ

'ঘুণে ধরা এই সমাজের সংশোধন সম্ভব নয়। এর জন্য দরকার এক প্রলয়ঙ্কারী তুফান। যা একে সমূলে ধবংস করে দেবে এরপর গড়ে উঠবে এক নতুন সমাজ।'

* * *

সুহাইব রূমী যদিও রোমসাম্রাজ্যের অট্টালিকা ও প্রসাদসমূহে প্রতিপালিত হয়েছেন। যদিও তিনি সেই দেশের মাটি ও মানুষ—তাদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির মাঝে বেড়ে উঠেছেন, যদিও তিনি নিজের মাতৃভাষা আরবী প্রায় ভুলতে বসেছিলেন। কিন্তু তিনি কখনোই ভুলতে পারেননি যে তিনি দুরন্ত আরবের এক মরুর সন্তান।

দাসত্বের শৃঙ্খলমুক্ত হওয়ার এবং স্বজাতির লোকদের সঙ্গে মিলিত হওয়ার ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষা তার হৃদয় থেকে এক মুহূর্তের জন্যও মুছে যায়নি।

তার আরব দেশে ফেরার আকাঙ্ক্ষা তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠল। যখন তিনি জনৈক খ্রিস্টধর্মযাজককে একজন খ্রিস্টান সরদারের কাছে এই মন্তব্য করতে শুনলেন,

'সেই সময়টি একেবারেই নিকটবর্তী হয়ে গেছে, যখন আরব দেশের পবিত্র মক্কানগরীতে আবির্ভূত হবেন এমন একজন নবী যিনি সত্য প্রমাণ করবেন হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের নবুওয়াত-রেসালাতকে এবং যিনি মানুষকে কুফর ও শিরকের অন্ধকার থেকে উদ্ধার করে পৌঁছে দেবেন ঈমান ও হেদায়াতের আলোকিত রাজপথে।'

* * *

এক সুবর্ণ সুযোগ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সুহাইব রূমী দাসত্বের শেকল ছিঁড়ে ফেলে ছুটতে থাকলেন আরবদের আশ্রয়কেন্দ্র, প্রতীক্ষিত নবীর জন্মভূমি উম্মুল কূরা মক্কার উদ্দেশ্যে।

মক্কাতেই যখন তিনি বসবাস শুরু করলেন, সেখানের লোকেরা তার (রোমানদের মতো) বাধাবাধা আরবী কথা আর লালচুলের কারণে তাকে সুহাইব 'রূমী' নামে ডাকা শুরু করল।

* * *

সুহাইব রূমী মক্কার বিখ্যাত সরদার আবদুল্লাহ ইবনে জুদআনের আশ্রয়ে জীবন-যাপন শুরু করলেন। ব্যবসা-বাণিজ্য করে প্রচুর ধন-সম্পদের মালিক হলেন। তবে এই ব্যবসা ও প্রচুর মুনাফা সেই খ্রিস্টান পাদ্রির কথা তার মন থেকে মুছে দিতে পারল না। সেই ভবিষ্যতবাণীর কথা যখনই তার মনে জেগে উঠত তখনই নবীর সন্ধানে ব্যাকুল হয়ে নিজেই নিজের মধ্যে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিতেন, 'কবে ঘটবে সেই নবীর

আগমন?' অল্প কয়দিন পরেই দীর্ঘ প্রতীক্ষিত সেই প্রশ্নের জবাব তার সামনে এসে গেল।

* * *

কোনো এক দিনের কথা। সুহাইব রূমী দীর্ঘ ও দূরবর্তী এক বাণিজ্যিক সফর শেষ করে মক্কায় ফিরে এসেছেন। বিভিন্ন মানুষের মুখে তিনি শুনতে পেলেন, আবদুল্লাহর পুত্র মুহাম্মাদকে নবুওয়াতের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এরই ভিত্তিতে তিনি মানুষকে এক আল্লাহর প্রতি ঈমান গ্রহণের আহ্বান জানাচ্ছেন। ইনসাফ ও সৎকর্মের প্রতি মানুষকে উদ্বুদ্ধ করছেন। অন্যায় ও অশ্লীল কাজ থেকে তাদের বাধা প্রদান করছেন।

সুহাইব ব্যাকুল হয়ে জানতে চাইলেন, 'লোকেরা যাকে 'আল-আমীন' বলে ডাকে তিনিই কি এই ব্যক্তি নন?'

তারা বললেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ...। সেই নবী আর আল-আমীন একই ব্যক্তি।'

তিনি আবার প্রশ্ন করলেন, 'তাঁর বাড়িটা কোন্ জায়গায়?'

জবাবে তাকে জানানো হলো,
'আরকাম ইবনে আবিল আরকাম-এ তার বাড়ি। সাফা পর্বতের পাদদেশে।

তবে সাবধান হে যুবক! কুরাইশের কেউ যেন তোমাকে সেখানে দেখতে না পায়। তাদের কেউ যদি তোমাকে সেখানে দেখে ফেলে তাহলে ওরা তোমার সর্বনাশ করে ফেলবে। নানাভাবে ওরা তোমার ওপর নির্যাতন করতে থাকবে। এখানে সাহায্য করার মতো কোনো নিকটআত্মীয় তোমার নেই। ওদের হাত থেকে তোমাকে রক্ষা করার মতো নিজ বংশের কেউই নেই। সুতরাং খুব সাবধান হে যুবক!'

* * *

অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে চতুর্দিক সজাগ দৃষ্টি রেখে সুহাইব একদিন 'দারুল-আরকামে' হাজির হলেন। সেখানে পৌঁছার পর দরজায় দেখতে পেলেন আম্মার ইবনে ইয়াসিরকে। পূর্বপরিচিত হলেও দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়লেন। তবে এক মুহূর্তের মধ্যেই ইতস্তত ভাব ঝেড়ে ফেলে কাছে গিয়ে সোজাসুজি প্রশ্ন করলেন,

'আম্মার তুমি এখানে? কী চাও?' একই রকম বিস্ময় ও জিজ্ঞাসা চোখেমুখে ফুটিয়ে আম্মার পাল্টা প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলেন, 'আমি কেন এখানে, কী চাই' সে কথা একটু পরেই বলছি। তুমিই আগে এই প্রশ্নের জবাব দাও যে তুমি এখানে কেন এবং কী উদ্দেশ্যে এসেছ?'

সুহাইব বললেন,
'এখানে এই ব্যক্তির বক্তব্য শোনার উদ্দেশ্যে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছি।'

আম্মার বললেন,
'আমিও একই উদ্দেশ্যে এখানে এসেছি।'

সুহাইব বললেন,
'তাহলে চলো, একসঙ্গেই দু'জনে আল্লাহর নাম নিয়ে ভেতরে ঢুকি এবং তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করি।'

* * *

আম্মার ইবনে ইয়াসির এবং সুহাইব ইবনে সিনান আর-রূমী একসঙ্গে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে 'দারুল আরকামে' প্রবেশ করলেন। দু'জনেই গভীর মনোযোগ দিয়ে তাঁর কথা শুনলেন। সে আলোচনায় তাদের হৃদয় মাঝে জ্বলে উঠল ঈমানের নূর। দু'জনেই একত্রে আনুগত্য ও সমর্পণের হাত বাড়িয়ে দিলেন নবীজীর সম্মুখে। দৃপ্ত শপথের মতো একসুরে ঘোষণা করলেন,

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ

'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই এবং আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] আল্লাহর প্রিয় বান্দা ও রাসূল।'

তারা উভয়েই সেদিনের পুরো সময় নবীজীর সঙ্গে কাটালেন। তাঁর পরশতুল্য সান্নিধ্যে ধন্য হলেন। তাঁর উপদেশ ও নির্দেশনায়, তাঁর আচরণ ও স্বভাবমাধুর্যে নিজেদের যথাসম্ভব সুবাসিত করে তুললেন।

যখন রাত ঘনিয়ে এল। কোলাহল থেমে সবদিকে নিস্তব্ধতা ছেয়ে গেল। তখনই তারা দু'জন নবীজীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন নিজ নিজ গন্তব্যের উদ্দেশ্যে। অল্পসময়ের এই সাক্ষাতের বদৌলতে তারা বুকের মধ্যে বয়ে আনলেন এত নূর যা দিয়ে আঁধার পৃথিবীর সবটুকু আলোকিত করে দেওয়া সম্ভব।

* * *

বেলাল, আম্মার, সুমাইয়া ও খাব্বাব রাযিয়াল্লাহু আনহুমের মতো সুহাইব আর-রূমীকেও এক আল্লাহর প্রতি ঈমান ও রাসূলকে মেনে চলার অপরাধে (?) কুরাইশের লোকদের অমানবিক ও নির্মম অত্যাচার সহ্য করতে হয়।

সবকিছুই তিনি সহ্য করেছেন মুখ বুজে-নীরবে, প্রশান্ত ও স্থিরচিত্তে। কারণ, তিনি ভালোভাবেই জানতেন যে জান্নাতের পথে নির্যাতন আর শাস্তি অবধারিত। এপথ কষ্টে-ঘেরা, কাঁটায়-ভরা।

* * *

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সাহাবীদের মদীনায় হিজরত করার অনুমতি দিলেন তখন (সকল সাহাবী একে একে ও দলবেঁধে মদীনায় হিজরত করলেও) সুহাইব রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহুর সঙ্গে হিজরত করার সিদ্ধান্ত স্থির করেন। কিন্তু কুরাইশের

লোকেরা তার সিদ্ধান্তের কথা অনুমান করতে পেরে তার হিজরতের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। তারা সুহাইব রাযিয়াল্লাহু আনহুর চারপাশে সার্বক্ষণিক নজরদারি করার জন্য পাহারা বসিয়ে দিল, যেন তিনি যাবতীয় সোনা-রূপা ও সম্পদ নিয়ে পালাতে না পারেন।

* * *

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সঙ্গী আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহু মক্কা থেকে মদীনার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ার পর থেকে সুহাইব রাযিয়াল্লাহু আনহু হিজরতের এই মহান যাত্রায় তাঁদের সঙ্গে মিলিত হওয়ার সুযোগ খুঁজতে থাকলেন। কিন্তু তিনি সেরকম কোনো সুযোগই বের করতে পারলেন না। কারণ, তার চারপাশে নিয়োজিত সার্বক্ষণিক প্রহরীদের সতর্ক দৃষ্টির কঠিন বেষ্টনী ভেদ করা সম্ভবপর ছিল না। সুতরাং কোনো কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ ছাড়া তিনি কোনো উপায় দেখতে পেলেন না।

ভীষণ কণকণে এক শীতের রাতে সুহাইব রাযিয়াল্লাহু আনহু (ডাইরিয়া) আমাশায় আক্রান্ত ব্যক্তির মতো বদনা নিয়ে বারবার বাইরে যেতে লাগলেন। দীর্ঘসময় পার করে ফেরার একটু পরেই আবার বদনা হাতে দে দৌড়। অবস্থা দেখে প্রহরীরা তাকে বাস্তব আমাশয়ে আক্রান্তরোগী ভেবে খুব মজা পেল এবং একে অন্যকে বলতে লাগল, 'দেখো দেখো, লাত-উয্যার ক্রোধে আমাশয় তাকে কিভাবে পাকড়াও করেছে! বেচারা! সারারাত বদনা নিয়ে দৌড়াক। আমরা আজকের রাতটা একটু আরাম করে ঘুমাই।'

ব্যস্! নিশ্চিন্ত মনে তারা বিছানায় চলে গেল এবং অল্পসময়ের মধ্যেই গভীর ঘুমে তলিয়ে গেল।

সুহাইব রাযিয়াল্লাহু আনহু বেশিদূর যেতে পারলেন না হঠাৎ প্রহরীরা বুঝতে পারল যে তিনি এখান থেকে সটকে পড়েছেন। আতঙ্কিত হয়ে তারা বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠল। দ্রুতগামী ঘোড়ায় চড়ে তাকে খুঁজতে

বেরিয়ে পড়ল। অল্পক্ষণেই তারা সুহাইবকে পেয়ে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গেই তাকে ঘেড়াও করে ফেলল।

বেগতিক অবস্থা বুঝতে পেরে সুহাইব রাযিয়াল্লাহু আনহু পাহাড়ের চূড়ায় উঠে গেলেন। তূণীর থেকে সবগুলো তীর বের করলেন। ধনুকে তীর লাগিয়ে তাক করে ধরে চিৎকার করে বললেন,

'হে কুরাইশের লোকেরা! তীর চালনায় আমার দক্ষতার কথা তোমরা ভালো করেই জানো। তারপরও আমি তোমাদের আরেকবার জানিয়ে দিচ্ছি, আল্লাহর কসম! আমি তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে দক্ষ ও শ্রেষ্ঠ তীরন্দাজ। যে কোনো লক্ষ্যে তীরবিদ্ধ করতে আমি সর্বাধিক পারদর্শী। আল্লাহর শপথ! আমার হাতে যতক্ষণ শক্তি আছে তোমাদের কাউকেই আমার কাছে আসতে দেব না। একেকটি তীর দিয়ে তোমাদের একেকজনকে হত্যা করতে থাকব। এরপর যে কয়জন বেঁচে থাকবে তরবারি দিয়ে তাদের সবগুলোকে খতম করব।'

সুহাইব রাযিয়াল্লাহু আনহুর এই দৃপ্ত মরণপণ শপথ ও চ্যালেঞ্জ শুনে একজন বলে উঠল,

'হে সুহাইব! মক্কায় আসার সময় তুমি ছিলে একেবারে নিঃস্ব-ফকির। এই মক্কাতেই তুমি ব্যবসা-বাণিজ্য করে হয়েছ অঢেল সম্পদের মালিক। আল্লাহর কসম! আমরা ওইসব সম্পদ নিয়ে তোমাকে আমাদের চোখের সামনে দিয়ে অক্ষত অবস্থায় চলে যেতে দেব না।'

সুহাইব রাযিয়াল্লাহু আনহু অর্থই তাদের প্রধান দুর্বলতা বুঝতে পেরে সঙ্গে সঙ্গেই বললেন,

'যদি আমার সকল অর্থ-সম্পদ তোমাদের দিয়ে দেই, তাহলে কি আমাকে ছেড়ে দেবে? নির্বিঘ্নে যেতে দেবে?'

তারা বলল, 'হ্যাঁ, তাহলে তুমি নির্বিঘ্নেই যেতে পারবে।'

সুহাইব রাযিয়াল্লাহু আনহু মক্কায় তার বাড়ির সেই স্থানটির কথা তাদের বলে দিলেন, যেখানে সোনা-দানা ও সারাজীবনের সম্পদ সঞ্চিত

করে রাখা আছে। তারা কয়েকজন মক্কায় গিয়ে নির্দিষ্ট স্থান থেকে সকল সম্পদ বের করে নিল। এরপর তাকে ছেড়ে দিয়ে বলল, 'এবার তুমি নির্বিঘ্নে চলে যেতে পারো।'

* * *

সুহাইব রাযিয়াল্লাহু আনহু নিজের দীনকে সম্বল আর আল্লাহর সন্তুষ্টিকে লক্ষ্য বানিয়ে অবিরাম ছুটে চললেন মদীনার দিকে। যে অঢেল সম্পদ অর্জনের জন্য ব্যয় হয়েছিল তার জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়—সেই সম্পদ সবটুকু মক্কায় ফেলে আসার জন্য তার মধ্যে কোনো খেদ নেই, আফসোস নেই।

দীর্ঘপথ চলতে চলতে যখন একটু কষ্ট ও ক্লান্তি বোধ হয়েছে তাঁর দেহে, তখনই তার মনে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভালোবাসা আর তাঁর সাক্ষাতের ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষা নতুন সজীবতা ছড়িয়ে দিয়েছে। আবারও নতুন উদ্যমে শুরু করেছেন পথচলা।

মদীনার অদূরে মদীনার প্রবেশপথ 'কুবায়' পৌঁছলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে এভাবে আসতে দেখে খুব খুশি হলেন এবং তাকে অবাক করে দিয়ে বললেন,

رَبِحَ الْبَيْعُ يَا أَبَا يَحْيَى ... رَبِحَ الْبَيْعُ ...

'হে আবু ইয়াহইয়া! দারুন লাভের ব্যবসা করেছ! খুব লাভবান হয়েছ এই কেনাবেচায়।'

একথা শুনে ক্লান্ত সুহাইব রাযিয়াল্লাহু আনহুর চেহারা খুশিতে ঝলমল করে উঠল। তিনি বললেন,

وَاللهِ مَا سَبَقَنِيْ إِلَيْكَ أَحَدٌ يَا رَسُوْلَ اللهِ ... وَمَا أَخْبَرَكَ بِه إِلَّا جِبْرِيْلُ

'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আজ আমার আগে তো কেউ মক্কা থেকে আপনার কাছে আসেনি। নিশ্চয় এই সংবাদ জিবরীল আলাইহিস সালাম ছাড়া অন্য কেউ আপনাকে বলেনি।'

* * *

সত্যিই তাঁর বাণিজ্য লাভজনক হয়েছে। আসমান থেকে অহী এসে যার সত্যতা প্রকাশ করেছে। জিবরীল আলাইহিস সালাম সাক্ষ্য দিয়ে যাকে আরও মহিমান্বিত করে তুলেছেন।

সুহাইব রাযিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা তার পবিত্র কালামে আয়াত নাজিল করে বলেন,

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْرِىْ نَفْسَهُ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ ۗ وَاللّٰهُ رَءُوْفٌۢ بِالْعِبَادِ

'এমন মানুষও আছে যে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে নিজেকে বিক্রি করে দেয়। আল্লাহ তার বান্দাদের প্রতি বড়ই সদয়।'

–বাকারা : ২০৭

সুহাইব ইবনে সিনান আর-রূমী রাযিয়াল্লাহু আনহুর প্রতি অভিনন্দন, নিজেকে সর্বোত্তম মূল্যে আল্লাহ তাআলার কাছে বিক্রি করে দেওয়ার জন্য।

তথ্যসূত্র :

1. *আল-ইসতীআব*, ('*আল-ইসাবা*'র টীকায় দ্রষ্টব্য) ২য় খণ্ড, ১৭৪ পৃষ্ঠা।
2. *তাবাকাতে ইবনে সাআদ*, ৩য় খণ্ড, ২২৬ পৃষ্ঠা।
3. *হায়াতুস সাহাবা*, ৪র্থ খণ্ডের সূচি দ্রষ্টব্য।
4. *আল-ইসাবা*, ২য় খণ্ড, ১৯৫ পৃষ্ঠা অথবা *আত্তারজামা*, ৪১০৪।
5. *সিফাতুস সফওয়া*, ১ম খণ্ড, ১৬৯ পৃষ্ঠা।
6. *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, ৭ম খণ্ড, ৩১৮-৩১৯ পৃষ্ঠা।
7. *উসদুল গাবাহ*, ৩য় খণ্ড, ৩০ পৃষ্ঠা।

আবুদ দারদা

(উওয়াইমির ইবনে মালেক আল-খাযরাজী)

আবুদ দারদা দুনিয়ার লোভ-লালসা ও ভোগ-বিলাসকে দূরে ঠেলে দিতেন। মন-প্রাণ ও চেতনা থেকেও, আবার বাস্তবজীবন থেকেও।

-আবদুর রহমান ইবনে আউফ

আবুদ দারদা নামে সুপরিচিত উওয়াইমির ইবনে মালেক আল-খাযরাজী অতি ভোরে ঘুম থেকে জেগে উঠলেন। ছুটে চলে গেলেন তার দেবী মূর্তির কাছে—যাকে তিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন বাড়ির সবচেয়ে আকর্ষণীয় ও উত্তম স্থানে। প্রণাম করে তার পূজা করলেন এবং সুগন্ধির বিখ্যাত বাজার থেকে আনা সবচেয়ে মূল্যবান আতর ও চন্দন মেখে তাকে সুবাসিত করলেন। এরপর তাকে সর্বোচ্চ মূল্যের রেশমি কাপড়ের পোশাক পরিয়ে দিলেন। যা গতকালই তাকে উপহার দিয়েছেন ইয়েমেন থেকে আসা এক বিশিষ্ট ব্যবসায়ী।

সূর্য বেশ কিছুটা উপরে উঠে গেলে আবুদ দারদা বাড়ি থেকে বের হলেন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যে।

পথে বেরিয়েই তার চোখে পড়ল মদীনার অলিগলি আজ লোকে লোকারণ্য। আজ মুহাম্মাদের অনুসারীরা বদর যুদ্ধ থেকে বিজয়ী বাহিনীর

গৌরব নিয়ে ফিরছে। দলে দলে তারা শহরে প্রবেশ করছেন আর তাদের সামনে দলে দলে শৃঙ্খলিত কুরাইশবন্দীদের টেনে আনা হচ্ছে। মুসলিমদের এই বিজয় গৌরব আর কুরাইশদের চরম লাঞ্ছনার দৃশ্য আবুদ দারদার মোটেও ভালো লাগছিল না। পথের এই দৃশ্য থেকে তিনি নিজেকে ভিন্ন দিকে মনোযোগী করতে চাইলেন। খাযরাজ গোত্রের এক তরুণের কাছে এগিয়ে গেলেন এবং তার কাছে নিজের অন্তরঙ্গ বন্ধু আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহার খবরাখবর জানতে চাইলেন। খাযরাজী তরুণ তাকে জানাল,

'বদরযুদ্ধে তিনি শত্রুদের বিরুদ্ধে চরম নৈপুণ্য ও বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করেছেন এবং প্রচুর গনিমতের মালসহ নিরাপদেই ফিরে এসেছেন। আপনি তাঁর ব্যাপারে চিন্তামুক্ত থাকতে পারেন।'

খাযরাজের এই তরুণ আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা সম্পর্কে আবুদ দারদার প্রশ্নে মোটেও অবাক হয়নি। কারণ, তাদের দু'জনের অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব এবং পারস্পারিক ভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার কথা সকলেই জানত।

তাদের ভ্রাতৃত্ববন্ধন জাহেলী যুগ থেকেই চলে আসছিল। ইসলামের আবির্ভাব হলে আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করলেন কিন্তু আবুদ দারদা নতুন ধর্মকে প্রত্যাখ্যান করে বাপ-দাদার ধর্মকে আঁকড়ে ধরে থাকলেন। তবে তাদের দুই মেরুতে অবস্থান সত্ত্বেও ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্বের সম্পর্কে কখনো ফাটল সৃষ্টি হয়নি। অন্তরঙ্গতার কোনো অবনতি ঘটেনি। এর কারণ আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা ইসলাম গ্রহণ করা সত্ত্বেও বন্ধু আবুদ দারদার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ ও যোগাযোগ অব্যাহত রাখেন। ইসলাম গ্রহণের জন্য তাকে দাওয়াত দেওয়া, বিভিন্নভাবে উৎসাহিত করার কাজ চালু রাখেন। শিরকের ছায়ায় কাটানো বন্ধুর জীবনের প্রতিটি দিনের জন্য আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা খুবই ব্যথিত ও অনুতপ্ত হতেন।

* * *

আবুদ দারদা তার ব্যবসা কেন্দ্র—দোকানে পৌঁছে গেলেন। বসলেন মহাজনের উঁচু আসনে। শুরু করলেন বেচা-কেনা। দোকানের নিয়মিত কর্মকাণ্ডের সবই তিনি যথারীতি করে চলেছেন। দোকানের ব্যস্ত কর্মকাণ্ডের ঠিক সেই সময়টাতে তার বাড়িতে কী ঘটছিল সে কথা তার কিছুই জানা ছিল না।

এক বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা অন্তরঙ্গ বন্ধু আবুদ দারদার বাড়ি গিয়ে হাজির হলেন। সেখানে পৌঁছে দেখতে পেলেন বাড়ির দরজা খোলা। আবুদ দারদার স্ত্রীকে উঠানেই পেয়ে তিনি বললেন,

'হে আল্লাহর প্রিয় বান্দী! আসসালামু আলাইকুম।'

স্ত্রী বললেন, 'ওয়া আলাইকুমুস সালাম হে আবুদ দারদার প্রিয়বন্ধু!'

আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা জিজ্ঞাসা করলেন,

'আমার বন্ধু আবুদ দারদা কোথায়?'

স্ত্রী বললেন, 'তিনি দোকানে গিয়েছেন, তাড়াতাড়িই চলে আসবেন।'

'আমি কি এখানে একটু অপেক্ষা করতে পারি?' আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা জিজ্ঞাসা করলেন।

স্ত্রী বললেন, 'অবশ্যই।'

এরপর আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহাকে ভেতরে বসার ব্যবস্থা করে দিলেন। দরজা খুলে তাকে ভেতরে স্বাগতম জানালেন। তিনি ঘরে ঢুকে বসার পর আবুদ দারদার স্ত্রী চলে গেলেন। সংসার ও সন্তানদের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

* * *

আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইলেন। এরপর চুপিসারে এক ফাঁকে গিয়ে হাজির হলেন আবুদ দারদার পূজার ঘরে। নিজের কাছে লুকিয়ে রাখা কুড়ালটি বের করে আবুদ

দারদার দেবীমূর্তিটাকে টুকরো টুকরো করে ফেললেন। মুখে আবৃত্তি করতে থাকলেন,

أَلَا كُلُّ مَا يُدْعَى مَعَ اللهِ بَاطِلٌ – أَلَا كُلُّ مَا يُدْعَى مَعَ اللهِ بَاطِلٌ

'সাবধান! এক আল্লাহ ছাড়া যারই ইবাদত করা হবে, সবই বাতিল।'

এভাবেই আবুদ দারদার দেবীকে ভেঙে চুরমার করে দিয়ে চুপি-চুপি বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লেন আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাযিয়াল্লাহু আনহু।

* * *

উম্মুদ দারদা (আবুদ দারদার স্ত্রী) বিশেষ প্রয়োজনে পূজার ঘরে ঢুকলেন। ঘরের মেঝেতে দেবীমূর্তির হাত-পা ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ টুকরো টুকরো ও চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে এলোমেলো পড়ে থাকতে দেখে যেন তিনি বজ্রাহত হলেন। নিজের গালে চপেটাঘাত করতে করতে বলতে থাকলেন-

أَهْلَكْتَنِيْ يَا ابْنَ رَوَاحَةَ ....

أَهْلَكْتَنِيْ يَا ابْنَ رَوَاحَةَ ....

'হায় রে রাওয়াহার ব্যাটা! এ তুই কী করলি! তুই আমার সর্বনাশ করে দিলি!

'হায় রে রাওয়াহার ব্যাটা! এ তুই কী করলি! তুই আমার সর্বনাশ করে দিলি!'

* * *

কিছুক্ষণের মধ্যেই আবুদ দারদা নিজের বাড়িতে ফিরে এলেন। পূজার ঘরের দরজায় বসে নিজের স্ত্রীকে বিলাপ করে কাঁদতে দেখলেন। তার

চোখেমুখে ভীষণ ভয়ের ছাপ দেখে আবুদ দারদা কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন,

'তোমার কী হয়েছে? এমন করে কাঁদছ কেন?'

স্ত্রী কাঁদতে কাঁদতে জানালেন,

'আপনি দোকানে চলে যাওয়ার পরে আপনার ভাই আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা এসেছিলেন। আপনার দেবীর কী দুর্দশা করে রেখে গেছেন, দেখুন।'

তিনি পূজার ঘরের ভেতরে ঢুকলেন। দেবীমূর্তিকে চূর্ণবিচূর্ণ দেখে রাগে তার শরীর ও মনে আগুন জ্বলে উঠল। প্রতিশোধ নেওয়ার ইচ্ছা মনের মধ্যে ঘুরপাক খেতে থাকল। কিন্তু অল্পসময়ের মধ্যে তার উত্তেজনা থেমে গেল এবং রাগ ঠাণ্ডা হয়ে গেল। এরপর পুরো ব্যাপারটি নিয়ে তিনি গভীর চিন্তা করে ঠাণ্ডা মাথায় বললেন,

'আমাদের উপকার করা কিংবা অপকার থেকে রক্ষা করার কোনো ক্ষমতা যদি এই প্রতিমার থাকত, তাহলে অবশ্যই সে কুঠারের আঘাত থেকে অন্তত নিজেকে বাঁচাতে পারত।'

এরপর সঙ্গে সঙ্গে রওনা করলেন আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহার বাড়ির দিকে। সেখানে পৌঁছে দু'জনে একত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে হাজির হয়ে ইসলাম কবুলের ঘোষণা দিলেন। ইসলাম গ্রহণের তালিকায় তিনিই ছিলেন এলাকার সর্বশেষ ব্যক্তি।

* * *

আবুদ দারদা রাযিয়াল্লাহু আনহু ঈমান গ্রহণের প্রথম মুহূর্ত থেকেই আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি নিখাদ ভালোবাসাপূর্ণ ও ঈমানদীপ্ত জীবন গড়ে তুললেন।

ঈমান কবুলের পূর্বদিনগুলোর ব্যাপারে তিনি সীমাহীন অনুতাপদগ্ধ হতে থাকেন। বিলম্বে ইসলাম গ্রহণের ফলে তিনি গভীরভাবে উপলব্ধি

করেন যে, সঙ্গীরা তার চেয়ে এগিয়ে গেছেন অনেক দূর। তারা ইসলামের গভীর জ্ঞান অর্জন করেছেন। কুরআন হিফয করা ও কুরআনের মর্মবাণী উপলব্ধিতেও তারা এগিয়ে গেছেন। তারা ইবাদত-বন্দেগীও বেশি করেছেন। তাকওয়া-পরহেজগারীতেও তাদের সঞ্চয় ঢের বেশি। সব মিলিয়ে আল্লাহর কাছে তাদের মর্যাদা আমার চেয়ে অনেক অনেক বেশি।

এই গভীর আত্ম-উপলব্ধির ফলে তিনি সংকল্প করলেন, রাতদিন পরিশ্রম করে, সর্বোচ্চ সাধনা ও কষ্ট করে ওই ব্যবধান তিনি দূর করবেন। সঙ্গীদের মাঝের দূরত্ব অতিক্রম করে বরং তাদের চেয়ে অগ্রগামী হবেন।

তিনি দুনিয়াত্যাগী ও পরিপূর্ণ আল্লাহমুখী হয়ে আল্লাহর ইবাদতে আত্মনিয়োগ করলেন। জ্ঞানার্জনে তিনি ঝুঁকে পড়লেন গভীর তৃষ্ণাকাতর ব্যক্তির পানির প্রতি কাতরতার মতো। কুরআন হিফয করা এবং তার মর্মবাণী উপলব্ধির কাজে একাগ্রতার সঙ্গে আত্মনিয়োগ করলেন।

যখন তার মনে হলো, ‘ব্যবসা’ ইবাদত-বন্দেগীতে একাগ্রতা বিনষ্টকারী এবং জ্ঞানার্জনের পথে বাধা সৃষ্টিকারী—তখন তিনি নির্দ্বিধায় ব্যবসা ছেড়ে দিলেন।

কেউ তাকে ব্যবসা ছেড়ে দেওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলেন,

‘রাসূলের সঙ্গে ইসলাম গ্রহণের প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ হওয়ার পূর্বে আমি ছিলাম নিছক একজন ব্যবসায়ী। ইসলাম গ্রহণ করার পর ‘তিজারত ও ইবাদত’ দুটোই সুষ্ঠুভাবে পালন করার চেষ্টা করলাম, কিন্তু আমি দেখলাম বাস্তবে সেটা সম্ভব হলো না। এ কারণে তিজারত ছেড়ে দিলাম আর ইবাদতে আত্মনিয়োগ করলাম।’

‘যেই মহান আল্লাহর হাতে আবুদ দারদার প্রাণ, তাঁর নামে শপথ করে বলছি, আজ তো আমার অনুভূতি এমন যে মসজিদে নববীর সদর দরজায় আমার দোকান হোক, জামাতের সঙ্গে সব নামায আদায় করেই

ব্যবসা থেকে প্রতিদিন তিনশো স্বর্ণমুদ্রা লাভ হোক সেটাও আমার কাম্য নয়। একাগ্রতার সঙ্গে 'জ্ঞানার্জন' করা এবং বেশি বেশি পরিমাণে 'ইবাদত' করাই এখন আমার জীবনের প্রধান লক্ষ্য।'

এরপর তিনি প্রশ্নকারীর দিকে তাকিয়ে বললেন,

'দ্যাখো! এর অর্থ এই নয় যে ব্যবসা-বাণিজ্যকে আমি হারাম মনে করি। সেটা কখনোই নয়। ব্যবসা অবশ্যই হালাল। তবে আমি চাই তাদের অন্তর্ভুক্ত হতে—যাদের প্রশংসা করে আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَّلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهِ

'যাদেরকে ব্যবসা আর ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহর যিকির থেকে গাফেল করে না।' –সূরা নূর : ৩৭

* * *

আবুদ দারদা রাযিয়াল্লাহু আনহু শুধু ব্যবসা ছেড়েছিলেন তা নয়, তিনি দুনিয়া ও দুনিয়ার শোভা-সৌন্দর্য সব ছেড়ে দিয়েছিলেন। ভোগ-বিলাসিতা ত্যাগ করে কোনোরকম জীবনধারণ উপযোগী খাবার ও পোশাকেই তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন।

প্রচণ্ড এক শীতের রাতে তাঁর বাড়িতে কয়েকজন মেহমান এলেন। আপ্যায়নের জন্য তিনি মেহমানদের সামনে গরম খাবার পরিবেশন করলেন। কিন্তু শীত নিবারণের উপযোগী লেপ-তোশক ইত্যাদির মতো কোনো বিছানা-পত্রের ব্যবস্থা করলেন না। 'এত শীতে লেপ-তোশক ছাড়া কিভাবে রাত কাটাবে?'—মেহমানরা পরস্পরের মধ্যে এই নিয়ে আলোচনা করতে থাকলেন। একজন বলে উঠলেন, 'আমি তার কাছে যাচ্ছি কোনো শীতের কাপড়চোপড় পাঠানোর অনুরোধ করতে।' একজন নিষেধ করলেন। কিন্তু তা উপেক্ষা করেই লোকটি আবুদ দারদা রাযিয়াল্লাহু আনহুর ঘরের দরজায় গিয়ে দাঁড়ালেন। তিনি দেখলেন, আবুদ দারদা রাযিয়াল্লাহু আনহু শুয়ে আছেন আর তাঁর পাশেই স্ত্রী বসে

আছেন। লোকটি দেখে অবাক হলো যে তাদের দু'জনের শরীরেই হালকা পোশাক। লেপ-তোশক তো দূরের কথা—তারা শীত থেকে বাঁচার জন্য কোনো গরম পোশাকও গায়ে দেননি। লোকটি খুবই আশ্চর্য হয়ে আবুদ দারদাকে প্রশ্ন করলেন,

'কী ব্যাপার! আপনিও দেখছি আমাদের মতোই বিছানা ও লেপ-কম্বল ছাড়াই রাত কাটাচ্ছেন? আপনাদের পোশাক-আশাক, সামান-পত্র কোথায়?'

আবুদ দারদা রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন,

'আমাদের আরও একটি বাড়ি আছে অন্যখানে। আমাদের কাছে কোনো সামান-পত্র জমা হয়ে গেলে সেগুলো সঙ্গে সঙ্গে আমরা সেই বাড়িতে পাঠিয়ে দেই। এই বাড়িতে যদি কোনো কিছু অবশিষ্ট রাখতাম তাহলে অবশ্যই আপনাদের জন্য পাঠিয়ে দিতাম।

তা ছাড়া ঐ বাড়িতে যাওয়ার যে পথ সেটা খুবই দুর্গম। সামান-পত্রের বোঝা নিয়ে ঐ পথ পাড়ি দেওয়া বড়ই কষ্টদায়ক। সেই তুলনায় বোঝামুক্ত হালকা পথিকের জন্যই ঐ পথ বেশি উপযুক্ত। এই কারণে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, আমরা ভার ও বোঝামুক্ত থাকব যেন রাস্তাটা সহজে অতিক্রম করতে পারি।'

এরপর তিনি মেহমানকে জিজ্ঞাসা করলেন,

'আপনি কি কথাগুলোর মর্মোপলব্ধি করতে পেরেছেন?'

তিনি বললেন, 'জি হ্যাঁ... আমি বুঝতে পেরেছি এবং আমি যথার্থ উপদেশ লাভ করেছি। আল্লাহ আপনাকে এর উত্তম বিনিময় দান করুন।'

* * *

দ্বিতীয় খলীফা উমর ফারুক রাযিয়াল্লাহু আনহু নিজের শাসনামলে আবুদ দারদা রাযিয়াল্লাহু আনহুর কাছে সিরিয়া অঞ্চলে গভর্নর হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণের প্রস্তাব করেন। আবুদ দারদা রাযিয়াল্লাহু আনহু বিনয়ের

সঙ্গে খলীফার প্রস্তাব ফিরিয়ে দেন। খলীফা পীড়াপীড়ি করতে থাকলে তিনি বলেন,

'আপনি রাজি হলে আমি তাদের ইমামতি করার জন্য, তাদের কুরআন ও রাসূলের সুন্নাহ ও তাঁর জীবনাদর্শ শেখানোর উদ্দেশ্যে যেতে পারি।'

আমীরুল মুমিনীন এতে রাজি হলে তিনি সিরিয়ার রাজধানী 'দামেস্কে'র উদ্দেশ্যে বের হয়ে পড়লেন। দামেস্কে পৌঁছে তিনি বুঝলেন সকল শ্রেণির মানুষ আরাম-আয়েশে, শৌখিন ও বিলাসী জীবনে অভ্যস্থ হয়ে পড়েছে। ধন-সম্পদ আর ঐশ্বর্যের মোহে আসক্ত হয়ে পড়েছে। সর্বস্তরের মানুষের এই ঈমানী অধঃপতন তাঁকে শঙ্কিত করে তুলল। সকলকে মসজিদে সমবেত করে তিনি তাদের উদ্দেশ্যে ব্যথাভরা ও আবেগঝড়া কণ্ঠে বললেন,

'হে আমার প্রিয় দামেস্কবাসী! ইসলাম গ্রহণের কারণে আমার ও আপনাদের সম্পর্ক হলো আমরা একে অন্যের দীনী ভাই। বসবাসের হিসাবে আমরা একে অন্যের প্রতিবেশী বন্ধু। ইসলামের দুশমনদের মুকাবেলায় আমরা একে অন্যের সাহায্যকারী...

হে দামেস্কবাসী প্রিয়ভাই ও বন্ধুরা! আমি আপনাদের মাঝে একজন উপকারী ও উপদেশদাতা বন্ধু হিসাবে খলীফার অনুমোদন নিয়ে এসেছি। আশা করি আমাকে উপকারী বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করতে এবং আমার উপদেশ মেনে চলতে আপনাদের কোনো আপত্তি থাকবে না। আমি আপনাদের কাছে কোনো পারিশ্রমিক চাই না। আপনাদের জন্য আমার উপদেশ ও নসিহত প্রদানের ধারা চালু থাকবে আর আমার পারিশ্রমিক ও ব্যয়ভার চলতে থাকবে রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে।

এটা কেমন কথা যে, আপনাদের মধ্য থেকে আলেমগণ ইন্তেকাল করে চলে যাচ্ছেন, ধীরে ধীরে সমাজ আলেমশূন্য হয়ে যাচ্ছে। অথচ ইলম শেখার জন্য আপনারা আলেমদের শরণাপন্ন হচ্ছেন না। এটা

কেমন যুক্তির কথা যে, আপনাদের যা দেওয়ার জন্য আল্লাহ নিজে দায়িত্ব নিয়েছেন, তাই হাসিল করার জন্য আপনারা সর্বশক্তি নিয়োগ করে (রিযিকের পেছনে) হুমড়ি খেয়ে পড়েছেন। অথচ যেই বিষয়গুলো হাসিল করার জন্য আপনাদের বারবার জোরালো নির্দেশ দেওয়া হয়েছে (ঈমান, আমল ও উন্নত চরিত্র) সেইগুলো হাসিলের সব চেষ্টা আপনারা ত্যাগ করে বসে আছেন।

কেন আপনারা এত পরিমাণ সম্পদ সঞ্চয় করছেন যা খেয়ে শেষ করতে পারবেন না!

কেন এমন অট্টালিকা তৈরি করছেন যাতে চিরকাল বসবাস করতে পারবেন না।

কেন এত দীর্ঘ পরিকল্পনা ও স্বপ্ন সাজাচ্ছেন যার শেষ মাথায় আপনি কখনোই যেতে পারবেন না!

আপনাদের পূর্বে এ পৃথিবীতে এসেছিল বহুজাতি-গোষ্ঠী। তারাও ধন-সম্পদের পাহাড় গড়েছিল। অনেক পরিকল্পনা ও স্বপ্ন তারা সজিয়েছিল...

কিন্তু আজ চেয়ে দেখুন, তাদের সেই সকল সম্পদের ধবংসাবশেষ, তাদের বড় বড় অট্টালিকাসমূহ বিরান ভূমিতে পরিণত হয়েছে।

আপনাদের খুব কাছেই রয়েছে হূদ আলাইহিস সালামের উম্মত 'আদ' জাতির ধ্বংসাবশেষ—যে জাতি গোটা পৃথিবীতে জনবল, ধন-সম্পদ ও সভ্যতায় শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা লাভ করেছিল। আজ এমন কে আছে যে আমার নিকট থেকে মাত্র দুই দিরহাম দিয়ে সেই জাতির ধবংসাবশেষ ক্রয় করতে রাজি হবে?'

উপস্থিত জনগণ তাঁর এ হৃদয়গ্রাহী ও আবেগঝড়া বক্তব্য শুনে আঝোর ধারায় কাঁদতে থাকেন। সে কান্নার আওয়াজ মসজিদের বাহির থেকেও শোনা যাচ্ছিল।

* * *

সেদিনের সেই সর্বশ্রেণির মানুষকে উপদেশ দানের পর থেকে আবুদ দারদা রাযিয়াল্লাহু আনহু দামেস্কের বিভিন্ন সমাবেশস্থলে গিয়ে হাজির হতেন। হাটে-বাজারে ঘুরে ঘুরে মানুষের প্রশ্নের উত্তর দিতেন। অজানা মানুষকে শিক্ষা দিতেন। অসতর্ক গাফেল ব্যক্তিকে সচেতন করতেন। মানুষকে সংশোধনের প্রতিটা সুযোগকে কাজে লাগিয়ে ব্যাপকভাবে মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত হতেন।

* * *

ওই যে দেখুন, আবুদ দারদা রাযিয়াল্লাহু আনহু হেঁটে যাচ্ছেন। যেতে যেতে দেখলেন একদল লোক একজন মানুষকে ঘিরে ধরে রেখেছে। লোকটিকে তারা মারছে আর বকাবকি করছে। তিনি সেদিকে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন,

'কী ব্যাপার? কী হয়েছে এখানে?'

তারা জবাব দিল,

'এই লোকটি বড় একটি গুনাহ করেছে।'

আবুদ দারদা রাদিয়াল্লাহ আনহু বললেন,

'লোকটি কুয়ার মধ্যে পড়ে গেলে তোমরা কি সেখান থেকে তাকে উদ্ধার করতে না?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই করতাম।'

'তাই যদি হয়, তাহলে তাকে না-মেরে, না-বকে ভালোভাবে বোঝাও। এভাবেই তাকে উদ্ধার করো। তোমরা নিজেরা পাপে লিপ্ত হওয়া থেকে রক্ষা পেয়েছ সেজন্য আল্লাহর প্রশংসা ও শুকরিয়া আদায় করো। কারণ, তিনিই তোমাদের পাপ থেকে হেফাজত করেছেন।'

উত্তেজিত ঐ লোকগুলো আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করল,

'আপনি কি তাহলে এই পাপী লোকটিকে ঘৃণা করবেন না?'

‘প্রকৃতপক্ষে আমি তাকে নয় তার পাপকে ঘৃণা করব। যখনই সে পাপ কাজটি ত্যাগ করবে সঙ্গে সঙ্গে সে আমার ভাই হয়ে যাবে।’

এসব কথা শুনে লোকটি অনুশোচনায় কাঁদতে লাগল আর পুনরায় পাপ না করার অঙ্গীকার করে তাওবা করে নিল।

* * *

অন্য এক যুবক আবুদ দারদা রাযিয়াল্লাহু আনহুর কাছে এসে বলল,

‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গী! আমাকে কিছু উপদেশ দিন।’

তিনি বললেন,

‘বেটা! তোমার সুখ ও আনন্দের দিনগুলোতে আল্লাহর কথা মনে রেখো। তাহলে তোমার দুঃখ ও কষ্টের দিনগুলোতে তিনি তোমার কথা মনে রাখবেন।

হে পুত্র! হয় তুমি একজন আলেম হও, নয়তো ইল্‌ম শিক্ষার্থী ‘তালিবুল ইল্‌ম’ হও। এটাও না পারলে অন্তত আলেমদের সাহচর্যে থেকে তাদের কথার শ্রোতা হয়ে যাও। খবরদার! চতুর্থটা (অজ্ঞ-মূর্খ) হয়ো না। তাহলে তুমি বরবাদ হয়ে যাবে।

হে পুত্র! আল্লাহর ঘর মসজিদ যেন হয় তোমার বাড়ি। কেননা, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি,

أَلْمَسَاجِدُ بَيْتُ كُلِّ تَقِيٍّ

‘সকল মুত্তাকী ও আল্লাহ ভীরু লোকের বাড়ি হলো মসজিদসমূহ।’

মসজিদকে যারা বাড়ি বানাবে আল্লাহ তাআলা তাদের প্রতি দয়া ও শান্তি প্রদানের নিশ্চয়তা দিয়েছেন। আরও নিশ্চয়তা দিয়েছেন যে তারা আল্লাহর সন্তুষ্টির পথ অতিক্রম করতে পারবেন।’

* * *

একদিন তিনি একদল যুবককে রাস্তার পাশে বসে গল্প করতে দেখে তাদের কাছে এগিয়ে গেলেন। তিনি দেখলেন ওরা পথচারীদের দিকে তাকিয়ে নিজেদের মধ্যে মেতে উঠছে। তিনি তাদের বললেন,

'বাবারা! তোমরা মুসলিম যুবক। তোমাদের জন্য নিজ নিজ বাড়িতে অবস্থান করাই হলো ঈমান ও চরিত্র হেফাজতের সবচেয়ে নিরাপদ ব্যবস্থা। নিজ নিজ বাড়ি তোমাদের জন্য ইবাদতখানার মতো পবিত্রস্থান। দৃষ্টিকে সংযত ও নফসকে নিয়ন্ত্রণে রাখার সেটাই সর্বোত্তম স্থান। মনে রেখো, তোমাদের নৈতিকতা বিরোধী এবং চরম বিধ্বংসী বদঅভ্যাস হলো পথে-ঘাটে ও হাটে-বাজারে বসে আড্ডা দেওয়া। এই ধরনের বদঅভ্যাস যুবকদের অকর্মা ও কুকর্মা বানিয়ে দেয়।'

* * *

আবুদ দারদা রাযিয়াল্লাহু আনহুর দামেস্কে অবস্থানকালে একদিন দামেস্কের শাসক মুআবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু নিজ পুত্র ইয়াযিদের জন্য আবুদ দারদা রাযিয়াল্লাহু আনহুর কাছে তার কন্যা 'দারদা'র জন্য প্রস্তাব পাঠালেন। মুআবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু আশা করে অপেক্ষা করছিলেন,

আবুদ দারদা নিশ্চয় ইয়াযিদের সঙ্গে তাঁর কন্যা 'দারদা'কে বিয়ে দিতে আনন্দের সঙ্গেই রাজি হয়ে যাবেন। কিন্তু আবুদ দারদা রাযিয়াল্লাহু আনহু এই প্রস্তাব মানলেন না। বরং অতি সাধারণ মুসলিমপরিবারের চরিত্রবান ও দীনদার ছেলের সঙ্গে মেয়ে 'দারদা'র বিয়ে দিয়ে দিলেন।

বিষয়টি ব্যাপকভাবে মানুষের মুখে মুখে আলোচিত হতে লাগল যে আবুদ দারদা মেয়ের জন্য ইয়াযিদ ইবনে মুআবিয়ার প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়ে মেয়ে দারদার বিয়ে দিলেন সাধারণ এক মুসলিম যুবকের সঙ্গে।

একজন তো কৌতূহল দমন করতে না পেরে সোজা আবুদ দারদা রাযিয়াল্লাহু আনহুর কাছে এসে জিজ্ঞাসা করে বসলেন, 'কী উদ্দেশ্যে আপনি এমন করলেন?'

তিনি জবাব দিলেন,

'আমি যা করেছি সেটা আমার মেয়ে দারদার দীন-দুনিয়ার কল্যাণের জন্যেই করেছি।'

'এতে মেয়ের কল্যাণ কিভাবে হবে? গভর্নরের ছেলেকে বাদ দিয়ে একজন সাধারণ যুবকের সঙ্গে বিয়ে দেওয়াতে মেয়ের কি লাভ ও উপকার হবে?'

আবুদ দারদা রাযিয়াল্লাহু আনহু জবাব দিলেন,

'আমার মেয়ে দারদাকে আমি ধন-সম্পদ, দুনিয়ার চাকচিক্য ও অহঙ্কার মুক্ত জীবন-যাপনের শিক্ষায় গড়ে তুলেছি। যদি বিয়ের পর এমন পরিবেশে গিয়ে হাজির হয় যেখানে সে দেখবে আলো ঝলমলে আর শৌখিন আসবাবে ঠাসা বিশাল প্রাসাদ, সামনে তার বহুদাস-দাসী সর্বদা হুকুম তামিল করার অপেক্ষায় দণ্ডায়মান, সেই মুহূর্তে তার দীনদারির অবস্থা কি হবে?

* * *

আবুদ দারদা রাযিয়াল্লাহু আনহু সিরিয়াতে থাকাকালীন খলীফাতুল মুসলিমীন উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু গোপনে একবার সিরিয়ার সফরে বের হলেন। সিরিয়ার খোঁজ-খবর নেওয়ার পর তিনি ভাবলেন, গোপনে গোপনে আবুদ দারদার খবরটাও জেনে যাই। সেই হিসাবে তিনি রাতের বেলা আবুদ দারদার বাড়ি গিয়ে দরজার কড়ায় হাত দিতেই দেখলেন দরজা বন্ধ করা হয়নি। খোলা দরজা ধাক্কা দিয়ে দেখলেন ঘর অন্ধকার। কোথাও কোনো আলোর ব্যবস্থা নেই। কোনো আগন্তুকের পায়ের আওয়াজ অনুভব করতে পেরে আবুদ দারদা উঠে দাঁড়ালেন। উমর ফারুক রাযিয়াল্লাহু আনহুকে চিনতে পেরে স্বাগত জানিয়ে তাঁকে বসালেন।

আল্লাহর রাসূলের বিখ্যাত এই দুই সাহাবী একত্রে বসে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা বললেন। নানা ব্যাপার নিয়ে মত-বিনিময় করলেন। সেই

রাতে আবুদ দারদার ঘরে তেলের অভাবে বাতি জ্বালানো হয়নি। যার ফলে অন্ধকারে তারা একে অন্যের চেহারা দেখতে পাচ্ছিলেন না। এই অন্ধকারে কথা বলতে বলতেই হযরত উমরের মনে কৌতূহল জাগল যে আবুদ দারদার বালিশটা কেমন, একটু নেড়ে দেখি। সেটা কি খুবই আরামদায়ক নাকি খুব সাধারণ মানের?

উমর ফারুক রাযিয়াল্লাহু আনহু নেড়েচেড়ে দেখে যা বুঝতে পারলেন তা হলো, আবুদ দারদা রাযিয়াল্লাহু আনহুর কোনো বালিশই নেই। ঘোড়ার পিঠে যে মোটা কাপড় ব্যবহার করা হয়, রাতের বেলা সেটাকেই তিনি ব্যবহার করে থাকেন বালিশ হিসাবে। এরপর খলীফা উমর হাত বাড়ালেন তার বিছানার ধরন বোঝার জন্য। দেখলেন গুঁড়ো গুঁড়ো পাথর আর বালি মেশানো তোষক। বিছানা হিসাবে তিনি এটাই ব্যবহার করছেন। এরপর তিনি লেপ বা কম্বলের খোঁজ করতে গিয়ে দেখতে পেলেন, লেপ-কম্বল বলতে তাঁর রয়েছে একটিমাত্র পাতলা চাদর—দামেস্কের কনকনে শীত মোকাবেলায় যা একেবারেই অনুপযোগী।

অন্ধকারে এইসব নেড়েচেড়ে দেখে ও বুঝে খলীফা উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু আবুদ দারদা রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বললেন,

'আমি কি আপনার জরুরি প্রয়োজন মেটানোর জন্য উপযুক্ত ভাতার ব্যবস্থা করিনি? আমি কি আপনার মাসিক ভাতা সময় মতো আপনার কাছে পাঠাইনি? তারপরও কেন আপনার এই করুণ অবস্থা? আল্লাহ রহম করুন আপনার প্রতি।'

আবুদ দারদা রাযিয়াল্লাহু আনহু উত্তরে বললেন,
'হে উমর! আপনার কি মনে পড়ে সেই হাদীসটির কথা যা প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের শুনিয়েছিলেন?'

উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন,
'কোন্ হাদীসটির কথা বলতে চাইছেন?'

আবুদ দারদা রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন,

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি আমাদের বলেননি?

لِيَكُنْ بَلَاغُ أَحَدِكُمْ مِنَ الدُّنْيَا كَزَادِ رَاكِبٍ

'দুনিয়ায় তোমাদের ধন-সম্পদ যেন একজন মুসাফিরের সামানের চেয়ে বেশি না হয়।'

উমর ফারুক রাযিয়াল্লাহু আনহু উত্তর দিলেন,
'হ্যাঁ, তিনি বলেছিলেন।'

আবুদ দারদা রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন,
'হে উমর! তিনি চলে যাবার পর আমরা এসব কী করছি?'

খলীফা উমর তখন কাঁদতে লাগলেন। আবুদ দারদা রাযিয়াল্লাহু আনহুও কাঁদলেন। সে রাতটি এভাবেই তাঁদের কান্নাকাটির মধ্যে কেটে গেল।

* * *

আবুদ দারদা রাযিয়াল্লাহু আনহু জীবনের শেষ নিঃশ্বাষ পর্যন্ত দামেস্কবাসীর প্রতি ওয়াজ-নসিহতের ধারা অব্যাহত রাখলেন। বিভিন্ন বিষয়ে তাদের সজাগ করতে থাকেন। তাদের কুরআন ও হেকমত শেখাতে থাকেন।

এরপর যেদিন তিনি মৃত্যশয্যায় শায়িত হলেন, ঘনিষ্ঠ সঙ্গী ও বন্ধুরা তাঁর কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন,
'আপনার সমস্যা কী?'

তিনি বললেন,
'আমার সমস্যা হলো আমার গুনাহ।'

তারা জিজ্ঞাসা করলেন,
'আপনি চান কি?'

তিনি জবাব দিলেন,
'আমি চাই আমার আল্লাহর ক্ষমা।'

এরপর তিনি আশপাশের সকলকে বললেন,
'তোমরা আমাকে কালিমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূল্লাহ'-এর তালকীন করো। তারা কালিমা পড়তে থাকলেন আর তিনি শুনে শুনে বলতে থাকলেন। এভাবেই কালিমা পড়তে পড়তে প্রাণত্যাগ করলেন।

* * *

আবুদ দারদা রাযিয়াল্লাহু আনহুর ইন্তেকালের পর বিখ্যাত তাবেঈ আউফ ইবনে মালেক আল্-আশজাঈ রহমাতুল্লাহি আলাইহি স্বপ্নে দেখেন যে,

'একটি বিশাল বিস্তীর্ণ সবুজ মাঠ, যার মাঝ বরাবর চামড়ার তৈরি এক বিশাল গম্বুজ দেখা যাচ্ছে। এর চারপাশে রয়েছে সাদা ও অপূর্ব সুন্দর সারিবদ্ধ এক বিশাল বকরির পাল।'

আউফ ইবনে মালেক জিজ্ঞেসা করলেন,
'এইসব নয়নাভিরাম, অপূর্ব শুভ্রসুন্দর সম্পদের মালিক কে?'

তাকে জানানো হলো,
'আবদুর রহমান ইবনে আউফ।'

এই কথাবার্তার পর চামড়ার তৈরি সুন্দর সেই গম্বুজ থেকে আবদুর রহমান ইবনে আউফ রাযিয়াল্লাহু আনহু স্বপ্নদ্রষ্টা মালেকের পুত্র আউফকে বললেন,

'হে ইবনে মালেক! মহান আল্লাহ এই এত কিছু আমাকে দান করেছেন কুরআনের বদৌলতে। তুমি যদি এই পথ ধরে আরও কিছুটা অগ্রসর হও তাহলে দেখতে পাবে এমন কিছু—যা তোমার চোখ কখনোই দেখেনি। শুনতে পাবে এমন কিছু—যা তোমার কান

কোনোদিনই শোনেনি এবং পেয়ে যাবে এমন কিছু—কোনদিন তুমি যার কল্পনাও করতে পারোনি।'

ইবনে মালেক (স্বপ্নদ্রষ্টা) রাযিয়াল্লাহু আনহু জিজ্ঞাসা করলেন,

'হে আবু মুহাম্মাদ! (আবদুর রহমান ইবনে আউফ!) সেইসব অকল্পনীয় সম্পদ কার?'

তিনি বললেন,

'সেই অভাবিত, অশ্রুতপূর্ব ও অকল্পনীয় সবকিছু আল্লাহ সাজিয়ে রেখেছেন আবুদ দারদার জন্য। কেননা, আবুদ দারদা মনে-প্রাণে দুনিয়ার ভোগ-বিলাস ও মোহ-মায়াকে পরিত্যাগ করেছিলেন এবং তিনি দুনিয়াকে দুই হাত ও বুক দিয়ে ধাক্কা দিয়ে দিয়ে দূরে ঠেলে দিয়েছিলেন।

তথ্যসূত্র :

১. *আল-ইসাবা*, ৩য় খণ্ড, ৪৫ পৃষ্ঠা অথবা *আত্তারজামা*, ৬১১৭।
২. *আল-ইসতীআব*, (*আল-ইসাবার টীকা*) ৩য় খণ্ড, ১৫ পৃষ্ঠা এবং ৪র্থ খণ্ড, ৫৯ পৃষ্ঠা।
৩. *উসদুল গাবাহ*, ৪র্থ খণ্ড, ১৫৯ পৃষ্ঠা।
৪. *হুলইয়াতুল আউলিয়া*, ১ম খণ্ড, ৩০৮ পৃষ্ঠা।
৫. *হুসনুস সাহাবা*, ২১৮ পৃষ্ঠা।
৬. *সিফাতুস সফওয়া*, ১ম খণ্ড, ২৫৭ পৃষ্ঠা।
৭. 'যাহাবী'কৃত *তারীখুল ইসলাম*, ২য় খণ্ড, ১০৭ পৃষ্ঠা।
৮. *হায়াতুস সাহাবা*, সূচি দ্রষ্টব্য।
৯. *আল-কাওয়াকিবুদ দুররিয়্যাহ*, ১ম খণ্ড, ৪৫ পৃষ্ঠা।
১০. 'যিরকলী'কৃত *আল-আলাম*, ৫ম খণ্ড, ২৮১ পৃষ্ঠা।

যায়েদ ইবনে হারেসা

আল্লাহর কসম! যায়েদ ইবনে হারেসা নেতৃত্বের জন্য অত্যন্ত উপযুক্ত ব্যক্তি। সে আমার অন্যতম প্রিয় মানুষ।'

—মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

সুদা বিনতে সালাবা শ্বশুরবাড়ি থেকে নিজের কওম বনী মাআনের উদ্দেশ্যে অর্থাৎ নিজের আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য বের হয়েছেন। কাফেলার অন্যদের পাশাপাশি এ যাত্রায় তার একান্ত সঙ্গী ছিল শিশুপুত্র যায়েদ ইবনে হারেসা আল-কাবী। দুর্ভাগ্য, এই কাফেলা নিজ গোত্রের আবাসভূমিতে পৌঁছার পূর্বক্ষণে তাদের ওপর আক্রমণ করে বসে 'আল্-কাইন' গোত্রের লুটতরাজকারী অশ্বারোহী দল। 'লুটেরা' দল কাফেলার সদস্যদের সকল অলঙ্কার, নগদ অর্থ ও সম্পদ ছিনিয়ে নেয়, তাদের বাহন উটগুলোও কেড়ে নেয় আর লোকজনকে করে বন্দী।

লুটেরাবাহিনীর হাতে যারা বন্দী হলো—সুদার শিশুপুত্র যায়েদ ছিল তাদের মধ্যে অন্যতম। ছোট্ট বালক শিশু যায়েদের বয়স তখন আটের ঘর ছুঁই ছুঁই করছে। তারা বালকটিকে বিক্রির জন্য উকাযের মেলায় তুলল। সেখান থেকে তাকে কুরাইশ বংশের বিখ্যাত ধনাঢ্য ব্যক্তি হাকীম ইবনে হাযাম ইবনে খুওয়াইলিদ চারশো দিরহাম দিয়ে কিনে নিলেন। এর

সঙ্গে আরও কয়েকজন বালককে কিনে নিয়ে হাকিম ইবনে হাযাম মক্কায় ফিরে এলেন :

* * *

উকাযের মেলা থেকে বাড়ি ফেরার খবর পেয়ে তার ফুফু খাদীজা বিনতে খুওয়াইলিদ এসে হাজির হলেন। তাকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানালেন। হাকিম ইবনে হাযাম ফুফুকে উদ্দেশ্য করে বললেন,

'ফুফু! আজ আমি উকাযের মেলা থেকে বেশ কয়েকটা বালক ক্রয় করেছি। আপনি ওদের দেখুন। আপনার যাকেই ভালো লাগবে তাকেই আপনার জন্য হাদিয়া।'

খাদীজা বিনতে খুওয়াইলিদ সব বালকের চেহারা গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলেন অবশেষে তিনি যায়েদ ইবনে হারেসার মধ্যে মেধা ও বুদ্ধির নিদর্শন দেখে তাকেই পছন্দ করলেন এবং তাকে সঙ্গে করে নিজের বাড়িতে ফিরে এলেন।

এর কিছুদিন পরেই মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহর সঙ্গে খাদীজা বিনতে খুওয়াইলিদের বিয়ে হয়। খাদীজা নতুন স্বামীকে আকর্ষণীয় একটি উপহার দেওয়ার কথা চিন্তা করলেন। কিন্তু সেই মুহূর্তে তাঁর প্রিয় গোলাম যায়েদ ইবনে হারেসা ছাড়া আর কোনো উত্তম উপহার হতে পারে বলে মনে হলো না। তাই তিনি যায়েদ ইবনে হারেসাকেই উপহার হিসাবে পেশ করলেন স্বামীর খেদমতে।

* * *

একদিকে এই ভাগ্যবান কিশোর যায়েদ বেড়ে উঠতে থাকেন মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহর স্নেহপূর্ণ তত্ত্বাবধানে, তাঁর পরশতুল্য সান্নিধ্যে এবং যায়েদের শরীর ও মনের বিকাশ ঘটতে থাকে তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ চরিত্রমাধুরীর সংস্পর্শে।

অপরদিকে একমাত্র কলিজার টুকরা যায়েদকে হারানোর পর থেকে তার হতভাগা মা বেঁচে থাকার আশাই হারিয়ে ফেলেন। অবাধ্য তার দু'চোখ মানছে না কোনো শাসন। অবিরাম বয়ে যাচ্ছে শ্রাবণের বর্ষণ।

সীমাহীন দুঃখ-বেদনায় ভারাক্রান্ত তার হৃদয় ধীরে ধীরে চরম হতাশায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ছে। কারণ, তিনি জানতেই পারলেন না যে তার একমাত্র পুত্র কি জীবিত না মৃত? জীবিত থাকলে তাকে ফিরে পাবার আশায় বুক বাঁধবেন আর মৃত হলে তাকে ফিরে পাবার আশা ত্যাগ করে স্বাভাবিক জীবন-যাপন শুরু করবেন।

একইভাবে যায়েদের পিতা হারেসাও হন্যে হয়ে হারানো পুত্রকে খুঁজতে চেনা-অচেনা সকল স্থান চষে ফেলেন। পুত্রের শোকে কাতর হয়ে পেরেশান পিতা প্রত্যেক কাফেলার কাছে ছুটে গিয়ে হারানো সন্তানের সন্ধান করতে থাকেন। কিংকর্তব্যবিমূঢ় পিতা ব্যথাভরা এক শোকগাথা গেয়ে গেয়ে ভবঘুরের মতো ঘুরতে থাকেন। তার কলিজা ছেঁড়া শোকগাথা ছিল,

بَكَيْتُ عَلى زَيْدٍ وَلَم أَدْرِ مَا فَعَلْ – أَحَيٌّ فَيُرْجى أَمْ أَتى دُوْنَه الْأَجَلْ

'পুত্র যায়েদের জন্য কেঁদে কেঁদে বুক ভাসালাম, অথচ আজও জানতে পারলাম না যে সে জীবিত না মৃত? আমি বিষণ্ন, আমি ব্যথায় কাতর, পুত্রের শোকে পাথর। আমি দিশেহারা। আমি কি তার ফিরে আসার অপেক্ষা করব নাকি চিরতরে তার আশা ছেড়ে দেব।

فَوَاللهِ مَا أَدْرِىْ وَإِنِّىْ لَسَائِلٌ – أَغَالَكَ بَعْدِىْ السَّهْلُ أَمْ غَالَكَ الْجَبَلُ

'আল্লাহর কসম! আমি আজ কিছুই জানি না তার কথা। কোথায় সে আছে? কী বা করছে? আমি সত্যিই জানতে চাই তার কী পরিণতি হলো?

হে আমার পুত্র! তোমাকে কি কোনো চোরাবালি গিলে ফেলল নাকি কোনো পাহাড় তোমাকে নিঃশেষ করে ফেলল।'

تُذَكِّرُنِيْهِ الشَّمْسُ عِنْدَ طُلُوْعِهَا – وَتَعْرِضُ ذِكْرَاهُ إِذَا غَرْبُهَا أَفَلْ

'সূর্য উদয়ের সময় থেকেই তোমাকে ভেবে আমার কান্না শুরু হয়। দুপুর বিকেল গড়িয়ে সূর্যাস্তের মাধ্যমে দিন ফুরিয়ে যায়। শুধু আমার কান্না ফুরোয় না। এভাবেই আমার চোখ দুটো ঝড়েই চলেছে রাতদিন, ঘুমহীন, বাধাহীন।'

سَأُعْمِلُ نَصَّ الْعِيْسِ فِيْ الْأَرْضِ جَاهِدًا – وَلَا أَسْأَمُ التَّطْوَافَ أَوْ تَسْأَمَ الْإِبِلْ

'দ্রুতগামী উত্তম উট নিয়ে আমি তোমাকে খুঁজব গোটা পৃথিবীর সবখানে, আমার উট যতদিন ক্লান্ত না হবে, আমার জীবন বাজি রেখে এ মিশন আমি চালাতেই থাকব।'

حَيَاتِيْ أَوْ تَأْتِيْ عَلَيَّ مَنِيَّتِيْ – فَكُلُّ امْرِءٍ فَانٍ وَإِنْ غَرَّهُ الْأَمَلْ

'হয় আমি তোমাকে খুঁজে পাব নয়তো মৃত্যু এসে আমাকে গ্রাস করবে। জীবমাত্রই মরণশীল যদিও দীর্ঘ আশা তাকে অনিবার্য মৃত্যু থেকে উদাসীন করে রাখে।'

* * *

এক হজ মৌসুমে বাইতুল্লায় হজ করতে আসে যায়েদের গোত্রের একদল লোক। তারা বাইতুল্লার তাওয়াফ করার সময় হঠাৎ যায়েদকে সামনা-সামনি পেয়ে যায়। তারা যায়েদকে চিনতে পারে এবং যায়েদও তাদের চিনতে পারে। তারা যায়েদের কাছে পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর থেকে বর্তমান পর্যন্ত তার অবস্থা সম্পর্কে জানতে চায়। যায়েদও তাদের কাছে পিতা-মাতা ও এলাকার খোঁজ-খবর জিজ্ঞাসা করে। এইসব লোক হজ পালন শেষ করে এলাকায় ফিরে গিয়েই

যায়েদের পিতা হারেসাকে হারানো ছেলে যায়েদ সম্পর্কে আদ্যোপান্ত সকল সংবাদ শোনাল।

যায়েদের পিতার খুশি তখন দেখে কে? তিনি দ্রুত কলিজার টুকরা, চোখের মনি পুত্রকে মুক্ত করার জন্য মুক্তিপনের অর্থ, বাহন আর পাথেয়ের ব্যবস্থা করে ফেললেন। ভাই কাবকে সঙ্গী করে মক্কার উদ্দেশ্যে অবিরাম সফর করলেন। মক্কায় পৌঁছেই তারা মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহর বাড়ি গিয়ে হাজির হলেন। তার কাছে নিজেদের এই সফরের উদ্দেশ্য জানিয়ে বললেন,

'হে আবদুল মুত্তালিবের বংশধর! আপনারা আল্লাহর ঘর কাবার প্রতিবেশী ও খাদেম। আপনারা অভাবগ্রস্থের অভাব দূর করেন, নিরণ্ন ও ক্ষুধার্তকে খাদ্য দান করেন। আপনারা বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিকে বিপদমুক্তিতে সাহায্য করেন।

আপনাদের এ সকল গুণ ও বৈশিষ্ট্যের কারণে আমরা বহু আশা নিয়ে আপনার কাছে ছুটে এসেছি আমাদের পুত্রকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে—যে এখন রয়েছে আপনারই কাছে। আমি তার জন্য মুক্তিপণ নিয়ে এসেছি। আপনি যা চান তাই নিয়ে ওকে মুক্ত করে দিন। আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করুন।'

মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ বললেন,
'কে আপনাদের পুত্র? কার কথা বলছেন?'

তারা একসঙ্গে বলে উঠলেন,
'আপনার গোলাম যায়েদ ইবনে হারেসা।'

তিনি বললেন,
'মুক্তিপণ দিয়ে তাকে মুক্ত করে নিয়ে যাবেন, এরচেয়েও ভালো ব্যবস্থায় কি আপনারা রাজি হবেন?

তারা ব্যাকুল হয়ে জানতে চাইলেন,

'কী সেই ব্যবস্থা?'

তিনি বললেন,

'আমি তাকে আপনাদের সামনে ডেকে আনছি, 'আমার সঙ্গে থেকে যাওয়া' অথবা 'আপনাদের সঙ্গে চলে যাওয়া' দুই বিকল্পের কোনো একটি বেছে নেওয়ার সুযোগ তাকে দিন। যদি সে স্বেচ্ছায় আপনাদের সঙ্গে চলে যেতে চায়, তাহলে কোনো মুক্তিপণ ছাড়াই আপনারা তাকে নিয়ে যান। আর যদি সে স্বেচ্ছায় আমার সঙ্গে থেকে যাওয়াকে বেছে নেয়, তাহলে আল্লাহর কসম! আমি তার স্বাধীন সিদ্ধান্তকে পরিবর্তন করতে বলব না।'

তারা দু'জনেই একই সুরে বলে উঠলেন,

'সত্যিই আপনার বর্ণিত ব্যবস্থা খুবই ইনসাফপূর্ণ। এর চেয়ে ভালো ব্যবস্থা হতেই পারে না।'

এরপর মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ যায়েদকে তাদের সামনে ডেকে এনে জিজ্ঞাসা করলেন,

'এরা দু'জন তোমার কি হন?'

যায়েদ উত্তরে বলল,

'(পিতাকে দেখিয়ে) ইনি আমার পিতা হারেসা ইবনে শুরাহীল এবং (চাচাকে দেখিয়ে) ইনি আমার চাচা কাব।'

এবার মুহাম্মাদ যায়েদকে বললেন,

'যায়েদ! তোমার পিতা এসেছেন তোমাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য। তোমার ইচ্ছা হলে তার সঙ্গে বাড়ি চলে যেতে পারো, আমার আপত্তি নেই। আর যদি আমার কাছে থাকতে চাও তাও থাকতে পারো, তুমি স্বাধীন ভাবে সিদ্ধান্ত নাও। আমরা কেউ তোমাকে কোনোটার জন্য বাধ্য করব না এবং বাধাও দেব না।'

যায়েদ অবিলম্বে এবং নির্দ্বিধায় বলল,

'আমি আপনার সঙ্গেই থাকব, পিতার সঙ্গে যাব না। এটাই আমার স্বাধীন সিদ্ধান্ত।'

পিতা চমকে উঠে বললেন,

'একি যায়েদ! পিতা-মাতার সঙ্গে স্বাধীন জীবন-যাপনের চেয়ে তুমি এখানে দাসত্বের জীবনকেই প্রাধান্য দিচ্ছ?'

যায়েদ বলল,

'এই মহান ব্যক্তির মাঝে আমি এমন এমন গুণ ও বৈশিষ্ট্য দেখেছি যেগুলো ছেড়ে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

* * *

মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ যায়েদের আচরণে, তার কথা শুনে, তার মানসিকতার আঁচ পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে তার হাত ধরে বাইতুল্লাহর দিকে টেনে নিয়ে গেলেন এবং একদল কুরাইশের লোকজনের উপস্থিতিতে হজরে আসওয়াদের পাশে দাঁড়িয়ে উচ্চস্বরে ঘোষণা করলেন,

'হে কুরাইশের লোকেরা! তোমরা সাক্ষী থাক; এই কিশোর বালক যায়েদ এখন থেকে আমার পুত্র। সে আমার উত্তরাধিকারী এবং আমিও তার উত্তরাধিকারী।'

এই দৃশ্য দেখে যায়েদের পিতা ও চাচার প্রাণ উৎফুল্ল হয়ে গেল। তারা তাকে বাড়ি নিয়ে যাওয়ার চেয়ে মুহাম্মাদের কাছে রেখে যেতেই বেশি আনন্দবোধ করলেন। ছেলেকে সেখানে রেখেই নিশ্চিন্ত মনে নিজ কওমের কাছে ফিরে গেলেন।

সেদিন থেকে যায়েদ ইবনে হারেসাকে যায়েদ ইবনে মুহাম্মাদ বলে ডাকা শুরু হলো। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নবুওয়াত প্রদান এবং ইসলাম পিতা-পুত্রের মৌখিক সম্পর্কের প্রচলিত রীতিকে বিলুপ্ত না করা পর্যন্ত তাকে 'যায়েদ ইবনে মুহাম্মাদ' বলে ডাকা চালু থাকল। প্রাচীন সেই রীতিকে রদ করে আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করলেন,

ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ

'তোমরা তাদেরকে তাদের পিতৃপরিচয়ে ডাকো।' -আল আহযাব : ৫

এই আয়াতের হুকুম নাজিল হওয়ার পর আবার তাকে 'যায়েদ ইবনে হারেসা' বলে ডাকা শুরু হলো।

* * *

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিজ পিতা-মাতার চেয়ে প্রাধান্য দেওয়ার সময় যায়েদ জানতে পারেননি যে তিনি কি বিশাল গনীমত ও কী মহাপুরস্কার লাভ করলেন। তিনি এটাও বুঝতে পারেননি যে তিনি যেই মনিবকে পিতা-মাতা ও আত্মীয়-পরিজনের ওপর অগ্রগণ্য করলেন, তিনি আগের ও পরের সকল মানুষের নেতা এবং তিনিই বিশ্বমানবতার কাছে প্রেরিত বিশ্বনবী।

একই ভাবে যায়েদ কল্পনাও করতে পারেননি যে অদূর ভবিষ্যতে এই মাটির পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হবে আসমানী নীতিমালার এক মহাশান্তির শাসন। অচিরেই মানবীয় দুর্বলতা, ত্রুটি ও যাবতীয় ব্যাধিমুক্ত সুস্থ ও সুষ্ঠু এক সমাজ গড়ে উঠবে। পূর্ব থেকে পশ্চিমে, উত্তর থেকে দক্ষিণে অর্থাৎ গোটা পৃথিবীতে সেই শাসন উপহার দেবে একটি ন্যায় ও ইনসাফ, সাম্য ও সম্প্রীতি, সুখ ও সমৃদ্ধিপূর্ণ এক সমাজ। আর সেই সুন্দর ও সুষ্ঠু সমাজ প্রতিষ্ঠার অন্যতম বুনিয়াদি সদস্য হবেন যায়েদ নিজেই। এই অসম্ভব সুন্দর ভবিষ্যত ছিল যায়েদের একেবারেই অজানা। তাঁর হৃদয়ের মণিকোঠায় কল্পনায়ও কখনো ঘুরপাক খায়নি এই ভবিষ্যৎ দৃশ্য।

এটা আল্লাহ তাআলার একান্ত অনুগ্রহ। তিনি যাকে চান শুধু তাকেই এই মহাসৌভাগ্য দান করেন। তিনি বড়ই সৌভাগ্যদাতা, মহান।

গোলাম ও দাস হিসাবে জীবন-যাপনের পরিবর্তে আপন পিতা-মাতার কাছে ফিরে গিয়ে স্বাধীন জীবন-যাপনের সুযোগ পাওয়ার এই অপূর্ব ও

স্মরণীয় ঘটনার কয়েক বছর পরেই আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নবুওয়াত দান করলেন। তাঁকে নবী হিসাবে মেনে তাঁর প্রতি ঈমান গ্রহণকারী প্রথম পুরুষ হলেন যায়েদ। 'সর্বপ্রথম ঈমান গ্রহণকারী পুরুষ'-এর বিরল মর্যাদা লাভ কি যেন তেন ব্যাপার!?

যায়েদ ইবনে হরেসা রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূলের প্রিয় ও আস্থাভাজন ব্যক্তিত্ব থেকে পর্যায়ক্রমে তাঁর যাবতীয় গোপন বিষয় ও সংবাদ সংরক্ষণকারী আমানতদার ব্যক্তিতে পরিণত হলেন। ছোট-বড় বিভিন্ন যুদ্ধে তিনি প্রিয় নবীর পক্ষ থেকে সেনাপতি নিযুক্ত হলেন। তাঁর অনুপস্থিতির কালে মদীনায় তাঁরই অন্যতম প্রিয় স্থলাভিষিক্ত খলীফা হলেন।

* * *

যায়েদ ইবনে হারেসা রাযিয়াল্লাহু আনহু যেভাবে প্রিয় নবীকে আপন পিতা-মাতার চেয়ে বেশি ভালোবাসতেন একইভাবে প্রিয় নবীও তাকে অনেক বেশি ভালোবাসতেন। আর সে কারণেই তাকে নিজ পরিবার ও আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছিলেন। যায়েদ কখনো দূরে গেলে ফিরে না আসা পর্যন্ত প্রিয় নবী তার জন্য উদ্বিগ্ন থাকতেন। ফিরে এলে তিনি উৎফুল্ল হয়ে উঠতেন। তিনি এমন অন্তরঙ্গ ভাবে তাকে সাক্ষাৎ দান করতেন, যে অন্তরঙ্গতা লাভের সৌভাগ্য যায়েদ ছাড়া আর কারও কপালে জোটেনি।

এই বর্ণনাটি শুনুন, এতে উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা তুলে ধরেছেন যে, যায়েদের আগমনে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কী পরিমাণ উৎফুল্ল হতেন। তিনি বলেন,

'কোনো একটি জরুরি কাজে যায়েদ মদীনার বাহিরে গিয়ে অনেক বেশি দেরি করে অবশেষে যখন মদীনায় ফিরে এলেন। এক মুহূর্তও

বিলম্ব না করে সোজা গিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরজায় আওয়াজ দিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেসময় আমার ঘরেই ছিলেন। তিনি যায়েদের ফিরে আসা বুঝতে পেরে খালি গায়েই দরজার দিকে ছুটতে লাগলেন। তখন তার পরনে ছিল শুধু নাভি থেকে হাঁটু ঢাকা একখণ্ড চাদর। এইভাবেই তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে প্রিয় যায়েদকে আলিঙ্গন করে, কপালে চুমু দিয়ে খুশির প্রকাশ ঘটালেন।'

উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা এই ঘটনায় নিজের মন্তব্য প্রকাশ করে বলেন,

وَاللهِ مَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ عُرْيَانًا قَبْلَه وَلَا بَعْدَه

'আল্লাহর কসম! আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এর আগে বা পরে আর কখনোই কারও সামনে এভাবে খালি গায়ে বের হতে দেখিনি।'

যায়েদের প্রতি রাসূলের গভীর ভালোবাসা ও অন্তরঙ্গতার বিষয়টি সবার মাঝে ছড়িয়ে পড়লে সকলে তাকে ডাকতেন 'আদরের যায়েদ' বলে, তাকে আখ্যায়িত করতেন প্রিয় নবীর 'প্রিয় পাত্র' উপাধিতে। এমনকি এই ভালোবাসা ও অন্তরঙ্গতার ধারা চলমান থাকায় যায়েদের পরে তার পুত্র উসামাকেও ভূষিত করা হতো (حِبُّ رَسُوْلِ اللهِ وَابْنُ حِبِّهِ) 'নবীজীর প্রিয় পাত্র এবং প্রিয় পাত্রের পুত্র' বলে।

* * *

অষ্টম হিজরীতে হিকমতওয়ালা মহান আল্লাহ তাআলা চাইলেন তাঁর প্রিয়বন্ধুকে বন্ধুর বিচ্ছেদ বেদনা দিয়ে পরীক্ষা করতে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসলাম কবুলের দাওয়াত সম্বলিত একটি চিঠি দিয়ে 'বুসরা'র বাদশার কাছে দূত হিসাবে পাঠালেন হারেস ইবনে উমায়ের আল্-আযদীকে। এই দূত পূর্ব জর্ডানের 'মূতা' নামক স্থানে

পৌঁছলে 'গাসসানী' এক নেতা শুরাহবীল ইবনে আমর এসে তার পথ রোধ করে। তার হাত-পা বেঁধে বুসরার বাদশার সামনে হাজির করলে বাদশা তাকে হত্যা করে।

এ ঘটনায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত ব্যথিত, মর্মাহত ও আঘাতপ্রাপ্ত হন। কারণ তাঁর কোনো দূতকে ইতিপূর্বে আর কেউ হত্যা করার মতো দুঃসাহস দেখায়নি।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'মূতা' প্রান্তরে দূত হত্যার প্রতিশোধের জন্য তিন হাজার যোদ্ধার এক বাহিনী তৈরি করেন এবং তাঁর প্রিয় পাত্র যায়েদ ইবনে হারেসাকে এই বাহিনীর সেনাপতি নিযুক্ত করে বলেন,

إِنْ أُصِيْبَ زَيْدٌ فَتَكُوْنُ الْقِيَادَةُلِجَعْفَرِ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ، فَإِنْ أُصِيْبَ جَعْفَرٌ كَانَتْ إِلى عَبْدِ اللهِ بْنِ رَوَاحَةَ، فَإِنْ أُصِيْبَ عَبْدُ اللهِ فَلْيَخْتَرِ الْمُسْلِمُوْنَ لِأَنْفُسِهِمْ رَجُلاً مِنْهُمْ

'যদি যায়েদ শহীদ হয়ে যায়, তাহলে সেনাপতির দায়িত্ব অর্পিত হবে জাফর ইবনে আবী তালেবের ওপর। যদি জাফর শহীদ হয়ে যায়, তাহলে দায়িত্ব অর্পিত হবে আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহার ওপর। সেও যদি শাহাদাত বরণ করে, তাহলে সেনাসদস্যরা পরামর্শ করে নিজেদের ভেতর থেকে কাউকে সেনাপতি হিসাবে বেছে নেবে।'

* * *

প্রিয় নবীর নির্দেশে যথারীতি মুসলিমসেনাদল পূর্ব জর্দানের 'মাআন' নামক স্থানে পৌঁছে গেল। ওদিকে রোমসম্রাট হিরাক্লিয়াস এক লাখ সৈন্য নিয়ে তার গাস্‌সানী গভর্নরের সাহায্যে ছুটে এল। আবার এই বিশাল রোমানবাহিনীর সাহায্যের জন্য প্রস্তুত হয়ে রইল আরবের এক লাখ

মুশরিকবাহিনী। দুই লাখ দুঃধর্ষ সৈন্যের বিশাল এই বাহিনী মুসলিমবাহিনীর অদূরেই অবস্থান নিল।

* * *

মুসলিমবাহিনী 'মাআন'-এ পরপর দুই রাত কাটাল। পরিস্থিতির মূল্যায়ন ও পর্যবেক্ষণ করল। বর্তমান পরিস্থিতিতে তাদের পদক্ষেপ কী হবে এই নিয়ে তারা পরামর্শে বসলে একজন প্রস্তাব দিলেন,

'রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে চিঠি দিয়ে শত্রুবাহিনীর সংখ্যা সম্পর্কে জানিয়ে আমরা তাঁর নির্দেশের অপেক্ষায় থাকি।'

অন্য একজন (আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা) বললেন,

'হে প্রিয় মুসলিম মুজাহিদ ভাইয়েরা! আল্লাহর কসম! আমরা নিজেদের শক্তি-সামর্থ্য ও সংখ্যার আধিক্যের ওপর নির্ভর করে জিহাদ করি না। আমাদের বিজয় শত্রুবাহিনীর শক্তি ও সংখ্যার ওপর নির্ভর করে আসে না। আমরা লড়াই করি আল্লাহর দীনের জন্য। অতএব হে মুসলিমবাহিনী! যে মহান লক্ষ্য নিয়ে তোমরা এসেছ, সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখে শত্রুবাহিনীর মুকাবেলায় এগিয়ে যাও, রুখে দাঁড়াও। আল্লাহ তাআলা তোমাদের দুই সফলতার যে কোনো একটি অবশ্যই দান করবেন—হয় বিজয়, নয় শাহাদাত।'

* * *

এরপর সব দ্বিধা-দ্বন্দের অবসান ঘটিয়ে মুসলিমবাহিনী 'মূতা'র প্রান্তরে রোমানবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। মুসলিমসৈনিকেরা এমন মরণপণ লড়াই করতে থাকল যে রোমানবাহিনীর অন্তরে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল। 'মাত্র তিন হাজার'—এই সামান্য সংখ্যক মুজাহিদই প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এবং আরব যোদ্ধাদের সমন্বয়ে গঠিত দুই লাখ সৈন্যের বিশাল বাহিনীর মধ্যে প্রচণ্ড ত্রাস সৃষ্টি করে ফেলল।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পতাকাবাহী সেনাপতি যায়েদ ইবনে হারেসা রাযিয়াল্লাহু আনহু সেনাপরিচালনায় এমন বীরত্ব ও দক্ষতার নজির সৃষ্টি করলেন যা বীরযোদ্ধাদের বীরত্বের ইতিহাসে একেবারে বিরল। কিন্তু শত্রুবাহিনীর নিক্ষিপ্ত শতাধিক তীর ও বর্শা তার দেহকে ছিন্নভিন্ন করে দিল আর রক্তের স্রোতে ভাসতে থাকল তার দেহ। নিস্তেজ হয়ে পড়লেন তিনি। আল্লাহর দেওয়া জান আল্লাহর জন্য বিলিয়ে দিয়ে শাহাদাত বরণ করলেন। এরপর জাফর ইবনে আবী তালেব রাযিয়াল্লাহু আনহু সেনাপতির ঝাণ্ডা হাতে তুলে নিলেন এবং প্রচণ্ড বীরত্বের সঙ্গে ইসলামের পতাকা সমুন্নত রাখার উদ্দেশ্যে আক্রমণ করতে করতে আর শত্রুবাহিনীর আক্রমণ ঠেকাতে ঠেকাতে শাহাদাত বরণ করে পূর্ববর্তী সাথীর সঙ্গে মিলিত হয়ে গেলেন।

এবার তার থেকে জিহাদের ঝাণ্ডা হাতে তুলে নিলেন আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাযিয়াল্লাহু আনহু। তিনিও পূর্বের দুই সঙ্গীর মতোই বীরবিক্রমে লড়াই করে দুশমনদের আতঙ্কিত করে তোলেন। এভাবেই লড়াই করতে করতে পূর্বসূরীদের মতো শাহাদাত বরণ করেন। এবার সকলে মিলে মুসলিমবাহিনীর সেনাপতি নির্বাচিত করেন খালিদ ইবনে ওয়ালীদকে। তিনি ছিলেন অল্প কিছুদিন পূর্বে ইসলাম গ্রহণকারী নওমুসলিম ও বিখ্যাত যোদ্ধা। তিনি মুসলিমবাহিনীকে আসন্ন বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করে পেছনে সরে আসেন।

* * *

রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'মূতা' যুদ্ধের সকল খবর বিশেষ করে পর পর তিন সেনাপতির শহীদ হওয়ার সংবাদে খুবই ব্যথিত ও মর্মাহত হলেন। তাঁকে পূর্বে কখনো এত অধিক ব্যথিত ও মর্মাহত হতে আর দেখা যায়নি। ভীষণ ব্যথিত হৃদয়ে শহীদদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করেন।

যায়েদ ইবনে হারেসা রাযিয়াল্লাহু আনহুর বাড়ি পৌঁছলে যায়েদের ছোট্ট মেয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আঁকড়ে ধরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকেন। এই করুণ দৃশ্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সহ্য করতে না পেরে নিজেও উচ্চস্বরে কাঁদতে থাকেন।

সাদ ইবনে উবাদাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু জিজ্ঞাসা করলেন,
'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি এভাবে কেন কাঁদছেন?'

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাব দিলেন,
'এটা হচ্ছে অন্তরঙ্গ বন্ধুর জন্য অন্তরঙ্গ বন্ধুর কান্না।'

তথ্যসূত্র :

১. *সহীহ মুসলিম*, ৭ম খণ্ড, ১১৩ পৃষ্ঠা, বাবু ফাজায়িলিস সাহাবাহ।
২. *জামিউল উসূল মিন আহাদীসির রাসূল*, ১০ম খণ্ড, ২৫-২৬ পৃষ্ঠা।
৩. *আল-ইসাবা*, ১ম খণ্ড, ৫৬৩ পৃষ্ঠা অথবা জীবনী ২৮৯০।
৪. *আল-ইসতীআব* (*আল-ইসাবার* টীকা) ১ম খণ্ড, ৫৪৪ পৃষ্ঠা।
৫. ইবনে হিশামকৃত *আস-সীরাতুন্নবুবিয়্যাহ*, ৪র্থ খণ্ডের সূচিপত্র দ্রষ্টব্য।
৬. *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, (অষ্টম হিজরীর ঘটনাবলী অংশে দ্রষ্টব্য)।
৭. *হায়াতুস সাহাবা*, ৪র্থ খণ্ডের সূচি দ্রষ্টব্য।
৮. *সিফাতুস সফওয়া*, ১ম খণ্ড, ১৪৭ পৃষ্ঠা।
৯. আল-বাগদাদী কৃত *খাযানা*, ১ম খণ্ড, ৩৬৩ পৃষ্ঠা।

উসামা ইবনে যায়েদ

নিঃসন্দেহে উসামার পিতা আল্লাহর রাসূলের কাছে তোমার পিতার চেয়ে বেশি প্রিয় ছিল আর উসামাও তাঁর কাছে ছিল তোমার চেয়ে বেশি প্রিয়।'

–নিজপুত্র আবদুল্লাহর প্রতি উমর ফারুকের উক্তি

এখন আমরা হিজরতের সাত বছর পূর্বে। মক্কায় চলছে মুমিনদের চরম দুর্দিন।

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তার সঙ্গীরা কুরাইশদের নানামুখী নির্যাতন ও নিপীড়ন সহ্য করে যাচ্ছেন।

নতুন নতুন মানুষের ইসলাম কবুল এবং আরও বেশি মানুষের কাছে ইসলাম প্রচারের ফলে রাসূল ও তাঁর সঙ্গীদের একের পর এক বিপদ-আপদ ও দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে নিতে হচ্ছে। প্রিয় নবীর জীবনকে দুর্বিসহ করে তোলা হয়েছে।

এই রকম করুণ অবস্থার মধ্যেই নবীজীর জীবনে, তাঁর চোখে মুখে ভেসে উঠল এক নির্মল খুশি ও আনন্দের আভাস। রাসূলের চোখে মুখে এই খুশি ও আনন্দের আভাস দেখে তাঁর অন্যসঙ্গীরাও সকলেই খুশি হলেন।

সুসংবাদদাতা এসে তাঁকেই সুসংবাদটি বলে গেল যে উম্মে আইমান একটি পুত্র সন্তান প্রসব করেছেন। এই সংবাদ শুনে নবীজী খুবই খুশি হলেন। তাঁর মুখমণ্ডলে হাসি ফুটে উঠল।

কে এই ভাগ্যবান শিশু, যার জন্মের সুসংবাদ শুনে নবীজী এত আনন্দিত হয়েছিলেন?

হ্যাঁ, এ শিশুই উসামা ইবনে যায়েদ।

নবজাতক শিশুটি জন্ম নেওয়ায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এত আনন্দ ও খুশি দেখে তাঁর সাহাবীদের কেউই আশ্চর্য হলেন না। কারণ, এ শিশুর পিতা-মাতা, নবীজীর অতি আপনজন হওয়ার কারণে তাদের দু'জনের সন্তান লাভের খুশিতে নবীজীর খুশি হওয়া স্বাভাবিক ব্যাপার।

নবজাতক শিশুটির মায়ের নাম 'বারাকা আল্-হাবাশিয়্যা' তবে সকলেই তাকে ডাকত 'উম্মে আইমান' বলে। তিনি ছিলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মা আমেনা বিনতে ওয়াহ্হাবের ক্রীতদাসী। মা আমেনার জীবদ্দশায় তিনিই রাসূলের লালন-পালন করেছিলেন। আবার মা আমেনার ইন্তেকালের পরও বেশ কিছুকাল তিনিই নবীজীর দেখাশোনা ও পরিচর্যার দায়িত্ব পালন করেছিলেন। ফলে নবীজী যখন নিজস্ব উপলব্ধি আর দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে পৃথিবীর প্রতি তাকাতে শিখেছেন তখন থেকেই আবছা ও অস্পষ্টভাবে মনে পড়া নিজের মা ছাড়া আর যাকে তিনি মা বলে জানেন, তিনিই এই ভাগ্যবতী মহিলা উম্মে আইমান।

সুতরাং খুব স্বাভাবিক কারণেই নবীজী তাকে গভীরভাবে শ্রদ্ধা করতেন আর মন-প্রাণ খুলে ভালোবাসতেন। প্রায় সময়ই উম্মে আইমান সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন,

'আমার আপন মায়ের পর তিনিই আমার আসল মা। তিনিই আমার পরিবারভুক্তদের শেষব্যক্তি।'

এ ছিল ভাগ্যবান শিশুর ভাগ্যবতী মায়ের কথা আর তার পিতা ছিলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রিয় পাত্র যায়েদ ইবনে হারেসা রাযিয়াল্লাহু আনহু। যিনি ছিলেন ইসলামের পূর্বকালে নবীজীর পালকপুত্র আর ইসলাম এসে গেলে নবীজীর সম্মানিত সাহাবী। তাঁর গোপন বিষয় রক্ষার বিশ্বস্ত জিম্মাদার, নবী-পরিবারের সদস্য এবং প্রিয় নবীর সর্বাধিক ভালোবাসার পাত্র।

সাহাবায়ে কেরাম উসামা ইবনে যায়েদের জন্মে এতবেশি খুশি হয়েছিলেন যতটা খুশি তারা আর কোনো শিশুর জন্মে হননি। এর কারণ অন্য কিছু নয়—নবীজীর খুশি ও আনন্দ। নবীজী উসামার জন্মগ্রহণে খুব খুশি ও আনন্দিত হয়েছিলেন বলে সাহাবায়ে কেরামও খুশি ও আনন্দিত হয়েছিলেন।

রাসূলের এই খুশির কারণেই তারা ভাগ্যবান শিশুর উপাধি দিলেন 'নবীজীর প্রিয় পাত্র ও প্রিয় পাত্রের পুত্র'।

* * *

সাহাবায়ে কেরামের পক্ষ থেকে এই ছোট্ট শিশু উসামাকে 'নবীজীর প্রিয় পাত্র ও প্রিয় পাত্রের পুত্র' আখ্যা প্রদান কোনো অতিরঞ্জন ছিল না। এটাকে বাড়াবড়ি বলা যায় না। কারণ, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে এতটাই ভালোবাসতেন যে সেটা দেখে আশপাশের গোটা পরিবেশটাই ঈর্ষান্বিত হতো। বয়সের বিচার করলে এই প্রিয় পাত্রের আর রাসূলের বয়সের ব্যবধান বিস্তর। কিন্তু উসামা ইবনে যায়েদ এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মেয়ে ফাতেমা রাযিয়াল্লাহু আনহার ছেলে হাসান ইবনে আলী ছিলেন সমবয়সী।

হাসান ছিলেন আকর্ষণীয়, উজ্জ্বল ফর্সা এবং ঠিক নানার গঠনের মতো। পক্ষান্তরে উসামা ছিলেন খুবই কালো, ক্ষুদ্র ও চ্যাপটা নাকওয়ালা ঠিক তার হাবশি মায়ের মতো। কিন্তু স্নেহ-মমতা ও ভালোবাসার ক্ষেত্রে

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের দু'জনের মধ্যে কোনো তফাৎ রাখেননি। তিনি উসামাকে এক উরুতে বসাতেন আর নিজের নাতি হাসানকে বসাতেন অন্য উরুতে। এরপর উভয়কে বুকে জড়িয়ে ধরে বলতেন,

أَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أُحِبُّهُمَا فَأَحِبَّهُمَا

'হে আল্লাহ! এদের দু'জনকেই আমি খুব ভালোবাসি, দয়া করে তুমিও ওদের ভালোবাস।'

উসামা ইবনে যায়েদকে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কত যে ভালোবাসতেন—সেটা অনুমান করা যায় একটি দুর্ঘটনা থেকে। একবার উসামা দরজার চৌকাঠে পড়ে গেলে তার কপাল কেটে রক্ত বের হতে থাকে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাড়াতাড়ি আঘাতের স্থান থেকে রক্ত মুছে দেওয়ার জন্য আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহাকে ইশারা করলেন। কিন্তু তিনি শিশুর আঘাতলাগা, রক্তপড়া দেখে তখনো ধাতস্থ হতে পারেননি বুঝতে পেরে রাসূল নিজেই তার ক্ষতস্থানে মুখ লাগিয়ে রক্ত চুষে বাহিরে ফেলছিলেন। সেই সঙ্গে মিষ্টি ও মজার কথা বলে বলে শিশু উসামার কষ্ট ভুলিয়ে দিচ্ছিলেন।

* * *

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উসামা ইবনে যায়েদকে যেভাবে তার শৈশবে ভালোবাসতেন একই ভাবে কৈশোরে ও যুবককালেও ভালোবাসতেন। কুরাইশের এক সম্ভ্রান্ত নেতা হাকীম ইবনে হাযাম একবার ইয়েমেন থেকে 'যু-ইয়াযান' বাদশার মহামূল্যবান পোশাক নিলাম থেকে পঞ্চাশ স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে কিনে রাসূলকে উপহার হিসাবে নিতে অনুরোধ করেন। কিন্তু তখনো তিনি মুশরিক ছিলেন বলেই রাসূল সেটা গ্রহণ করতে অসম্মতি জানালেন। তবে সেটা তিনি তার কাছ থেকে কিনে নিয়ে একবারমাত্র জুমার নামাযে পরেছিলেন। তারপর সেটা উসামা

ইবনে যায়েদকে দিয়ে দেন। উসামা রাসূলের দেওয়া সেই মহামূল্যবান পোশাক পরে সমবয়সী মুহাজির ও আনসার যুবকদের মাঝে সকাল-বিকাল ঘোরাফেরা করতেন।

* * *

উসামা ইবনে যায়েদ রাযিয়াল্লাহু আনহু যখন যুবক বয়সে উপনীত হলেন, তখন তার মাঝে উত্তম চরিত্র আর উন্নত স্বভাব-বৈশিষ্ট্যের বিকাশ চোখে পড়তে লাগল। যেগুলো তাকে আরও বেশি করে রাসূলের ভালোবাসা ধন্য এবং তাঁর আরও বেশি আপন বানিয়ে দিল।

তিনি ছিলেন তীক্ষ্ম মেধাবী আর অসম্ভব বুদ্ধিমান। চরম সাহসী যোদ্ধা ও প্রজ্ঞাবান। ছিলেন নিষ্কলুষ ও পবিত্র চরিত্রের অধিকারী। নিচুতাকে খুবই ঘৃণা করতেন। তিনি ছিলেন জনপ্রিয় ও মিশুক। সর্বস্তরের মানুষই তাঁকে ভালোবাসত। তিনি ছিলেন আল্লাহ ভীরু মুত্তাকী—আল্লাহর প্রিয় বান্দা।

ওহুদ যুদ্ধের প্রাক্কালে উসামা ইবনে যায়েদ জিহাদ ফী সাবীলিল্লায় শরীক হওয়ার উদ্দেশ্যে সাহাবী সন্তানদের একদল কিশোর সাহাবীকে নিয়ে রাসূলের কাছে উপস্থিত হলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের থেকে বাছাই করে যাদের জিহাদে যাওয়ার উপযোগী মনে করলেন তাদের রেখে অবশিষ্টদের অল্পবয়সের কারণে ফেরৎ পাঠালেন। উসামা ইবনে যায়েদ ছিলেন ফেরৎ দলের একজন। উসামা ইবনে যায়েদ নিরূপায় হয়ে ফিরে এলেন কিন্তু আল্লাহর রাসূলের পতাকা তলে জিহাদের আকাঙ্ক্ষা পুরণ না হওয়ার ব্যথায় তার ছোট ছোট চোখ দুটো থেকে অঝোর ধারায় ঝড়ছিল বেদনার আঁসু।

* * *

উসামা ইবনে যায়েদ সমবয়সী একদল তরুণ সাহাবীকে সঙ্গে নিয়ে আবারও রাসূলের খেদমতে হাজির হন 'খন্দকের' যুদ্ধের সময়। পায়ের

বুড়ো আঙুলে ভর দিয়ে নিজেকে বড় প্রমাণের চেষ্টা করছিলেন—যেন আল্লাহর রাসূলের অনুমতি পাওয়া যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উসামার এই তীব্র আগ্রহ দেখে তাকে অনুমতি প্রদান করেন। উসামা ইবনে যায়েদ জিহাদের উদ্দেশ্যে তরবারি ধারণ করেন মাত্র পনেরো বছর বয়সে।

* * *

'হুনাইন' যুদ্ধের দিন মুসলিমবাহিনী যখন শত্রুর হাতে মার খেয়ে চরম পরাজয়ের মুখোমুখি। সে সময় উসামা ইবনে যায়েদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং চাচাতো ভাই আবু সুফিয়ান ইবনে হারেস-সহ আরও ছয়জন সাহাবী একসঙ্গে রাসূলের পাশে স্থির হয়ে শত্রুর মুকাবেলা করেন। তারা শত্রুবাহিনীর বিরুদ্ধে পাহাড়ের মতো অটল অবস্থান গ্রহণ করেন। এই সামান্য কয়জন জানবাজ যোদ্ধা-সাহাবীর সাহায্যেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুনাইনের পরাজয়কে বিজয়ে রূপান্তরিত করতে সক্ষম হন। তা ছাড়া এই ছোট্ট দলের সাহায্যেই যুদ্ধের ময়দান থেকে পালিয়ে যাওয়া সাহাবীদের আক্রমণকারী কাফের-মুশরিক সেনাদের হাত থেকে রক্ষা করতে সক্ষম হন।

* * *

উসামা ইবনে যায়েদ মাত্র আঠারো বছর বয়সে পিতা যায়েদ ইবনে হারেসার পতাকাতলে মূতার যুদ্ধে শরীক হন। এ যুদ্ধের ময়দানে তিনি নিজ চোখে পিতাকে নির্মমভাবে শহীদ হতে দেখেন। কিন্তু পিতার এই শাহাদাতের দৃশ্য দেখে তিনি বিচলিত ও দুর্বল হয়ে হাল ছেড়ে দেননি। বরং পরবর্তী সেনাপতি জাফর ইবনে আবী তালেব রাযিয়াল্লাহু আনহুর নেতৃত্বে বীরবিক্রমে লড়াই করতে থাকেন। অবশেষে এই সেনাপতিও তার চোখের সামনেই শহীদ হয়ে যান। এরপর তৃতীয় সেনাপতি

আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাযিয়াল্লাহু আনহুর পতাকাতলে লড়াই অব্যাহত রাখেন। অবশেষে তিনিও শহীদ হয়ে যান। সবশেষে সেনাপতির ভার অর্পিত হয় খালিদ ইবনে ওয়ালীদের ওপর। তিনি এই ক্ষুদ্র বাহিনীকে বিশাল রোমানবাহিনীর আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য পিছু হঠার নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত উসামা ইবনে যায়েদ রাযিয়াল্লাহু আনহু অব্যাহতভাবে লড়াই করতে থাকেন।

* * *

যুদ্ধ শেষে পিতা যায়েদ ইবনে হারেসা রাযিয়াল্লাহু আনহুর জন্য মহান আল্লাহর দরবারে সর্বোচ্চ প্রতিদান ও পুরস্কারের প্রার্থনা করে, তাঁর পবিত্র দেহকে সিরিয়ার সীমান্তে দাফন করে রেখে শহীদ পিতার ঘোড়ায় চড়ে মদীনায় ফিরে এলেন।

* * *

এগারো হিজরীর কথা। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রোমসাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক জিহাদের প্রস্তুতির জন্য সর্বস্তরের মুজাহিদদের নির্দেশ দান করেন। আবু বকর সিদ্দীক, উমর ফারুক, সাদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস, আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ রাযিয়াল্লাহু আনহুম প্রমূখ বড় বড় সাহাবায়ে কেরামকে তিনি নিজে এই বাহিনীতে যুক্ত করেন। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই বিশাল ও গুরুত্বপূর্ণ সেনাদলের নেতৃত্ব ভার অর্পণ করেন উসামা ইবনে যায়েদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর ওপর। অথচ তার বয়স ছিল তখন কুড়ি বছরের নিচে। তিনি এই তরুণ সেনাপতিকে নির্দেশ দেন, যেন 'বালকা' সীমান্তে এবং রোমসাম্রাজ্যের 'গাজা'র নিকটবর্তী 'দারূম' দুর্গ পর্যন্ত অভিযান পরিচালনা করা হয়।

সেনাদল প্রস্তুতির কাজ যখন প্রায় শেষ পর্যায়ে উপনীত, তখনই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুব অসুস্থ ও বিছানাগত হয়ে

পড়লেন। অসুস্থতা বাড়তেই থাকল। আশঙ্কাজনক এই অসুস্থতার কারণে তাঁর প্রস্তুতকৃত সেনাদলের যাত্রা বিলম্বিত করে দেওয়া হলো।

উসামা ইবনে যায়েদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন,

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অসুস্থতা আশঙ্কাজনক পর্যায়ে পৌঁছলে আমি আমার কয়েকজন সঙ্গীসহ তাঁর কাছে গেলাম। দেখলাম, তাঁর শারীরিক অবস্থা এতটাই সঙ্কটময় যে দুর্বলতার কারণে তিনি কথা বলার শক্তিও হারিয়ে ফেলেছেন। তখন তিনি মুবারক হাতখানা আসমানের দিকে উঁচু করে ধরে আমার ওপর রাখলেন। তাতে বুঝতে পারলাম তিনি আমার জন্য দুআ করলেন।'

* * *

অল্প সময়ের মধ্যেই প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই পৃথিবী ছেড়ে চিরতরে চলে গেলেন প্রিয় প্রভু ও মহান মাওলার সান্নিধ্যে। সর্বশ্রেষ্ঠ সাহাবী হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহুর ওপর খেলাফতের দায়িত্ব অর্পিত হলো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রথম খলীফা নির্বাচিত হওয়ার পর আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহু সর্বপ্রথম যে কাজটি করলেন সেটা হলো, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রস্তুতকৃত উসামার বাহিনীকে রওনা হওয়ার নির্দেশ দিলেন।

কিন্তু আনসার সাহাবীদের ছোট্ট একটি দল এই বাহিনীর যাত্রা আরও কিছুদিন বিলম্বিত করার পক্ষপাতি ছিলেন। তারা উমর ইবনুল খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহুকে অনুরোধ করলেন খলীফাকে বিষয়টি জানানোর জন্য। তারা উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর কাছে একথাও বলে দিলেন যে, খলীফা যদি 'বিলম্বে'র অনুরোধ গ্রহণ না করেন তাহলে আমাদের কোনো আপত্তি নেই। আমরা খলীফার আদেশ মতো এখনই চলে যাব একটি শর্তে—খলীফা যেন উসামার চেয়ে প্রবীণ ও অভিজ্ঞ কাউকে আমাদের সেনাপতি নিযুক্ত করে দেন।

খলীফা আবু বকর সিদ্দীক উমর ফারুকের মুখে আনসারদের এই কথা শোনামাত্রই লাফিয়ে উঠে উমরের দাড়ি চেপে ধরে ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন,

'খাত্তাবের ব্যাটা উমর! তোমার মা যেন তোমার মরামুখ দেখে। তোমার মা যেন সন্তানহারা হয়ে যায়। আরে উমর! আল্লাহর রাসূল যাকে সেনাপতি নিযুক্ত করে গেছেন, তুমি বলছ তাকে আমি অপসারণ করব? আল্লাহর কসম! এটা হবার নয় এবং কিছুতেই এটা হবে না।'

উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু ফিরে এলে তারা জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি হলো?'

তিনি বললেন, 'তোমরা তাড়াতাড়ি রওনা হয়ে যাও, কোনো কথা বলো না। আজ তোমাদের কারণে খলীফার কাছে আমাকে অনেক রাগ শুনতে হয়েছে।'

* * *

তরুণ সেনাপতি উসামা রাযিয়াল্লাহু আনহুর নেতৃত্বে এই বাহিনী যখন রওনা করল, তাকে বিদায় জানাতে আল্লাহর রাসূলের খলীফা আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহু হেঁটে হেঁটে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। ঘোড়ায় চড়ে এগিয়ে চলা তরুণ সেনাপতি উসামা এই দৃশ্য বরদাশ্‌ত করতে না পেরে বিনয়ের সঙ্গে বললেন,

'হে আল্লাহর রাসূলের খলীফা! আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি, হয়তো আপনি ঘোড়ায় চড়ুন অথবা আমাকে নেমে আপনার সঙ্গে হাঁটার অনুমতি দিন।'

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু বললেন,

'আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি, তুমি কিছুতেই নামবে না এবং আমিও ঘোড়ায় চড়ব না। আরে আমি তো চাচ্ছি কিছু সময় জিহাদী কাফেলার সঙ্গে হেঁটে আমার দু'পায়ে আল্লাহর পথের পবিত্র ধুলা মাখানোর সৌভাগ্য অর্জন হোক।'

এরপর তিনি সেনাপতি উসামাকে বললেন,

'আমি আল্লাহর কাছেই সমর্পণ করছি তোমার দীন, আমানতদারী এবং তোমার কাজের শেষ পরিণতি। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাকে যেখানে যেখানে অভিযান চালানোর আদেশ করেছেন, সেটাই বাস্তবায়নের জন্য আমি তোমাকে অসিয়ত করছি।'

এরপর খলীফা বিনীত হয়ে বললেন,

'তুমি যদি উমরের মাধ্যমে আমাকে সাহায্য করা সমীচীন মনে করো, তাহলে তাকে আমার সঙ্গে থাকার অনুমতি দাও।' উসামা ইবনে যায়েদ রাযিয়াল্লাহু আনহু সঙ্গে সঙ্গে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে থেকে যাবার অনুমতি দিয়ে দিলেন।

* * *

উসামা ইবনে যায়েদ রাযিয়াল্লাহু আনহু তার বাহিনী নিয়ে ছুটে চললেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে যেই যেই অঞ্চলে অভিযান চালানোর আদেশ করেছিলেন তিনি সেইসব অঞ্চলেই গেলেন এবং মুসলিমবাহিনী একে একে 'বালকা' সীমান্ত, ফিলিস্তিনের 'দারূম' দুর্গ পর্যন্ত জয় করে ফেলেন। এই বিশাল বিজয়ের ফলে মুসলিমবাহিনীর অন্তর থেকে রোমানবাহিনীর আতঙ্কও দূর হয়ে যায়। তা ছাড়া আগামীতে মুসলিমবাহিনীর সামনে সিরিয়া, মিশর, উত্তর অফ্রিকাসহ আটলান্টিক মহাসাগর পর্যন্ত বিশাল এলাকা জয়ের পথ সহজ হয়ে যায়।

এরপর তরুণ সেনাপতি উসামা ইবনে যায়েদ রাযিয়াল্লাহু আনহু সেই ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে ফিরে আসেন—যাতে চড়ে তাঁর পিতা জিহাদ করতে করতে শহীদ হয়েছিলেন। সঙ্গে বহন করে নিয়ে আসেন এতবেশি পরিমাণ গনিমতের মাল—যা ছিল একেবারেই অভাবনীয়। এমনকি এই বাহিনী সম্পর্কে সবাই মন্তব্য করতে লাগল,

‘উসামা ইবনে যায়েদের বাহিনীর চেয়ে রক্তপাতহীন বিজয় অর্জনকারী এবং এতবেশি গনিমত লাভকারী আর দেখা যায় না।’

* * *

উসামা ইবনে যায়েদ রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেওয়া দায়িত্ব পরিপূর্ণরূপে পালন করার এবং তাঁর স্নেহধন্য ব্যক্তি হওয়ার কারণে জীবনভর মুসলিমজাতির ভালোবাসা, ভক্তি ও শ্রদ্ধার পাত্রে পরিণত হন।

দ্বিতীয় খলীফা উমর ফারুক রাযিয়াল্লাহু আনহু নিজ শাসনামলে উসামা ইবনে যায়েদের জন্য নিজের ছেলে আবদুল্লাহ ইবনে উমরের চেয়ে বেশি ভাতা নির্ধারণ করেছিলেন। এতে পিতা উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর কাছে পুত্র আবদুল্লাহ আপত্তি করে বলেন,

‘হে আমার পিতা! এটা কেমন কথা যে আপনি উসামা ইবনে যায়েদের জন্য সরকারি ভাতা নির্ধারণ করেছেন চার হাজার দিরহাম আর আমার জন্য নির্ধারণ করেছেন মাত্র তিন হাজার দিরহাম? অথচ তার পিতার মর্যাদা আপনার চেয়ে বেশি ছিল না এবং উসামার মর্যাদাও আমার চেয়ে বেশি নয়।’

উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু ছেলের এই কথার জবাবে ধমক দিয়ে বললেন,

‘হায় হায়! তুমি কোন্ আত্মাহমিকায় ডুবে বাস্তবতাকে ভুলে বসে আছ? উসামার পিতা তোমার পিতার চেয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনেক বেশি প্রিয় মানুষ ছিলেন, আর সে নিজে তোমার চেয়ে রাসূলের অনেক বেশি প্রিয়।’

একথা শুনে উমরের পুত্র আবদুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু রাষ্ট্রের নির্ধারণকে আনন্দের সঙ্গে মেনে নিলেন।

উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু উসামা ইবনে যায়েদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হলেই খুশির সঙ্গে তাকে স্বাগতম জানাতেন এই বলে-

مَرْحَبًا بِأَمِيْرِىْ

'মারহাবা মারহাবা হে আমার আমীর! স্বাগতম হে আমার সেনাপতি!'

একথা শুনে কেউ আশ্চর্য হলে তিনি ব্যাখ্যা করে বলতেন,

'আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই উসামাকে সেনাপতি বানিয়ে আমাকে সেই সেনাদলের সাধারণ সদস্য বানিয়ে ছিলেন।'

* * *

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ওই সকল মহৎপ্রাণ ব্যক্তির প্রতি সীমাহীন দয়া ও করুণা বর্ষণ করুন। মহাকালের ইতিহাসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গড়ে তোলা মহৎ জামাত অর্থাৎ মহান সাহাবায়ে কেরামের মতো সম্ভ্রান্ত, পরিপূর্ণ ও সেরা অদর্শবান একটি মানুষও খুঁজে পাওয়া দুষ্কর।

তথ্যসূত্র :

১. *জামেউল উসূল*, ১০ম খণ্ড, ২৭ পৃষ্ঠা।
২. *আল-ইসাবা*, ১ম খণ্ড, ৩১ পৃষ্ঠা অথবা জীবনী নং ৮৯।
৩. *আল-ইসাবা* গ্রন্থের টীকা, ১ম খণ্ড, ৫৭ পৃষ্ঠা।
৪. *তাকরীবুত্ তাহযীব*, ১ম খণ্ড, ৫৩ পৃষ্ঠা।
৫. আয্-যাহাবীকৃত *তারীখুল ইসলাম*, ২য় খণ্ড, ২৭০-২৭২ পৃষ্ঠা।
৬. *আত্-তাবাকাতুল কুবরা*, ৪র্থ ও ৪২তম খণ্ড, ৬১ ও ৭২ পৃষ্ঠা।
৭. *আস্-সীরাতুন্নবাবিয়্যাহ* (ইবনে হিশাম), সূচিপত্র দ্রষ্টব্য।
৮. *আল-ইবার*, ১ম খণ্ড, ৯৫ পৃষ্ঠা।
৯. আবুল ফুতুহ আত্-তিওয়ানিসী কৃত *মিনআবতালিনা আল্লাযীনা ছানাউ আত্-তারীখ*, ৩৩-৩৯ পৃষ্ঠা।
১০. *কাদাতু ফাতহিশ শাম ওয়া মিছর*, ৩৩-৫১ পৃষ্ঠা।
১১. *আল-আলাম ওয়া মারাজিউহু*, ১ম খণ্ড, ২৮১-২৮২ পৃষ্ঠা।

সাঈদ ইবনে যায়েদ

হে আল্লাহ! আমি যখন এই কল্যাণকর দীন কবুলের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হলাম অন্তত আমার ছেলে সাঈদকে সেই দীন ইসলাম থেকে বঞ্চিত করো না।

-সাঈদের পিতা যায়েদের প্রার্থনা

যায়েদ ইবনে আমর ইবনে নুফাইল উৎসবের কোলাহল থেকে দূরে দাঁড়িয়ে কুরাইশের লোকজনকে দেখছেন। তারা একটি আনন্দ-উৎসবে সমবেত হচ্ছে। তিনি দেখলেন, পুরুষরা দামি দামি রেশমি পাগড়ি বেঁধে আর মূল্যবান ইয়েমেনি চাদর গায়ে দাম্ভিক চালে অনুষ্ঠানে হাজির হচ্ছে। যায়েদ ইবনে আমর তাকালেন নারী আর ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের দিকে। তারা ঝলমলে, বর্ণিল পোশাক আর বিচিত্র সব অলঙ্কারের সাজে সেজে উঠেছে। সবশেষে তিনি তাকালেন বিত্তবান ধনীদের টেনে নিয়ে আসা ভেড়া-বকরির দিকে, সেগুলোকে তারা নানান সাজে সাজিয়ে এনেছেন দেব-দেবীর সামনে বলি দেওয়ার উদ্দেশ্যে।

যায়েদ ইবনে আমর ইবনে নুফাইল কাবা শরীফের দেয়ালে হেলান দিয়ে এতক্ষণ এইসব দৃশ্য দেখার পর কুরাইশের লোকদের সম্বোধন করে বললেন,

‘হে কুরাইশের লোকেরা! এইসব ভেড়া-বকরিকে সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ। এদের দানা-পানির ব্যবস্থাও করেন তিনিই। আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করে জামিনে ঘাস ও লতা-পাতা তিনিই উৎপন্ন করেন। আল্লাহর দেওয়া সেই পানি ও ঘাস-পাতা খেয়েই এরা বেড়ে ওঠে, মোটাতাজা হয়। তোমরা কেমন মূর্খ যে সেই ভেড়া বকরি এনে সৃষ্টিকর্তাকে বাদ দিয়ে অন্যসব দেব-দেবীর নামে বলি দিচ্ছ! এরচেয়ে বড় মূর্খতা ও নির্বুদ্ধিতা আর কি হতে পারে?’

এসব কথা শুনে ক্ষেপে গেলেন তার চাচা খাত্তাব অর্থাৎ উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর পিতা। এগিয়ে এসে যায়েদের গালে এক চড় বসিয়ে বললেন,

‘শয়তান! আজ আর তোকে ছেড়ে দেব না। এতদিন ধরে তোর আজেবাজে কথা শুনে সহ্য করেছি। আজ আমাদের সহ্যশক্তি ফুরিয়ে গেছে। আজ তোকে দেখাচ্ছি মজা। এরপর তিনি কওমের স্বল্পবুদ্ধির দুষ্ট ছেলেদের উসকে দিলেন তাকে শায়েস্তা করার জন্য। ওরা তাকে নানাভাবে কষ্ট দিতে থাকল। কষ্ট সইতে না পেরে তিনি মক্কা থেকে বেরিয়ে হেরা গুহায় গিয়ে আত্মরক্ষা করলেন। খাত্তাব তখন একদল দুষ্ট কুরাইশী যুবককে দায়িত্ব দিয়ে বললেন, তার ওপর কড়া নজর রাখবে যেন সে মক্কায় ঢুকতে না পারে।’

এরপর থেকে যায়েদ প্রকাশ্যে মক্কায় প্রবেশ করতে পারতেন না। গোপনে, লুকিয়ে লুকিয়ে তাকে মক্কায় যেতে হতো।

* * *

এত কিছু করেও যায়েদকে দমানো গেল না। গোপনে গোপনে তার মক্কায় আসা-যাওয়া চলতে থাকল। সময় ও সুযোগ পেলেই তিনি ওয়ারাকা ইবনে নওফাল, আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ, উসমান ইবনে হারেস এবং রাসূলের ফুফু আবদুল মুত্তালিবের মেয়ে উমাইমার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ ও আলাপ-আলোচনা করতেন। আরবদের গুমরাহী ও

পথভ্রষ্টতা নিয়ে পর্যালোচনার মাঝে একদিন যায়েদ উপস্থিত সকলকে লক্ষ্য করে বললেন,

'আল্লাহর কসম! তোমাদের কওম ও জাতি সম্পর্কে তোমরা ভালোভাবেই জানো যে ধর্মীয় ধ্যান-ধারণা, আচার-বিশ্বাসের বিচারে তারা একেবারে অজ্ঞ ও মূর্খ। দীনে ইবরাহীমের 'তাওহীদের' শিক্ষাকে অবজ্ঞা করে তারা 'শিরকের' অন্ধকারে ডুবে গেছে। স্বজাতির এই গুমরাহী থেকে তোমরা যদি নিজেদের রক্ষা করতে চাও, তোমরা যদি আল্লাহর আজাব থেকে নাজাত পেতে চাও, তাহলে শিরকমুক্ত কোনো দীন-ধর্ম খুঁজে বের করো।'

এই চারজন মহান ব্যক্তি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়লেন সত্য সঠিক ধর্মের সন্ধানে। ইহুদী, খ্রিস্টান ও অন্যান্য ধর্মের পণ্ডিতদের কাছে ছুটে গিয়ে দীনে ইবরাহীমের 'একেশ্বর বাদিতা'র সন্ধান করতে থাকেন।

এই অনুসন্ধানের ফলাফল হিসাবে ওয়ারাকা ইবনে নওফাল খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করলেন। আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ ও উসমান ইবনে হারেসা প্রচলিত কোনো ধর্মকেই পছন্দ করতে পারলেন না। তারা কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারলেন না।

যায়েদ ইবনে আমর ইবনে নুফাইলের কি হলো?

এর উত্তর জানতে প্রিয় পাঠক চলুন যায়েদের জবানীতেই শুনি বিষাদময় সেই কাহিনী।

* * *

যায়েদ ইবনে আমর বলেন,

'আমি ইহুদী ও খ্রিস্টধর্ম সম্পর্কে অনেক অবগতি লাভ করলাম। কিন্তু ঐ ধর্মে এমন কোনো আকীদা-বিশ্বাস খুঁজে পেলাম না, যা দ্বারা হৃদয়ে প্রশান্তি মেলে। আমি ঐ ধর্মদুটো কবুল না করে আরও দেশ সফর করে আরও বেশি করে মিল্লাতে ইবরাহীমের সন্ধান করতেই থাকলাম। সিরিয়াতে পৌঁছার পর আমাকে জানানো হলো যে একজন পাদ্রি আছেন

যিনি আসমানী কিতাবের আলেম। আমি তাঁর কাছে গিয়ে হাজির হলাম। আমার সব কাহিনী তার কাছে খুলে বললাম। সবকথা শুনে তিনি বললেন,

'মনে হচ্ছে তুমি 'দীনে ইবরাহীম'কে খুব ভালোবাস হে মক্কার ভাই?'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ, আর সেই ভালোবাসার জন্যই এত দূর পথ পাড়ি দিয়ে দীনে ইবরাহীম তালাশ করে বেড়াচ্ছি।'

তিনি বললেন,

'সত্যি কথা এই যে তুমি এমন একটি দীনের সন্ধান করে বেড়াচ্ছ, বর্তমানে যেই দীনের কোনো অস্তিত্ব নেই। তবে তুমি তোমার জন্মস্থানে ফিরে যাও। তোমার কওম থেকে আল্লাহ তাআলা এমন একজন নবী পাঠাবেন যিনি দীনে ইবরাহীমের অনুসরণ করবেন। তুমি যদি তাঁকে পাও, তাহলে তাঁর অনুসরণ করবে এবং তাঁকেই আঁকড়ে ধরে থাকবে।'

যায়েদ মক্কার পথে ফিরতে থাকলেন, প্রতি পদক্ষেপে প্রতিশ্রুত নবীর বিষয়ে স্বপ্ন বুনতে থাকলেন। তিনি মক্কায় পৌঁছার আগেই সত্য ও হেদায়াতের দীন দিয়ে আল্লাহ তাআলা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নবী হিসাবে পাঠান। কিন্তু যায়েদ তাঁর কাছে পৌঁছতে পারলেন না। কারণ, একদল বেদুইন দস্যু তার ওপর আক্রমণ করে বসে। সেখানেই যায়েদ প্রাণ হারান। জীবনের অন্তিম মুহূর্তে যায়েদ আকাশের দিকে তাকিয়ে আকাশের মালিকের কাছে শেষ নিবেদন জানিয়ে বলেন,

'হে আল্লাহ! আমি যখন এই কল্যাণকর দীন কবুলের সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হলাম, অন্তত আমার ছেলে সাঈদ যেন এই দীন থেকে বঞ্চিত না হয়।'

* * *

আল্লাহ তাআলা যায়েদের আবেগভরা ঐ অন্তিম মুহূর্তের প্রার্থনা কবুল করে নিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবুওয়াত লাভ করার পর মানুষকে ইসলামের দিকে যখন ডাকা শুরু করলেন, সেই

ডাকে সাড়া দিয়ে যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনল এবং রাসূলের রিসালাতকে বিশ্বাস করল, সাঈদ ইবনে যায়েদ রাযিয়াল্লাহু আনহু সেই সৌভাগ্যবানদের প্রথম সারিতেই অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলেন।

আশ্চর্যের কিছু নেই। কারণ, সাঈদ ইবনে যায়েদ এমন একটি পরিবারে বেড়ে উঠেছিলেন, যে পরিবারের প্রতিটি সদস্য কুরাইশের শিরকমূলক কর্মকাণ্ড ও তাদের গুমরাহীকে চরমভাবে ঘৃণা করত। লালিত-পালিত হয়েছিলেন এমন পিতার তত্ত্বাবধানে, যিনি সত্য দীনের সন্ধানে জীবন কাটিয়েছেন। যার মৃত্যুও ঘটেছে সত্যের পেছনে তৃষ্ণার্ত আত্মার মতো ছুটতে ছুটতে।

সাঈদ একাই ইসলাম গ্রহণ করেননি। তার সঙ্গে স্ত্রী উমর ইবনুল খাত্তাবের বোন ফাতেমা বিনতে খাত্তাবও ইসলাম গ্রহণ করেন।

এই কুরাইশী যুবক ও তার স্ত্রী ইসলাম গ্রহণ করার অপরাধে স্বজাতির কাছ থেকে এত ভয়াবহ জুলুম ও নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন, যা ছিল তাদেরকে ইসলাম ত্যাগে বাধ্য করার জন্য যথেষ্ট। কিন্তু কুরাইশের লোকেরা তাদেরকে ইসলামের গণ্ডি থেকে বের করে আনা তো দূরের কথা উল্টো তারা দু'জন স্বামী-স্ত্রী সক্ষম হয়েছিলেন তাদের দল থেকে এমন একজন লৌহমানবকে বের করে আনতে, যিনি ছিলেন তাদের দলের অতিগুরুত্বপূর্ণ সদস্য এবং যিনি ছিলেন মুসলিমদের জন্য এক মূর্তিমান আতঙ্ক। যার নাম উমর উবনুল খাত্তাব। সাঈদ এবং তার স্ত্রীই ছিলেন উমর ফারুকের ইসলাম গ্রহণের কারণ।

* * *

সাঈদ ইবনে যায়েদ রাযিয়াল্লাহু আনহু মাত্র কুড়ি বছর বয়সেই ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন। এর ফলে তিনি টগবগে তারুণ্যের পূর্ণশক্তি ও সময় নিয়োগ করতে পেরেছিলেন দীন ইসামের কল্যাণ ও সেবায়। একমাত্র 'বদর' ছাড়া তিনি ইসলামের সকল জিহাদে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নেতৃত্বে বীরত্বের সঙ্গে লড়াই

করেছেন। ইসলামের সর্বপ্রথম গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ 'বদর' এর দিনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব না দিলে তিনি সেই যুদ্ধে অংশগ্রহণের সৌভাগ্য থেকেও নিশ্চয়ই বঞ্চিত থাকতেন না।

তিনি অংশ নিয়েছিলেন 'কিসরা ও কায়সার' পারস্য ও রোম-সাম্রাজ্যের পতন অভিযানেও। মুসলিমবাহিনী যত যুদ্ধ ও অভিযান পরিচালনা করেছে, তার সবগুলোতেই সাঈদ ইবনে যায়েদের শুধু অংশই ছিল না বরং তাদের প্রতিটি অভিযানেই ছিল তাঁর প্রশংসনীয় ভূমিকা ও উজ্জ্বল অবদান। তাঁর সর্বাধিক সাহসী ও চমৎকার যে বীরত্বের কথা ইতিহাসের পাতায় আলোচিত হয়েছে সেটা হলো, 'ইয়ারমূকের' লড়াইয়ের ময়দানে। সেদিনের সেই আলোচিত ও আলোকিত অবদানের কথা শুনতে চলুন যাই সাঈদ ইবনে যায়েদের কাছে।

* * *

সাঈদ ইবনে যায়েদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

'ইয়ারমূকের যুদ্ধের দিন আমাদের সৈন্যসংখ্যা ছিল চব্বিশ হাজার। আর আমাদের মুকাবেলার জন্য রোমানবাহিনীর সৈন্য ছিল এক লাখ বিশ হাজার। তারা দৃঢ় পদক্ষেপে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছিল এমন ভাবে, যেন কোনো অদৃশ্য শক্তি সুদৃঢ় পাহাড়কে পরিচালনা করছে। তাদের সম্মুখভাগে এগিয়ে আসছিল ধর্মযাজক বিশপ ও পাদ্রীগণ। তারা খ্রিস্টধর্মের প্রতীক ক্রুশ বহন করে চিৎকার করে ধর্মীয় শ্লোগান উচ্চারণ করছিল। আর পেছন থেকে বিশাল বাহিনী মেঘগর্জনের মতো করে সেই শ্লোগানের প্রতিধ্বনি করে যেন আকাশ-বাতাশ কাঁপিয়ে তুলছিল।

মুসলিমবাহিনী যখন প্রতিপক্ষের এই অবস্থা নিজ চোখে দেখল, তাদের বিপুল সংখ্যাধিক্য ও অন্যান্য ভীতিকর ব্যাপারগুলো তাদের মধ্যে কিছুটা ভীতির সঞ্চার করল।

তখন আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু মুসলিম-বাহিনীকে জিহাদের জন্য উজ্জীবিত করার উদ্দেশ্যে দাঁড়িয়ে প্রথমে কুরআনের আয়াত পড়ে বললেন,

اِنْ تَنْصُرُوا اللّٰهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ اَقْدَامَكُمْ

'আল্লাহর আইনকে বিজয়ী করার লক্ষ্যে আল্লাহর জন্য লড়াই করো, দুশমনের বিরুদ্ধে এ লড়াইয়ে তিনি তোমাদের সাহায্য দিয়ে তোমাদের অবস্থান দৃঢ় করবেন।' –সূরা মুহাম্মাদ : ৭

'হে আল্লাহর প্রিয় বান্দাগণ! জিহাদের ফরয হুকুম পালনে অটল ও অবিচল থাকুন। মনে রাখবেন, এই যুদ্ধক্ষেত্রে অবিচলতাই আল্লাহর আদেশ লঙ্ঘন থেকে বাঁচার একমাত্র উপায়। মহান প্রভুর সন্তুষ্টি লাভ ও পরাজয়ের গ্লানি থেকে মুক্তির পথও এটাই। আপনারা লৌহবর্ম পরে নিজেদের সুরক্ষিত করে নিন। যার যার বল্লম ও তীর তাক করে ধরুন। আমি আক্রমণের হুকুম না দেওয়া পর্যন্ত মনে মনে আল্লাহর যিকির ছাড়া সকলেই মুখ বন্ধ রাখুন।'

সাঈদ ইবনে যায়েদ বলেন,

'সেই মুহূর্তে মুসলিমসেনাদলের সারি ভেদ করে একজন সৈনিক সম্মুখে অগ্রসর হয়ে সেনাপতি আবু উবাইদা রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বললেন,

'আমি সংকল্প করেছি যে, এখনই আমি লড়াই করে শহীদ হয়ে পরপারে গিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে মিলিত হব। আপনি কি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে কোনো বার্তা পাঠাতে চান? চাইলে আমাকে বলুন।'

আবু উবাইদা রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন,

'হ্যাঁ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গিয়ে আমার ও সকল মুসলিমের সালাম পৌঁছে দিয়ে বলবেন। ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের রব আমাদের সঙ্গে যে ওয়াদা করেছিলেন, আমরা তা সম্পূর্ণরূপে পেয়ে গেছি।'

সাঈদ ইবনে যায়েদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

'আমি যখনই সেই সৈনিকের কথা শুনলাম এবং তাকে দেখলাম তরবারি কোষমুক্ত করে শত্রুদের ওপর মরণপণ আক্রমণে ঝাঁপিয়ে পড়তে। সঙ্গে সঙ্গে আমি নিচু হয়ে দুই হাঁটু মাটিতে ঠেকিয়ে বর্শা তাক করে ছুঁড়ে মারলাম মুসলিমবাহিনীর দিকে এগিয়ে আসা প্রথম অশ্বারোহীর দিকে। এটাকে ধরাশায়ী করে ফেলার পর আমি জীবনের মায়া ছেড়ে শত্রুবাহিনীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম। ততক্ষণে আল্লাহর ইচ্ছায় আমার অন্তর থেকে সব ভয় একেবারেই দূর হয়ে গেছে। অন্য সকলেও তখন রোমানদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রাণপণে লড়াই করতে থাকে। অবশেষে আল্লাহ তাআলা মুসলিমসেনাদলকে বিশাল রোমানবাহিনীর বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক বিজয় দান করেন।'

* * *

এরপর সাঈদ ইবনে যায়েদ রাযিয়াল্লাহু আনহু সিরিয়ার রাজধানী 'দামেস্ক' বিজয়ে অংশ নেন। দামেস্ক যখন মুসলিমবাহিনীর হাতে বিজিত হয় এবং সেখানের জনতা ইসলামী সরকারের আনুগত্য স্বীকার করে নেয় তখন আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু সাঈদ ইবনে যায়েদ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে সেখানের গভর্নর নিযুক্ত করেন। এভাবে তিনিই হয়ে যান ইসলামের ইতিহাসে দামেস্কের সর্বপ্রথম মুসলিমগভর্নর।

* * *

বনী উমাইয়ার শাসনামলে সাঈদ ইবনে যায়েদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর জীবনে ঘটে এমন এক দুর্ঘটনা—দীর্ঘদিন যাবৎ মদীনার লোকদের মুখে মুখে যার কথা আলোচিত হতে থাকে।

ঘটনাটির বিবরণ এ রকম :

'আরওয়া বিনতে উয়াইস' নামের এক মহিলার মনে সন্দেহ জাগে যে সাঈদ ইবনে যায়েদ রাযিয়াল্লাহু আনহু 'আরওয়ার' জমির কিছু অংশ

অবৈধভাবে দখল করে নিজের জমির সীমানা বাড়িয়ে নিয়েছেন। মনের এই সন্দেহের ব্যাপারটি মহিলা সকলের কাছে প্রচার করতে থাকে। শুধু এতটুকুতেই ক্ষ্যান্ত হলে তাও একরকম হতো। শেষ পর্যন্ত মদীনার গভর্নর মারওয়ান ইবনে হাকামের কাছেও তার বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে বিচার চেয়ে বসে। মারওয়ান ইবনে হাকাম বিচার-মীমাংসার উদ্দেশ্যে তার কাছে কয়েকজন লোক পাঠান। পুরো বিষয়টি তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মানিত এই সাহাবীর কাছে কষ্টদায়ক হয়ে যায়। তিনি দুঃখ করে বলেন,

'বলাবলি হচ্ছে যে আমি মহিলার ওপর জুলুম করেছি। আমার পক্ষে আদৌ কি তার ওপর জুলুম করা সম্ভব? অথচ আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি,

مَنْ ظَلَمَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ طُوِّقَه يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرْضِيْنَ

'যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে অন্যের মাত্র এক বিঘত জমিও দখল করবে, কেয়ামতের দিন শস্তিস্বরূপ তার গলায় সাত স্তর পর্যন্ত ভূমি ঝুলিয়ে দেওয়া হবে।'

'ইয়া আল্লাহ! যে মহিলা দাবি করেছে যে আমি অন্যায়ভাবে তার জমি দখল করে আমার জমির অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছি, সে যদি মিথ্যা বলে থাকে তাহলে তাকে অন্ধ করে দাও এবং যে কূপটি আমি দখল করেছি বলে অভিযোগ করেছে, সেই কূপের মধ্যেই তাকে ফেলে দাও। আমার পক্ষে এমন জ্বলন্ত কোনো উদাহরণ সৃষ্টি করে দাও যাতে সমগ্র মুসলিমজাতির কাছে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়ে যায় যে আমি তার ওপর কোনো জুলুম ও অন্যায় করিনি।'

* * *

এই ঘটনার মাত্র কয়েকটা দিন পর। মদীনা শহরে শুরু হলো লাগাতার ও প্রবল বৃষ্টি বর্ষণ। প্রবল বৃষ্টিপাতের ফলে সৃষ্ট বন্যায় আকীক উপত্যকা ও আশপাশ ডুবে গেল। এমন প্রবল বৃষ্টি ও বন্যা আর কখনোই দেখা যায়নি। এই বন্যা জমির সীমানার ওপর জমে থাকা মাটির

স্তূপ ধুয়ে নিয়ে যায় এবং প্রকৃত সীমানা প্রকাশ হয়ে যায়। যার ফলে মদীনার সকল মুসলিম জানতে পারেন যে সাঈদ ইবনে যায়েদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর কথাই ছিল সত্য ও সঠিক। এর মাসখানেকের মধ্যেই ঐ মহিলা দৃষ্টি শক্তি হারিয়ে পুরোপুরি অন্ধ হয়ে যায় এবং সে অবস্থাতেই নিজের জমিতে ঘোরাফেরা করতে করতে কূপের মধ্যে পড়ে মরে যায়।

আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন,

'আমরা যখন ছোট ছিলাম তখন দেখতাম মানুষ কাউকে অভিশাপ দেওয়ার সময় বলত,

أَعْمَاكَ اللهُ كَمَا أَعْمَىٰ الْأَرْوَىٰ

'আল্লাহ তোমাকে 'আরওয়া'র মতো অন্ধ করে দিক'

অন্ধ হয়ে যাওয়ার ঘটনায় অবাক হওয়ার কিছু নেই। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

اتَّقُوا دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ

'মজলুমের বদ দুআ থেকে বাঁচার চেষ্টা করো, কেননা, ঐ দুআ সরাসরি আল্লাহর কাছে পৌঁছে যায়, কোনো অন্তরায় ও বাধা থাকে না।'

সাধারণ কোনো মজলুমের অবস্থা যদি এমন হয়, তাহলে মজলুম ব্যক্তিটি জান্নাতের সু-সংবাদপ্রাপ্ত দশজনের একজন সাঈদ ইবনে যায়েদ রাযিয়াল্লাহু আনহু হলে তাঁর বদ দুআর প্রভাব কেমন হবে?

তথ্যসূত্র :

১. *আল-ইসাবা*, ২য় খণ্ড, ৪৬ পৃষ্ঠা অথবা *আত্তারজামা*, ৩২৬১ নং জীবনী।
২. *আল-ইসতীআব* (*আল-ইসাবা*'র টীকা), ২য় খণ্ড, ২ পৃষ্ঠা।
৩. *তাবাকাতে ইবনে সাআদ*, ৩য় খণ্ড, ২৭৫ পৃষ্ঠা।
৪. *তাহযীবে ইবনে আসাকির*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১২৭ পৃষ্ঠা।
৫. *সিফাতুস সফওয়া*, ১ম খণ্ড, ১৪১ পৃষ্ঠা।
৬. *হুলইয়াতুল আউলিয়া*, ১ম খণ্ড, ৯৫ পৃষ্ঠা।
৭. *আর-রিয়াযুন নুযরা*, ২য় খণ্ড, ৩০২ পৃষ্ঠা।
৮. *হায়াতুস সাহাবা*, ৪র্থ খণ্ড, সূচি দ্রষ্টব্য।

উমাইর ইবনে সাদ

(বাল্যজীবন)

উমাইর ইবনে সাদ একেবারেই ব্যতিক্রমধর্মী এক অনন্য মানুষ।

—উমর ইবনুল খাত্তাবের মন্তব্য

উমাইর ইবনে সাদ আল-আনসারী একেবারে শিশুকালেই পিতৃহীনতা, দারিদ্র ও চরম দুঃখ-কষ্টের শিকার হন। তার পিতা সাদ তাকে একেবারে কপদর্কহীন ও অভিভাবকহীন রেখে মৃত্যুবরণ করেন। বিধবা মা নিরুপায় হয়ে 'আউস' গোত্রের এক ধনী ব্যক্তি জুলাস ইবনে সুওয়াইদের বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তিনি সদ্য বিবাহিতা স্ত্রীর পাশাপাশি তার এতীম পুত্র উমাইরেরও ভরণ-পোষণের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাকেও নিজ পরিবারের অন্তর্ভুক্ত করে নেন।

উমাইর ইবনে সাদ জুলাসের এমন স্নেহ-মমতা, সযত্ন তত্ত্বাবধান ও সদাচরণ পেলেন—যার কারণে তার পূর্ববর্তী পিতৃহীন অবস্থার দুঃখ-কষ্ট এমনকি পিতার মৃত্যুর কথাও একদম ভুলে গেলেন। এর ফলে উমাইর যেমন জুলাসকে পিতার মতো ভক্তি শ্রদ্ধা করতেন, ভালোবাসতেন, একই ভাবে জুলাসও উমাইরকে নিজ পুত্রের মতোই আদর-স্নেহ দিতেন, ভালোবাসতেন।

উমাইর যতই বড় হতে থাকলেন, তার প্রতি জুলাসের স্নেহ-মমতা ও ভালোবাসাও বাড়তে থাকল। তার প্রতিটি কাজে-কর্মে মেধা ও আভিজাত্যের প্রকাশ দেখে, তার প্রতিটি আচার-আচরণ, চাল-চলন ও স্বভাব-চরিত্রে সততা ও আমানতদারীর আলামত দেখে তার প্রতি মুগ্ধ ও অভিভূত হতে থাকেন।

* * *

দশ বছর বয়স পূর্ণ হওয়ার আগেই উমাইর ইসলাম গ্রহণ করেন। ফলে নিষ্পাপ বালক উমাইরের চিন্তা ও ঝামেলামুক্ত হৃদয়ে, পার্থিব ক্লেদ ও আবিলতাশূন্য নির্মল-স্বচ্ছ অন্তরে ইসলাম ও ঈমানের চেতনাগুলো দৃঢ়ভাবে স্থান করে নিল। ঈমানী ও ইসলামী শিক্ষাগুলো তার স্বভাবে পরিণত হয়ে গেল। সে কারণে অল্পবয়সী এই বালক-অবস্থাতেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পেছনে নামাযের জামাতে শামিল হতে কখনোই অলসতা করেননি। তার মা ছোট্ট বালকপুত্রের কখনো পিতার সঙ্গে কখনো একাকী নামাযের জন্য মসজিদে যেতে ও আসতে দেখে আনন্দে আপ্লুত হয়ে উঠতেন।

* * *

বালক উমাইর ইবনে সাদের জীবন এভাবেই সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যেভরা ছন্দময় গতিতে এগিয়ে যাচ্ছিল। কোনো বাধা ও প্রতিবন্ধকতাই সেখানে দেখা যাচ্ছিল না। কিন্তু মহান আল্লাহর ইচ্ছায় এই পাক্কা ঈমানদার বালককে মুখোমুখি হতে হয় এক ভয়াবহ কঠিন বাস্তবতার। সম্মুখীন হতে হলো এমন এক অগ্নিপরীক্ষার—যাতে উত্তীর্ণ হওয়া এত অল্পবয়সী বালকের জন্য প্রায় অসম্ভব।

নবম হিজরীতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোমানদের বিরুদ্ধে 'তাবুক' যুদ্ধের ঘোষণা দিলেন এবং নারী-পুরুষসহ সর্বস্তরের মুসলিমদের কাছে এই যুদ্ধের জন্য অর্থ ও যুদ্ধসামগ্রী দিয়ে সাহায্য করার

এবং মুজাহিদদের সর্বপ্রকার শারীরিক ও মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণের উদাত্ত আহ্বান জানালেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোনো যুদ্ধে যাওয়ার বা অভিযান পরিচালনার জন্য বের হতেন, তখন তিনি সুস্পষ্ট ভাষায় সুনির্দিষ্ট করে বলতেন না যে কার বিরুদ্ধে বা কোথায় যুদ্ধে যাবেন। বরং যেদিকে তাঁর যাওয়ার ইচ্ছা থাকত, ইশারা-ইঙ্গিত করতেন উল্টো দিকে যাওয়ার। তিনি এই অভ্যাসের ব্যতিক্রম করলেন শুধু তাবুক যুদ্ধের ক্ষেত্রে। শুধু এই যুদ্ধের ক্ষেত্রেই পূর্ব থেকেই সুস্পষ্ট ভাষায় সকল বিষয় জানিয়ে সকলকে প্রস্তুত থাকার নির্দেশ প্রদান করেছিলেন। এর কারণ ছিল হয়তো এটাই যে শত্রুবাহিনীর বিশাল শক্তিমত্তা, দুর্গম পথ ও যুদ্ধক্ষেত্রের দূরত্ব সবকিছু জেনে বুঝে যেন সকলে সার্বিক প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারে।

এ ছাড়া তখন সময়টাও চলছিল ভিন্ন আমেজ ও অন্যরকম আবেশের। গ্রীষ্মের প্রচণ্ড উত্তাপ দিনের পর দিন বেড়েই চলছিল। গাছে গাছে খেজুর পাকা শুরু হয়েছিল। মরুভূমির আগুনঝড়া এই দিনগুলোতে নিবিড় ছায়া-ঘেরা শীতল পরিবেশ মানুষকে হাতছানি দিয়ে ডাকছিল। মানুষমাত্রই তখন আরাম-আয়েশে, আলস্যে ও বিলম্বের দিকে ঝুঁকে পড়েছিল। মুসলিমজাতি ঐ সকল আরাম-আয়েশ আর আলসেমীর প্রাকৃতিক আহ্বান উপেক্ষা করেই তাদের নবীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে যুদ্ধের প্রস্তুতিতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

পক্ষান্তরে একশ্রেণির মুনাফিক (কপট মুসলিম, যারা বাহিরে মুসলিম অন্তরে কাফের) নানান সন্দেহ ও সংশয়ের বিষয় উত্থাপন করে মুসলিমবাহিনীর মনোবল ও সংকল্পকে ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা চালাতে থাকল। গোপনে গোপনে তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিভিন্ন সমালোচনাও করতে থাকল। তারা তাদের নিজস্ব গোপন মজলিসগুলোতে এমন সবকথা বলাবালি করতে লাগল, যেগুলো বলার দ্বারা একজন মানুষ পরিষ্কারভাবে বেঈমান ও কাফের হয়ে যায়।

'তাবুক' যুদ্ধে সেনাদল রওনা হওয়ার পূর্বে প্রস্তুতিপর্বের দিনগুলোর একদিনে উমাইর ইবনে সাদ মসজিদে নামায আদায় করে ফিরে এলেন। এইমাত্র মসজিদে মুসলিমদের আত্মত্যাগ ও দানের যে জ্বলন্ত দৃষ্টান্তগুলো নিজ চোখে দেখলেন আর জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর জন্য তাদের আবেগভরা আকুতির কথা নিজ কানে শুনে এলেন—তার হৃদয়ে সেগুলো বারবার দোলা দিচ্ছে।

তিনি দেখে এসেছেন, জিহাদে যাওয়ার জন্য মুজাহিদরা প্রতিযোগিতা করে দান করছেন।

আরও দেখে এসেছেন, মুহাজির ও আনসার নারীরা দলে দলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে তাদের স্বর্ণালঙ্কার সব খুলে খুলে দিচ্ছেন। এগুলো বিক্রি করা অর্থ মুজাহিদ ও জিহাদের প্রয়োজনে খরচ করার জন্য তারা আকুতি পেশ করছেন।

তিনি নিজের চোখে এটাও দেখে এসেছেন যে উসমান ইবনে আফ্‌ফান রাযিয়াল্লাহু আনহু একহাজার স্বর্ণমুদ্রার একটি থলে এনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে পেশ করলেন। আবদুর রহমান ইবনে আউফ 'রাযিয়াল্লাহু আনহু দুইশো উকিয়া (আউনসের মতো একটি মাপ বা ওজন) স্বর্ণখণ্ডের একটি বস্তা কাঁধে করে এনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে পেশ করেন।

এমনকি এক ব্যক্তিকে দেখলেন, বিছানাপত্র নিয়ে এসে বলছেন, 'এগুলো বিক্রি করে যেন জিহাদের ময়দানে ব্যবহারের জন্য তরবারি কেনা হয়।'

এই অদ্ভুৎ ত্যাগ ও কুরবানীর দৃশ্যগুলো বারবার উমাইর ইবনে সাদের মনে পড়ে যাচ্ছে। তাতে তিনি আনন্দিত ও পুলকিত হয়ে উঠছেন। একই সঙ্গে তিনি আশ্চর্য হচ্ছেন জুলাসের কর্মকাণ্ডে। তিনি অবাক হচ্ছেন যে জুলাস কেন আর্থিক ও শারীরিক সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে জিহাদে অংশ নেওয়ার সুযোগ

থেকে পিছপা হচ্ছেন। কেন তিনি জিহাদের খাতে অর্থ দান করতে বিলম্ব করছেন?

জুলাসের দিলে জিহাদে শরীক হওয়ার আগ্রহ সৃষ্টি এবং তার মধ্যে ঈমানী চেতনা জাগিয়ে তোলার উদ্দেশ্যে উমাইর ইবনে সাদ পরিকল্পনা করলেন যে, মসজিদে দেখা ও শোনা ঘটনাগুলো জুলাসকে শোনাবেন। বিশেষ করে ওইসব লোকের কাহিনী শোনাবেন, যাদের কাছে তীর, তরবারি বা কোনো যুদ্ধাস্ত্র নেই এবং কোনো বাহনও নেই। যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে নিজেদেরকে একথা বলে পেশ করছিলেন যে তাদের জন্য অস্ত্র ও বাহনের ব্যবস্থা করলে তারা জিহাদে যেতে প্রস্তুত। কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের ফেরৎ পাঠাচ্ছিলেন। কারণ, এত উট ঘোড়া তিনি কোথায় পাবেন? তারা চোখের পানি ফেলতে ফেলতে এই কষ্ট বুকে চেপে ফিরে যাচ্ছিলেন যে জিহাদের আকাঙ্ক্ষা তাদের পূরণ হলো না এবং শাহাদাতের স্বপ্ন তাদের বাস্তবায়িত হলো না।

উমাইর ইবনে সাদ এইসব দৃশ্যও জুলাসের কাছে তুলে ধরবেন বলে মনে মনে পরিকল্পনা স্থির করে নিলেন।

এরপর উমাইর একে একে জুলাসের কাছে ওইসব দৃশ্য বর্ণনা করলেন, জুলাসও আগ্রহভরে সবকিছু শুনলেন। কিন্তু হঠাৎ করে জুলাসের মুখ দিয়ে এমন ভয়াবহ একটি মন্তব্য বেরিয়ে গেল যা শুনে উমাইর একেবারে বাকরুদ্ধ হয়ে গেলেন। তিনি জুলাসকে বলতে শুনলেন,

إِنْ كَانَ مُحَمَّدٌ صَادِقًا فِيْمَا يَدَّعِيْهِ مِنَ النُّبُوَّةِ فَنَحْنُ شَرٌّ مِّنَ الْحَمِيْرِ

'মুহাম্মাদ যদি তার নবুওয়াতের দাবিতে সত্যবাদী হয়ে থাকে, তাহলে তো আমরা গাধার চেয়েও বড় নির্বোধ।'

* * *

একথা শুনে উমাইর তো হতভম্ব, নির্বাক! তিনি ভাবতেই পারলেন না যে জুলাসের মতো একজন অভিজ্ঞ ও বুদ্ধিমান মানুষ কি করে এমন বাক্য উচ্চারণ করতে পারে? এমন একটি কথা কিভাবে বলা সম্ভব যা মুখে আনার সঙ্গে সঙ্গে ঈমান চলে যায় এবং সঙ্গে সঙ্গেই ওই ব্যক্তি কুফরীর অতল তলায় ডুবে যায়? খুবই কঠিন ও নাজুক মুহূর্ত। এখন তার কী করা উচিৎ? উমাইর খুব দ্রুত ভাবতে লাগলেন—জুলাসের এই বিপদজনক মন্তব্য শোনার পরও নীরব থাকা এবং বিষয়টাকে গোপন রাখার অর্থ হচ্ছে আল্লাহ ও রাসূলের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা এবং ইসলামের বিরুদ্ধে চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রকারী মুনাফিকদের সাহায্য করা।

পাশাপাশি উমাইর একথাও ভাবলেন যে এই মানুষটির কত বিরাট অবদান আমার ওপর! আমি যখন আশ্রয়হীন, খাদ্যহীন ও পিতৃহীন আমার সেই চরম অসহায় মুহূর্তে তিনি দয়া করে নিজের কাঁধে পিতার দায়িত্ব তুলে নিয়ে আমার ভরণ-পোষণের, আমার আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেছিলেন। তার মারাত্মক মন্তব্যটি প্রচার করার অর্থ দাঁড়ায় এমন একজন দয়ালু পিতার অবাধ্য হয়ে যাওয়া, তার এত বিশাল বিশাল দয়া ও অনুগ্রহের বিনিময়ে তাকে চরম আঘাত দেওয়া।

এমন পরস্পরবিরোধী দুটো বিষয়ের একটি উমাইরকে বেছে নিতেই হবে। যার একটি গ্রহণ করলে অপরটি ত্যাগ করার ক্ষতি তাকে মানতেই হবে। উমাইর ইবনে সাদ অতি দ্রুত দ্বিধা ঝেড়ে ফেলে একটি পথ বেছে নিয়ে পিতৃতুল্য জুলাসকে সম্বোধন করে বললেন,

وَاللهِ يَا جُلَاسُ! مَاكَانَ عَلى ظَهْرِالْأَرْضِ أَحَدٌ بَعْدَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِاللهِ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْكَ ...

فَأَنْتَ آثَرُالنَّاسِ عِنْدِىْ ' وَأَجَلُّهُمْ يَدًا عَلَيَّ ' وَلَقَدْ قُلْتَ مَقَالَةً إِنْ ذَكَرْتُهَا فَضَحْتُكَ ' وَإِنْ أَخْفَيْتُهَا خُنْتُ أَمَانَتِىْ وَأَهْلَكْتُ نَفْسِىْ وَدِيْنِىْ ' وَقَدْ

عَزَمْتُ عَلَى أَنْ أَمْضِيَ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأُخْبِرَهُ بِمَا قُلْتَ، فَكُنْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ أَمْرِكَ .

'হে জুলাস! আল্লাহর কসম এ পৃথিবীতে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে আপনার চেয়ে বেশি আপনজন আমার আর কেউ নেই। তাঁর পরে আমার কাছে আপনিই সেরা পছন্দনীয় ব্যক্তি। আমার ওপর আপনার দয়া ও অনুগ্রহ এত বেশি যে গোটা জীবনেও আপনার সেই ঋণ আমি শোধ করতে পারব না। কিন্তু আপনি এমন একটি জঘন্য মন্তব্য করেছেন যা প্রকাশ করলে আপনি লাঞ্ছিত হবেন আর আপনার সম্মানের দিকে তাকিয়ে সেটা গোপন রাখলে আমি আল্লাহ ও রাসূলের কাছে হয়ে যাব বিশ্বাসঘাতক—যা হবে আমার দীন-ঈমান ও জীবনের জন্য আত্মহননের শামিল। এসব কিছু বিবেচনা করে আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে এখনই, এই মুহূর্তেই আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গিয়ে আপনার কথাটি জানিয়ে দেব। আপনি নিজের বক্তব্য ও যুক্তি প্রমাণ প্রস্তুত রাখুন।'

* * *

একথা বলেই উমাইর মসজিদে নববীর দিকে রওনা করলেন। মসজিদে পৌঁছে তিনি রাসূল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন,

'আমার পিতৃতুল্য জুলাস আপনার শানে জঘন্য মন্তব্য করেছেন।' জুলাসের মুখ থেকে শোনা সেই কথাটিও তিনি নবীজীকে শোনালেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উমাইরকে নিজের কাছে বসিয়ে রেখে এক সাহাবীকে দিয়ে জুলাসকে ডেকে পাঠালেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই জুলাস এসে হাজির হলেন এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সালাম দিয়ে তাঁর সামনে আদবের সঙ্গে বসলেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উমাইরের কাছে শোনা মন্তব্যটি উল্লেখ করে জুলাসকে জিজ্ঞাসা করলেন,

'এ ব্যাপারে তোমার বক্তব্য কী?'

উত্তরে জুলাস ইবনে সুওয়াইদ বললেন,

'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার বিরুদ্ধে এটা একেবারেই মিথ্যা অভিযোগ। বানোয়াট কথা। আমি একথা কখনোই উচ্চারণ করিনি।'

উপস্থিত সাহাবায়ে কেরাম রাযিয়াল্লাহু আনহুম একবার জুলাসের দিকে একবার উমাইরের দিকে তাকাচ্ছিলেন। আর তাদের চেহারা থেকে মনের মাঝে লুকানো সত্যটা বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করছিলেন। এরপর কেউ কেউ মুখ খুলতে লাগল। কেউ কেউ ফিস্ ফিস্ করে, আর কেউ কেউ সরবে। তারা কেউ জুলাসের সমর্থনে কেউবা উমাইরের সমর্থনে যুক্তি দিতে শুরু করল।

একজন মুনাফিক বলে উঠল,

'এ তো দেখি ভারি বেয়াদব ছেলে। যে মানুষটি তার জন্য এত কিছু করল, তার প্রতি দয়া-অনুগ্রহ দেখানো মানুষটিকেই আজ সে বেইজ্জত করে ছাড়ল!'

একজন সাহাবী তার প্রতিবাদে বললেন,

'একদম বাজে কথা, উমাইর খুবই ভালো ছেলে। শৈশব থেকেই সে নিয়মিত নামাযে আসে। রীতিমত ইসলামী অনুশাসনে বেড়ে উঠেছে। তার চোখ ও মুখের অভিব্যক্তি বলে দিচ্ছে, সে সত্য কথাই বলেছে।'

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উমাইরের দিকে তাকিয়ে দেখলেন, তার মুখমণ্ডলে রক্ত জমে লাল হয়ে গেছে এবং তার লাল ও রক্তিম দুই চোখ থেকে অশ্রু ঝড়ে দুই গাল ও বুক ভিজিয়ে দিচ্ছে। সেই অশ্রুসিক্ত নয়নে আবেগভরা আওয়াজে সকল সমস্যার একমাত্র সমাধান দাতা আল্লাহকে ডেকে বললেন,

أَللّٰهُمَّ أَنْزِلْ عَلٰى نَبِيِّكَ بَيَانَ مَا تَكَلَّمْتُ بِهِ

أَللّٰهُمَّ أَنْزِلْ عَلٰى نَبِيِّكَ بَيَانَ مَا تَكَلَّمْتُ بِهِ

'আয় আল্লাহ! তোমার নবীর ওপর ওহী নাজিল করে আমার কথার সত্যতা প্রমাণ করে দাও।'

উমাইরের কলজে ছেঁড়া এই তীব্র আর্তনাদ গোটা পরিবেশকে তার পক্ষে নিয়ে নিচ্ছিল দেখে জুলাস নিজ থেকেই আগ বাড়িয়ে বলতে লাগল,

'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আপনার কাছে যা বলেছি, সেটাই সত্য। এমনকি আপনি চাইলে আমি আপনার সামনে এরজন্য আল্লাহর নামে 'হলফ'ও করতে পারি।'

আমি আল্লাহর নামে কসম করে বলছি,

'উমাইর আপনার কাছে আমার নামে যে কথা বলেছে, তার কিছুই আমি বলিনি।'

জুলাসের স্বপ্রণোদিত এই শপথ বাক্য শেষ হলে এবার সকলেরই দৃষ্টি গিয়ে পড়ল উমাইয়ের দিকে। কারণ, এবার হলফ করার পালা তার। কিন্তু তার আর প্রয়োজন হলো না।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 'সাকীনা' প্রশান্তি ও নিথরতা আচ্ছাদিত করে ফেলল। সাহাবায়ে কেরাম বুঝতে পারলেন যে উমাইরের আর্তনাদে ওহী নাজিল হতে শুরু করেছে। সবাই থেমে গেলেন নিজ নিজ স্থানে। থেমে গেল তাদের হাত-পায়ের নড়াচড়াও। সবাই নীরব নিস্তব্ধ হয়ে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে। সকলের দৃষ্টিতেই তীব্র কৌতূহল। ওহীর নির্দেশ কার পক্ষে হবে? কে হবে সত্যবাদী?

কিন্তু এবার জুলাসের মধ্যে আতঙ্কের ভাব ফুটে উঠেছে।

উমাইরের মাঝে প্রকাশ পাচ্ছে প্রত্যাশা ও প্রতীক্ষা।

এভাবে সকলেই যখন প্রতীক্ষার প্রহর গুনছিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের থেকে ওহীর প্রভাব কেটে গেল। তখন তিনি এইমাত্র অবতীর্ণ ওহীর বাণী তেলাওয়াত করে শোনালেন,

يَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ مَا قَالُوْا ۗ وَلَقَدْ قَالُوْا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوْا بَعْدَ اِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوْا بِمَا لَمْ يَنَالُوْا ۚ وَمَا نَقَمُوْٓا اِلَّآ اَنْ اَغْنٰهُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ مِنْ فَضْلِهٖ ۚ فَاِنْ يَّتُوْبُوْا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ ۚ وَاِنْ يَّتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللّٰهُ عَذَابًا اَلِيْمًا ۙ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۚ وَمَا لَهُمْ فِى الْاَرْضِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ

'তারা আল্লাহর নামে কসম করে বলে যে তারা সেটা বলেনি, অথচ তারা নিশ্চিতরূপে কুফরী বাক্য বলেছিল। তারা ইসলাম গ্রহণের পর পুনরায় কুফরীর পথ অবলম্বন করেছিল। আর তারা করতে চেয়েছিল এমন সব কাজ যা তারা করতে সক্ষম হয়নি। তাদের এসব রাগ এ কারণেই যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তাদের নিজ দয়ায় সচ্ছল করে দিয়েছেন। এখন যদি তারা নিজেদের এ আচরণ থেকে তাওবা করে, ফিরে আসে। তবে সেটা হবে তাদের পক্ষেই মঙ্গলজনক। আর যদি তারা তাওবা না করে মুখ ফিরিয়ে নেয় আল্লাহ তাদের কঠিন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেবেন দুনিয়াতে ও আখেরাতে। আর পৃথিবীতে তারা সাহায্যকারী ও বন্ধু হিসাবে কাউকে পাবে না।' সূরা তাওবা, আয়াত : ৭৪

কুরআনের আয়াতে মিথ্যাবাদিতা ও কুফরী অবলম্বনের তথ্য প্রকাশ এবং তাওবা না করলে দুনিয়া ও আখেরাতের যন্ত্রণাদায়ক আযাবের ঘোষণা শুনে ভীষণ আতঙ্কে জুলাসের গা-হাত-পা কাঁপতে শুরু করল। তীব্র উৎকণ্ঠার কারণে তার কথা জড়িয়ে যাবার উপক্রম হলো। কোনো রকমে তোতলামোর মতো তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ভুল স্বীকার করে বললেন,

'ইয়া রাসূলাল্লাহ! উমাইর যা বলেছে, সেটাই সত্য আর আমিই ছিলাম মিথ্যাবাদী। আমি তাওবা করে ভুল থেকে ফিরে আসছি। ইয়া রাসূলাল্লাহ! মেহেরবানী করে আমার জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করুন তিনি যেন আমার তাওবা কবুল করে নেন। এখন থেকে আমি পরিপূর্ণরূপে আপনার জন্য উৎসর্গিত। আমার জান-প্রাণ আপনার কদমে নিবেদিত।'

তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদর ও স্নেহমাখা দৃষ্টিতে তাকালেন বালক উমাইর ইবনে সাদের দিকে। দেখলেন ঈমানের আলোয় উদ্ভাসিত তার মুখমণ্ডলকে আনন্দের অশ্রুরা ধুয়ে বৃষ্টিভেজা ভোরের মতো স্বচ্ছ ও পবিত্র বানিয়ে দিয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একগুচ্ছ আদর-ভালোবাসা আর স্নেহ মাখিয়ে তার মুবারক হাতখানা বাড়ালেন উমাইরের কানের কাছে, আলতো ভাবে কানটি ধরে বললেন,

وَفَّتْ أُذُنُكَ يَا غُلَامُ مَا سَمِعَتْ وَصَدَّقَكَ رَبُّكَ

'হে বালক! তোমার এই কান যা শুনেছিল তাই সত্য প্রমাণিত হয়েছে তোমার সত্যবাদিতার পক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছেন খোদ তোমার রব।'

* * *

এরপর থেকে জুলাস ইবনে সুওয়াইদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর খাঁটি তাওবা ও নিষ্ঠাপূর্ণ আন্তরিক প্রত্যাবর্তন স্পষ্টভাবে প্রকাশ হতে দেখা গেল।

উমাইরের প্রতি তাঁর কৃতজ্ঞতার মনোভাব, দয়া ও অনুগ্রহের মাত্রা বৃদ্ধি ইত্যাদি দেখে সাহাবায়ে কেরাম বুঝতে পেরেছিলেন যে জুলাসের সংশোধনী ছিল নিখুঁত ও নির্ভেজাল। তাওবা করে খাঁটি মুমিন হতে পারায় জীবনভর তিনি উমাইর ইবনে সাদের প্রতি সুযোগ পেলেই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলতেন,

‘উমাইর আমাকে কাফের অবস্থা থেকে বের করে এনেছে। আমাকে নতুন করে মুমিন হতে সাহায্য করেছে। কুফরী থেকে আর জাহান্নামের আযাব থেকে আমাকে রক্ষা করায় আমি তার প্রতি খুবই কৃতজ্ঞ। আল্লাহ যেন এর বিনিময়ে তাকে সর্বোত্তম পুরস্কারে ভূষিত করেন।’

শেষ নিবেদন পাঠকের খেদমতে, এতক্ষণ যা নিবেদন করেছি সেটাই বালক সাহাবী উমাইর ইবনে সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর সর্বাধিক আলোকিত কাহিনী নয়।

তাঁর জীবনে রয়েছে আরও চমৎকার, আরও আকর্ষণীয় কাহিনী।

তাহলে প্রিয় পাঠক! আমাদের আবারও সাক্ষাৎ হবে প্রিয় সাহাবী উমাইরের পরবর্তী জীবনের এক নতুন পর্বে।

উমাইর ইবনে সাদ

(কর্মময় জীবনে)

মনে কত যে স্বপ্ন আর আশা ছিল প্রশাসনের বিভিন্ন কাজে মুসলিমজাতির সাহায্যের জন্য উমাইর ইবনে সাদের মতো আরও কিছু মানুষ হয়তো আমি পাব!'

—উমর ইবনুল খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহু

একটু আগে আমরা বিখ্যাত সাহাবী উমাইর ইবনে সাদের বাল্যজীবনের একটি অনন্য ও অকর্ষণীয় কাহিনী জেনেছি। এবার তার কর্মময় জীবন থেকে জানব আরও একটি চমৎকার কাহিনী। আশা করি পাঠকের কাছে দ্বিতীয় কাহিনী প্রথমটির চেয়ে মোটেও কম সরস মনে হবে না।

* * *

সিরিয়ার রাজধানী দামেস্ক। দামেস্ক আর হলবের মধ্যবর্তী নগরটির নাম 'হিমস'। বিখ্যাত বীর সাহাবী খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর কবর রয়েছে এই হিমস শহরে। হিমস শহরের জনগণ খুব বেশি সমালোচক এবং অভিযোগপ্রবণ। যখনই সেখানে কোনো শাসক ও গভর্নর পাঠানো হয় লোকজন তার একগাদা দোষ-ত্রুটি আর অভিযোগ

খলীফাতুল মুসলিমীনের দরবারে পৌঁছে দেয়। হিমসের কোনো শাসকই হিমসবাসীর সমালোচনা ও অভিযোগ থেকে মুক্ত থাকতে পারে না। তারা প্রত্যেক শাসক ও গভর্নরের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেই খলীফার দরবারে আবেদন জানায় যে এই লোককে বাদ দিয়ে এর চেয়ে ভালো কাউকে পাঠান।

বারবার একই অভিযোগ শুনতে শুনতে খলীফাতুল মুসলিমীন উমর ফারুক রাযিয়াল্লাহু আনহু সিদ্ধান্ত নিলেন যে 'হিমস'-এ এমন কাউকে গভর্নর হিসাবে পাঠাবেন যার বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠানোর কোনো সুযোগ না থাকে। এমন একজনকে পাঠাতে হবে যার চরিত্রে কোনো দোষ-ত্রুটিই খুঁজে না পাওয়া যায়।

দক্ষ তীরন্দাজ যেমন সব তীর ঢেলে একটি একটি পরখ করে সেরা তীরটি বাছাই করে, ঠিক সেভাবে তিনি সেরা-যোগ্যদের তালিকা দেখে অনেক ভেবে-চিন্তে শীর্ষ সেরা ব্যক্তিত্বের সন্ধান করতে থাকলেন। খলীফার অনুসন্ধানে শীর্ষ সেরা ব্যক্তি নির্বাচিত হলেন উমাইর ইবনে সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহু।

সে সময় উমাইর ইবনে সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহু শাম দেশের দ্বীপাঞ্চলে বিশাল এক সেনাদলের সেনাপতি হিসাবে জিহাদ করছিলেন। বিজয়ী সেনাপতি হিসাবে তিনি একের পর এক দুর্গ ও অঞ্চল জয় করে ইসলামী রাষ্ট্রের আয়তন বৃদ্ধি করছিলেন। একই সঙ্গে ইসলামের দিগ্বিজয়ী তাওহীদের শিক্ষার বিস্তার ঘটিয়ে চলছিলেন। বিজিত অঞ্চলের বিভিন্ন গোত্র থেকে মানুষ দলে দলে ইসলাম কবুল করছিলেন। যার ফলে নতুন ইসলাম গ্রহণকারীদের ইসলামী শিক্ষা, ইবাদত-বন্দেগী ও সামাজিক বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের কেন্দ্র হিসাবে তিনি প্রতিটা অঞ্চলেই মসজিদ প্রতিষ্ঠা করছিলেন।

এই ব্যাপক কর্মযজ্ঞের মাঝেই আমীরুল মুমিনীন উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে ডেকে পাঠালেন। খলীফার ডাকে সাড়া দিয়ে তিনি অবিলম্বে মদীনায় গিয়ে তাঁর সামনে হাজির হলেন। খলীফা উমর রাযিয়াল্লাহু

আনহু তাঁকে হিমস নগরীর অবস্থা জানালেন এবং সেখানে গিয়ে তাকে গভর্নরের দায়িত্ব বুঝে নেওয়ার আদেশ প্রদান করলেন। একজন সাচ্চা মুজাহিদ হিসাবে উমায়ের ইবনে সাদের প্রধান আকর্ষণ ছিল নিষ্ঠার সঙ্গে জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর প্রতি। গভর্নর পদ ও পদবির প্রতি তার ছিল অনীহা। তা সত্ত্বেও আমীরুল মুমিনীনের আদেশকে শিরোধার্য করে তিনি রওনা করলেন হিমসের প্রতি।

* * *

উমাইর ইবনে সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহু হিম্‌স নগরীতে পৌঁছলেন। সকলকে মসজিদে সমবেত হওয়ার আহ্বান জানালেন।

নামায আদায়ের পর উপস্থিত জনতার উদ্দেশ্যে বক্তব্য প্রদানের জন্য তিনি বসলেন। প্রথমে মহান আল্লাহ তাআলার হামদ ও সানা (প্রশংসা), এরপর মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দরূদ ও সালামের পর বললেন,

'হে লোকসকল! নিঃসন্দেহে ইসলাম একটি দুর্ভেদ্য ও সুদৃঢ় দুর্গ, ইসলাম একটি সুরক্ষিত ও মজবুত দরজা। মনে রাখতে হবে ইসলামের দুর্গ হলো, এই ধর্মের পক্ষপাতহীন ইনসাফ ও ন্যায়পরায়ণতা, এর দরজা হলো আপসহীনভাবে প্রত্যেকের হক ও প্রাপ্য বুঝিয়ে দেওয়া।

যদি কখনো ইসলামের পক্ষপাতহীন ইনসাফ ও ন্যায়পরায়ণতার দুর্গটি চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেওয়া হয়—জুলুম ও বেইনসাফি চালুর মাধ্যমে এবং ইসলামের সুরক্ষিত দরজাটি যদি কখনো ভেঙে চুরমার করে দেওয়া হয় পক্ষপাতমূলক শাসন চালুর মাধ্যমে তাহলে এই বিশ্বজয়ী দীন ইসলামের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে ধুলিস্যাৎ করে দেওয়া হবে।

মনে রাখবেন, দীন ইসলাম ততদিন দুর্ভেদ্য, সুরক্ষিত ও মজবুত থাকবে যতদিন পর্যন্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত শাসকেরা সুদৃঢ় ও মজবুত থাকবেন।

তবে শাসকের দৃঢ়তার অর্থ জনগণকে চাবুক মারা আর অপরাধীর শিরচ্ছেদ করা নয় বরং শাসকের দৃঢ়তা মানে সর্বপ্রকারের পক্ষপাতমুক্ত

থেকে নির্মোহভাবে ইনসাফ ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা এবং পাওনাদার যেই হোক—ধর্ম, বর্ণ, ধনি, দরিদ্র নির্বিশেষে সকল প্রকারের পাওনাদারকে আপসহীনভাবে পাওনা বুঝিয়ে দেওয়া।'

এই সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে তিনি নিজ শাসনের যে নীতিমালা তুলে ধরেন অতিসত্তর সেগুলো বাস্তবায়নে নেমে পড়লেন।

* * *

উমাইর ইবনে সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহু পূর্ণ এক বছর হিমস নগরের গভর্নর হিসাবে সুষ্ঠুভাবে দায়িত্ব পালন করেন। এই এক বছরে হিমসের জনগণ খলীফার কাছে গভর্নরের বিরুদ্ধে একটি অভিযোগও পাঠায়নি। তিনি নিজেও এই সময়ে খলীফার কাছে কোনো চিঠিপত্র লেখেননি এবং কেন্দ্রীয় বাইতুল মালের জন্য ভূমিকর হিসাবে কোনো দিরহাম ও দিনার পাঠাননি। এতে খলীফা উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর মনে সন্দেহের উদ্রেক হতে শুরু করল। এমনিতেই তিনি গভর্নরদের ব্যাপারে ক্ষমতার প্রভাব খাটানো কিংবা কোনো দুর্নীতিতে জড়নো নিয়ে ভীষণ চিন্তিত থাকতেন। কারণ, তাঁর দৃষ্টিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাড়া আর কেউই নিষ্পাপ ও সন্দেহের ঊর্ধে নয়।

এ কারণে তিনি তাঁর সচিবকে নির্দেশ দিলেন, উমাইর ইবনে সাদের নিকট চিঠি পাঠিয়ে দিন যে 'আমীরুল মুমিনীনের সঙ্গে পত্রপাঠমাত্রই সাক্ষাৎ করুন। হিমস ত্যাগ করে আসার সময় অবশ্যই সঞ্চিত খেরাজ বা ভূমিকর সঙ্গে নিয়ে আসবেন।'

* * *

উমাইর ইবনে সাদ খলীফার পত্র পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলেন। এরপর খাদ্যদ্রব্য বহনের থলেটিতে অজুর পাত্র আর খাবার থালা ঢুকিয়ে কাঁধে তুলে নিলেন। বর্শাটি হাতেই রাখলেন। হিমস ও গভর্নরের পদ পেছনে ফেলে মরুর দুর্গম পথ ধরে মদীনার উদ্দেশ্যে হাঁটতে শুরু করলেন। দিনের পর দির লাগাতার হেঁটে

দীর্ঘপথ পাড়ি দিয়ে মদীনায় পৌঁছতে উমাইর ইবনে সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর চেহারার রঙ একেবারে বিবর্ণ হয়ে গেল। খাওয়া-দাওয়া ও বিশ্রামের অভাবে শরীর-স্বাস্থ্য কৃষকায় ও দুর্বল হয়ে পড়ল। চুল-দাড়ি লম্বা হয়ে গেল। তাঁকে দেখেই বোঝা যাচ্ছিল, তিনি দীর্ঘ ও কষ্টকর সফর করে একেবারেই ক্লান্ত ও দুর্বল হয়ে পড়েছেন।

* * *

উমাইর ইবনে সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহু দুর্বল ও ক্লান্ত দেহে আমীরুল মুমিনীন উমর ফারুক রাযিয়াল্লাহু আনহুর সামনে হাজির হলেন। তাঁর দিকে তাকিয়ে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু চমকে উঠলেন। অবাক বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলেন,

'এ কি হাল হয়েছে তোমার হে উমাইর?'

উত্তরে উমাইর ইবনে সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন,

'কই আমার তো কিছুই হয়নি হে আমীরুল মুমিনীন। আল্লাহর শোকর আমি সুস্থ-স্বাভাবিক আছি। আমার গোটা দুনিয়া সঙ্গে করে বয়ে এনেছি, দুই শিং ধরে টেনে আনার মতো।'

উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু জিজ্ঞাসা করলেন,

'কী কী সম্পদ আছে তোমার দুনিয়ায়?' তিনি ভাবছিলেন যে উমাইর প্রচুর পরিমাণ সম্পদ বাইতুল মালের জন্য নিয়ে এসেছেন।

উমাইর রাযিয়াল্লাহু আনহু জবাব দিলেন,

'আমার দুনিয়ার মধ্যে আছে আমার থলে—যাতে ঢুকিয়েছি আমার জিনিসপত্র। জিনিসপত্র বলতে একটিমাত্র পাত্র যা পানি পান করার কাজে ব্যবহার হয়। অজুর বদনা, গোসলের বালতি—কাপড় ধোয়ার জন্য কাজে লাগে আর একটি পানিভর্তি মশক। হে আমীরুল মুমিনীন, এটুকুই আমার গোটা দুনিয়া। এর বেশি আমার আর কোনো কিছুর প্রয়োজন নেই। এমনকি অন্য কারোর জন্যও মৌলিক ঐ জিনিসগুলো ছাড়া আর কোনো অতিরিক্ত কিছুরই প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না।'

উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'তুমি কি হেঁটে এসেছ?'

উমাইর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'হ্যাঁ, ইয়া আমীরুল মুমিনীন।'

'প্রশাসনের পক্ষ থেকে তোমাকে কি কোনো ঘোড়া দেওয়া হয়নি?'

'প্রশাসনের বর্তমান লোকেরা আমাকে কোনো বাহন দেয়নি আর আমিও তাদের কাছে চাইনি।'

খলীফা জানতে চাইলেন,

'বাইতুল মালের জন্য ভূমিকরের (খেরাজের) যে অর্থকড়ি এনেছ সেগুলো কোথায়?'

উমাইর ইবনে সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন,

'আমি তো কিছুই আনতে পারিনি হে আমীরুল মুমিনীন!'

উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু প্রশ্ন করলেন,

'কেন? কি কারণে বাইতুল মালের জন্য কিছুই আনলে না?'

তিনি আমীরুল মুমিনীনের প্রশ্নের উত্তরে বললেন,

'আমি হিমসে পৌঁছার পর সেখানের নেক ও যোগ্য লোকদের ডেকে তাদের ওপর জনগণের খেরাজ বা ভূমিকর সংগ্রহ করার দায়িত্ব অর্পণ করি। এরপর যখনই তারা কোনো এলাকার খেরাজ সংগ্রহ করে আনত আমি আবার তাদের সঙ্গে পরামর্শ করতাম সেই অর্থ খরচের ব্যাপারে। তাদের পরামর্শ নিয়ে সংশ্লিষ্ট এলাকার প্রকৃত হকদার গরিব ও অভাবী লোকদের মাঝে বিলিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করতাম।'

খলীফাতুল মুসলিমীন উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু উমাইর রাযিয়াল্লাহু আনহুর উত্তর শুনে তার অতি চমৎকার ব্যবস্থাপনার বিষয়টি জেনে খুব খুশি হলেন। তিনি তাঁর সচিবকে নির্দেশ দিলেন, 'উমাইর ইবনে সাদকে হিমসের গভর্নর হিসাবে বহাল রাখার লিখিত আদেশ জারি করে দাও।'

কিন্তু উমাইর ইবনে সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহু পুনরায় সেই দায়িত্ব গ্রহণ করতে অপারগতা প্রকাশ করে বললেন,

'হে আমীরুল মুমিনীন! আমি কিছুতেই এই দায়িত্ব গ্রহণে সম্মত নই। শুধু আপনার শাসনামলে নয়, আপনার পরেও কেউ আমাকে এই দায়িত্ব

দিতে চাইলে আমার পক্ষ থেকে তখনো একই জবাব থাকবে—আমি দায়িত্ব গ্রহণে অক্ষম ও অপারগ।'

এরপর তিনি খলীফার কাছে অনুমতি চাইলেন মদীনার উপকণ্ঠে যাওয়ার, যেখানে বাস করে তাঁর পরিবার-পরিজন। খলীফার অনুমতি পেয়ে তিনি রওনা করলেন আপন পরিবারবর্গের উদ্দেশ্যে।

* * *

উমাইর ইবনে সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর গ্রামে যাওয়া বেশিদিন হয়নি। এরই মধ্যে খলীফা উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু চিন্তা করলেন, উমাইর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে একটু পরীক্ষা করে তার ব্যাপারে নিশ্চিত হতে হবে। দুনিয়ার অর্থ-সম্পদের প্রতি তার নিরাসক্তি বাস্তব কিনা এইগুলো একটু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন। তিনি নিজের আস্থাভাজন গোয়েন্দা হারেসকে একান্তে ডেকে নিয়ে বললেন,

'হারেস! তুমি উমাইর ইবনে সাদের বাড়ি যাও। নিজের পরিচয় গোপন করে তার বাড়িতে অচেনা মেহমান ও মুসাফির হিসাবে কয়েকদিন কাটাও। যদি তার মধ্যে প্রাচুর্যের অথবা স্বচ্ছলতা ও স্বাচ্ছন্দের ভাব দেখতে পাও, তাহলে যেভাবে নিজের পরিচয় গোপন করে গিয়েছিলে, সেভাবেই ফিরে এসো। আর যদি তাকে তীব্র অভাবী ও দরিদ্র দেখতে পাও, তাহলে নিজের পরিচয় দিয়ে তাকে এই থলেটি খলীফার পক্ষ থেকে দিয়ে এসো।' এ কথা বলেই খলীফা একশো দিনার ভর্তি একটি থলে হারেসের হাতে তুলে দিলেন।

* * *

খলীফার বিশ্বস্ত গোয়েন্দা হারেস উমাইরের গ্রামে গিয়ে পৌঁছলেন। লোকজনকে জিজ্ঞাসা করতে করতে উমাইরের বাড়ি পৌঁছে গেলেন।

উভয়ের মাঝে সালাম জবাবের পর উমাইর ইবনে সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহু আগন্তুকের কাছে জানতে চাইলেন,

'আপনি কোথা থেকে এলেন?'
'মদীনা থেকে।' আগন্তুকের জবাব শুনে তিনি আবার প্রশ্ন করলেন, 'ঐ এলাকার মুসলিমদের কেমন দেখে এসেছেন?'
'ভালো।' গোয়েন্দা উত্তর দিলেন।
'আমীরুল মুমিনীন কেমন আছেন?'
'সুস্থ ও স্বাভাবিকভাবে সব দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন।'

উমাইর ইবনে সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহু জিজ্ঞাসা করলেন,
'খলীফাতুল মুসলিমীন কি 'হদ' (ইসলামী শরীয়তের সুনির্দিষ্ট দণ্ডবিধি যেমন ব্যাভিচারের শাস্তি পাথর মারা, চুরির শাস্তি হাত কেটে দেওয়া ইত্যাদি শাস্তিগুলোকে বলা হয়) প্রয়োগ করেন না?'

'অবশ্যই করেন। এই তো কিছুদিন হলো নিজের পুত্রকেই অশ্লীল কাজের অপরাধে এমন বেত্রাঘাতের হদ প্রয়োগ করেছেন যে সেই পুত্রের মৃত্যুও হয়ে গেছে।'

একথা শুনে উমাইর ইবনে সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহু আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে বললেন,

أَللّٰهُمَّ أَعِنْ عُمَرَ، فَإِنِّى لَا أَعْلَمُه إِلَّا شَدِيْدَ الْحُبِّ لَكَ

'আয় আল্লাহ! তুমি উমরকে সাহায্য করো। কারণ, আমি জানি তোমার প্রতি তাঁর ভালোবাসা খুবই তীব্র।'

* * *

খলীফা উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর পাঠানো গোয়েন্দা হারেস তিন রাত উমাইর ইবনে সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর বাড়িতে মেহমান হিসাবে কাটিয়ে দিলেন। সেই তিন রাতেই তিনি মেহমানের জন্য একটি করে পাতলা যবের রুটি খেতে দিতেন। তৃতীয় রাতে উমাইয়েরের কওমের এক ব্যক্তি হারেসকে বললেন,

'ভাই! আপনি উমাইরের বাড়িতে মেহমান হয়ে তাকে এবং তার স্ত্রীকে ভীষণ কষ্টে ফেলে দিয়েছেন। বেচারারা বড় বিপদেই আছে।

কারণ, সারাদিন পর একটি পাতলা যবের রুটি ছাড়া তাদের দু'জনের আর কোনো খাবার নেই। সেই একটিমাত্র রুটি দিয়ে তারা নিজেরা না খেয়ে গত তিন রাতে আপনার মেহমানদারির ব্যবস্থা করেছে। আপনাকে খাইয়েছে আর নিজেরা খিদের কষ্ট সহ্য করেছেন। আপনার আপত্তি না হলে তাদের বাড়ি ছেড়ে আমার মেহমান হতে পারেন।'

* * *

সেই সময় সরকারি গোয়েন্দা কর্মকর্তা হারেস স্বর্ণমুদ্রার থলেটি বের করে উমাইর রাযিয়াল্লাহু আনহুর হাতে তুলে দিলেন।

উমাইর রাযিয়াল্লাহু আনহু চমকে উঠে জিজ্ঞাসা করলেন,
'এগুলো কী?'

'একশো স্বর্ণমুদ্রা। আমীরুল মুমিনীন আপনার জন্য পাঠিয়েছেন।'

উমাইর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন,
'এগুলো তাঁর কাছে ফেরৎ নিয়ে যান। তাঁকে আমার সালাম জানিয়ে বলবেন, উমাইরের এই মুদ্রাগুলোর কোনো প্রয়োজন নেই।'

তখন আড়াল থেকে তার স্ত্রী জোরে আওয়াজ দিলেন, এতক্ষণ তিনি স্বামী ও মেহমানের কথাবার্তা আড়ালে দাঁড়িয়ে শুনছিলেন। স্বামীকে ডাক দিয়ে বললেন,

'হে উমাইর! খলীফার হাদিয়া ফেরৎ না দিয়ে রেখে দিন। আপনার প্রয়োজন হলে খরচ করুন। না হলে গরিব ও অভাবী লোকদের মাঝে বিলিয়ে দিন। এ এলাকায় গরিব-মিসকিন বা অভাবী-অসহায় মানুষের তো আর অভাব নেই।'

হারেস যখন উমাইরের স্ত্রীর কথা শুনলেন, সেই কথার আলোকে স্বর্ণমুদ্রাগুলো উমাইরের সামনে ঢেলে দিয়ে ফিরে গেলেন। উমাইর ইবনে সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহু সেগুলো ছোট ছোট থলেতে ভরে ফেললেন এবং সেই রাতে ঐ স্বর্ণমুদ্রাগুলো বিভিন্ন অভাবী মুনুষের মাঝে বিলি-বণ্টন শেষ না করে তিনি ঘুমাতেই গেলেন না। মুদ্রাগুলো বিলি করার সময় তিনি

অন্য অভাবীদের পাশাপাশি বিশেষভাবে শহীদ পরিবারের অসহায় সদস্যদের প্রতিও লক্ষ রাখলেন।

* * *

গোয়েন্দা হারেস মদীনায় ফিরে এলে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে জিজ্ঞাসা করলেন,

'হারেস! উমাইরের অবস্থা কেমন দেখলে? কী বুঝলে?'

তিনি বললেন, 'তীব্র অভাব আর সঙ্কটের মধ্যে কাটছে তাঁর জীবন।'

'দিনারগুলো কি তাকে দিয়েছ?' খলীফা জানতে চাইলেন।

'হ্যাঁ, দিয়েছি।'

'সেগুলো তিনি কি করলেন?'

'সে খবর আমার জানা নেই। তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস সেখান থেকে এক কানাকড়িও তিনি নিজের জন্য রাখবেন না।'

উমর ফারুক রাযিয়াল্লাহু আনহু উমাইর ইবনে সাদের কাছে পত্র মারফৎ আদেশ পাঠালেন,

'আমার এই পত্র পাওয়ামাত্রই আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে। হাত থেকে পত্র রাখার সময়টুকুও যেন বিলম্ব না হয়।'

* * *

উমাইর ইবনে সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহু খলীফার নির্দেশমতো এক মুহূর্তও বিলম্ব না করে সোজা মদীনায় গিয়ে আমীরুল মুমিনীনের সামনে হাজির হলেন। উমর ফারুক রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে অভিনন্দন ও অভ্যর্থনা জানিয়ে অত্যন্ত সম্মানের সঙ্গে তাঁকে বসতে দিয়ে কুশল বিনিময় করলেন। এক পর্যায়ে জিজ্ঞাসা করে বসলেন,

'আমার পাঠানো দিনারগুলো কী করেছ হে উমাইর?'

'মুদ্রাগুলো যখন আমাকে দিয়েই দিয়েছেন এখন আবার সেগুলোর ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করে কী লাভ হে উমর?'

'আমি তোমাকে অনুরোধ করছি, বলো সেগুলো কী করেছ?'

'নিজের জন্য সঞ্চয় করে রেখেছি—এমন একদিন ওইগুলো দ্বারা উপকৃত হব—যেদিন সন্তান ও সম্পদ কোনো কাজে লাগবে না।'

উমাইর ইবনে সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর কথা শুনে উমর ফারুক রাযিয়াল্লাহু আনহুর দুই চোখ দিয়ে টপটপ করে পানি পড়তে লাগল। তিনি বললেন,

أَشْهَدُ أَنَّكَ مِنَ الَّذِيْنَ يُؤْثِرُوْنَ عَلى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَتْ بِهِمْ خَصَاصَةٌ

'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে তুমি সেই সকল মহান মানুষের অন্তর্ভুক্ত, যারা নিজেরা অভাবী হওয়া সত্ত্বেও অন্যদের নিজেদের ওপর প্রাধান্য দিয়ে থাকে।'

এরপর খলীফা তার জন্য এক ওয়াসাক খাবার, একজোড়া পোশাক দেওয়ার আদেশ দিলেন। (ওয়াসাক হলো ৬০ সা। এক সা = তিন কেজি তিনশো গ্রাম)

খলীফার আদেশে কৃতার্থ উমাইর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

'ইয়া আমীরুল মুমিনীন! খাবারের কোনো প্রয়োজন এই মুহূর্তে আমাদের নেই। কারণ, আমার স্ত্রীর কাছে আমি দুই সা যব রেখে এসেছি। ঐগুলো আমরা খেয়ে শেষ করতে না করতেই আল্লাহ তাআলা আবার আমাদের খাবারের ব্যবস্থা করে দেবেন ইনশাআল্লাহ। তবে কাপড় দুটো আমি গ্রহণ করছি আমার স্ত্রীর জন্য। কারণ, তার পোশাক ছিঁড়ে সে প্রায় বিবস্ত্র হয়ে পড়েছে।'

* * *

খলীফা উমর ফারুক রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং তাঁর প্রাক্তন এই গভর্নর উমাইর রাযিয়াল্লাহু আনহুর মাঝে সংঘটিত সাক্ষাতের পর বেশি দিন যায়নি। আল্লাহ তাআলা উমাইরের দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর তাঁর প্রাণপ্রিয় নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে পরলোকে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে দিলেন। এই পৃথিবী থেকে তাকে তুলে নিলেন।

উমাইর ইবনে সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহু আখেরাতের পথে পাড়ি জমালেন। নিশ্চিন্তে, নির্ঝাঞ্ঝাটে তিনি চলে গেলেন পরপারে। দুনিয়ার কোনো বোঝা তার কাঁধকে ভারী করতে পারেনি। কোনো কঠিন বোঝা তাঁর পিঠকে ক্লান্ত করতে পারেনি।

পরকালের এই যাত্রায় তাঁর সঙ্গে ছিল নূর আর হেদায়াত, তাকওয়া ও পরহেজগারী।

উমর ফারুক রাযিয়াল্লাহু আনহুর কাছে যখন তাঁর ইন্তেকালের সংবাদ গেল, শোকে তাঁর চেহারা মলিন ও বিবর্ণ হয়ে গেল। কষ্টে হৃদয় ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ল। তিনি বললেন,

'আমার মনে কত যে স্বপ্ন আর আশা ছিল, প্রশাসনের বিভিন্ন কাজে মুসলিমজাতির সাহায্যের জন্য উমাইর ইবনে সাদের মতো আরও কিছু মানুষ হয়তো পাব!'

* * *

আল্লাহ তাআলা উমাইর ইবনে সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর প্রতি রাজি ও সন্তুষ্ট হয়ে যান এবং তাঁকেও রাজি ও খুশি করে দিন।

নিঃসন্দেহে তিনি ছিলেন এক অনন্য সাধারণ ও অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব।

তিনি ছিলেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাদরাসার সর্বোচ্চ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছাত্র।

তথ্যসূত্র :

১. *আল-ইসাবা*, ৩য় খণ্ড, ৩২ পৃষ্ঠা অথবা জীবনী ৬০৩৬।
২. *আল-ইসতীআব*, (*আল-ইসাবা*'র টীকা), ২য় খণ্ড, ৪৮৬ পৃষ্ঠা।
৩. *উসদুল গাবাহ*, ১ম খণ্ড, ২৯৩ পৃষ্ঠা।
৪. *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, ১ম খণ্ড, ৮৬ পৃষ্ঠা।
৫. *হায়াতুস সাহাবা*, (৪র্থ খণ্ডের সূচি দ্রষ্টব্য)।
৬. *কাদাতু ফাতহিল ইরাক ওয়াল জাযীরা*, ৫১৩ পৃষ্ঠা।
৭. *আল-আলাম*, ৫ম খণ্ড, ২৬৪ পৃষ্ঠা।

আবদুর রহমান ইবনে আউফ

তুমি যা দিলে আল্লাহ তাতেও বরকত দিন
আর যা রাখলে আল্লাহ তাতেও বরকত দিন।

–রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি দুআ

তিনি সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণকারী আটজনের একজন....

জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশ ভাগ্যবানের অন্যতম....

খলীফা উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর পরবর্তী খলীফা নির্বাচনের জন্য গঠিত বিজ্ঞ ছয় পরামর্শকের অন্যতম সদস্য....

রাসূললুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় মদীনা মুনাওয়ারাতে যে সামান্য ক'জন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি ফতোয়া দিতেন, মুসলিমজাতির দীনি সমস্যার সমাধান দিতেন তিনি ছিলেন তাঁদেরই একজন...

জাহেলী যুগে যাঁর নাম ছিল আবদে আমর, ইসলাম গ্রহণের পর প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাঁর নাম রাখেন আবদুর রহমান।

তিনিই হচ্ছেন আবদুর রহমান ইবনে আউফ রাযিয়াল্লাহু আনহু।

* * *

আবদুর রহমান ইবনে আউফ ইসলাম গ্রহণ করেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিয়মতান্ত্রিকভাবে দারুল আরকামে দাওয়াত শুরুর পূর্বে। (দারুল আরকাম হলো আল্‌-আরকাম ইবনে আবদে মানাফ আল-মাখযূমীর বাড়ি। মক্কার এই বাড়িতেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসলামের দাওয়াত দিতেন এবং ইসলাম গ্রহণের পর মুসলিমদের ইসলামের শিক্ষা দিতেন। ইসলামের সর্বপ্রথম অফিস এটাই।) এটা ছিল আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহুর ইসলাম গ্রহণের মাত্র দু'দিন পরে।

ইসলাম গ্রহণ করার পর আবদুর রহমান ইবনে আউফকেও প্রথম ইসলাম গ্রহণকারীদের মতো নানা প্রকার কষ্ট ও নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছিল। কোনো কষ্ট নির্যাতনই তাঁর ধৈর্যচ্যুতি ঘটাতে পারেনি বরং সবকিছু সহ্য করেই তিনি অপরাপর মুসলিমদের মতো অটল ও অবিচল থেকেছেন। আল্লাহ-রাসূল ও আখেরাতের বিশ্বাসকে বুকে আগলে রেখে জীবনের অন্য সকল বিষয়কে বিসর্জন দিয়েছেন অন্য মুসলিমভাইদের মতোই। সেজন্য দীন-ঈমান রক্ষার স্বার্থে তিনি অন্য মুসলিমদের সঙ্গে সবকিছুর মায়া ত্যাগ করে হাবশায় হিজরত করেছেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরাম রিযওয়ানুল্লাহি আলাইহিম আজমাঈনকে যখন মদীনায় হিজরত করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল তখন আবদুর রহমান ইবনে আউফ ছিলেন আল্লাহ ও রাসূলের জন্য মদীনায় হিজরতকারী মুহাজির সাহাবীদের শীর্ষে।

হিজরত করে মদীনায় যাওয়ার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনুষ্ঠানিক ভাবে একেক মুহাজিরকে একেক আনসারীর সঙ্গে ভ্রাতৃত্বে বন্ধনে আবদ্ধ করে দেন। সেই সূত্র ধরেই মদীনার সাদ ইবনে রাবী আল্‌-আনসারীর সঙ্গে ভ্রাতৃত্ব গড়ে দেন আবদুর রহমান ইবনে আউফ রাযিয়াল্লাহু আনহুর। এই বিরল সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার পর সাদ আল-আনসারী রাযিয়াল্লাহু আনহু তার স্বদেশ-স্বজন ত্যাগ করে আসা মুহাজির

ভাই আবদুর রহমান ইবনে আউফ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে সম্বোধন করে বললেন,

'হে আমার প্রিয় ভাই! মদীনার লোকদের মধ্যে আমিই সবচেয়ে বেশি ধনবান মানুষ। আমার রয়েছে দুই দুইটি বিশাল বাগান আর দুই দুইজন স্ত্রী। আপনি দেখুন কোন্ বাগানটি আপনার পছন্দ, সেটাই আমি আপনাকে দিয়ে দেব। আর দেখুন আমার কোন্ স্ত্রী আপনার ভালো লাগে? আমি তালাক দিয়ে দেব যেন আপনি তাকে বিয়ে করতে পারেন।'

আবদুর রহমান ইবনে আউফ রাযিয়াল্লাহু আনহু খুশি হয়ে তাঁর আনসারী ভাইকে বললেন,

'ধন্যবাদ আপনাকে হে আমার আনসারী ভাই! আল্লাহ তাআলা আপনার পরিবার-পরিজনের মধ্যে এবং ধন-সম্পদের মধ্যে বরকত দান করুন। আপনি দয়া করে আমাকে বাজারের পথ চিনিয়ে দিন।'

তিনি তাকে বাজার চিনিয়ে দিলেন।

আবদুর রহমান ইবনে আউফ বাজারে ব্যবসা শুরু করে দিলেন। কেনা-বেচা করে লাভবান হতে থাকলেন। লাভ বা মুনাফার অর্থ জমাতে থাকলেন। এভাবে অল্পদিনের মধ্যে তার কাছে 'মোহরানা'র পরিমাণ অর্থ জমা হয়ে গেলে তখন তিনি বিয়ে করলেন। পরের দিন বিয়ের সুগন্ধি ও সজ্জা নিয়েই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে হাজির হলেন। তাকে দেখেই নবীজী প্রশ্ন করলেন,

'আরে আবদুর রহমান, কী ব্যাপার বলোতো? তোমাকে আজ অন্যরকম লাগছে?'

আবদুর রহমান বিনয়ের সঙ্গে বললেন-
'বিয়ে করেছি ইয়া রাসূলাল্লাহ!'

আবার জিজ্ঞাসা করলেন-
'মোহর হিসাবে স্ত্রীকে কী দিয়েছ?'

তিনি জবাব দিলেন, 'কয়েক রতি স্বর্ণ।'

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন,

'ওলীমার আয়োজন করো, ছোট্ট একটা বকরি দিয়ে হলেও। আল্লাহ তোমার ধন-সম্পদে প্রচুর বরকত দান করুন।'

আবদুর রহমান ইবনে আউফ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

'রাসূললুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সেই দুআর উসিলায় দুনিয়ার ধন-সম্পদ জোয়ারের পানির মতো আমার কাছে ছুটে আসতে থাকল। এমনকি তখন আমার মনে হতো, আমি যদি কোনো পাথরও উঁচা করে ধরি তাহলে ওর নিচেও হয়তো সোনা বা রূপা পেয়ে যাব।'

* * *

বাতিলের বিরুদ্ধে ইসলামের প্রথম জিহাদ 'বদরে'র দিনে এই সাহাবী আবদুর রহমান ইবনে আউফ রাযিয়াল্লাহু আনহু জান-প্রাণ দিয়ে একজন মরণজয়ী মুজাহিদ হিসাবে চূড়ান্ত সাহসের সঙ্গে লড়াই অব্যাহত রাখেন। সেদিন তিনিই মক্কার কুখ্যাত জালেম আল্লাহর দুশমন উমাইর ইবনে উসমান ইবনে কাআব আত-তাইসীকে হত্যা করেন।

ওহুদের প্রান্তরে মুসলিমবাহিনী যেখানে বিপর্যয়ের মুখোমুখি হয়ে পড়েছিল, সেখানেও তিনি পাহাড়ের মতো অনড় অবস্থান নিয়ে লড়াই চালিয়ে গিয়েছিলেন। ওহুদের যুদ্ধে পরাজিত ও পালায়নপর মুশরিকবাহিনী হঠাৎ ফিরে এসে পেছন দিক থেকে ঝড়ের গতিতে আক্রমণ করে বসলে গনিমত নিয়ে ব্যস্ত অপ্রস্তুত মুসলিমবাহিনীর প্রায় সকলেই যখন পালিয়ে যাচ্ছিলেন সেই মুহূর্তেও আবদুর রহমান ইবনে আউফ রাযিয়াল্লাহু আনহু সিংহের মতো সাহস নিয়ে কাফেরদের বিরুদ্ধে আঘাতের পর আঘাত হানতে থাকেন। যুদ্ধ শেষে তাঁর শরীরে ছিল কুড়িটিরও বেশি জখমের চিহ্ন। যার মধ্যে কোনো কোনো আঘাত ছিল এতটাই মারাত্মক ও গভীর যে, সেখানে মানুষের হাত ঢুকে যাবে।

কিন্তু আবদুর রহমান ইবনে আউফের এত সাহসী সংগ্রাম ও লড়াই সত্ত্বেও তাঁর শারীরিক জিহাদকে সামান্য মনে করা হয় আর্থিক জিহাদের তুলনায়।

আসুন দেখে নেওয়া যাক তাঁর জিহাদ বিলমাল বা আর্থিক জিহাদের কিছু চিত্র।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাফের-মুশরিকদের বিরুদ্ধে ক্ষুদ্র এক অভিযান পরিচালনা করার সিদ্ধান্ত নিলেন এবং তার জন্য তহবিল সংগ্রহের প্রয়োজনে সাহাবায়ে কেরামকে আহ্বান জানিয়ে বললেন,

تَصَدَّقُوْا فَإِنِّىْ أُرِيْدُ أَنْ أَبْعَثَ بَعْثًا

'হে আমার প্রিয় সাহাবীরা! আমি মুশরিকদের বিরুদ্ধে ছোট সামরিক অভিযান পরিচালনা করতে যাচ্ছি। সুতরাং তোমরা যথাসাধ্য এর জন্য দান করো।'

এই আহ্বান শোনামাত্রই আবদুর রহমান ইবনে আউফ রাযিয়াল্লাহু আনহু বাড়ির দিকে দৌড়াতে থাকলেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই ফিরে এসে বললেন,

'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার কাছে চার হাজার দিনার ছিল। দুই হাজার আল্লাহ ও রাসূলের খুশির জন্য দান করলাম আর দুই হাজার পরিবারবর্গের জন্য রেখে এলাম।'

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর এই প্রাণখোলা দানের কথা শুনে বললেন,

بَارَكَ اللهُ فِيْمَا أَعْطَيْتَ – وَ بَارَكَ اللهُ فِيْمَا أَمْسَكْتَ

'তুমি যা দিলে, আল্লাহ তাতে বরকত দান করুন এবং যা রাখলে আল্লাহ তাতেও বরকত দান করুন।'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাবূক যুদ্ধের সিদ্ধান্ত নিলেন—যা ছিল তাঁর জীবনের সর্বশেষ যুদ্ধ। এই যুদ্ধে বিপুল সৈন্য যেমন প্রয়োজন ছিল একই সঙ্গে যুদ্ধাস্ত্র ও অন্যান্য সরঞ্জাম ক্রয়ের জন্য জরুরি ছিল প্রচুর অর্থ। কারণ, এ যুদ্ধের প্রতিপক্ষ রোমানবাহিনী সৈন্যসংখ্যায়ও ছিল বিশাল আবার তাদের যুদ্ধাস্ত্র ও যুদ্ধ প্রস্তুতিও ছিল একেবারে অত্যাধুনিক। বিপদের ওপর আরও বড় বিপদ ছিল এই যে, সেই বছর মদীনায় অনাবৃষ্টিজনিত কারণে ফসল না হওয়ায় চলছিল তীব্র অভাব। যুদ্ধ যাত্রার পথ ছিল দুর্গম ও দীর্ঘ। দীর্ঘ পথের জন্য অত্যাবশ্যক সামান ও সরঞ্জাম ছিল একেবারেই না থাকার মতো। মরুর পথ পাড়ি দেওয়ার জন্য অতি জরুরি ঘোড়া ও উটের অভাব ছিল এত তীব্র যে, একদল মুমিন যুদ্ধে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে এসে রাসূলের কাছে আবেদন করেন তাদের জন্য 'অস্ত্র ও বাহনে'র ব্যবস্থা করার। কিন্তু সে ব্যবস্থা না থাকায় বাধ্য হয়ে আল্লাহর রাসূল তাদের ফেরৎ পাঠিয়ে দেন। তারা জিহাদে অংশগ্রহণ করতে না পারায় অশ্রুসজল হয়ে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে ফিরে যান। এই কারণে এই যুদ্ধে যোগদানে ব্যর্থ সাহাবীদের 'প্রচুর ক্রন্দনকারী' আর 'সেনাদল'কে 'কষ্ট সহ্যকারীবাহিনী' বলে আখ্যায়িত করা হয়।

এহেন চরম সংকটময় মুহূর্তে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে আল্লাহর কাছে নিশ্চিত সাওয়াব প্রাপ্তির আশায় জিহাদী তহবিলে প্রাণখুলে দান করার নির্দেশ দিলেন। সাহাবায়ে কেরাম প্রিয় নবীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে সাধ্যমতো প্রত্যেকেই দান করলেন। এখানেও দানকারীদের মধ্যে শীর্ষস্থানে ছিলেন আবদুর রহমান ইবনে আউফ রাযিয়াল্লাহু আনহু। এবারে তিনি দান করেন দুইশো উকিয়া স্বর্ণ যাতে হয় প্রায় একবস্তা স্বর্ণখণ্ড। তাঁর এই দানের অবস্থা দেখে উমর ইবনুল খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে মন্তব্য করলেন,

إِنِّىْ لَأَرٰى عَبْدَ الرَّحْمٰنِ اِلَّا مُرْتَكِبًا إِثْمًا – فَمَا تَرَكَ لِأَهْلِه شَيْئًا

'আমার মনে হয় আবদুর রহমানের এটা অন্যায় হলো, সে পরিবারের জন্য কিছুই না রেখে একেবারে সবই দান করে দিল।'

তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞাসা করলেন,
'আবদুর রহমান! পরিবারের জন্য কিছু রাখোনি?'

আবদুর রহমান বললেন,
'হ্যাঁ রেখেছি, বরং এর চেয়ে উত্তম এবং বেশি পরিমাণ রেখেছি।'
'কী রেখেছ?' রাসূল প্রশ্ন করলেন।
আবদুর রহমান উত্তর দিলেন,

مَا وَعَدَ اللهُ وَرَسُوْلُه مِنَ الرِّزْقِ وَالْخَيْرِ وَالْأَجْرِ

'দানকারীর জন্য আল্লাহ ও রাসূলের ওয়াদা রেখে এসেছি। তাদের জন্য রেখেছি 'উত্তম পুরস্কার', 'কল্যাণ' ও 'রিযিকে'র নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি।'

* * *

সেনাদল 'তাবূক' পৌঁছে গেল। এখানে আবদুর রহমান ইবনে আউফকে আল্লাহ তাআলা এমন এক বিরল সম্মানে ভূষিত করলেন যা এ পৃথিবীর বুকে আর কাউকেই করেননি। বিষয়টি হলো, নামাযের সময় হয়ে গিয়েছিল কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই মুহূর্তে সেখানে উপস্থিত না থাকায় আবদুর রহমান ইবনে আউফ রাযিয়াল্লাহু আনহু নামায পড়াতে শুরু করলেন। এদিকে প্রথম রাকাতের মাঝেই সেখানে হাজির হয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জামাতে আবদুর রহমান ইবনে আউফের পিছে মুক্তাদি হিসাবে নামায শুরু করে দেন।

সৃষ্টি জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, যিনি সকল নবী-রাসূলের ইমাম সেই মহান নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইমাম হওয়ার মতো সম্মান ও মর্যাদার বিষয় আর কিছু কি হতে পারে?

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পৃথিবী থেকে চিরবিদায় নেওয়ার পর আবদুর রহমান ইবনে আউফ 'উম্মাহাতুল মুমিনীন' বা প্রিয় নবীর সম্মানিতা জীবনসঙ্গিনীদের কাজকর্ম সেরে দেওয়া, সকল প্রয়োজন মিটিয়ে দেওয়া ইত্যাদি সকল দায়িত্ব নিজ কাঁধে তুলে নেন। তাঁরা কোথাও যেতে চাইলে তিনি তাঁদের স্বসম্মানে সেখানে নিয়ে যেতেন। তাঁরা হজের ইচ্ছা করলে তিনি সঙ্গী হয়ে হজের সকল আয়োজন ও ব্যবস্থা করে তাঁদের সঙ্গে হজ সম্পন্ন করতেন। তাঁদের উটের পিঠের আসনগুলো (হাওদাগুলো) কে সবুজ মূল্যবান পর্দা দিয়ে আবৃত করে দিতেন। তাঁদের ভালোলাগার স্থানগুলোতে যাত্রাবিরতি করাতেন। উম্মাহাতুল মুমিনীনের এই সকল খেদমতের সৌভাগ্য নিঃসন্দেহে আবদুর রহমান ইবনে আউফের গৌরবদীপ্ত জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সর্বপরি তাঁর প্রতি উম্মাহাতুল মুমিনীনের এমন গভীর আস্থা ছিল—যা নিয়ে তিনি গৌরব করার অধিকার রাখেন।

* * *

মুসলিমজাতির প্রতি এবং উম্মাহাতুল মুমিনীনের প্রতি আবদুর রহমান ইবনে আউফ রাযিয়াল্লাহু আনহুর ব্যাপক কল্যাণকর তৎপরতার একটি উদাহরণ এই যে, একবার তিনি নিজের একটি জমি চল্লিশ হাজার দিনার বা স্বর্ণমুদ্রায় বিক্রি করেন। এরপর পূর্ণ চল্লিশ হাজার স্বর্ণমুদ্রা প্রিয় নবীর মা আমিনা বিনতে ওয়াহাবের গোত্র 'বনু যোহরা', মুহাজির ও আনসারদের অসহায় পরিবার এবং উম্মাহাতুল মুমিনীনের মাঝে ভাগ করে দেন।

উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার খেদমতে তাঁর অংশ পাঠালে তিনি জিজ্ঞাসা করেন, 'কে পাঠিয়েছেন এই অর্থ?' তাঁকে জানানো হলো, 'আবদুর রহমান ইবনে আউফ।' তিনি বললেন, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন-

لَايَحْنُوْ عَلَيْكُنَّ اِلَّا الصَّابِرُوْنَ

‘আমার ইন্তেকালের পর ঈমান ও ইসলামের পথে অবিচল ব্যক্তিরাই কেবল তোমাদের প্রতি সহানুভূতি দেখাবে।’

* * *

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুআ কবুল হয়েছিল এবং আবদুর রহমান ইবনে আউফ রাযিয়াল্লাহু আনহুর ধন-সম্পদে প্রচুর বরকত হয়েছিল। ব্যাপক বৃদ্ধি ঘটেছিল। তাঁর ব্যবসা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। মুনাফাতে ব্যাপক বৃদ্ধি ঘটেছিল। তাঁর ব্যবসায়িক উটবহর বিভিন্ন শহর-বন্দর থেকে মদীনাবাসীদের জন্য গম, আটা, তেল, পোশাক, বাসনপত্র ও সুগন্ধিসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় সকল কিছু মদীনায় নিয়ে আসত আর মদীনায় উৎপাদিত অতিরিক্ত সামগ্রী বাইরে নিয়ে যেত।

* * *

একদিন আবদুর রহমান ইবনে আউফ রাযিয়াল্লাহু আনহুর বাণিজ্য কাফেলার উটবহর মদীনায় এল। সেই কাফেলায় উটের সংখ্যা ছিল সাতশো। হ্যাঁ, সাতশো উট মদীনার মানুষের জন্য খাদ্য, বস্ত্রসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় বিভিন্ন বস্তু বয়ে এনেছে।

এই মালবোঝাই সাতশো উটের বহর যখন মদীনায় প্রবেশ করল, মদীনার মাটি যেন কেঁপে উঠল। কৌতূহলী মানুষের মধ্যে হৈচৈ আর হট্টগোল বেধে গেল। উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা জিজ্ঞাসা করলেন,

‘এত হৈচৈ কিসের?’

তাঁকে জানানো হলো,

‘আবদুর রহমান ইবনে আউফের সাতশো উটের বহর গম, আটা, ময়দা ও আরও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য নিয়ে মদীনায় প্রবেশ করেছে।’

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বললেন,

'আল্লাহ তাআলা দুনিয়াতে তার ধন-সম্পদে বরকত ও সমৃদ্ধি দান করুন আর আখেরাতে তার জন্য জান্নাতে অনেক বড় পুরস্কার তো আছেই।'

* * *

উট বহরের মালামাল খালাস করার পূর্বে উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার পবিত্র মুখনিঃসৃত জান্নাতি পুরস্কারের সংবাদ আবদুর রহমান ইবনে আউফ রাযিয়াল্লাহু আনহুর কানে গেল। এ কথা শোনামাত্রই তিনি ছুটতে ছুটতে এসে হাজির হয়ে উম্মুল মুমিনীনকে সম্বোধন করে বললেন,

أُشْهِدُكَ يَا أُمَّهْ أَنَّ هذِهِ الْعِيْرَ جَمِيْعَهَا بِأَحْمَالِهَا وَأَقْتَابِهَاوَأَحْلَاسِهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

'হে আম্মা! আমি আপনাকে সাক্ষী রেখে বলছি যে, এই উট বহরের সাতশো উটের সকল উট, বয়ে আনা সকল মালামাল, এগুলোর পিঠে মালবহনের বিশেষ জিন ও জিনপোষসহ সবকিছু আল্লাহর রাস্তায় দান করে দিলাম।'

* * *

আবদুর রহমান ইবনে আউফ রাযিয়াল্লাহু আনহুর জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 'ধন-সম্পদে বরকত ও সমৃদ্ধির' দুআটি তাঁর জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত কার্যকর ও সুফলদায়ক ছিল। তাইতো তিনি সাহাবায়ে কেরামের মাঝে সর্বাধিক ধন-ঐশ্বর্যের মালিক হয়েছিলেন। কিন্তু এত বিশাল ধন-সম্পদের মালিক হওয়া সত্ত্বেও তিনি আল্লাহ ও রাসূলের সন্তুষ্টির জন্যই নিজের সম্পদ ব্যয় করতেন। তাঁর

বিশাল সম্পদের ভাণ্ডার থেকে সর্বদা দুই হাতে ডানে-বামে, গোপনে ও প্রকাশ্যে তিনি দান করতেই থাকতেন।

একবার তিনি চল্লিশ হাজার দিরহাম অর্থাৎ রৌপ্যমুদ্রা দান করেন। এর পরপরই চল্লিশ হাজার দিনার বা স্বর্ণমুদ্রা, আবার অন্য সময় দান করেছেন বস্তাভর্তি স্বর্ণ বা দুইশো উকিয়া স্বর্ণ। একবার তিনি গরিব অসহায় মুজাহিদদের সাহায্যের উদ্দেশ্যে পাঁচশো ঘোড়াকে যুদ্ধাস্ত্রে সাজিয়ে ফী সাবীলিল্লাহ দান করেন। আবার অন্য সময় এক হাজার পাঁচশো মুজাহিদের জন্য উটের ব্যবস্থা করে দেন।

মৃত্যুর পূর্বে আবদুর রহমান ইবনে আউফ রাযিয়াল্লাহু আনহু নিজের অনেক দাস-দাসী মুক্ত করে দেন। জীবিত 'বদরী' (বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী) সাহাবীদের প্রত্যেককে একশো করে স্বর্ণমুদ্রা দেওয়ার অসিয়ত করেন। সে সময় জীবিত বদরী সাহাবীর সংখ্যা ছিল একশো। উম্মুল মুমিনীনের প্রত্যেকের জন্য বিপুল পরিমাণ সম্পদ দানের নির্দেশ দিয়েছিলেন। উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা প্রায় সময়ই তাঁর জন্য এই বলে দুআ করতেন,

سَقَاهُ اللّٰهُ مِنْ مَّاءِ السَّلْسَبِيْلِ

'আল্লাহ যেন তাকে জান্নাতের 'সালসাবীল' ঝরনার পানি দিয়ে পরিতৃপ্ত করেন।'

এত দান-খায়রাত করার পরও তিনি উত্তরাধিকারীদের জন্য যে পরিমাণ সম্পদ রেখে যান তা গণনা করা কঠিন। তিনি পরিত্যক্ত সম্পদ হিসাবে উট রেখে যান এক হাজার, ঘোড়া একশোটি, আর বকরি ছিল তিন হাজার। তাঁর স্ত্রী ছিলেন চারজন। তারা প্রত্যেকেই মোট সম্পদের এক অষ্টমাংশের এক চতুর্থাংশ পান। এই এক চতুর্থাংশের পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল আশি হাজার দিনার। তা ছাড়া তিনি পরিবারের লোকদের জন্যে সোনা-রূপা যে পরিমাণ রেখে যান তা উত্তরাধিকারীদের মধ্যে ভাগ

করার জন্য কুড়াল দিয়ে কেটে কেটে ভাগ করতে হয়। এমনকি স্বর্ণ কাটার দায়িত্বে নিয়োজিত শ্রমিকদের হাতে স্বর্ণ টুকরা করতে গিয়ে ফোস্কা পড়ে গিয়েছিল।

এত যে সম্পদের মালিক তিনি হয়েছিলেন, তা ছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 'আল্লাহ তার সম্পদে বরকত দান করো।' এই দুআরই ফসল।

* * *

এত বিশাল সম্পদের মালিক হওয়া সত্ত্বেও আবদুর রহমান ইবনে আউফ রাযিয়াল্লাহু আনহু কখনোই আল্লাহকে ভুলে যাননি। কখনোই আল্লাহর হুকুম থেকে গাফেল হননি। এত সম্পদ কখনোই তাঁর সরল ও সাধারণ জীবনধারার পরিবর্তন ঘটাতে পারেনি। তিনি দাস-দাসীদের মাঝে থাকলে দেখে কেউ পার্থক্যই করতে পরত না যে, কোন্টা মালিক আর কোন্টা ক্রীতদাস।

তিনি রোযা রেখেছিলেন। ইফতারির পূর্বে তাঁর জন্য গরম খাবার পেশ করা হলো। সেই সুস্বাদু খাবারের দিকে তিনি আফসোস করে বলতে লাগলেন,

'মুসআব ইবনে উমাইর ধনীর দুলাল ছিলেন। সম্মান ও মর্যাদায় ছিলেন আমার উপরে। আল্লাহর রাস্তায় জীবন উৎসর্গ করে শহীদ হওয়ার পর তাঁর কাফনের জন্য আমাদের কাছে শুধু এতটুকু কাপড়ই ছিল, যা দিয়ে মাথা ঢাকলে পায়ের দিক আগলা হয়ে যাচ্ছিল আবার পায়ের দিক ঢাকলে মাথা আগলা হয়ে যাচ্ছিল।

এরপর আল্লাহ তাআলা সময়ের গতিধারা পাল্টে দিয়েছেন। আমাদের জন্য দুনিয়ার ধন-সম্পদ ও প্রাচুর্যের দুয়ার খুলে দিয়েছেন। এরপর তিনি বলেন, আমার তো খুবই আশঙ্কা হয়, আমাদের সব সাওয়াব, প্রতিদান ও পুরস্কার এখানেই শেষ করে দেওয়া হচ্ছে নাতো?' এসব কথা বলে

তিনি বিলাপ করে কাঁদতে থাকলেন। এমনকি তার জন্য আনা গরম খাবার ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

* * *

বিশাল কল্যাণ ও সৌভাগ্য আবদুর রহমান ইবনে আউফ রাযিয়াল্লাহু আনহুর জন্য। ঈর্ষনীয় ও মহান এক জীবনের অধিকারী তিনি। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে পৃথিবীব বুকে বেঁচে থাকাবস্থায় জান্নাতের সুসংবাদ শুনিয়েছেন। তাঁর জানাযা কাঁধে করে বহন করেছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মামা সাদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস রাযিয়াল্লাহু আনহু। তাঁর জানাযার নামায পড়িয়েছেন যুন্নুরাইন উসমান ইবনে আফ্ফান রাযিয়াল্লাহু আনহু। জানাযার পরে দাফনের জন্য শবমিছিলে শামিল থেকে তাঁকে শেষ বিদায় জানিয়ে ছিলেন আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু।

আবেগআপ্লুত হয়ে তিনি বলে উঠেছিলেন,

'ভেজাল মানুষের বেড়াজালে তোমাকে জড়াতে হয়নি। এ জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষদের সুবাসিত সান্নিধ্য নিয়ে তুমি চলে যাচ্ছ। যাও বন্ধু, আল্লাহ তোমায় রহম করুন।'

তথ্যসূত্র :

১. *সিফাতুস সফওয়াহ*, ১ম খণ্ড, ১৩৫ পৃষ্ঠা।

২. ইবনে হিশাম রচিত *আস-সীরাতুন্নবাবিয়্যাহ*, (সূচি দ্রষ্টব্য)।

৩. *তারীখুল খামীস*, ২য় খণ্ড, ২৫৭ পৃষ্ঠা।

৪. *আল-বাদউওয়াত তারীখ*, ৫ম খণ্ড, ৮৬ পৃষ্ঠা।

৫. *আর-রিয়াযুন নাযিরা*, ২য় খণ্ড, ২৮১ পৃষ্ঠা।

৬. *আল-জামউ বাইনা রিজালিস সহীহাইন*, ২৮১ পৃষ্ঠা।

৭. *আল-ইসাবা*, ২য় খণ্ড, ৪১৬ পৃষ্ঠা অথবা *আত্তারজামা*, ৫১৭৯।

৮. *হুলইয়াতুল আউলিয়া*, ১ম খণ্ড, ৯৮ পৃষ্ঠা।

৯. *হায়াতুস সাহাবা* (সূচিপত্র দ্রষ্টব্য)।

১০. *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৭ম খণ্ড, ১৬৩ পৃষ্ঠা।

১১. *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, ২য় খণ্ড, ৩৪০ পৃষ্ঠা।

১২. *তাহযীবুত তাহযীব*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ২৪২ পৃষ্ঠা।

১৩. *আল-ইসতীআব* (*আল-ইসাবা*'র টীকা) ২য় খণ্ড, ৩৯৩ পৃষ্ঠা।

জাফর ইবনে আবী তালেব

জাফরকে আমি জান্নাতে দেখেছি, পাখির মতো দুইটি পাখা দিয়ে উড়ে বেড়াচ্ছে। তবে তার পাখা আর পালকগুলো ছিল তাজা রক্তে ভেজা

–রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

আবদে মানাফ গোত্রে পাঁচজন মানুষ ছিলেন, যাদের চেহারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে মিলে যেত। রাসূলের চেহারার সঙ্গে তাদের চেহারার এত মিল ছিল যে, অপরিচিতরা এবং দুর্বল দৃষ্টির লোকেরা বেশিরভাগ সময় তাদের মাঝে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাঝে পার্থক্য করতে পারত না।

আমি নিশ্চিত প্রিয় পাঠক! নবীজীর চেহারার সঙ্গে এত মিল ও সাদৃশ্যপূর্ণ সেই পাঁচজনের ব্যাপারে কৌতূহল ইতিমধ্যে আপনার মধ্যে তৈরি হয়েছে।

তাহলে আসুন জেনে নিই...

এক : আবু সুফিয়ান ইবনে হারিস ইবনে আবদুল মুত্তালিব। এই আবু সুফিয়ান একাধারে রাসূলের চাচাত ভাই এবং দুধভাই।

দুই : কুসাম ইবনে আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব। তিনিও রাসূলের চাচাত ভাই।

তিন : সাইব ইবনে উবাইদ ইবনে আবদে ইয়াযীদ ইবনে হাশেম। তিনি ইমাম শাফেয়ী রহমাতুল্লাহি আলাইহির দাদা।

চার : হাসান ইবনে আলী, অর্থাৎ রাসূলের মেয়ে ফাতেমা রাযিয়াল্লাহু আনহার পুত্র। পাঁচজনের মধ্যেও রাসূলের চেহারার সঙ্গে সবচেয়ে বেশি মিল ছিল এই হাসান রাযিয়াল্লাহু আনহুর।

পাঁচ : জাফর ইবনে আবী তালেব। আমীরুল মুমিনীন আলী ইবনে আবী তালেবের ভাই।

তাহলে চলুন এবার জাফর ইবনে আবী তালেব রাযিয়াল্লাহু আনহুর ঈমানদীপ্ত জীবনের কিছু কাহিনী আলোচনা করি।

* * *

আবু তালেব কুরাইশ বংশের শীর্ষ সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী হলেও তিনি অনেক সন্তানাদির কারণে আর্থিক দিক থেকে ছিলেন খুবই অভাবী ও অস্বচ্ছল।

এই অভাব ও অস্বচ্ছলতা অসহনীয় অবস্থায় পৌঁছে গেল তীব্র খড়া ও অনাবৃষ্টিজনিত ফসল, পশুর ব্যাপক ক্ষয়-ক্ষতির বছর। কুরাইশের ওপর নেমে আসা আসমানী বিপদের মতো সেই দুর্ভিক্ষের বছর মানুষকে ক্ষুধা-পিপাসায় এতটাই অসহায় করে দিয়েছিল যে বাধ্য হয়ে মানুষকে তখন শুকনো হাড্ডিও খেতে হয়েছিল।

সেই চরম অভাবের সময়ে হাশেমীদের মধ্যে মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ এবং তাঁরই চাচা আব্বাস ছাড়া আর কেউই অভাবমুক্ত ও স্বচ্ছল ছিলেন না।

এ কারণেই মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ তাঁর চাচা আব্বাসকে একটি প্রস্তাব দিয়ে বললেন,

'চাচাজান! আপনার ভাই আবু তালেব অনেক সন্তানাদির কারণে এমনিতেই খুব অভাবী। তার ওপর এই খরা ও অনাবৃষ্টির কারণে মানুষ

কী পরিমাণ খাদ্য-পানির অভাবে ক্ষুধা ও পিপাসার যন্ত্রণা ভোগ করছে, সেটা তো দেখতেই পাচ্ছেন। অতএব চলুন আমি আর আপনি দু'জনে তার দুটো সন্তানকে নিয়ে আসি। তাদের ভরণ-পোষণ করে আবু তালেবের কষ্ট কিছুটা লাঘব করি।'

আব্বাস বললেন,
'খুবই চমৎকার ও নেক প্রস্তাব দিয়েছ।'

এরপর তারা দু'জনেই আবু তালেবের কাছে গিয়ে বললেন,
'যে বিশাল পারিবারিক বোঝা আপনার ঘাড়ে চেপে আছে, বর্তমানের চরম দুর্দশা যাকে আরও কষ্টকর বানিয়ে দিয়েছে, আমরা সেটাকে কিছুটা লাঘব করার উদ্দেশ্যে আপনার দুটো সন্তানকে আমাদের পরিবারভুক্ত করে নিতে চাই। বর্তমান অবস্থার উন্নতি না হওয়া পর্যন্ত ওরা দু'জন আমাদের দায়িত্বেই থাকবে।'

আবু তালেব বললেন,
'আমার বড় ছেলে আকীলকে আমার কাছে রেখে দাও। অন্য যে কোনো দু'জনকে তোমরা নিতে চাও নিয়ে যাও।'

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলীকে নিয়ে তাঁর পরিবারভুক্ত করলেন আর আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু নিলেন জাফরকে।

তখন থেকেই আলী ইবনে আবী তালেব মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহর সঙ্গে থেকে গেলেন এবং কিশোরদের মধ্যে তিনিই হলেন সর্বপ্রথম ঈমান গ্রহণকারী।

জাফর থেকে গেলেন চাচা আব্বাসের সঙ্গে তরুণ বয়স পর্যন্ত। এখানে থেকেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করলেন এবং চাচার থেকে আলাদা হয়ে বিয়ে-শাদি করে স্বাবলম্বি হয়ে গেলেন।

* * *

জাফর ইবনে আবী তালেব এবং তাঁর স্ত্রী আসমা বিনতে উমাইস ইসলামের আলোর কাফেলায় শামিল হয়ে গেলেন একেবারে শুরুর লগ্ন

থেকেই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবুওয়াত পাওয়ার পর দারুল আরকামে নিয়মিত দাওয়াতি কাজ শুরু করার আগেই তারা স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহুর হাতে ইসলাম কবুল করে নিলেন।

ইসলাম গ্রহণের অপরাধে এই হাশেমী তরুণ ও তাঁর স্ত্রীকে কুরাইশের নানারকম জুলুম ও অত্যাচারের শিকার হতে হয় যেমন হয়েছিল প্রথম দিকে ইসলাম কবুলকারী অন্যান্য মুসলিমদেরও। তাঁরা উভয়েই সকল কষ্ট ও নির্যাতন সহ্য করেও ইসলামী আদর্শের ওপর পাহাড়ের মতো অটল দাঁড়িয়ে থাকেন। কেননা, তাঁরা খুব ভালো করেই জানতেন যে, যেই পথের শেষ গন্তব্য জান্নাত—তা বিপদাপদ ও কষ্টঘেরা। জান্নাতে যেতে হলে এইসব বিপদাপদের পাহাড় ডিঙিয়ে, রক্তের সাগর পাড়ি দিয়েই পৌঁছুতে হয়। এজন্যই তারা সকল নির্যাতন, দুঃখ-কষ্ট ও বিপদাপদ নীরবেই সয়ে যাচ্ছিলেন। এত জুলুম নির্যাতন করেও কুরাইশের লোকদের জালেম আত্মা শান্ত হলো না। তাদের দু'জনের এবং অপর মুসলিমদের ইসলামী বিধি-বিধান পালনে তারা প্রতিবন্ধকতা শুরু করে দিল। ইবাদত-বন্দেগীর মাধ্যমে মানসিক প্রশান্তি লাভের সুযোগ মুসলিমদের জন্য তারা রুদ্ধ করে দিল। তাদের প্রতিটি পদক্ষেপে এমনকি প্রতিটি নিঃশ্বাসেও জালেমরা বাধা দিতে থাকল।

মুসলিমরা কাফেরদের শারীরিক, মানসিক নির্যাতন সহ্য করেছিলেন। সমাজিক বয়কটের সময়ও তারা নীরব ছিলেন। কিন্তু ইবাদত-বন্দেগীতে বাধা পেয়ে তারা আর নীরব থাকতে পারলেন না।

জাফর ইবনে আবী তালেব রাযিয়াল্লাহু আনহু স্ত্রীসহ সাহাবীদের একটি দল নিয়ে হাবশায় (বর্তমান ইথিওপিয়া ও ইরিত্রিয়ায়) হিজরত করার জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে অনুমতি চাইলেন। বিষণ্ন মনে তিনি তাদের অনুমতি প্রদান করলেন।

নিজের নিরীহ-নির্বিবাদী এই সকল সঙ্গী-সাথীদের স্বদেশভূমি ছেড়ে যাওয়ার অনুমোদন দেওয়া প্রিয় নবীর জন্য ছিল ভীষণ কষ্টকর। কেন

আজ তাদের নিজেদের জন্মভূমি ছেড়ে যেতে হচ্ছে? যেখানে মিশে আছে তাদের দুরন্ত শৈশবের কত স্মৃতি! উচ্ছল তারুণ্যের কত কাহিনী! তাদের রক্তের সঙ্গে মিশে থাকা হাজারো কাহিনী আর স্মৃতি জাগানো এই মাটি-মাতৃভূমি, এই জন্মভূমি ছেড়ে চলে যেতে হচ্ছে বিনা অপরাধে। অবশ্য কাফেরদের চোখে এরা বিরাট অপরাধী। কাফেরদের দেব-দেবীকে এরা মানে না। এরা মানে শুধু আল্লাহ আর রাসূলকে। বিশ্বাস করে আখেরাতের জবাবদিহিতাকে।

অবশেষে তিনি বন্ধুদের বিচ্ছেদকে মেনে নিয়ে নিজেকে এই বলে প্রবোধ দিলেন,

'কিন্তু কি করা যাবে! কুরাইশের লোকদের নির্যাতন থেকে তাদের বাঁচানোর আর তো কোনো উপায় ছিল না।'

* * *

জাফর ইবনে আবী তালেব রাযিয়াল্লাহু আনহুর নেতৃত্বে মক্কা থেকে সর্বপ্রথম হিজরতকারী কাফেলা হাবশায় পৌঁছে গেল। সেখানের সুযোগ্য সৎ ও ন্যায়পরায়ণ বাদশা নাজাশীর সাহায্য-সহযোগিতায় নিরাপদ জীবন-যাপন করতে লাগল।

ইসলাম কবুলের পর এই প্রথম তারা নির্যাতনের ভয়মুক্ত নিরাপদ জীবনের স্বাদ পেলেন। কোনোরূপ বাধা ও প্রতিবন্ধকতামুক্ত ইবাদতের মজা উপভোগ করলেন।

কিন্তু কুরাইশের লোকজন যখনই জানতে পারল যে একদল মুসলিম নিরাপদে হাবশায় চলে গেছে এবং সেখানে বাদশার সহযোগিতায় নিজেদের ধর্ম ও বিশ্বাস বুকে নিয়ে নিরাপদে ইবাদত করে যাচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গেই তারা সিদ্ধান্ত নিল—ওদেরকে হত্যা করতে হবে নয়তো সেখান থেকে ফিরিয়ে এনে মক্কার বড় জেলখানায় ভরে রাখতে হবে।

আমরা এবার যাচ্ছি ঐ হিজরতকারী কাফেলার এক সদস্য উম্মে সালামা রাযিয়াল্লাহু আনহার বর্ণনা শুনতে। এ বিষয়ে তিনি নিজে

যা দেখেছেন, শুনেছেন সেটার সবিস্তার বর্ণনাই হবে আমাদের জন্য সর্বোত্তম মাধ্যম।

* * *

উম্মে সালামা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন,

'আমরা হাবশায় পৌঁছে দেখতে পেলাম আমাদের আশপাশের সকল প্রতিবেশী সর্বোত্তম আচরণ করছে। আমরা এমন চমৎকার প্রতিবেশীদের কারণে দীন ও ঈমানের ব্যাপারে শঙ্কামুক্ত হয়ে গেলাম। নিরাপদে, নিশ্চিন্তমনে আমরা মহান আল্লাহর ইবাদতে মগ্ন হতে পারলাম। না কোনো বাধা, না কোনো কটুকথা, কোনো প্রতিকুলতাই তখন আমাদের ইবাদতের মাঝে এসে দাঁড়ায়নি। আমাদের এরূপ নিরাপদ জীবন আর বাধাহীন ইবাদতের খবর কুরাইশের লোকদের কানে যাওয়ামাত্রই তারা এক দীর্ঘ পরিকল্পনা ও চক্রান্তের জাল বুনতে শুরু করে দিল। চক্রান্তের অংশ হিসাবে তাদের মধ্য থেকে চতুর ও বাকপটু দু'জন ব্যক্তি অর্থাৎ আমর ইবনুল আস ও আবদুল্লাহ ইবনে আবী রাবীআকে নাজাশী বাদশার নিকট প্রচুর উপহার-উপঢৌকন দিয়ে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিল। হিজায ভূমিতে নাজাশী বাদশা এবং তার উপদেষ্টা পাদ্রীদের পছন্দনীয় নানান সামগ্রী তাদের হাতে দিয়ে বলে দেওয়া হলো, বাদশার সঙ্গে সাক্ষাতের পূর্বেই সকল পাদ্রীর হাতে মূল্যবান উপঢৌকন পৌঁছাতে হবে।

* * *

আমর ইবনুল আস এবং আবদুল্লাহ ইবনে আবী রবীআ হাবশায় পৌঁছেই প্রথমে নাজাশীর উপদেষ্টা পাদ্রীদের প্রত্যেকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাদের হাতে উপঢৌকন বুঝিয়ে দিল এবং প্রত্যেকের কাছে মক্কার নেতাদের এই অনুরোধও পৌঁছে দিল,

'দেখুন, আমাদের এলাকার কিছু নির্বোধ লোকজন পালিয়ে এসে মহামান্য বাদশার এই দেশে আশ্রয় নিয়েছে। আমরা এই অপরাধীদের ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চাই এবং এ ব্যাপারে আমরা বাদশার সঙ্গে কথা

বলব। আপনার কাছে আমাদের নেতৃবৃন্দের অনুরোধ শুধু এতটুকুই যে, বাদশার সঙ্গে কথা বলার সময় আপনারা তাঁকে এতটুকু বলবেন, ওদের যেন আমাদের হাতে তুলে দেন এবং যেন ওদের কাছে ওদের ধর্ম সম্পর্কে কোনো কথা জানতে না চান। কারণ, কওমের বিজ্ঞ নেতৃবৃন্দই ভালো জানেন—তাদের ধর্ম ও বিশ্বাসের ভ্রান্তি সম্পর্কে।' কী শাস্তি তাদের প্রাপ্য ইত্যাদি সবকিছু নেতাদের ওপর ছেড়ে দেওয়ার জন্য আপনারা বাদশাকে পরামর্শ দেবেন। পাদ্রীরা তাদের অনুরোধ মেনে নিয়ে বললেন, ঠিক আছে। আমরা বাদশাকে সেটাই পরামর্শ দেব।

উম্মে সালামা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন,

'বাদশা নাজাশী আমাদের কাউকে ডেকে ইসলাম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে বসেন কিনা এবং এই সূত্র ধরে তিনি ইসলামের কিছু কথা জেনে ফেলেন কিনা—এটাই ছিল তাদের সবচেয়ে বড় ভয়।'

* * *

এরপর তারা দু'জন বাদশা নাজাশীর রাজ দরবারে উপস্থিত হয়ে তাঁর সামনে উপহার সামগ্রী পেশ করল। সেগুলো দেখে বাদশার খুবই পছন্দ হলো। এত চমৎকার উপহার পেয়ে তিনি মুগ্ধ হয়ে গেলেন। এই সুযোগের সৎব্যবহার করে তারা বিনীত ভাবে তাদের দাবি পেশ করতে গিয়ে বলল,

'হে মহামান্য বাদশা! আমাদের কয়েকজন দুষ্ট প্রকৃতির লোক পালিয়ে এসে আপনার দেশে আশ্রয় নিয়েছে। তারা এমন একটি ধর্মের অবিষ্কার করেছে, যে সম্পর্কে আমরাও কিছু জানি না, আপনারাও জানেন না। তারা আমাদের প্রাচীন ধর্ম ত্যাগ করে এসেছে অথচ আপনাদের ধর্মেও দীক্ষিত হয়নি। আমাদের কওমের প্রধান ব্যক্তিবর্গ অর্থাৎ এদের বাপ-চাচা ও আত্মীয়স্বজন সকলে মিলে আমাদের দু'জনকে আপনার দরবারে পাঠিয়েছেন যেন আপনি ওদেরকে ফেরৎ পাঠান। আর এদের সৃষ্ট গোলযোগ ও বিভ্রান্তি সম্পর্কে তারাই সবচেয়ে ভালোভাবে অবগত।'

বাদশা নাজাশী উপদেষ্টা পাদ্রীদের দিকে তাকালেন তাদের মতামত জানার জন্য। তারা একবাক্যে বলে উঠল,

'মহামান্য বাদশা! এরা দু'জন ঠিক কথাই বলেছে যে তাদের কওমের প্রধানরা এদের অপরাধ সম্পর্কে আমাদের চেয়ে বেশি জানে। সুতরাং আমাদের মতে এখানে এসে আশ্রয় নেওয়া অপরাধীদেরকে তাদের কাছেই ফেরৎ পাঠিয়ে দেওয়া হোক—যেন এদের ব্যাপারে তারাই ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।'

পাদ্রীদের এই মত ও অনুরোধ শুনে বাদশা নাজাশী ভীষণ রেগে উঠে বললেন,

'আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি, আমি পুরো বিষয়টি যাচাই না করে এদের দু'জনের হাতে ওদেরকে তুলে দেব না। ওদের বিরুদ্ধে এরা যে অপরাধের অভিযোগ তুলে ধরেছে, সে সম্পর্কে আমি ওদের জিজ্ঞাসা করে দেখব। এই দু'জনের দাবি সত্য হলে আমি ওদেরকে এদের হাতে তুলে দিতে দ্বিধা করব না। আর যদি তারা নির্দোষ প্রমাণিত হয় তাহলে আমি ততদিন পর্যন্ত তাদেরকে আমার আশ্রয়ে রেখে উত্তম আচরণ করতে থাকব যতদিন তারা আমার আশ্রয়ে থাকতে চাইবে।'

* * *

উম্মে সালামা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন,

'এরপর বাদশা নাজাশী আমাদেরকে ডেকে পাঠালেন সাক্ষাতের জন্য। তখন আমরা নিজেরা একত্র হয়ে আলোচনা করলাম, বাদশা নিশ্চয় আমাদের কাছে আমাদের দীন ইসলাম সম্পর্কে প্রশ্ন করবেন। আমাদের উচিৎ হবে তাঁর কাছে ঈমান ও ইসলাম সম্পর্কে সুস্পষ্ট আলোচনা তুলে ধরা। আমাদের আলোচনায় এটাও স্থির হলো, বাদশার দরবারে কথা বলার জন্য আমাদের মুখপাত্র থাকবেন জাফর ইবনে আবী তালেব। যা বলার ও আলোচনা করার সব তিনিই করবেন।'

উম্মে সালামা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন,

'এরপর আমরা বাদশার সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে তার দরবারে গিয়ে দেখলাম, তিনি তাঁর উপদেষ্টা পাদ্রীদেরও সেখানে আহ্বান করেছেন। সে হিসাবে পাদ্রীরা সবাই নিজ নিজ আসন নিয়ে বাদশার ডানে ও বামে বসে আছেন। সকলেই টুপি মাথায় দিয়ে ধার্মীয় পণ্ডিতদের বিশেষ পোশাক অর্থাৎ সবুজ রঙের মূল্যবান আবা (গাউন) পরে ধর্মগ্রন্থ খুলে নিয়ে বসেছেন।

আমরা সেখানে কুরাইশী দুই দূত আমর ইবনুল আস এবং আবদুল্লাহ ইবনে আবী রাবীআকেও উপস্থিত দেখতে পেলাম।'

আমরা সকলেই বসে পড়লে বাদশা নাজাশী আমাদের লক্ষ্য করে বললেন,

'কি ধরনের নতুন ধর্ম তোমরা তৈরি করেছ যার কারণে পূর্ব-পুরুষদের ধর্ম ত্যাগ করতে হয়েছে? তোমরা আমাদের ধর্মেও প্রবেশ করোনি, এমনকি প্রচলিত অন্য কোনো ধর্মেও না। কী আছে তোমাদের ঐ নতুন ধর্মে?'

জাফর ইবনে আবী তালেব রাযিয়াল্লাহু আনহু বাদশার কাছে একটু অগ্রসর হয়ে বললেন,

'হে মহামান্য বাদশা! আমরা ছিলাম পথভ্রষ্ট-অজ্ঞ জাতি। নিষ্প্রাণ মূর্তির পূজা করতাম। মৃতপ্রাণী খেতাম। ব্যাভিচার করতাম। আত্মীয়তার সম্পর্ক নষ্ট করতাম। প্রতিবেশীর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করতাম। আমাদের শক্তিশালী ধনীরা দুর্বল গরিবদের ওপর জুলুম করত। এই সকল অন্যায় ও অনাচারে যখন আমাদের সমাজ ডুবে ছিল, তখন মহান আল্লাহ আমাদের কাছে আমাদের মধ্য থেকে এমন এক মহান ব্যক্তিকে রাসূল হিসাবে মনোনীত করলেন, যাঁর বংশমর্যাদা, সততা-সত্যবাদিতা, আমানতদারী ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য একেবারে অতুলনীয়।

আল্লাহর রাসূল মনোনীত হওয়ার পর তিনি আমাদেরকে এক আল্লাহর দিকে আহ্বান জানালেন। তিনি আমাদেরকে আল্লাহ তাআলার একত্ব ও

অদ্বিতীয়তার শিক্ষা দিলেন। যেন আমরা একমাত্র আল্লাহরই ইবাদত করি এবং শিরককে সম্পূর্ণ রূপে বর্জন করি। ইতিপূর্বে আমরা ও আমাদের পূর্ব-পুরুষেরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে যেসব দেব-দেবী ও মূর্তির পূজা করতাম, তিনিই আমাদের ঐ সকল শিরক বর্জন করার নির্দেশ দিয়েছেন।

তিনি আমাদের সত্য কথা বলতে, আমানতদারী রক্ষা করতে, আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখতে, প্রতিবেশীর সঙ্গে সদাচরণ করতে নির্দেশ দিয়ে থাকেন। তিনি আদেশ করেন হারাম ও নিষিদ্ধ কর্মকাণ্ড থেকে, খুনাখুনি ও রক্তারক্তি থেকে দূরে থাকতে। তিনি আমাদের অশ্লীল-নৈতিকতা বিরোধী কর্মকাণ্ড, মিথ্যা কথা, এতীমের সম্পদ আত্মসাৎ করা ও চরিত্রবান পবিত্র-সতী নারীদের বিরুদ্ধে অপবাদ আরোপ করা থেকে কঠোরভাবে হুশিয়ার করেছেন।

তিনি আমাদের হুকুম প্রদান করেন, আমরা যেন একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করি এবং কোনোপ্রকার শিরকে লিপ্ত না হই এবং আমরা যেন নামায কায়েম করি, যাকাত প্রদান করি, রমযানে রোযা রাখি...

এ সকল আদেশ-নিষেধকে আমরা সত্য বলে মেনে নিয়েছি। আল্লাহর রাসূল হিসাবে তাঁকে বিশ্বাস করে তাঁর প্রতি ঈমান এনেছি। আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর নিয়ে আসা সকল বিধানকে বাস্তব জীবনে অনুসরণ করেছি। আমরা সেটাকেই হালাল হিসাবে মানি যাকে তিনি হালাল বলেন আর তিনি হারাম বললে আমরা সবাই সেটাকে হারাম হিসাবে মানি।

মহামান্য বাদশা! আমাদের শুধুমাত্র ঐ ইতিবাচক পরিবর্তনের কারণে কুরাইশী নেতারা ও জনসাধারণ শুরু করে চরম বাড়াবাড়ি। আমাদের ওপর চালাতে থাকে ভীষণ অমানুষিক নির্যাতন ও নিপীড়ন। যেন তাদের নির্যাতনে অতিষ্ট হয়ে আমরা সত্য ধর্ম ছেড়ে আবার দেব-দেবী ও মূর্তিপূজার শিরকে লিপ্ত হয়ে যাই।

তাদের অবর্ণনীয় জুলুম-অত্যাচারে আমাদের জীবন যখন দুর্বিসহ হয়ে পড়ল, আমাদের পৃথিবী সংকুচিত হয়ে গেল, আমাদের ধর্ম-কর্মে ও

ইবাদত পালনে নানাভাবে বাধার সৃষ্টি করা হলো, তখন আমরা নিরূপায় হয়ে আপনার দেশে হিজরত করি। অন্য কোনো রাজা-বাদশার চেয়ে আমরা আপনাকেই বেশি পছন্দ করি। আমাদের আশা এই যে, আপনার দেশে আমাদের ওপর কেউ জুলুম করতে পারবে না।'

* * *

উম্মে সালামা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন,

'এরপর বাদশা নাজাশী জাফর ইবনে আবী তালেব রাযিয়াল্লাহু আনহুকে জিজ্ঞাসা করলেন,

আল্লাহর পক্ষ থেকে যে বাণী আপনাদের নবী নিয়ে এসেছেন, তার কোনো অংশ কি শোনাতে পারবেন?

তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, শোনাতে পারব।'

বাদশা বললেন, 'আমাকে একটু পড়ে শোনান।'

এরপর তিনি সূরা মারয়াম শুরু থেকে পড়লেন,

كٓهٰيٰعٓصٓ ﴿١﴾ ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهٗ زَكَرِيَّا ﴿٢﴾ اِذْ نَادٰى رَبَّهٗ نِدَآءً خَفِيًّا ﴿٣﴾ قَالَ رَبِّ اِنِّیْ وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّیْ وَ اشْتَعَلَ الرَّاْسُ شَيْبًا وَّلَمْ اَكُنْۢ بِدُعَآئِكَ رَبِّ شَقِيًّا ﴿٤﴾

'কাফ, হা, ইয়া, আইন, সোয়াদ। এটা তোমার প্রতিপালকের দয়ার বিবরণ তাঁর বান্দা যাকারিয়ার প্রতি। যখন সে তার প্রতিপালকের কাছে দুআ করেছিল নির্জনে। সে বলেছিল আমার হাড্ডি দুর্বল হয়ে গেছে, বার্ধক্যের কারণে (আমার) মাথা (র চুল) শুভ্রোজ্জল হয়ে গেছে। হে আমার প্রতিপালক! তোমার কাছে দুআ-প্রার্থনা করে আমি কখনো মাহরূম হইনি।' –সূরা মারয়াম ১-৪

উম্মে সালামা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহা বলেন,

‘কুরআনের এই আয়াতগুলো শুনে বাদশা নাজাশী খুবই আবেগাপ্লুত হয়ে এত বেশি কাঁদলেন যে, চোখের পানিতে তার দাড়ি ভিজে গেল। তাঁর কান্না দেখে পাদ্রীরাও একইভাবে কাঁদতে লাগলেন। এমনকি তাদের কান্নার কারণে ধর্মগ্রন্থগুলোও ভিজে গেল।

এরপর বাদশা নাজাশী নিজেকে একটু স্বাভাবিক করে নিয়ে বললেন,

‘নিশ্চয় আপনাদের নবী মুহাম্মাদের [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] নিয়ে আসা এই বাণী এবং আমাদের নবী ঈসা আলাইহিস সালামের নিয়ে আসা বাণী একই উৎস থেকে উৎসরিত।’

এরপর কুরাইশের দুই দূতকে সরাসরি বললেন,

‘তোমরা চলে যাও। আল্লাহর কসম! আমি কখনোই তাদেরকে তোমাদের হাতে তুলে দেব না।’

* * *

উম্মে সালামা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন,

‘আমরা বাদশার দরবার থেকে যখন বের হচ্ছিলাম আমর ইবনুল আস তখন আমাদের শাসাচ্ছিল এবং আমাদের শুনিয়ে শুনিয়ে আবদুল্লাহ ইবনে আবী রাবীআকে বলছিল, ‘আল্লাহর কসম! আমি আবার আগামীকাল বাদশার কাছে আসব এবং তাকে এমন কিছু কথা শোনাব যাতে এদের প্রতি রাগে ও ক্ষোভে তার অন্তর বিষিয়ে ওঠে। এমন তথ্য দেব যা শুনে তার হৃদয় এদের প্রতি ঘৃণায় জ্বলে ওঠে। আমি এমনভাবে তাকে উসকে দেব যেন তিনি এদেরকে দেশছাড়া করতে তৈরি হয়ে যান।’

এমন ভয়ঙ্কর কথা শুনে আবদুল্লাহ ইবনে আবী রাবীআ তাকে নিবৃত্ত করার জন্য বলল,

‘দেখো আমর! নতুন করে আর কিছু করতে যেয়ো না। যত কিছুই হোক এরা তো আমাদেরই স্বজন।’

কিন্তু এ কথায় আমরের কোনো ভাবান্তর হলো না বরং উল্টো আবদুল্লাহকে তিরস্কার করে বলল,

'আরে বাদ দাও তো তোমার ওসব কুটুমতালির কথা। আল্লাহর কসম! বাদশাকে এমন সংবাদ দেব যে ওদের পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাবে। আল্লাহর কসম! আমি অবশ্যই বাদশাকে বলব যে এরা ঈসা ইবনে মারয়ামকে আল্লাহর দাস ও গোলাম দাবি করে।'

* * *

পরের দিন আমর ইবনুল আস নাজাশী বাদশার দরবারে সাক্ষাৎ করে বলল,

'মাননীয় বাদশা! যাদের আপনি আশ্রয় দিয়েছেন এবং যাদের নিরাপত্তা প্রদানের ওয়াদাও করেছেন, তারা ঈসা সম্পর্কে খুবই জঘন্য মন্তব্য করে থাকে। প্রয়োজন হলে ওদেরকে ডেকে জিজ্ঞাসা করে দেখুন যে ঈসা সম্পর্কে তাদের বিশ্বাস কী?'

উম্মে সালামা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন,

'এই চক্রান্তের কথা শুনে আমরা ভীষণ চিন্তিত ও বিচলিত হয়ে পড়লাম। আমরা পরস্পর বলাবলি করতে লাগলাম,

'বাদশা ঈসা ইবনে মারয়াম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে আমরা কী জবাব দেব?'

সর্বসম্মতিতে সিদ্ধান্ত হলো, আমরা ঈসা আলাইহিস সালাম সম্পর্কে সে কথাই বলব যা আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেছেন এবং আমাদের নবী যে শিক্ষা আমাদের দান করেছেন। আমরা আল্লাহর বাণী এবং রাসূলের ঐ শিক্ষা থেকে এক চুল পরিমাণও নড়ব না—তাতে যা হয় হোক।

আমাদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে এটাও স্থির হলো, আজও আমাদের মুখপাত্র হিসাবে কথা বলবেন জাফর ইবনে আবী তালেব।

নাজাশী বাদশার ডাক পেয়ে রাজ দরবারে গিয়ে আমরা দেখলাম তাঁর উপদেষ্টা পাদ্রীগণ আজও একই রকম দামী সবুজ আবা (গাউন) ও টুপি পরে এবং সামনে ধর্মগ্রন্থ খুলে বসে আছেন। যেমনটি আগের দিন আমরা তাদের দেখেছিলাম।

একইভাবে আমর ইবনুল আস এবং আবদুল্লাহ ইবনে আবী রাবীআকেও বাদশার দরবারে উপস্থিত দেখলাম।

আমরা সকলে বাদশার সামনে হাজির হওয়ার পর তিনি সরাসরি আমাদের জিজ্ঞাসা করলেন,

'ঈসা ইবনে মারয়াম সম্পর্কে আপনারা কী বিশ্বাস পোষণ করেন?'

জাফর ইবনে আবী তালেব রাযিয়াল্লাহু আনহু এর জবাবে বললেন,
'তাঁর সম্পর্কে আমাদের নবী যা বলেন, সেটাই আমাদের বিশ্বাস।'

নাজাশী আবার জিজ্ঞাসা করলেন, 'তিনি কী বলেন ঈসা ইবনে মারয়াম সম্পর্কে?'

জাফর রাযিয়াল্লাহু আনহু জবাব দিলেন,
'আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, নিশ্চয় ঈসা আলাইহিস সালাম আল্লাহ তাআলার বান্দা ও তাঁর রাসূল। তিনি আল্লাহ প্রেরিত রূহ ও কালেমা (পবিত্র বাক্য), যা নিষ্পাপ কুমারী মাতা মারয়াম আলাইহাস সালামের গর্ভে নিক্ষেপ করেন।'

বাদশা নাজাশী জাফরের মুখে ঈসা ইবনে মারয়াম সম্পর্কে তাদের বিশ্বাসের কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে জোরে চাপড় মেরে বলে উঠলেন,

'আল্লাহর কসম! ঈসা সম্পর্কে আপনাদের নবী যা বলেছেন, বাস্তবে ঈসা তার চেয়ে এক চুল পরিমাণও এদিক-সেদিক ছিলেন না।'

বাদশার এই উক্তি শুনে তার দু'পাশ থেকে পাদ্রীরা নিন্দাস্বরূপ নাক সিঁটকাতে থাকলে তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন,

'আপনাদের কাছে যতই অপ্রিয় বোধ হোক না কেন, বাস্তব সত্য এটাই যে ঈসা ইবনে মারয়াম ছিলেন আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। তিনি কখনোই আল্লাহর পুত্র নন।'

এরপর তিনি মুহাজির মুমিনদের উদ্দেশ্যে বললেন,
'আপনারা নিশ্চিন্তে, নিরাপদে এই দেশে থাকুন।

মনে রাখবেন, আপনাদের বিরুদ্ধে কোনো কটুকথা, তিরস্কার ও গালাগালি করা হলে সেটাকে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে। আর আপনাদের কোনো কাজে বা ইবাদত-বন্দেগীতে বাধা দেওয়া হলে সেটাকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে গণ্য করা হবে। আল্লাহর কসম! কেউ আপনাদের কোনোরূপ কষ্ট দিলে আমি সেটা বরদাশ্‌ত করব না। এমনকি আমাকে পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ উপহার দিলেও।'

এরপর তিনি আমর ইবনুল আস ও আবদুল্লাহ ইবনে আবী রাবীআকে দেখিয়ে হুকুম দিলেন যে,

'এদের সকল উপহার সামগ্রী ফেরৎ দিয়ে দাও। ওগুলোর কোনো প্রয়োজন আমার নেই।'

উম্মে সালামা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন,
'এরপর কুরাইশী দুই দূত আমর ও আবদুল্লাহ পরাজয়ের গ্লানি মাথায় নিয়ে বিধ্বস্ত ও পরাজিত হয়ে সেখান থেকে বের হয়ে গেল আর আমরা নাজাশীর আশ্রয়ে সবোর্ত্তম নিরাপত্তা ও সুখে-শান্তিতে বসবাস করতে থাকলাম।'

* * *

জাফর ইবনে আবী তালেব রাযিয়াল্লাহু আনহু স্বপরিবারে মহানুভব বাদশা নাজাশীর নিরাপদ আশ্রয়ে একাধারে দশ বছর নিশ্চিন্তে কাটিয়ে দিলেন।

হিজরতের সপ্তম বর্ষে তিনি একদল মুসলিমকে সঙ্গে নিয়ে হাবশা ছেড়ে মদীনার উদ্দেশ্যে রওনা করলেন। যখন তারা মদীনায় পৌঁছলেন,

তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খায়বার বিজয় শেষে মাত্র মদীনায় ফিরে এসেছেন।

জাফরকে দেখে তিনি খুবই খুশি হয়ে বললেন,

مَا أَدْرِيْ بِأَيِّهِمَا أَشَدُّ فَرَحًا !! أَبِفَتْحِ خَيْبَرَ أَمْ بِقُدُوْمِ جَعْفَرَ؟

'জানি না আমি কিসে বেশি খুশি? খায়বার বিজয়ের আনন্দে নাকি জাফরের আগমনে।'

জাফর ইবনে আবী তালেব রাযিয়াল্লাহু আনহুর মদীনায় আগমনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনন্দের চেয়ে সর্বসাধারণ মুসলিম বিশেষত অসহায় দরিদ্র মুসলিমদের আনন্দ কোনো অংশে কম ছিল না।

কারণ, জাফর রাযিয়াল্লাহু আনহু দুর্বল-অসহায় মুসলিমদের প্রতি ছিলেন খুব বেশি সদয়। তাদের এত বেশি খোঁজ-খবর রাখতেন যে, তাকে উপাধী দেওয়া হয়েছিল 'আবুল মিসকীন' বা গরীবের বন্ধু বলে।

আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু জাফর ইবনে আবী তালেব রাযিয়াল্লাহু আনহুর অসহায় গরিবদের প্রতি সদয় মনোভাবের বর্ণনা দিয়ে বলেন,

'আমরা যারা অসহায়-দরিদ্র, জাফর ইবনে আবী তালেব তাদের সর্বাধিক সদয় ও উত্তম বন্ধু। তিনি আমাদের নিজের বাড়িতে নিয়ে যেতেন। বাড়িতে যা থাকত তাই আমাদের খাওয়াতেন। এমনকি দেওয়ার মতো কিছু না থাকলেও তিনি আমাদের ঘিয়ের ছোট ছোট পাত্র এনে দিতেন। পাত্রগুলোর গায়ে লেগে থাকা ঘি আমরা চেটে চেটে খেতাম।'

* * *

মদীনাতে জাফর ইবনে আবী তালেব রাযিয়াল্লাহু আনহুর অবস্থান বেশি দীর্ঘ হয়নি।

কারণ অষ্টম হিজরীর প্রথম দিকে শামদেশের সীমান্তে সমবেত বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি বাহিনী তৈরি করে যায়েদ ইবনে হারেসাকে সেনাপতি মনোনীত করে ঘোষণা করেন,

'যায়েদ যদি শহীদ হয়ে যায় অথবা আহত হয়, তাহলে সেনাপতি হবে জাফর ইবনে আবী তালেব। জাফর শহীদ হলে অথবা আহত হলে সেনাপতি হবে আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা। যদি আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা শহীদ হয়ে যায় অথবা আহত হয় তাহলে মুজাহিদবাহিনী তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্তে সেনাপতি মনোনীত করে নেবে।'

ইসলামী সেনাদল জর্ডানের পাদদেশে অবস্থিত 'মূতা' অঞ্চলে পৌঁছে দেখতে পেল, রোমসম্রাট মুসলিম-মুজাহিদবাহিনীর মুকাবেলার জন্য এক লক্ষ স্বশস্ত্র সৈন্য মোতায়েন করেছে। উপরন্তু লাখাম, জাযাম ও কুযাআ প্রভৃতি গোত্রের খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের আরও এক লাখ সৈন্য তাদের সাহায্য করার জন্য প্রস্তুত রয়েছে।

অন্যদিকে মুসলিমসৈনিকদের সংখ্যা সর্বসাকুল্যে তিন হাজার।

অসম এই দুটো দল যুদ্ধের ময়দানে মুখোমুখি দাঁড়াল। শুরু হলো ইতিহাসের ভয়াবহ যুদ্ধ। সেনাপতি যায়েদ ইবনে হারেসা বীরবিক্রমে যুদ্ধ পরিচালনা করতে করতে এক সময় শত্রুদের আক্রমণে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে শহীদ হয়ে গেলেন।

যায়েদের শাহাদাতের দৃশ্য দেখার পর নির্ধারিত দ্বিতীয় সেনাপতি জাফর ইবনে আবী তালেব সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়ার পিঠ থেকে লাফিয়ে পড়লেন এবং নিজের তরবারি দিয়ে সুন্দর সুঠামদেহী ঘোড়াটির সামনের দু'পা কেটে দিলেন। যেন শত্রুরা কেউ এটাকে কোনো কাজে লাগাতে না পারে।

তিনি মুসলিম সেনাদলের পতাকা নিজের নিয়ন্ত্রণে নিলেন। জান্নাতের কথা স্মরণ করে কবিতা আবৃত্তি করতে করতে শত্রুবাহিনীর একেবারে ভেতরে ঢুকে যেতে লাগলেন।

يَا حَبَّذَا الْجَنَّةُ وَاقْتِرَابُهَا – طَيِّبَةٌ وَبَارِدٌ شَرَابُهَا
وَالرُّوْمُ رُوْمٌ قَدْ دَنَا عَذَابُهَا – كَافِرَةٌ بَعِيْدَةٌ أَنْسَابُهَا
عَلَيَّ إِذْ لَاقَيْتُهَا ضِرَابُهَا

'জান্নাত, কতই না সুখের ঠিকানা! জান্নাত আজ আমার কতই না কাছে! আমাকে বারবার হাতছানি দিয়ে ডাকছে। সেখানের ঠাণ্ডা, সুমিষ্ট পানি দিয়ে মেটাব আজ আমার তৃষ্ণা।

রোমানবাহিনী ওরাতো কামনা-বাসনার গোলাম, জাহান্নামের কিট। ওরা আল্লাহকে অস্বীকারকারী—কাফের, আল্লাহর জমিনে ওরা আগাছা। ওদের যাকেই সামনে পাব কচুকাটা করে আগাছা পরিষ্কার করব।'

তিনি শত্রুবাহিনীর সারিতে ঢুকে তরবারির আঘাতে শত্রুসৈন্যদের কচুকাটা করতে করতে নির্ভিকভাবে সামনে অগ্রসর হতে থাকেন। এক সময় হঠাৎ দুশমনের প্রচণ্ড এক আঘাতে তাঁর ডানহাত দেহ থেকে আলাদা হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে তিনি বাম হাত দিয়ে পতাকা ধরে ফেললেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই আরেকটি প্রচণ্ড আঘাতে বাম হাতটিও শরীর থেকে পৃথক হয়ে গেল। তখন তিনি কাটা দুই হাতের বাকি অংশ দিয়ে পতাকাটিকে বুকের সঙ্গে আঁকড়ে ধরে রাখলেন। এরপর আরেকটি প্রচণ্ড আক্রমণে তাঁর শরীর দু'টুকরো হয়ে গেল। পরবর্তী সেনাপতি আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা ছুটে এসে তাঁর থেকে পতাকা গ্রহণ করলেন। তিনিও পূর্বের দু'জনের মতোই বীরবিক্রমে লড়তে লড়তে শহীদ হয়ে গেলেন।

* * *

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে তাঁর তিন সেনাপতির শহীদ হয়ে যাওয়ার সংবাদ পৌছলে তিনি ভীষণ দুঃখে ভারাক্রান্ত হয়ে পড়লেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁর চাচাত ভাই জাফর ইবনে আবী তালেব রাযিয়াল্লাহু আনহুর বাড়ির দিকে রওনা করলেন। তার

বাড়িতে পৌঁছার পর দেখলেন তার স্ত্রী আসমা অনুপস্থিত স্বামী জাফরকে অভ্যর্থনা জানানোর প্রস্তুতি নিচ্ছেন। রুটি বানানোর জন্য আটার খামিরা তৈরি করেছেন। বাচ্চাদের গোসল করিয়ে তেল মেখে ভালো পোশাক পরিয়ে দিয়েছেন।

* * *

আসমা বিনতে উমাইস রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন,

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের বাড়িতে তাশরীফ আনলে দেখতে পেলাম শোকের কালো ছায়া তাঁর চেহারা মুবারক ঢেকে রেখেছে। আমার মনের মধ্যে ভয় ও আশঙ্কা ছড়িয়ে পড়ল। কিন্তু আমি তাকে জাফরের কথা কিছুই জিজ্ঞাসা করলাম না এই ভয়ে যে, হয়তো অনাকাঙ্ক্ষিত কোনো সংবাদ শোনা লাগতে পারে।'

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাম দিয়ে বললেন,

'জাফরের বাচ্চাদের আমার কাছে ডেকে নিয়ে এসো। আমি ওদের ডেকে আনলাম, ওরা হুড়মুড় করে খুশিতে রাসূলের নিকট ছুটে এল। কার আগে কে রাসূলের কোলে উঠবে এই নিয়ে তাদের মধ্যে ঠেলাঠেলি শুরু হয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সবাইকে জড়িয়ে ধরে মায়াভরা দৃষ্টিকে তাদের দিকে তাকালেন। মাথা নিচু করে তাদের ঘ্রাণ নিতে থাকলেন আর দু'চোখ থেকে তাঁর টপটপ করে অশ্রু গড়াতে লাগল।' আমি বললাম,

'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার মাতা-পিতা আপনার জন্য উৎসর্গীত। আপনি কাঁদছেন কেন? জাফর এবং তার দুই সঙ্গীর ব্যাপারে কি কোনো দুঃসংবাদ পেয়েছেন?

তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, তারা সকলেই আজ শহীদ হয়ে গেছে।'

শিশু বাচ্চারা যখন দেখল তাদের মা কান্নায় ভেঙে পড়েছেন, তখন তাদের নিষ্পাপ চেহারা থেকে সকল হাসি-আনন্দ নিভে গেল। বজ্রাহতের মতো তারা একেবারে নিথর ও নিশ্চল পাথর হয়ে পড়ল। আর রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অশ্রু মুছতে মুছতে সেখান থেকে বিদায় হলেন। কান্নাভেজা কণ্ঠে তিনি দুআ করছিলেন,

اَللّٰهُمَّ اخْلُفْ جَعْفَرًا فِىْ وَلَدِه ..... اَللّٰهُمَّ اخْلُفْ جَعْفَرًا فِىْ أَهْلِه

'হে আল্লাহ! তুমিই জাফরের সন্তানদের দায়িত্ব গ্রহণ করো, ইয়া আল্লাহ! তুমিই জাফরের পরিবারকে হেফাজতের দায়িত্ব গ্রহণ করো।'

দুআ করার পর তিনি বললেন,

'জাফরকে আমি জান্নাতে দেখেছি, পাখির মতো দু'টি পাখায় ভর করে উড়ে বেড়াচ্ছে। তবে তার পাখা ও পালকগুলো ছিল তাজা রক্তে ভেজা।'

তথ্যসূত্র :

১. ইবনে হিশাম রচিত *আস-সীরাতুন্নবাবিয়্যাহ*, ১ম খণ্ড, ৩৫৭ পৃষ্ঠা, ৪র্থ খণ্ড, ৩ ও ২০ পৃষ্ঠা
২. আবদুল বার রচিত *আদ্-দুরার ফী ইখতেছারিল মাগাযী ওয়াস-সিয়ার*, ৫০ ও ২২২ পৃষ্ঠা।
৩. *হুলইয়াতুল আউলিয়া*, ১ম খণ্ড ১১৪ পৃষ্ঠা।
৪. *তাবাকাতে ইবনে সাআদ*, ৪র্থ খণ্ড, ২২ পৃষ্ঠা।
৫. *মুজামুল বুলদান*, বিষয় 'মূতার' যুদ্ধ।
৬. *তাহযীবুত তাহযীব*, ২য় খণ্ড, ৯৮ পৃষ্ঠা।
৭. *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৪র্থ খণ্ড, ২৪১ পৃষ্ঠা।
৮. *আল-ইসাবা*, ১ম খণ্ড, ২৩৭ পৃষ্ঠা অথবা *আত্তারজামা*, ১১৬৬।
৯. *সিফাতুস্ সফওয়া*, ১ম খণ্ড, ২০৫ পৃষ্ঠা।
১০. *হায়াতুস সাহাবা*, সূচি দ্রষ্টব্য।
১১. ইবনে আসীর রচিত *আল-কামিল*, ২য় খণ্ড, ৩০ ও ৯৬ পৃষ্ঠা।
১২. *আল-ইসতীআব* (*আল-ইসাবা* গ্রন্থের টীকা) ১ম খণ্ড, ২১০ পৃষ্ঠা।

আবু সুফিয়ান ইবনুল হারিস

আমি আবু সুফিয়ানের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে গেলাম। আজ পর্যন্ত তার সকল শত্রুতা ও বিরোধিতাকে আল্লাহ তাআলা ক্ষমা করে দিয়েছেন। সে হবে জান্নাতের যুবকদের সরদার।

—মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং আবু সুফিয়ান ইবনুল হারিস—এই দু'জনের মাঝে যেমন নানারকম সম্পর্কের যোগসূত্র, (অর্থাৎ একই সঙ্গে আত্মীয়তা, বন্ধুত্ব ও সমবয়স্কতা ইত্যাদি) একই সঙ্গে এতগুলো সম্পর্ক ও বন্ধনের যোগসূত্র আর কোনো দু'জনের মধ্যে খুবই কম দেখা যায়।

কারণ, আবু সুফিয়ান রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সমবয়সী। খুব কাছাকাছি সময়ে তাঁদের জন্ম এবং একই পরিবারে হয়েছিল তাদের লালন-পালন।

তিনি ছিলেন রাসূলের আপন চাচাত ভাই। তার পিতা হারিস এবং রাসূলের পিতা আবদুল্লাহ সহোদর ভাই। তারা উভয়েই আবদুল মুত্তালিবের ঔরষের সন্তান।

এছাড়াও আবু সুফিয়ান ছিলেন রাসূলের দুধভাই। হালীমা সাদিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহা তাদের দু'জনকেই স্তন্য দান করেছেন।

এইসব কিছুর পরও তিনি ছিলেন নবুওয়াতের পূর্বে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্তরঙ্গ বন্ধু আর এই দুই বন্ধুর চেহারাও ছিল প্রায় একই রকম।

* * *

প্রিয় পাঠক! মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং আবু সুফিয়ান ইবনুল হারিসের মাঝে বিদ্যমান এই যে নানামুখী সম্পর্কের যোগসূত্র, এরচেয়েও গভীর ও মজবুত কোনো সম্পর্ক কি আপনি দেখেছেন? এরচেয়েও বেশি কোনো দৃঢ় বন্ধন বা গভীর ভালোবাসার কথা কি আপনি শুনেছেন?

এই এতগুলো সম্পর্ক ও বন্ধনের যোগসূত্রের কারণেই আবু সুফিয়ানের বিষয়ে সাধারণ অনুমান এমনই ছিল যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাওয়াত কবুলে এবং তাঁর অনুসরণে সকলের চেয়ে তিনিই থাকবেন এগিয়ে।

কিন্তু বাস্তবে ঘটতে দেখা গেল সকল আশা ও অনুমানের একেবারেই উল্টো ঘটনা।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়সাল্লাম যখনই প্রকাশ্যে ইসলামের দাওয়াত দেওয়া শুরু করলেন, কাছের আত্মীয়দের সতর্ক করতে আরম্ভ করলেন সঙ্গে সঙ্গে রাসূলের বিরুদ্ধে আবু সুফিয়ানের অন্তরে হিংসা ও বিদ্বেষের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল।

দীর্ঘদিনের বন্ধুত্ব পরিণত হলো চরম শত্রুতায়...

আত্মীয়তা রূপ নিল বিচ্ছিন্নতায়...

ভ্রাতৃত্ব রূপান্তরিত হলো প্রতিরোধ আর প্রতিবন্ধকতায়...

* * *

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সময় প্রকাশ্যে ইসলামের দাওয়াত প্রদান শুরু করেন সেই সময় আবু সুফিয়ান ছিলেন কুরাইশের বিখ্যাত অশ্বারোহী যোদ্ধা এবং তাদের প্রখ্যাত ও সেরা কবি।

তিনি অস্ত্র ও কাব্য দুটো শক্তিকেই কাজে লাগালেন রাসূলের বিরোধিতায় আর তাঁর দাওয়াতের প্রতিরোধে।

কুরাইশের লোকেরা রাসূলের বিরুদ্ধে কোনো যুদ্ধে নামলে আবু সুফিয়ান হতেন তার ইন্ধনদাতা।

আবার তারা মুসলিমদের ওপর কোনো নির্যাতন চালালেও আবু সুফিয়ানই হতেন তাদের উস্কানিদাতা।

* * *

আবু সুফিয়ান তার কাব্য প্রতিভা কাজে লাগিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে ব্যাপক নিন্দা কবিতা রচনা করতে থাকলেন। রাসূলের বিরুদ্ধে নানারকমের আজে-বাজে কথা, অশ্লীল ও বেদনাদায়ক বক্তব্য শানিত কবিতার মাধ্যমে প্রচার করতে থাকলেন।

* * *

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে আবু সুফিয়ানের শত্রুতা আর বিরোধিতা চলতেই থাকল একাধারে কুড়ি বছর পর্যন্ত। এই দীর্ঘ সময়ে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে এমন কোনো ষড়যন্ত্র নেই যা তিনি করেননি। এমন কোনো নির্যাতন নেই যা তিনি চালাননি। এভাবেই তিনি পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষভাবে রাসূল ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত-ষড়যন্ত্র আর নির্যাতন চালিয়ে একের পর এক পাপের বোঝা ভারী করে তোলেন।

* * *

অবশেষে মক্কা বিজয়ের অল্প কয়েকদিন পূর্বে আবু সুফিয়ানের কপালে জুটল ইসলাম কবুলের সৌভাগ্য। জীবনী আর ইতিহাস গ্রন্থগুলোতে রয়েছে তার সেই ইসলাম কবুলের চমৎকার কাহিনী।

চলুন আবু সুফিয়ান ইবনুল হারিস রাযিয়াল্লাহু আনহুর জবানীতেই শোনা যাক তাঁর নিজের ইসলাম গ্রহণের কাহিনী...

নিজের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ এই কাহিনী বর্ণনায় তাঁর অনুভূতিই হবে সবচেয়ে গভীর। তাঁর প্রকাশভঙ্গিই হবে সবচেয়ে নিখুঁত ও নির্ভুল।

আবু সুফিয়ান রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

'ইসলামী রাষ্ট্র যখন মজবুত ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে গেল এবং ইসলাম ধর্মের নিশ্চিত বিজয় দেখে দলে দলে মানুষ ইসলামে প্রবেশ করতে থাকল। শিগগিরই মক্কা বিজয়ের উদ্দেশ্যে রাসূলের অভিযানের খবর যখন সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল তখন এই বিশাল জগতটা আমার জন্য খুবই ছোট হয়ে গেল। ছোট্ট সেই জগতে আমার যাওয়ার কোনো স্থান নেই, কোনো সাহায্যকারী নেই, কোনো সঙ্গী নেই। আমি মনে মনে ভাবলাম—আজ আমি কোথায় যাব? কার কাছে যাব? কার সাহায্য নেব।'

নিরূপায় আমি স্ত্রী আর সন্তানদের কাছে এসে বললাম,

'মক্কা থেকে আমাদের পালাতে হবে। তোমরা তৈরি হয়ে যাও। যেকোনো সময় মুহাম্মাদ এসে পড়বে। মুসলিমরা আমাকে ধরতে পারলে নিঃসন্দেহে মেরে ফেলবে।'

আমার এইসব হতাশাপূর্ণ কথা শুনে তারা আমাকে তিরস্কার করে বলল,

'এখনো কি বাস্তবতা অনুধাবন করে সত্যটা দেখার ও বোঝার সময় আপনার হয়নি? এখনো কি আপনার চোখে পড়ছে না, আরব-আনারব তথা গোটা জগৎ এখন মুহাম্মাদের অনুগত হয়ে পড়েছে। সবাই এখন তাঁর কথা মেনে চলছে। দলে দলে মানুষ তাঁর ধর্ম কবুল করে নিচ্ছে।

তাঁর ইসলামী রাষ্ট্র মজবুত ভিত্তির ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে পড়েছে অথচ আপনি এখনো তাঁর বিরোধিতা করেই যাচ্ছেন। তাঁর সাহায্য-সহযোগিতায়, তাঁর সমর্থনে আপনারই কি অগ্রণী ভূমিকায় থাকার কথা ছিল না?'

'এভাবেই তারা আমাকে মুহাম্মাদের ধর্ম কবুল করে নেওয়ার জন্য উৎসাহিত করতে থাকল। অবশেষে আল্লাহ তাআলা আমার অন্তরে বুঝ পয়দা করে দিলেন। আমার হৃদয়ের বন্ধ দুয়ার ইসলাম কবুলের জন্য উন্মুক্ত করে দিলেন।'

* * *

'আমি সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালাম। আমার গোলাম মাযকুরকে একটি উট ও একটি ঘোড়া প্রস্তুত করতে বললাম। আমি খবর পেয়েছিলাম, মুহাম্মাদ মক্কার উদ্দেশ্যে মদীনা থেকে রওনা হয়ে 'আবওয়া'তে প্রথম যাত্রা বিরতি করেছেন। সেই খবরের আলোকে আমি আমার ছেলে জাফরকে সঙ্গে নিয়ে আবওয়া-র উদ্দেশ্যে অবিরাম চলতে থাকলাম।'

আবওয়া-র নিকটবর্তী হওয়ার পর আমার চেহারা ঢেকে নিলাম—যেন কেউ আমাকে চিনতে না পারে এবং রাসূলের কাছে গিয়ে ইসলাম কবুল করার পূর্বেই যেন নিহত না হই।

'প্রায় এক মাইল পূর্ব থেকেই আমি পায়ে হেঁটে চলতে শুরু করলাম। মুসলিমদের অগ্রবর্তী দল একটার পর একটা মক্কার উদ্দেশ্যে এগিয়ে যাচ্ছে। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোনো সাহাবী আমাকে চিনে ফেলার ভয়ে আমি তাদের রাস্তা থেকে দূরে দূরে সরে থাকছিলাম।'

* * *

'এভাবে যেতে যেতে হঠাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যাত্রীদলের মিছিলের মধ্যে দেখে আমি তাঁর কাছে এগিয়ে

গেলাম। তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে আমার চেহারা থেকে পর্দা সরিয়ে দিলাম। তিনি গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে আমাকে চিনতে পেরে অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। আমি ঘুরে সেদিকেই চলে গেলাম। তিনি বিরক্তি নিয়ে আবারও আমার দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। আমি আবারও সেদিকে চলে গেলাম। তিনি বেশ কয়েকবার একই রকম করলেন।'

* * *

রাসূলের কাছে ইসলাম গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়ে বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় আমি নিশ্চিত ছিলাম, আমার ইসলাম গ্রহণে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুশি হবেন আর তাঁর খুশি দেখে সাহাবীরাও খুশি হবেন।

কিন্তু মুসলিমরা আমার দিক থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মুখ ফিরিয়ে নিতে দেখে আমার থেকে তারাও মুখ ফিরিয়ে নিল এবং সকলেই আমাকে উপেক্ষা করতে থাকল।

আবু বকরকে সামনে পেলাম কিন্তু সে ভীষণভাবে আমাকে উপেক্ষা করে চলে গেল। উমর ইবনুল খাত্তাবের দিকে সকরুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে তার হৃদয়ে কিছুটা কোমলতা জাগাতে চাইলাম। কিন্তু দেখলাম সে আমাকে আবু বকরের চেয়ে বেশি উপেক্ষা করল। উমর শুধু আমাকে উপেক্ষাই করল না বরং আমার বিরুদ্ধে একজন আনসারীকে উস্কে দিল। আনসারী লোকটি আমার কাছে এসে বলল,

'হে আল্লাহর দুশমন! তুমিই তো আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীদের ওপর নির্যাতন চালাতে। তুমিই তো আল্লাহর রাসূলের বিরুদ্ধে দুশমনি করতে। এমনকি দুশমনির কোনো সুযোগই তুমি হাতছাড়া করোনি।'

আনসারী লোকটি চিৎকার করে আমাকে রাগারাগি ও গালাগালি করতে থাকল—যা শুনে অন্য মুসলিমরাও রাগি রাগি চোখে আমাকে

বিদ্ধ করতে থাকল। তারা আজ ইসলামের দুর্বিনীত এই দুশমনের দুর্দশা দেখে বেশ খুশিও হলো।

এমন সময়ে আমার চাচা আব্বাসকে দেখে এগিয়ে গেলাম। তার আশ্রয় নিয়ে তার কাছে করুণ সুরে নিবেদন করলাম,

'চাচাগো! আমি আশা করে এসেছিলাম, রাসূলুল্লাহ তাঁর ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ও কুরাইশের নেতা হিসাবে আমার ইসলাম গ্রহণে খুশি হবেন। অথচ এখানে এসে দেখছি তিনি আমার প্রতি কতটা বিরক্ত। আমার প্রতি তাঁর উপেক্ষার বিষয়টি আপনি ভালোভাবেই জানেন। দয়া করে আপনি একটু সুপারিশ করুন যেন তিনি আমাকে ক্ষমা করে দেন এবং আমার প্রতি স্বাভাবিক হয়ে যান।'

আমার করুণ মিনতি শুনে চাচাও সোজা-সাপটা বলে দিলেন,

'আল্লাহর কসম! তোমার প্রতি তাঁর যে পরিমাণ বিরক্তি ও উপেক্ষা আমি দেখেছি, এরপর তোমার সম্পর্কে তাঁকে একটি কথাও আমি বলতে পারব না। তবে তোমাকে কথা দিচ্ছি, যদি তেমন কোনো সুযোগ পেয়ে যাই তাহলে সেই সুযোগ কাজে লাগিয়ে আমি বলব তোমার কথা। এখন কিছু বলতে পারব না। কারণ, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শ্রদ্ধাও করি আবার ভয়ও পাই, তাঁর মতের বিরুদ্ধে আমি কোনো কথা বলতে পারব না।'

আমি বললাম, 'চাচা আমাকে তাহলে কার কাছে যেতে বলছেন?'

তিনি জবাব দিলেন, 'আমি যা বলছি, তার বাইরে আর কিছু বলার নেই।'

আমাকে ভীষণ চিন্তা ও বিষণ্নতা ঘিরে ধরল। কি করব, কোথায় যাব কিছুই বুঝতে পারছি না। এরই মধ্যে আমার চাচাত ভাই আলী ইবনে আবী তালেবকে দেখতে পেয়ে তার কাছে গিয়ে বললাম আমার জন্য একটু সুপারিশ করতে। সেও চাচা আব্বাসের মতো একই রকম জবাব দিল। যাতে আমার চিন্তা একটুও কমল না।

তখন আমি আবার চাচা আব্বাসের কাছে গিয়ে বললাম,

'চাচাগো! আমার প্রতি রাসূলকে একটু করুণা করার কথা যদি বলতে না পারেন অন্তত ঐ লোকটির হাত থেকে আমাকে বাঁচানোর ব্যবস্থা করুন যে আমাকে গালাগালি করছে এবং অন্যদেরও গালাগালি করতে উস্কানি দিচ্ছে।'

তিনি বললেন, 'লোকটি দেখতে কেমন? তার দৈহিক গঠনের একটু বর্ণনা দাও। আমার বর্ণনা শুনে তিনি চিনতে পেরে বললেন, সেতো হলো নুআইমান ইবনে হারেস নাজ্জারী।' তাকে লোক পাঠিয়ে ডেকে এনে বললেন,

'হে নুআইমান! আবু সুফিয়ান হলো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচাত ভাই আর আমার ভাতিজা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার প্রতি আজ একটু অসন্তুষ্ট থাকলেও চিরকাল তো আর থাকবেন না। খুব শিগগিরই তিনি এর প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন। অতএব তুমি আর একে জ্বালাতন করো না।'

চাচা আব্বাস তাকে এভাবে বারবার বলতে থাকলে এক সময় নুআইমান রাজি হয়ে বললেন, 'ঠিক আছে, আমি আর কিছু বলব না এবং তাকে কোনো জ্বালাতন করব না।'

* * *

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন 'জুহফা'তে যাত্রা বিরতি করলেন—যা ছিল মক্কা থেকে মদীনার পথে চার মনজিল দূরে, আমি তাঁর তাঁবুর দরজায় বসে পড়লাম আর আমার ছেলে জাফর আমার পাশে দাঁড়িয়ে থাকল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বের হওয়ার সময় আমাকে সেখানে বসা দেখতে পেলেন। তিনি আমার দিকে তাকিয়ে মুহূর্তেই চোখ ফিরিয়ে নিলেন। আমি আশা ছাড়লাম না। তাঁকে সন্তুষ্ট আমি করবই। এরপর যে কবার কোনো মনজিলে তিনি যাত্রা বিরতি করেছেন, প্রতিটি মনজিলেই আমি তাঁর দরজায় বসে থেকেছি

আর আমার ছেলে জাফরকে পাশেই দাঁড় করে রেখেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতিবারই তাঁর দরজায় আমাকে বসা দেখে আমার দিকে তাকাতেন আর চোখ ঘুরিয়ে নিতেন।

এভাবেই আমি রয়ে গেলাম অনেক দিন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপেক্ষা যখন আমার জন্য অসহনীয় হয়ে গেল তখন আমার স্ত্রীকে বললাম, হয় আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন, না-হয় আমি আমার ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে উত্তপ্ত মরুভূমিতে মুখ থুবড়ে ক্ষুধা-পিপাসায় কাতর হয়ে ছটফট করে মরে যাব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এই সংবাদ পৌঁছলে তিনি আমার প্রতি সদয় ও কোমল হলেন। এরপর তাঁবু থেকে বের হওয়ার সময় আমার দিকে তাকাতেন আগের চেয়ে কোমল ও সদয় দৃষ্টিতে। দৃষ্টির কোমলতা দেখে আমার মনে আশা জাগত, আহা! যদি একটুখানি মুচকি হাসি দিতেন।'

* * *

'এরপর আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একজন সঙ্গী হয়ে মক্কায় প্রবেশ করলাম। তিনি মসজিদে হারামের উদ্দেশ্যে বের হলে আমি তাঁর সামনে সামনে দৌড়াতে থাকি। এক মুহূর্তের জন্যও আমি তার সঙ্গ ছাড়িনি।

মক্কা বিজয়ের পরপরই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে লড়াই করার উদ্দেশ্যে আরবের সকল গোত্র ঐক্যবদ্ধ হয়, যা ইতিপূর্বে আর কখনোই হয়নি। 'হুনাইন' নামক স্থানে সকল দল মিলে সর্বপ্রকার প্রস্তুতি গ্রহণ করে তারা এসেছিল চূড়ান্তভাবে ইসলাম ও মুসলিমদের নির্মূল করতে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই প্রধান সেনাপতির দায়িত্ব নিয়ে বিরাট একদল সাহাবীর সঙ্গে হুনাইনের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। তাদের সঙ্গে হুনাইনের ময়দানে পৌঁছার পর আমি দেখলাম,

মুশরিকদের যোদ্ধা সংখ্যায় অনেক অনেক বেশি। তখন আমি মনে মনে শপথ নিলাম,

وَاللهِ لَأُكَفِّرَنَّ الْيَوْمَ عَنْ كُلِّ مَا سَلَفَ مِنِّيْ مِنْ عَدَاوَةِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَيَرَيَنَّ النَّبِيُّ مِنْ أَثَرِيْ مَا يُرْضِي اللهَ وَيُرْضِيْهِ.

'বিগত দিনগুলোতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে যত শত্রুতা ও অন্যায়-অপরাধ করে এসেছি, আজ আমি পেছনের সকল পাপের কাফ্ফারা ও প্রায়শ্চিত্ত করে ছাড়ব। আজ আমি সাহস ও কুরবানীর এমন মরণজয়ী লড়াই লড়ব, যা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে খুশি করে দেবে।'

সম্মিলিত মুশরিক আর মুসলিমবাহিনীর মধ্যে যুদ্ধ শুরু হলো। মুশরিকদের প্রচণ্ড আক্রমণে অল্পসময়ের মধ্যে মুসলিমবাহিনীর মধ্যে ভয়-ভীতি ছড়িয়ে পড়ল। এমন অবস্থা রণাঙ্গনে সৃষ্টি হলো যে মুসলিমযোদ্ধারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ফেলে রেখেই প্রাণভয়ে এদিক ওদিক ছোটাছুটি করতে লাগল। দুর্ভাগ্যজনক পরাজয় আমাদের ওপর চেপে বসতে যাচ্ছিল, আমরা পড়ে গিয়েছিলাম চরম আশঙ্কাজনক অবস্থায়।

যুদ্ধের জয়-পরাজয়ের এই রকম চরম নাজুক মুহূর্তে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম—আমার পিতা-মাতা তাঁর জন্য কুরবান হোক—তিনি তাঁর 'শাহাবা' নামের খচ্চরের পিঠে বসে সীমাহীন সাহসের সঙ্গে পাহাড়ের মতো অনড় অবস্থান গ্রহণ করলেন। তিনি নাঙ্গা তলোয়ার চালিয়ে নিজের আর আশপাশের সঙ্গীদের এমনভাবে হেফাজত করছিলেন মনে হচ্ছিল যেন ক্ষিপ্ত সিংহ।

সেই চরম মুহূর্তে আমি লাফ দিয়ে ঘোড়ার পিঠ থেকে নিচে নেমে পড়লাম। আমার তরবারির খাপ ভেঙ্গে ফেললাম যেন আর কখনোই তরবারিকে খাপে ঢোকানোর প্রয়োজন না পড়ে এবং আমি অবিরাম

লড়াই চালিয়ে যেতে পারি। আল্লাহ তাআলা ভালো জানেন সেই মুহূর্তে আমার আন্তরিক কামনা ছিল একটাই—আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সকল আক্রমণ থেকে রক্ষা করব। শত্রুদের সকল আক্রমণ বুকে-পিঠে গ্রহণ করব। জীবন কুরবান করে দেব। তবুও তাঁর শরীরে কোনো আঘাত লাগতে দেব না।

আমার চাচা আব্বাস রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একপাশে তাঁর খচ্চরের লাগাম ধরে মজবুত অবস্থান নিলেন।

আমি অবস্থান নিলাম অন্যপাশে। বামহাতে তাঁর পাদানী শক্ত করে ধরে রেখে ডানহাতে তরবারি চালিয়ে জান-প্রাণ দিয়ে রাসূলের প্রতি শত্রুদের আক্রমণ ঠেকাতে থাকলাম।

এভাবে আমার প্রাণ-পণ আক্রমণ ঠোকানো দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুশির সুরে আমার চাচা আব্বাসকে জিজ্ঞাসা করলেন,

চাচা! প্রাণ-পণ লড়াইকারী এই মুজাহিদ লোকটি কে?

চাচা দেখলেন এটাই হলো সুবর্ণ সুযোগ। তিনি বললেন,

'ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই মুজাহিদ তো আপনারই চাচাত ভাই আবু সুফিয়ান ইবনুল হারেস। ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাকে ক্ষমা করে দিন, তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যান।'

তিনি সঙ্গে সঙ্গেই বললেন

قَدْ فَعَلْتُ، وَغَفَرَ اللهُ لَه كُلَّ عَدَاوَةٍ عَادَانِيْهَا

'আমি তাকে ক্ষমা করেছি, সন্তুষ্টও হয়েছি। আল্লাহ তাআলা তার সারাজীবনের শত্রুতা ও বিরোধিতার পাপ ক্ষমা করে দিয়েছেন।'

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ক্ষমা ও সন্তুষ্টির কথা শুনে খুশিতে আমার অন্তর ভরে উঠল। সেই খুশির আতিশয্যে আমি পাদানীতে রাখা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পা মুবারকে চুমু দিয়ে ভরে দিলাম।

এরপর তিনিও খুশির সঙ্গে গভীর মমতা মিশিয়ে আমাকে বললেন,

'হে আমার প্রিয়ভাই! শত্রুদের আক্রমণে আমার জীবন ঝুঁকির মধ্যে পড়ে গেছে। আমার বিপন্ন জীবনের কসম দিয়ে বলছি, তুমি সামনে এগিয়ে যাও আর শত্রুদের ওপর হামলা করো।'

সেনাপতি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই নির্দেশনা আমার ভেতরে জিহাদী চেতনা, বীরত্ব ও সাহসিকতাকে আগ্নেয়গিরির মতো জ্বালিয়ে দিল। আমি সঙ্গে সঙ্গে মুশরিকবাহিনীর ওপর এমন ভয়াবহ হামলা চালালাম যাতে তাদের শক্ত ও মজবুত অবস্থান একেবারে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। তাদের পায়ের তলার মাটি সরে গেল। আমার সঙ্গে একদল জানবাজ মুজাহিদ যুক্ত হওয়ায় আমাদের প্রচণ্ড আক্রমণের চোটে তারা যুদ্ধের ময়দান ছেড়ে পালাতে শুরু করল। আমরা পেছন থেকে তাদের তিন মাইল পর্যন্ত তাড়া করে ভাগিয়ে দিলাম।

* * *

আবু সুফিয়ান রাযিয়াল্লাহু আনহু হুনাইন যুদ্ধে ব্যাপক কৃতিত্বপূর্ণ অবদান রাখার পর থেকেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ক্ষমাপ্রাপ্ত ও সন্তুষ্টিপ্রাপ্ত হিসাবে জীবন-যাপন করতে থাকেন। তাঁর পরশতুল্য সোহবতধন্য হয়ে তিনি রাসূলের একজন নিকটতম সাহাবী হিসাবে গণ্য হন। এসব কিছুর পরও তিনি কখনোই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে চোখ তুলে তাকানোর সাহস দেখাননি। নিজের অতীত কৃতকর্মের কারণে লজ্জায় আর অনুশোচনায় তিনি রাসূলের সম্মুখে সবসময়ই দৃষ্টি নত করে রাখতেন।

* * *

আবু সুফিয়ান রাযিয়াল্লাহু আনহু যখন হিদায়াত ও সত্যের আলোকে আলোকিত হয়ে উঠলেন, কুরআন ছাড়া ও ইসলাম হারা হয়ে বরং ইসলামকে নির্মূল করার মিশন নিয়ে কাটানো কালো অতীতের ভ্রান্তিগুলো যখন বুঝতে পারলেন, তখন তিনি কালো অতীতের আক্ষেপ মেটাতে,

সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে দিন-রাত কুরআনের তেলাওয়াত, তার আদেশ-নিষেধের গভীর জ্ঞানার্জন এবং এর উপদেশ ও নসিহত নিজের জীবনে বাস্তবায়নের পেছনে নিজেকে ব্যস্ত রাখলেন।

তিনি নিজেকে দুনিয়া ও দুনিয়ার আরাম-আয়েশ, ভোগ-বিলাশ থেকে দূরে রেখে সারাক্ষণ সর্বাঙ্গে আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন হয়ে পড়েন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার তাকে মসজিদে নববীতে প্রবেশ করতে দেখে আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহাকে জিজ্ঞাসা করলেন,

'আয়েশা! তুমি কি এই লোকটিকে চেন?'

তিনি উত্তর দিলেন,

'না ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি তাকে চিনি না।'

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

'সে আমার চাচাত ভাই আবু সুফিয়ান ইবনুল হারেস। দ্যাখো, সে নামাযের জন্য সবার আগে মসজিদে প্রবেশ করে আর সবার শেষে মসজিদ থেকে বের হয়। তার দৃষ্টি কখনোই উপরের দিকে ওঠে না। সবসময় মাটির দিকে তাকিয়ে থাকে।'

* * *

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যখন ইন্তেকাল হয়ে গেল, আবু সুফিয়ান রাযিয়াল্লাহু আনহু তখন ভীষণ ব্যথিত ও শোকার্ত হয়ে পড়েন। এই শোকে তিনি এমনভাবে কাতর হয়ে পড়েন যেমন মা তার একমাত্র পুত্রের শোকে হয়ে থাকেন। তাঁকে হারিয়ে তিনি এমনভাবে কাঁদেন যেভাবে কোনো বন্ধু তার অন্তরঙ্গ বন্ধুকে হারিয়ে কাঁদে। তিনি প্রিয় নবীর বিচ্ছেদে এমন একটি শোকগাথা রচনা করেন যার শব্দে শব্দে ঝড়ে পড়ে তার হৃদয়ের পুঞ্জিভূত কষ্ট আর বেদনা :

أَرِقْتُ فَبَاتَ لَيْلِيْ لَا يَزُوْلُ – وَلَيْلُ أَخِيْ الْمُصِيْبَةُ فِيْهِ طُوْلُ

'ঘুমহীন রাত, আমার ও আমার মুসলিমভাইদের সেই বিপদের রাত কিছুতেই যেন ফুরাবে না। কষ্টের রাতগুলো এমনই হয়ে থাকে।'

وَأَسْعَدَنِيْ الْبُكَاءُ ذَاكَ فِيْمَا – أُصِيْبَ الْمُسْلِمُوْنَ بِه قَلِيْلُ

'আমি এবং সকল মুসলিম নর-নারী নবীজীকে হারানোর যে গুমোট কষ্ট ও বিপদে আক্রান্ত হয়েছি, অব্যক্ত সেই বেদনার পুঞ্জিভূত কষ্ট থেকে কান্নাই আমাকে কিছুটা (হাল্কা) সুখী করেছে।'

لَقَدْ عَظُمَتْ مُصِيْبَتُنَا وَجَلَّتْ – عَشِيَّةً قِيْلَ قَدْ قُبِضَ الرَّسُوْلُ

'যেই বিকালে বলা হলো রাসূলের ইন্তেকাল হয়েছে, এটা আমাদের জন্য এক বিশাল অসহনীয় বিপদের কারণ হলো।'

أَضْحَتْ أَرْضُنَا مِمَّا عَرَاهَا – تَكَادُ بِهَا جَوَانِبُهَا تَمِيْلُ

'বিশাল এই বিপদের প্রভাবে আমাদের পৃথিবী যেন সবকিছু উলটপালট করে দেবে।'

فَقَدْنَا الْوَحْيَ وَالتَّنْزِيْلَ فِيْنَا – يَرُوْحُ بِه وَيَغْدُوْ جِبْرَئِيْلُ

'নবীজীর কল্যাণে সকাল-সন্ধ্যায়, রাত ও দিনে জিবরীল নেমে আসতেন যে কোনো প্রয়োজনে। আহা! তাঁর ইন্তেকালে আরশের সঙ্গে আমাদের সে যোগসূত্রটাও হারিয়ে গেল।'

وَذَاكَ أَحَقُّ مَا سَالَتْ عَلَيْه – نُفُوْسُ النَّاسِ أَوْ كَرِبَتْ تَسِيْلُ

'তাঁর প্রতি মানুষের মুগ্ধ হওয়ার, আকৃষ্ট হওয়ার যতো কারণই থাক, সর্বশ্রেষ্ঠ কারণ এটাই যে জিবরীলের মাধ্যমে আরশে আজীমের সঙ্গে সর্বদাই তিনি থাকতেন সংযুক্ত।'

نَبِيٌّ كَانَ يَجْلُو الشَّكَّ عَنَّا – بِمَا يُوْحى إِلَيْه وَمَا يَقُوْلُ

'আহা! আমরা প্রিয়তম নবীকে হারিয়ে ফেললাম, যিনি ওহীর বাণী দিয়ে আমাদের সন্দেহ ও ভ্রান্তি দূর করে দিতেন। সত্যকে আমাদের সামনে স্পষ্ট ও আলোকিত করতেন।'

وَيَهْدِيْنَا فَلَا نَخْشى ضَلَالًا – عَلَيْنَا الرَّسُوْلُ لَنَا دَلِيْلُ

'তিনি আমাদের আল্লাহর পথের ঠিকানা দিয়েছেন, গন্তব্য চিনিয়ে ও বুঝিয়ে দিয়েছেন। আমাদের নেই কোনো ভয় পথ হারানোর, আমাদের পথ প্রদর্শক স্বয়ং শ্রেষ্ঠ রাসূল।'

أَفَاطِمُ إِنْ جَزِعْتِ فَذَاكَ عُذْرٌ – وَإِنْ لَمْ تَجْزَعِيْ ذَاكَ السَّبِيْلُ

'হে ফাতেমা! তুমি যদি শোকে কাতর হয়ে পড়ো, হতেই পারে তোমার ওজর গ্রহণযোগ্য। আর যদি নিজেকে সামলে নিয়ে, ধৈর্যের সাথে থাক অবিচল, মনে রেখো এটাই ছিল তোমার বাবার পথ চিরকাল।'

فَقَبْرُ أَبِيْكَ سَيِّدُ كُلِّ قَبْرٍ – وَفِيْهِ سَيِّدُ النَّاسِ الرَّسُوْلُ

'তোমার পিতার কবর তো সাধারণ কোনো কবর নয়। সেটা কবর জগতের শ্রেষ্ঠ ও সেরা। যেখানে আছেন সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ এমনকি সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল। [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম]'

* * *

দ্বিতীয় খলীফা উমর ফারুক রাযিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতকালে আবু সুফিয়ান রাযিয়াল্লাহু আনহু অনুভব করলেন যে তাঁর মৃত্যুর সময় কাছে এসে পড়েছে। সে জন্য তিনি নিজেই নিজের কবর তৈরি করে রাখলেন।

এই কবর খোঁড়ার মাত্র তিনদিন পর বাস্তবেই তিনি মৃত্যুমুখে উপনীত হলেন। যেন মৃত্যুর সঙ্গে আগে থেকেই কথা পাকা করা ছিল। তিনি নিজের সন্তান, স্ত্রী ও আহাল-পরিজনের সকলকে ডেকে বললেন,

لَا تَبْكُوْا عَلَيَّ فَوَاللهِ مَا تَعَلَّقْتُ بِخَطِيْئَةٍ مُنْذُ أَسْلَمْتُ

'আমার জন্য কান্নাকাটি করে তোমরা অস্থির হয়ো না। কারণ, আমি আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি যে ইসলাম গ্রহণের পর থেকে আজ পর্যন্ত আমি সামান্যতম কোনো পাপের কাজেও নিজেকে জড়াইনি।'

এর একটু পরেই তাঁর প্রাণ বেরিয়ে গেল। খলীফা উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু আবু সুফিয়ান রাযিয়াল্লাহু আনহুর জানাযা নামাযে ইমামতি করলেন। খলীফা নিজে এবং সকল সাহাবী তাঁর ইন্তেকালে গভীর ভাবে শোকাহত হয়ে ওঠেন।

সাহাবায়ে কেরাম সকলেই তাঁর মৃত্যুকে ইসলাম ও মুসলিমজাতির জন্য বেদনাদায়ক এক মুসিবত হিসাবে গণ্য করলেন।

তথ্যসূত্র :

১. *তাবাকাতু ফুহূলুশ শুআরা*, ২-৬ পৃষ্ঠা।
২. *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৪র্থ খণ্ড, ২৮৭ পৃষ্ঠা এবং ৫ম খণ্ড, ২৮২ পৃষ্ঠা।
৩. *সিফাতুস সফওয়া*, (হলব সংস্করণ) ১ম খণ্ড, ৫১৯ পৃষ্ঠা।
৪. ইবনে আসীর রচিত *আল-কামিল*, ২য় খণ্ড, ১৬৪ পৃষ্ঠা।
৫. ইবনে হিশাম রচিত *আস-সীরাতুন্নববিয়্যাহ*; ২য় খণ্ড, ২৬৮ পৃষ্ঠা (সূচিপত্র দ্রষ্টব্য)।
৬. *তারীখুত্ তাবারী*, ২য় খণ্ড, ৩২৯ পৃষ্ঠা।
৭. *আল-ইসাবা*, ৪র্থ খণ্ড ৯০ পৃষ্ঠা, অথবা *আত্তারজামা*, ৫৩৮।
৮. *আত্-তাবাকাতুল কুবরা*, ৪র্থ খণ্ড, ৫১ পৃষ্ঠা।
৯. *আল-ইসতীআব*, (*আল-ইসাবার* টীকা) ৪র্থ খণ্ড, ৮৩ পৃষ্ঠা।
১০. *নিহায়াতুল আর্ব*, ১৭তম খণ্ড, ২৯৮ পৃষ্ঠা।
১১. *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, ১ম খণ্ড, ১৩৭ পৃষ্ঠা।
১২. *দুওয়ালুল ইসলাম*, ৩য় খণ্ড, ৩৬ পৃষ্ঠা।
১৩. *মাআর রঈলিল আউয়াল*, ১০৪ পৃষ্ঠা।

সাদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস

তীর ছোঁড়ো হে সাদ! তীর ছোঁড়ো। আমার
পিতা-মাতা তোমার জন্য উৎসর্গীত।

—ওহুদের যুদ্ধে সাদকে উৎসাহ দিয়ে করা রাসূলের উক্তি

أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ ۚ حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ وَهْنًا عَلٰی وَهْنٍ وَّ فِصٰلُهٗ فِیْ عَامَیْنِ اَنِ اشْكُرْلِیْ وَلِوَالِدَیْكَ ؕ اِلَیَّ الْمَصِیْرُ

وَاِنْ جَاهَدٰكَ عَلٰۤی اَنْ تُشْرِكَ بِیْ مَا لَیْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ ۙ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِی الدُّنْیَا مَعْرُوْفًا ؗ وَّاتَّبِعْ سَبِیْلَ مَنْ اَنَابَ اِلَیَّ ۚ ثُمَّ اِلَیَّ مَرْجِعُكُمْ فَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ

'আমি মানুষকে তাদের পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণের নির্দেশ দিয়েছি। তার মা তাকে কষ্টের পর কষ্ট বরণ করে গর্ভে ধারণ করে এবং তাদের দুধ ছাড়ানো হয় দুই বছরে। সুতরাং কৃতজ্ঞ হও আমার প্রতি

এবং পিতা-মাতার প্রতি। প্রত্যাবর্তন তো আমার কাছেই। তোমার পিতা-মাতা যদি আমার সঙ্গে শিরক করার জন্য তোমার প্রতি জোর চেষ্টা করতে থাকে, এমন শিরক যার সমর্থনে তোমার নিকট কোনো দলিল প্রমাণ নেই, সে ক্ষেত্রে তুমি তোমার পিতা-মাতার আনুগত্য করো না। তবে দুনিয়ায় তাদের সঙ্গে সদ্ভাব ও শ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণ করো। যারা খাঁটি অন্তরে আমার নিকট ফিরে আসে, তাদের পথ অবলম্বন করো। তারপর আমার কাছেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন, তখন আমি তোমাদেরকে তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে সংবাদ দেব।'

–সূরা লুকমান, আয়াত ১৪-১৫

সূরা লুকমানের উপর্যুক্ত আয়াতগুলোতে সত্যকে সুদৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরা অত্যন্ত শান্তশিষ্ট ও নম্র-ভদ্র এক কিশোর বালকের ঈমানদীপ্ত কাহিনীর বিবরণ দেওয়া হয়েছে। তার শিরকের ওপর তাওহীদকে এবং মিথ্যার ওপর সত্যকে প্রাধান্য দিয়ে এক কঠিন অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার আশ্চর্য ঘটনার আলোচনা করা হয়েছে। যে ঘটনা যুগযুগ ধরে ঈমান ও সত্য পথ অবলম্বনকারীদের প্রেরণার উৎস হিসাবে অনুসরণীয় হয়ে আছে। যে কিশোরের ঈমানী দৃঢ়তাকে কেন্দ্র করে এই ঘটনার সূত্রপাত, তিনিই আমাদের আজকের আলোচনার প্রধান প্রাণপুরুষ মক্কার এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের সম্মানিত পিতা-মাতার একমাত্র আদরের সন্তান সাদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস রাযিয়াল্লাহু আনহু।

মক্কা নগরীতে যে সময় নবুওয়াতের নূর ও ইসলামের আলো ছড়িয়ে পড়ল, সে সময় সাদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস ছিলেন উঠতি বয়সী এক প্রাণোচ্ছল তরুণ। স্বভাবে তিনি ছিলেন অত্যন্ত কোমল ও নম্র, শান্ত ও ভদ্র আর ছিলেন পিতা-মাতার খুবই অনুগত। বিশেষ করে মায়ের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা ছিল তার অতুলনীয়।

মাত্র সতেরো বছর বয়সী উঠতি তরুণ হলেও তখন সাদ জ্ঞান-বুদ্ধি ও বিচক্ষণতায় ছিলেন বয়সের তুলনায় অনেক এগিয়ে। পোড়খাওয়া প্রবীণদের মতোই তার মধ্যে ছিল প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতা।

তিনি সমবয়সী বন্ধুদের মতো হাসি-তামাশা ও আমোদ-প্রমোদে মত্ত থাকতেন না। তীর ধনুক তৈরি আর তীরন্দাযীর প্রতিই ছিল তাঁর সীমাহীন আগ্রহ। তীরন্দাযীর প্রশিক্ষণ ও অনুশীলনের মাধ্যমে তিনি পৌঁছে গিয়েছিলেন সেরা তীরন্দাযদের সারিতে। তাঁর ব্যস্ততা দেখে মনে হতো যেন সুনির্দিষ্ট কোনো যুদ্ধের জন্যই তিনি সর্বক্ষণিক প্রস্তুতিতে ব্যস্ত।

অপর দিকে কুফর-শিরক ও কুসংস্কারপূর্ণ বিশ্বাসে ডুবে থাকা তার কওমের নানা রকম ভ্রান্ত কর্মকাণ্ডে তিনি মোটেও সন্তুষ্ট ছিলেন না। তিনি যেন অপেক্ষা করছিলেন কোনো মহামানবের—যিনি তার শক্ত হাত বাড়িয়ে অন্ধকারে নিমজ্জিত এই জাতিকে উদ্ধার করবেন।

* * *

এমনি এক পরিস্থিতিতে মহান আল্লাহ মক্কা নগরীসহ গোটা মানবতার মুক্তির লক্ষ্যে বিশ্বমানব দরদী, সৃষ্টির সেরা মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পাঠালেন মক্কায় কুরাইশ বংশে।

সঙ্গে নিয়ে এলেন আল্লাহ তাআলার অনির্বাণ নূর—আল-কুরআন।

সেই ঐশী নূরের আলোকে আঁধারে ডুবে থাকা জাতিকে তিনি মুক্তির আহ্বান জানালেন। তারা কুফর-শিরক ও অজ্ঞতার শেকল থেকে মুক্তির সন্ধান পেলেন। এই হক ও হিদায়াতের দাওয়াত পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সাদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস তাতে সারা দিয়ে ইসলাম কবুল করে নিলেন। তখন পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে তিনি হলেন তৃতীয় অথবা চতুর্থ ব্যক্তি। এটা নিয়ে অনেক সময় তিনি গৌরব করে বলতেন,

'সাতদিন পর্যন্ত আমিই ছিলাম ইসলামের এক-তৃতীয়াংশ।'

* * *

সাদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস রাযিয়াল্লাহু আনহু ইসলাম গ্রহণ করলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুবই খুশি হয়েছিলেন। কারণ,

বাল্যকাল থেকেই সাদের মধ্যে যে বুদ্ধিমত্তা ও আভিজাত্যের প্রকাশ দেখা যেতো, সেগুলোই ইঙ্গিত বহন করত যে এই বালকের ভবিষ্যত পূর্ণিমা চাঁদের মতোই উজ্জ্বল ও আলোকিত।

সাদের ইসলাম গ্রহণে রাসূলের আনন্দিত হওয়ার আরেকটি কারণ ছিল এই, তিনি অতি উঁচু ও সম্ভ্রান্ত বংশের ছেলে বলে হয়তো তার সমবয়সী মক্কার তরুণ যুবকেরা খুব সহজেই তার অনুসরণ করে তার মতোই ইসলাম গ্রহণ করে নেবে।

তা ছাড়া ওইসব কিছুর পরও রাসূল খুশি হয়েছিলেন এই কারণে যে সাদ ছিলেন তার মামা। তিনি ছিলেন 'যুহরা' পরিবারের সন্তান। আর 'যুহরা'ই হলো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মা আমেনা বিনতে ওয়াহাবের পরিবার।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাদকে মামা হিসাবে পেয়ে নিজেকে সম্মানিত বোধ করতেন।

বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন কয়েকজন সাহাবীর সঙ্গে বসেছিলেন। সে সময় সাদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস রাযিয়াল্লাহু আনহুকে আসতে দেখে বললেন,

هٰذَا خَالِيْ .... فَلْيُرِنِيْ امْرُءٌ خَالَه

'এটা আমার মামা। কার আছে এমন মহান মামা!'

* * *

তবে সাদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস রাযিয়াল্লাহু আনহুর ইসলাম গ্রহণের বিষয়টি খুব সহজ ও স্বাভাবিক ছিল না। তাকে মুখোমুখি হতে হয়েছিল কঠিন থেকে কঠিন পরিস্থিতির। ঈমান আনার কারণে তাকে অবতীর্ণ হতে হয়েছিল ভয়াবহ অগ্নিপরীক্ষায়। তাঁর সেই কঠিন অগ্নিপরীক্ষার কথা খোদ আল্লাহ তাআলা কুরআনেও জানিয়ে দিয়েছেন এবং সেখানে সাদের সিদ্ধান্তকেই সঠিক বলে সমর্থন জানিয়েছেন।

সাদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস রাযিয়াল্লাহু আনহু তাঁর সেই বিস্ময়কর ও বিরল পরীক্ষার বিবরণ দিয়ে বলেন,

'ইসলাম গ্রহণ করার তিন রাত পূর্বে আমি স্বপ্নে দেখি যে আমি সমুদ্রের গভীর অন্ধকার তলদেশে ডুবে যাচ্ছি। ঢেউয়ের তালে তালে হাবুডুবু খেতে খেতে হঠাৎ দেখতে পেলাম আমার সামনে উজ্জ্বল ও মিষ্টি চাঁদের আলো পড়েছে। আমি সেই আলো অনুসরণ করে চাঁদের কাছে পৌঁছে গেলাম। দেখলাম, আমার আগেই সেখানে পৌঁছে গেছেন আরও তিনজন। তারা হলেন, যায়েদ ইবনে হারেসা, আলী ইবনে আবী তালেব ও আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহুম।'

আমি তাদের জিজ্ঞাসা করলাম,
'আপনারা এখানে কতক্ষণ ধরে আছেন?'

তারা বললেন, 'অল্প সময়।'

এই স্বপ্ন দেখার পর একদিন প্রায় দুপুর বেলা আমি খবর পেলাম যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গোপনে গোপনে ইসলামের দাওয়াত দেওয়া শুরু করেছেন। সংবাদটি শোনার পর আমি বুঝতে পারলাম, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা আমার মঙ্গল কামনা করছেন। ইসলাম গ্রহণ করিয়ে তিনি আমাকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে টেনে আনতে চাচ্ছেন।

আর দেরি না করে আমি ছুটতে থাকলাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদ্দেশ্যে। খুঁজতে খুঁজতে 'শিআবে যিয়াদ'-এ গিয়ে তাঁকে পেয়ে গেলাম। তখন তিনি আসরের নামায শেষ করে উঠেছেন। আমি তাঁর হাতে হাত রেখে ইসলাম গ্রহণ করলাম। স্বপ্নে দেখা সেই তিনজনই মাত্র আমার পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছেন।'

ইসলাম গ্রহণের এই সংক্ষিপ্ত কাহিনী বর্ণনার পর ইসলাম গ্রহণ করার পর তাকে কি ভয়াবহ অগ্নিপরীক্ষার মুখোমুখি হতে হয়েছিল, সেটার বিবরণ দিতে গিয়ে তিনি বলেন,

'আমার মা আমার ইসলাম গ্রহণের সংবাদ পেয়ে ভীষণ ক্ষুব্ধ হলেন। আমি তো তাঁর খুবই অনুগত ছেলে। আমি তাঁকে খুবই ভালোবাসতাম।'

তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন,

'তুমি এটা কেমন ধর্ম গ্রহণ করলে যার কারণে পিতা-মাতার ধর্ম ছাড়তে হলো? আল্লাহর শপথ! হয় তুমি তোমার নতুন ধর্ম ছেড়ে আমাদের ধর্মে ফিরে আসবে, নয়তো আমি এই মুহূর্ত থেকেই খাওয়া-দাওয়া সব ছেড়ে দিলাম। তুমি যদি তোমার ধর্ম না ছাড়ো তাহলে আমি ক্ষুধার্ত-তৃষ্ণার্ত অবস্থায় মরে যাব। এতে সকল মানুষও তোমাকে ধিক্কার দেবে, ছি: ছি: করতে থাকবে।'

আমি খুব দৃঢ়তার সঙ্গে মাকে কোমল ভাষায় অনুরোধ করে বললাম,

'মাগো! তুমি এমন কোরো না। কারণ, কোনোভাবেই কোনো কিছুর বিনিময়েই আমি আমার ধর্ম ছাড়ব না। আমি আমার মতে অনড় থাকলাম। আর আমার মাও পানাহার ছেড়ে কয়েকদিন কাটিয়ে দিলেন।'

বেশ কয়েকদিন খাওয়া-দাওয়া না করার কারণে তার স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ল। দুর্বল হতে হতে প্রায় নিস্তেজ হয়ে পড়লেন। আমি প্রায় ঘণ্টায় ঘণ্টায় তার শরীর-স্বাস্থ্যের খোঁজ-খবর নিতে থাকি। জীবন বাঁচানোর জন্য অল্প হলেও কিছু খাওয়ার জন্য তাকে বারবার অনুরোধ করতে থাকি। তিনি প্রতিবারই আমার অনুরোধ ও আবেদন প্রত্যাখ্যান করতে থাকেন। এমনকি তিনি আরও কঠিন শপথ করে বললেন,

'আমাকে নতুন ধর্ম ছেড়ে পূর্বধর্মে ফিরতে হবে, না-হলে তিনি না খেয়েই মরে যাবেন।'

আমি তখন বাধ্য হয়েই তাকে বললাম,

'মাগো, তোমাকে আমি খুব ভালোবাসি, তবে আল্লাহ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভালোবাসি আরও বেশি। আল্লাহর কসম! তোমার যদি এক হাজারটা প্রাণ থাকত আর একটা একটা করে সবগুলো প্রাণ আমার চোখের সামনে বের হয়ে যেত তবুও আমি আমার

ধর্ম ত্যাগ করতাম না। আমি কোনো কিছুর বিনিময়ে আমার ধর্ম ছাড়ব না। তাতে যা হয়ে যায় যাক।'

আমার এই অনড় অবস্থা আর সীমাহীন অবিচল মানোভাব দেখে তিনি কিছুটা দমে গেলেন এবং খুবই অনিচ্ছা সত্ত্বেও কিছুটা পানাহার করলেন। আল্লাহ তাআলা আমাদের এই অবস্থা সম্পর্কে আয়াত নাজিল করলেন,

وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا

'তোমার পিতা-মাতা যদি আমার সঙ্গে শিরক করার জন্য তোমার প্রতি জোরাল চেষ্টা চালাতে থাকে, এমন শিরক যার সমর্থনে তোমার নিকট কোনো দলিল-প্রমাণ নেই। সেক্ষেত্রে তুমি তোমার পিতা-মাতার আনুগত্য করো না। তবে দুনিয়ায় তাদের সঙ্গে সদাচরণ সদ্ভাব বজায় রেখো।'

* * *

সাদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস রাযিয়াল্লাহু আনহু যে সময় ইসলাম গ্রহণ করেন, সে সময়টা ইসলাম ও মুসলিমদের দুর্দিন ছিল। মুসলিমদের মান-মর্যাদা ও ইসলামের শক্তিবৃদ্ধির প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। আল্লাহর ইচ্ছায় সাদের ইসলাম গ্রহণের মাধ্যমে মুসলিমদের শান শওকত বেড়েছিল এবং একই সঙ্গে ইসলামের শক্তিতেও বৃদ্ধি ঘটেছিল।

ইসলামের সর্বপ্রথম জিহাদ 'বদর'। এই যুদ্ধে সাদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস রাযিয়াল্লাহু আনহুর পাশাপাশি তাঁর ছোট ভাই উমাইরের ভূমিকাকেও খাটো করে দেখার কোনো অবকাশ নেই।

বদর যুদ্ধের প্রাক্কালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সময় নিজে মুজাহিদদের বয়স, শারীরিক ও মানসিক উপযোগিতা

(ফিটনেস) পরীক্ষা করছিলেন, সে সময় উঠতি বয়সী তরুণ সাদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস রাযিয়াল্লাহু আনহু 'বয়সের স্বল্পতার কারণে অনুপযোগিতার' আশঙ্কায় নিজেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দৃষ্টি থেকে আড়াল করে রাখছিলেন। শেষ পর্যন্ত সেটাই ঘটল, যা তিনি আশঙ্কা করেছিলেন। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে দেখে ফেললেন এবং বয়স অল্প হিসাবে তাকে অনুপযোগী ঘোষণা করলেন। এতে তিনি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করে দিলেন—যা দেখে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দয়ালু ও কোমল হৃদয় গলে গেল। শেষে তিনি উঠতি বয়সী এই তরুণ উমাইর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে যুদ্ধে যাওয়ার অনুমতি দিয়ে দিলেন। এতে সাদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস রাযিয়াল্লাহু আনহুর মনে আনন্দের জোয়ার বইতে লাগল। তিনি খুশি মনে ও হাসি মুখে ছোট ভাই উমাইরের কাঁধে তরবারি ঝুলিয়ে দিলেন। আনন্দের সঙ্গে দুই ভাই আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের জন্য রওনা করলেন। যুদ্ধ শেষে সাদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস রাযিয়াল্লাহু আনহু ছোট ভাই উমাইরকে বদর প্রান্তে শহীদদের সঙ্গে রেখে আল্লাহর কাছে এর উত্তম প্রতিদানের আশা নিয়ে একাই মদীনায় ফিরে এলেন।

* * *

ওহুদের যুদ্ধের ময়দানে মুসলিমমুজাহিদদের মাঝে এক পর্যায়ে ভয় ও দুর্বলতা ছড়িয়ে পড়লে তাদের পদস্খলন ঘটে। সাহাবায়ে কেরামের অল্প কয়েকজন ছাড়া সকলেই প্রাণ বাঁচানোর উদ্দেশ্যে এদিক সেদিক ছুটাছুটি করতে থাকেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হেফাজতের জন্য যারা তাঁর কাছে ছিলেন তাদের সংখ্যা দশ জনেও পূরণ হয়নি। সেই কঠিন বিপদের মুহূর্তে সাদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর থেকে কাফেরদের আক্রমণ প্রতিহত করছিলেন আর এক একটি তীর ছুঁড়ে এক একজন শত্রুসৈন্যকে হত্যা করছিলেন। তাঁর অব্যর্থ নিশানায় চোখের সামনে একের পর এক নিজেদের সৈন্যকে ঘায়েল হতে দেখে শত্রুরা পিছু হটতে

বাধ্য হয়। তাঁর এই তীর চালনার নৈপুণ্য দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে উৎসাহ দিয়ে বলেন,

اِرْمِ سَعَدُ ..... اِرْمِ فِدَاكَ أَبِيْ وَأُمِّيْ

'বাহ, সাদ বাহ, আরও তীর ছুঁড়ো, তোমার জন্য আমার পিতা-মাতা কুরবান হোক।'

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উৎসাহ প্রদানের জন্য আমি ছাড়া আর কাউকে একই সঙ্গে পিতা-মাতা কুরবান হওয়ার কথা বলেননি।'

* * *

তবে সাদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস রাযিয়াল্লাহু আনহু সর্বোচ্চ মর্যাদার আসন লাভ করলেন তখন, যখন খলীফা উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু পৃথিবীর বুক থেকে শিরক ও পৌত্তলিকতাকে সমূলে নির্মূল করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে পারস্যসাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে এক ভয়াবহ যুদ্ধের পরিকল্পনা তৈরি করলেন। তখনকার বিশ্বে এক নম্বর পরাশক্তি পারস্যসাম্রাজ্যকে নিশ্চিহ্ন করার পরিকল্পনায় সর্বপ্রথম তিনি তার সকল গভর্নরের উদ্দেশ্যে এক সরকারি ফরমানে নির্দেশ পাঠালেন,

'যার মধ্যে যুদ্ধের কাজে সাহায্য করার মতো কোনো যোগ্যতা ও প্রতিভা আছে তাকেই মদীনায় পাঠিয়ে দাও। যেমন, অস্ত্রধারী যোদ্ধা, ঘোরসওয়ার, তীরন্দাজ ছাড়াও পরামর্শ দেওয়ার মতো, যুদ্ধের ময়দানে সকল দিকে নজর রাখার মতো বিজ্ঞ, আহতদের চিকিৎসা সেবা দেওয়ার যোগ্য, মুজাহিদদের উদ্বুদ্ধ করার মতো কবি, সাহিত্যিক ও বক্তা ইত্যাদি সকল ধরনের লোক পাঠিয়ে দাও।'

সরকারি এই ফরমানের ফলশ্রুতিতে দলে দলে মানুষ মদীনায় আসতে লাগল। মদীনার অলিগলি, পথঘাট মানুষের ভিড়ে সরগরম হয়ে উঠল। সৈন্য সংগ্রহের কাজ চূড়ান্ত হয়ে গেলে খলীফা উমর ফারুক

রাযিয়াল্লাহু আনহু মজলিসে শূরার প্রবীণ ব্যক্তিদের নিয়ে এই বিশাল বাহিনীর সেনাপতি কাকে নিযুক্ত করা যায় এ ব্যাপারে সকলের মতামত চাইলেন।

তারা সকলেই একবাক্যে বলে উঠলেন,

'সিংহ তো একজনই, একজনই সাদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস। তিনিই হবেন সেনাপতি।' সকলের মতামত ও পরামর্শের ভিত্তিতে উমর ফারূক রাযিয়াল্লাহু আনহু সেনাপতি হিসাবে সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর হাতে যুদ্ধের পতাকা সোপর্দ করলেন।

এই বিশাল বাহিনী মদীনা থেকে পারস্যের উদ্দেশ্যে রওনার প্রাক্কালে উমর ফারুক রাযিয়াল্লাহু আনহু বিদায় জানাতে এলেন এবং সেনাপতি সাদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস রাযিয়াল্লাহু আনহুকে অসিয়ত করে বললেন,

"হে সাদ! 'আপনি রাসূলের মামা' 'আপনি রাসূলের নিকটতম একজন সাহাবী' এইসব অহঙ্কার যেন আপনার মনের মধ্যে জেগে না ওঠে। ভুলে যাবেন না যে আল্লাহ তাআলা পাপকে পাপ কাজ দিয়ে নির্মূল করেন না। তিনি পাপ ও অন্যায়কে নির্মূল করেন পূণ্যকর্মের দ্বারা।

হে সাদ! মনে রাখবেন, আল্লাহ ও বান্দার মাঝে ইবাদত-আনুগত্য ছাড়া আর কোনো সম্পর্ক নেই। মহান আল্লাহর কাছে মানুষের উঁচু বংশ আর নিচু বংশ একই সমান। আল্লাহ তাআলা উঁচু-নিচু সকল মানুষের রব ও প্রতিপালক আর তারা সকলেই আল্লাহর বান্দা। শুধুমাত্র তাকওয়ার মাধ্যমে মানুষের মর্যাদার পার্থক্য হয়। মানুষ আল্লাহর কাছে প্রতিদান ও মর্যাদা পেতে পারে একমাত্র ইবাদত ও আনুগত্যের মাধ্যমে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যে নীতি-আদর্শের ওপর প্রতিষ্ঠিত দেখেছেন, সেগুলোকেই আঁকড়ে ধরে অনুসরণ করবেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ বাস্তবায়ন করাই আমাদের কাজ এবং সেটাই আমাদের কর্তব্য।'

এরপর এই বিরাট বাহিনী জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর উদ্দেশ্যে পারস্যসাম্রাজ্যের অভিমুখে রওনা করে। এই বাহিনীর মধ্যে ছিলেন

নিরানব্বইজন বদরী সাহাবী—যারা বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সর্বোচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন। এই বাহিনীতে ছিলেন বাইয়াতে রিদওয়ানসহ পরবর্তী বিভিন্ন সমাবেশে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গ ও সোহবত পাওয়া তিনশো দশজন প্রবীণ সাহাবী। মক্কা বিজয়ে রাসূলের তিনশো যোদ্ধা সাহাবী ছাড়াও এই বাহিনীর অংশ ছিলেন সাহাবায়ে কেরামের পুত্র সাতশো টগবগে তরুণ যোদ্ধা। এত বড় ও বরকতপূর্ণ মুজাহিদদের নিয়ে গঠিত এই সেনাদলের প্রধান সেনাপতির মর্যাদা ছিল শুধু সাদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস রাযিয়াল্লাহু আনহুর।

* * *

সেনাপতি সাদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস রাযিয়াল্লাহু আনহু ১৬ হিজরীতে 'কাদিসিয়া' প্রান্তরে এই বিশাল বাহিনী দ্বারা সেনাসমাবেশ করলেন। এই যুদ্ধে পারস্যবাহিনীর বিরুদ্ধে মুসলিমবাহিনী ঐতিহাসিক বিজয় অর্জন করে এবং এখানেই মুসলিমবাহিনী পারস্যসৈনিকদের কোমর ভেঙে দেয়। যুদ্ধের শেষ দিন মুসলিমসেনাদল সংকল্প করে যে ঐদিনেই তারা শত্রুদের একেবারে চূড়ান্তভাবে ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন করে ফেলবে। পরিকল্পনা মতে তারা শত্রুদের চতুর্দিক দিয়ে ঘিরে ফেলে এবং 'আল্লাহু আকবার' এবং 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' ধ্বনির তালে তালে শত্রুবাহিনীর ভেতরে ঢুকে এমনভাবে তাদের হত্যা করতে থাকে যে ওরা পালানোর কোনো পথ খুঁজে পায় না।

এই রকম নাজুক অবস্থার মধ্যে হঠাৎ সবাই দেখল, পারস্য-বাহিনীর সেনাপতি 'রুস্তম'-এর কর্তিত মস্তক মুসলিমসেনাদলের বর্শার মাথায় দুলছে।

এই ভয়াবহ দৃশ্য দেখার পর পারস্যসৈনিকদের অন্তরে চরম ভীতির সঞ্চার হলো। এমনকি তারা মুসলিমসৈন্যের ইঙ্গিতেই মাথা নত করে তাদের সামনে এসে দাঁড়াচ্ছিল আর মুসলিমসৈন্যরা তাদেরকে তাদের অস্ত্র দিয়েই হত্যা করছিল।

এই যুদ্ধে গনিমতের পরিমাণ ছিল সকল অনুমান ও গণনার ঊর্ধ্বে। নিহত পারস্য-সেনাদলের যেই লাশগুলোর গণনা সম্ভব হয়েছিল, শুধু তাদের সংখ্যাই ছিল ত্রিশ হাজার।

* * *

সাদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস রাযিয়াল্লাহু আনহুকে আল্লাহ তাআলা দীর্ঘ হায়াত ও প্রচুর ধন-সম্পদ দান করেছিলেন। কিন্তু মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এলে তিনি একটি পুরাতন ও ছেঁড়া পশমি জুব্বা দেখিয়ে বললেন,

'এই পুরাতন জামাটি দিয়েই আমাকে কাফন পরাবে। কারণ, এটা পরেই আমি বদর যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলাম। আমি চাই, কেয়ামতের ময়দানে বদরের সেই পোশাকেই আল্লাহর মুখোমুখি হব।'

তথ্যসূত্র :

১. *আল-ইসতীআব*, (*আল-ইসাবার* টীকা), ২য় খণ্ড, ১৮ পৃষ্ঠা।
২. *আল-ইসাবা*, ২য় খণ্ড, ৩৩ পৃষ্ঠা, অথবা *আত্তারজামা*, ৩১৯৪।
৩. *আল-মিলাল ওয়ান নিহাল*, ১ম খণ্ড, ২১ পৃষ্ঠা।
৪. *আশ্হারু মাশাহিরিল ইসলাম*, ৩য় খণ্ড, ২১ পৃষ্ঠা।
৫. *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, ১ম খণ্ড, ২১ পৃষ্ঠা।
৬. *তুহফাতুল আহওয়াযী*, ১ম খণ্ড, ৩৫৩ পৃষ্ঠা।
৭. *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, ১ম খণ্ড, ৬২ পৃষ্ঠা।
৮. *যুআমাউল ইসলাম*, ১১৪ পৃষ্ঠা।
৯. *রিজালুন হাউলার রাসূল*, ১৪১ পৃষ্ঠা।
১০. সাহ্হার রচিত *সাআদুবনু আবী ওয়াক্কাস ওয়া আবতালুহু*।
১১. *আর-রিয়াযুন নাযিরাহ*, ১ম খণ্ড, ৩৯২ পৃষ্ঠা।
১২. *সিফাতুস সফওয়াহ*, ১ম খণ্ড, ১৩৮ পৃষ্ঠা।
১৩. ইবনে আসাকিরের *তাহযীব*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৯৩ পৃষ্ঠা।
১৪. *আল-মাআরিফ*, ১০৬ পৃষ্ঠা।
১৫. আন্-নুজূমুয যাহিরাহ : (সূচিপত্র দ্রষ্টব্য)
১৬. *উসদুল গাবাহ*, ২য় খণ্ড, ২৯০ পৃষ্ঠা।
১৭. *জামহারাতু আনসাবিল আরব*, ৭১ পৃষ্ঠা।
১৮. *তারীখুল ইসলাম*, ১ম খণ্ড, ৭৯ পৃষ্ঠা।
১৯. *ফুতুহু মিসরা ওয়া আখবারুহা*, ৩১৮ পৃষ্ঠা।
২০. *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৮ম খণ্ড, ৭২ পৃষ্ঠা।

হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান

(রাসূলের গুপ্ততথ্য সংরক্ষণকারী)

হুযাইফা তোমাদের যা বলবে তাকে সত্য বলে মেনে নিও আর আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ যেভাবে তোমাদের কুরআন পড়াবে তোমরা সেভাবেই পড়ো।

–আল-হাদীস

'মুহাজির' ও 'আনসার' যেটাই তোমার কাছে বেশি পছন্দনীয়, তুমি সেই পরিচয়েই নিজেকে পরিচিত করতে পারো।

'ইয়ামানে'র পুত্র হুযাইফা প্রথমবার যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে মক্কায় সাক্ষাৎ করেছিলেন, তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে উক্ত কথাটি বলেছিলেন।

মুসলিমজাতির কাছে সবচেয়ে বেশি প্রিয় দুটো গোষ্ঠীর যে কোনো একটি গোষ্ঠীতে নিজেকে অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়ার যে স্বাধীনতা তাকে দেওয়া হয়েছিল, এর পেছনে রয়েছে একটি কাহিনী। সেই কাহিনীটি এই রকম :

হুযাইফার পিতা ইয়ামান ছিলেন মক্কার 'আব্‌স' গোত্রের মানুষ। কোনো কারণে তিনি নিজ কওমের একজনকে হত্যা করে অপরাধী

সাব্যস্ত হন। সেই অপরাধের শাস্তি স্বরূপ তাকে মক্কা থেকে বহিষ্কার করে দেওয়া হয়। বাধ্য হয়ে তিনি মক্কা ছেড়ে মদীনায় চলে যান। সেখানে 'আবদে আশহাল' গোত্রের সঙ্গে বন্ধুত্বের চুক্তি করে বসবাস করতে থাকেন। সেই গোত্রেই তিনি বিয়ে করেন এবং সেখানেই জন্ম নেয় তার পুত্র হুযাইফা।

মদীনায় বসবাস করাকালীন এক সময় ইয়ামানের ওপর থেকে মক্কায় প্রবেশের বিধি-নিষেধ তুলে নেওয়া হয়। তখন থেকে তিনি মক্কা ও মদীনা দু'জায়গাতেই আসা-যাওয়া করতে থাকেন। যদিও মদীনাতেই তার অবস্থান থাকে বেশি ও ঘনিষ্ঠ।

ইসলাম যখন আরব ভূমিকে আলোকিত করে তুলল তখন হুযাইফার পিতা ইয়ামান আবদে আশহাল গোত্রের দশ সদস্যের প্রতিনিধি দলের অংশ হয়ে হিজরতের পূর্বে রাসূলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং সকলেই তাঁর কাছে ইসলাম কবুল করেন। এ কারণেই হুযাইফা ছিলেন একই সঙ্গে মক্কী এবং মাদানী। পিতার মূল শেকড় বিবেচনায় ছিলেন মক্কী আর লালন-পালনের বিবেচনায় ছিলেন মাদানী।

* * *

হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান একটি মুসলিমপরিবারে জন্মগ্রহণ করেন এবং ইসলাম গ্রহণে অগ্রগামী পিতা-মাতার তত্ত্বাবধানে লালিত-পালিত হন। এর ফলে তিনি নিজের চোখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখার পূর্বেই ইসলাম কবুলকারী মুসলিম হিসাবে পরিগণিত হন।

* * *

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে সাক্ষাতের প্রতি তীব্র আকাঙ্ক্ষা শিশু হুযাইফার অন্তরকে আলোকিত করত। পিতা-মাতার মাধ্যমে ইসলাম গ্রহণের পর থেকেই তিনি সবসময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যাপারে খোঁজ-খবর রাখতেন এবং তাঁর সম্পর্কে জানার জন্য বিভিন্ন রকম প্রশ্ন করতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি কৌতূহল ও আগ্রহ তার ভালোবাসাকে আরও বাড়িয়ে দেয়, তীব্র করে তোলে। এক সময় তার তীব্র কৌতূহল মেটাতে পিতা বাধ্য হয়ে তাকে মক্কায় নিয়ে যান রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করাতে। মক্কায় বাল্য বয়সের সেই প্রথম সাক্ষাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তিনি প্রশ্ন করেন,

'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি কি মুহাজির না আনসারী?'

তিনি বললেন,
'মুহাজির' ও 'আনসার' যেটাই তোমার বেশি পছন্দনীয়, তুমি সেটাতেই নিজেকে পরিচিত করতে পারো।'

হুযাইফা রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেছিলেন,
'তাহলে আমি আনসারী ইয়া রাসূলাল্লাহ!'

* * *

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মদীনায় হিজরত করলেন তখন হুযাইফা রাযিয়াল্লাহু আনহু একেবারে সার্বক্ষণিক তাঁর অনুসরণে লেগে থাকলেন। একমাত্র বদর ছাড়া সবগুলো যুদ্ধে তাঁর সঙ্গী হলেন।

বদর যুদ্ধে কেন উপস্থিত থাকতে পারেননি সেই কাহিনীর বর্ণনা দিয়ে তিনি নিজেই বলেন,

'বদর যুদ্ধে আমি অংশ গ্রহণ করতে পারিনি তার কারণ শুধুমাত্র এটাই যে, সেই সময় বিশেষ প্রয়োজনে আমি আমার পিতার সঙ্গে মদীনার বাহিরে অবস্থান করছিলাম। আমরা নিজেদের কাজ সেরে মদীনায় ফেরার পথে কুরাইশের লোকজন আমাদের বন্দী করে জিজ্ঞাসা করল 'তোমরা কোথায় কী উদ্দেশ্যে যাচ্ছ?' আমরা বললাম, 'আমরা

মদীনায় বসবাস করি, সেখানেই নিজ ঠিকানায় ফিরে যাচ্ছি।' তারা বলল, 'তোমরা মুহাম্মাদের সঙ্গে মিলে আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে যাচ্ছ?' আমরা বললাম, 'আমরা কাজের প্রয়োজনে মদীনার বাহিরে এসেছিলাম। আমাদের কাজ শেষ হয়েছে। তাই আমরা মদীনায় নিজেদের বাড়ি ফিরে যাচ্ছি। অন্য কোনো উদ্দেশ্য আমাদের নেই।'

তারা আমাদের কথা বিশ্বাস করতে চাচ্ছিল না। আমাদের মুক্তি দেওয়ার ইচ্ছাও তাদের ছিল না। অনেক কথার পরে তারা আমাদের একটিমাত্র শর্তে মুক্ত করতে রাজি হলো। তাদের শর্ত হলো তাদের কাছে আমাদের অঙ্গীকার করতে হবে যে, 'আমরা মুহাম্মাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে কুরাইশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব না।'

আমরা অনন্যোপায় হয়ে তাদের কাছে সেই অঙ্গীকার করি। তারপরেই তারা আমাদের মুক্ত করে।

মদীনায় ফেরার পর আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে পূর্ণ ঘটনার বিবরণ দিয়ে জানালাম, 'আমরা কুরাইশের লোকজনের হাতে বন্দী হয়েছিলাম এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করার অঙ্গীকার করে তবেই আমাদের মুক্তি মিলেছে। আমরা রাসূলের কাছে জানতে চাইলাম, এখন আমাদের করণীয় কী?'

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

'তাদের সঙ্গে কৃত অঙ্গীকার পূরণ করতে হবে এবং মহান আল্লাহর কাছে তাদের বিরুদ্ধে সাহায্য চাইতে হবে।'

* * *

হুযাইফা রাযিয়াল্লাহু আনহু তার পিতা ইয়ামান রাযিয়াল্লাহু আনহুর সঙ্গে ওহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। এই যুদ্ধে হুযাইফা রাযিয়াল্লাহু আনহু শত্রুদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত সাহস ও বিক্রম দেখিয়ে যুদ্ধ করেন এবং নিরাপদে নির্বিঘ্নে ফিরে আসেন। কিন্তু তার পিতা ইয়ামান রাযিয়াল্লাহু আনহু শাহাদাত বরণ করেন। তবে তিনি শত্রুবাহিনীর মুশরিকদের

তরবারিতে নয় বরং নিজেদের ভেতরে মুসলিমদের তরবারিতেই ভুলক্রমে শহীদ হয়ে যান। ঘটনার পূর্ণ বিবরণ এরকম,

ওহুদ যুদ্ধের ময়দানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অতিবৃদ্ধ ইয়ামান এবং সাবেত ইবনে ওয়াক্‌শ রাযিয়াল্লাহু আনহুমাকে বয়স ও বার্ধক্য বিবেচনা করে দুর্গের নিরাপদ আশ্রয়ে নারী ও শিশুদের পাশে রেখে গেলেন।

বৃদ্ধ, নারী ও শিশুদের স্থান নির্ধারণ করে দিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকল মুজাহিদকে নিয়ে যুদ্ধের ময়দানে চলে গেলেন। এরপর কাফের-মুশরিকদের বিরুদ্ধে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নেতৃত্বে মুসলিমবাহিনীর এই যুদ্ধ যখন ভীষণ তীব্রভাবে চলতে থাকল তখন হুযাইফা রাযিয়াল্লাহু আনহুর পিতা ইয়ামান রাযিয়াল্লাহু আনহু তার সঙ্গী সাবেত ইবনে ওয়াক্‌শ রাযিয়াল্লাহু আনহুর কাছে আক্ষেপ করে বললেন,

'দূর ছাই! কেন আমরা এখানে বসে রয়েছি? যুদ্ধের জন্য এসে আমরা নারী আর শিশুদের জায়গায় বসে কিসের অপেক্ষা করছি? আমাদের হায়াতের কতটুকুই বা বাকি আছে? আজ না হয় কাল তো আমাদের মরতেই হবে। তাহলে আর কেন এই দূরে দূরে থাকা? রাসূলের নেতৃত্বে জিহাদ করে আল্লাহ তাআলা যদি দয়া করে আমাদের শহীদী মৃত্যু দান করেন তাহলে সেটা হবে কতবড় সৌভাগ্য!'

এরপর তারা যার যার তরবারি নিয়ে যুদ্ধের ময়দানে ঢুকে পড়লেন।

আল্লাহ তাআলা সাবেত ইবনে ওয়াক্‌শ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে মুশরিকদের তরবারির আঘাতে শহীদী মৃত্যু দান করেন। আর হুযাইফা রাযিয়াল্লাহু আনহুর পিতা ইয়ামান রাযিয়াল্লাহু আনহু শহীদ হন মুসলিমসৈনিকদেরই তরবারির আঘাতে। তাকে চিনতে না পেরে, শত্রুসৈন্য মনে করে মুসলিমমুজাহিদরা উপুর্যপরি তরবারির আঘাত করতে থাকে। দূর থেকে দেখে হুযাইফা রাযিয়াল্লাহু আনহু আমার পিতাকে ছেড়ে দাও, আমার পিতাকে ছাড়ো বলে চিৎকার করতে থাকেন। কিন্তু জীবন-মরণের এই রকম যুদ্ধের ময়দানে কে শোনে কার

কথা। বৃদ্ধ সাহাবী নিজের সঙ্গী মুজাহিদদের তরবারির আঘাতেই শহীদ হয়ে গেলেন। এত বড় বেদনাদায়ক ভুলের শিকার সাহাবীদের উদ্দেশ্যে হুযাইফা রাযিয়াল্লাহু আনহু শুধু এতটুকু বললেন,

'আল্লাহ আপনাদের ক্ষমা করে দিন। তিনি অসীম দয়ালু ও ক্ষমাশীল।'

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুযাইফা রাযিয়াল্লাহু আনহুকে নিহত পিতার 'দিয়ত' রক্তপণ বা ক্ষতিপূরণ দিতে চাইলেন। কিন্তু হুযাইফা রাযিয়াল্লাহু আনহু সেই ক্ষতিপূরণ নিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করে বলেন,

'আমার পিতার আকাঙ্ক্ষা ছিল শাহাদাতের মৃত্যু। সেটা তিনি লাভ করেছেন। তাঁর আকাঙ্ক্ষা পূরণ হয়েছে। হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থেক, আমি আমার পিতার রক্তপণ বা ক্ষতিপূরণ মুমিন-মুসলিমদের মাঝে দান করে দিলাম। এই উন্নত মানসিকতার কারণে হুযাইফা রাযিয়াল্লাহু আনহুর মর্যাদা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আগের চেয়ে আরও বেশি বেড়ে গেল।

* * *

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমে হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বিভিন্ন রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন। এতে হুযাইফা রাযিয়াল্লাহু আনহুর তিনটি অনন্য বৈশিষ্ট্য তাঁর কাছে ফুটে ওঠে।

এক : যে কোনো জটিল সমস্যা সমাধান করার বিরল যোগ্যতা।

দুই : উপস্থিত বুদ্ধি।

তিন : রহস্য গোপন রাখার দুর্লভ ক্ষমতা।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অভ্যাস ছিল সাহাবীদের সুপ্ত প্রতিভা ও বৈশিষ্ট্য উদঘাটনের মাধ্যমে যোগ্যতা অনুসারে তাদের যথাযোগ্য স্থানে প্রতিষ্ঠা করা।

মদীনাতে মুসলিমদের সবচেয়ে বড় যে সমস্যার মুখে পড়তে হয়েছে তা হলো মুনাফিক অর্থাৎ ইহুদী ও তাদের সহযোগীদের ছদ্মবেশী অনুচর-মুসলিমদের উপস্থিতি। মুসলিম ও নবীজীর বিরুদ্ধে বিছানো তাদের চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের জাল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুযাইফা রাযিয়াল্লাহু আনহুর কাছে গোপনে ওই সকল ছদ্মবেশী মুনাফিকদের নাম পরিচয় প্রকাশ করে দিয়েছিলেন। এটা ছিল এমন এক গোপন তথ্য যা একমাত্র হুযাইফা রাযিয়াল্লাহু আনহু ছাড়া আর কোনো সাহাবীকেই তিনি বলেননি। তাঁকে মুনাফিকদের ব্যাপারে সজাগ দৃষ্টি রাখার নির্দেশ দান করেন। তাদের গোপন তৎপরতা ও গতিবিধির খোঁজ-খবর রাখতে বলেন। যেন ইসলাম ও মুসলিমদের হেফাজত করা যায়—তাদের চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রকে যথাসময়ে প্রতিহত করার মাধ্যমে। তখন থেকেই হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান রাযিয়াল্লাহু আনহুকে 'ছা-হিবু সিররি রাসূলিল্লাহ' অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গুপ্ততথ্য সংরক্ষণকারী বলে আখ্যায়িত করা হয়।

* * *

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুযাইফা রাযিয়াল্লাহু আনহুর আল্লাহ প্রদত্ত বিরল প্রতিভা ও উপস্থিত বুদ্ধিকে কঠিন বিপদজনক অবস্থাতে কাজে লাগিয়েছেন। খন্দকের যুদ্ধের সময় যখন মুসলিমরা সামনে ও পেছনে উভয় দিক থেকে শত্রুদের দ্বারা অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন। শত্রুবাহিনীর দীর্ঘ অবরোধ মুসলিমবাহিনীর জন্য চরম বিপদজনক অবস্থা সৃষ্টি করল। অবস্থার ভয়াবহ অবনতির ফলে মুমিন-মুসলিমদের ধৈর্য আর ত্যাগের সীমা প্রায় অতিক্রম করতে যাচ্ছিল। এমনকি দুর্বল ঈমানের মুসলিমরা আল্লাহর সাহায্য পাওয়ার ব্যাপারে হতাশাপূর্ণ ভুল মনোভাব প্রকাশ করছিলেন।

পক্ষান্তরে মুশরিক কুরাইশ ও মিত্রবাহিনীর অবস্থাও মুসলিমদের চেয়ে ভালো ছিল না। পরিণতিহীন এই দীর্ঘ অবরোধ তাদেরও ফেলে দিয়েছিল এক অসহ্য অবস্থায়। তাদের পক্ষে এই দীর্ঘ অবরোধ আরও দীর্ঘ করাও সম্ভব হচ্ছিল না, আবার মান-ইজ্জতের ভয়ে তুলে নেওয়াও ছিল অসম্ভব।

আল্লাহ তাআলা এমন এক প্রচণ্ড ঝড়ো হাওয়া পাঠালেন যাতে তাদের তাঁবুগুলো উপড়ে গেল। হাঁড়ি-পাতিল ও থালা-বাসন কোথায় উড়িয়ে নিল তার কোনো হদীস থাকল না। আগুনগুলো নিভিয়ে দিল। তাদের মুখমণ্ডলে বালু লেপে দিয়ে গেল আর চোখে-মুখে ও নাকের ছিদ্রে বালুর কঙ্কর ঢুকে বন্ধ করে দিল। আল্লাহ তাআলার পাঠানো এই ভয়াবহ আযাবের মুখে পড়ে তাদের মনোবল ও সাহস একেবারে ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। সামগ্রিক ভাবেই তারা হয়ে পড়ল একেবারে দুর্বল। এই বিপদজনক পরিবেশ তাদের ভাগ্যে পরাজয়কে ত্বরান্বিত করে তুলল।

* * *

যুদ্ধের ইতিহাস থেকে জানা যায়, এই ধরনের বিপদজনক প্রাকৃতিক পরিবেশে পরাজিত দল হয় তারাই, যারা প্রথমেই আহাজারি ও হা-হুতাশ করতে শুরু করে আর বিজয়ী দল সেটাই যারা দ্রুত সময়ের মধ্যে নিজেদের গুছিয়ে নেয়।

যুদ্ধে জয়-পরাজয় নির্ধারণের এই রকম জটিল মুহূর্তগুলোতে পরিস্থিতির মূল্যায়ন ও সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রায় সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে শক্তিশালী গোয়েন্দা তৎপরতার মাধ্যমে প্রতিপক্ষবাহিনীর মনোভাব জেনে নেওয়ার ওপর।

এই পর্যায়ে এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রয়োজনবোধ করেন হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান রাযিয়াল্লাহু আনহুর আল্লাহপ্রদত্ত প্রতিভা ও দক্ষতাকে কাজে লাগানোর। তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন, শত্রুবাহিনীর বিরুদ্ধে চূড়ান্ত আক্রমণ পরিচালনা করার পূর্বে তাঁর কাছে ওদের সংবাদ নিয়ে আসার জন্য রাতের অন্ধকারে হুযাইফাকে শত্রুবাহিনীর একেবারে কেন্দ্রে পাঠিয়ে দেবেন।

বাকি কাহিনী আমরা শুনব খোদ হুযাইফা রাযিয়াল্লাহু আনহুর নিজ জবানীতে। এই মরণযাত্রার ব্যাপারে দেখি তিনি কি বলেন। হুযাইফা বলেন,

'সেই ভয়ঙ্কর ঝড়ের রাতে আমরা সারিবদ্ধভাবে সতর্ক অবস্থায় বসেছিলাম। আবু সুফিয়ান এবং তার মুশরিক মিত্র-বাহিনী ছিল আমাদের সামনে আর বনূ-কুরাইযার ইহুদী-যোদ্ধারা ছিল আমাদের পেছনে। আমাদের ভয় হচ্ছিল, শত্রুবাহিনী হয়তো আমাদের নারী ও শিশুদের ওপর আক্রমণ করে বসবে। ঐ রাতের মতো এমন আঁধার ও বিপদজনক ঝড়-তুফানের রাত আমাদের জীবনে আর কখনো আসেনি। ঝরো হাওয়ার আওয়াজ হচ্ছিল বজ্রপাতের মতো। আর অন্ধকার ছিল এতই ভয়াবহ যে আমরা কেউ হাতের আঙ্গুল পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছিলাম না।

আমাদের মধ্যে ঘাপটি মেরে থাকা মুসলিমের বেশধারী মুনাফিকরাও নানা তাল-বাহানা করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ধরণা দিচ্ছিল। তারা বলছিল,

'আমাদের বাড়ি-ঘর একেবারেই অরক্ষিত—তাই আমাদের বাড়ি ফিরে যাওয়া জরুরি।'

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অজুহাত আর তাল-বাহানা পেশকারী প্রত্যেক মুনাফিককেই চলে যাওয়ার অনুমতি দিয়ে দিচ্ছেন। এভাবে একে একে মুনাফিকদের চলে যাওয়ায় শেষ পর্যন্ত আমরা তিনশোর কিছু বেশি সাহাবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে যুদ্ধের ময়দানে থেকে গেলাম।'

* * *

যুদ্ধের ময়দানটা মোটামোটি মুনাফিকমুক্ত হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের অবস্থা দেখার জন্য উঠে দাঁড়ালেন। একে একে আমাদের প্রত্যেকের মুখ দেখে দেখে তিনি সামনে এগোতে এগোতে আমার কাছ পর্যন্ত এলেন। শীতের জন্য তখন আমি শুধু আমার স্ত্রীর ওড়নাটা গায়ে দিয়ে হাঁটু পর্যন্ত ঢেকে বসেছিলাম। তিনি আমার কাছে এসে বললেন,

'কে তুমি?'

আমি বললাম, 'হুযাইফা।'

তিনি বললেন, 'হুযাইফা?'

ভীষণ শীত আর ক্ষুধায় কাতর আমি সে মুহূর্তে উঠে দাঁড়াতে না পেরে ওড়নার মধ্যে নিজেকে শক্ত করে জড়িয়ে মাটিতে মিশিয়ে বললাম,

'হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান।'

তখন তিনি বললেন,

'শক্রপক্ষের মধ্যে তোলপাড় সৃষ্টি করা কোনো খবর পাওয়া যেতে পারে। তুমি তাদের ভেতরে ঢুকে তাদের আসল মনোভাবটা জেনে এসো। ওরা কি যুদ্ধ করতে পারবে? সে অবস্থা কি ওদের আছে?'

আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ মাথা পেতে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালাম, কিন্তু ভীষণ শীত, ক্ষুধা আর ভয়ে কাঁপছিলাম দেখে তিনি বললেন,

اَللّٰهُمَّ احْفَظْهُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ 'وَمِنْ خَلْفِه' وَعَنْ يَمِيْنِه وَعَنْ شِمَالِه

'হে আল্লাহ! হুযাইফাকে সামনে, পেছনে, ডানে, বামে এবং ওপর ও নিচের সকল বালা-মুসিবত ও বিপদ-আপদ থেকে হেফাজত করো।'

আল্লাহর কসম! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুআ শেষ হতে না হতেই আল্লাহ তাআলা আমার দেহ-মন থেকে সকল প্রকার ভয়-ভীতি, ক্ষুধা ও শীতের কষ্ট দূর করে দিলেন।

আমি রওনা করতে গেলাম তখন তিনি আমাকে ডেকে বললেন,

'হুযাইফা! খবরদার, আমার কাছে ফেরৎ আসার আগ পর্যন্ত শক্রবাহিনীতে কোনো ঘটনা ঘটাবে না।'

আমি বললাম, 'ঠিক আছে।'

একথা বলেই আমি রাতের অন্ধকারে মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়ে গোপনে শক্রবাহিনীর ভেতরে ঢুকে পড়লাম। আমি এমন ভাব করে থাকলাম যেন আমি তাদেরই একজন সৈনিক।

কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখলাম, সেনাপতি আবু সুফিয়ান সেনাদলের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য দাঁড়িয়েছেন। মূল বক্তব্য শুরু করার পূর্বে তিনি গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়ের দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন,

'প্রিয় কুরাইশের সৈনিক ভাইয়েরা! যুদ্ধের যেই পরিস্থিতিতে আমরা এসে পড়েছি আমার আশঙ্কা, মুহাম্মাদের গুপ্তচরেরা আমাদের সৈনিকের ছদ্মবেশে আমাদের মাঝে ঘাপটি মেরে বসে থাকতে পারে, সেই কারণে প্রত্যেকেই আগে নিজের পাশের জনের পরিচয় নিশ্চিত করে নিন। তারপর মনোযোগ দিয়ে আমার বক্তব্য শুনুন।'

এই পর্যায়ে সকলেই সেনাপতির নির্দেশমতো যার যার পাশের জনের পরিচয় নিতে থাকলে আমি আমার পাশের সৈনিককে আমার পরিচয় জিজ্ঞাসার সুযোগ না দিয়ে আগ বাড়িয়ে তার বাহুতে ঝাঁকি দিয়ে বললাম,

'এই তুমি কে? তোমার পরিচয় কী?'

সে উত্তর দিল, 'আমি অমুকের পুত্র অমুক।'

বহিরাগত কেউ নেই শুনে আবু সুফিয়ান মূল বক্তব্য দেওয়া শুরু করলেন। তিনি বললেন,

'হে কুরাইশের ভাইয়েরা! নিশ্চয় আপনারা হাঁপিয়ে উঠেছেন। বিরক্ত ও ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। আমাদের পশুগুলো—উট, ঘোড়া ঝড়ের কারণে সব মারা গেছে। আমাদের সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিয়েও বনূ কুরাইযার ইহুদী সম্প্রদায় প্রতিশ্রুতি ভেঙে আমাদের সহযোগিতা থেকে হাত গুটিয়ে নিয়েছে। আপনাদের চোখের সামনেই আমরা প্রচণ্ড ঝড়ে আর শীতে অবর্ণনীয় ঝুঁকির মধ্যে পড়ে গেছি। অতএব, এখনো যার যতটুকু শক্তি-ক্ষমতা অবশিষ্ট আছে, চলুন তাই নিয়ে আমরা মক্কায় ফিরে যাই। এরপর তিনি উটের কাছে গিয়ে রশি খুলে তার পিঠে চড়ে বসলেন এবং মক্কার উদ্দেশ্যে রওনা করলেন।'

এই সময় ইচ্ছা করলে আমি তীর ছুঁড়ে আবু সুফিয়ানকে হত্যা করতে পারতাম। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের

নিষেধাজ্ঞার কথা স্মরণ করে নিজেকে নিবৃত্ত করে রাখলাম এবং সেখান থেকে ফিরে এলাম।

ফিরে এসে দেখলাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো এক স্ত্রীর চাঁদর গায়ে জড়িয়ে নামায পড়ছেন। আমাকে দেখে তিনি কাছে ডাকলেন। চাঁদরের এক অংশ দিয়ে আমাকে ঢেকে দিলেন। আমি তাকে বিস্তারিত খবর শোনালাম। শুনে তিনি ভীষণ খুশি হয়ে আল্লাহর প্রশংসা ও শুকরিয়া আদায় করলেন।

* * *

হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান রাযিয়াল্লাহু আনহু সারাটা জীবন মুনাফিকদের তথ্য আমানত হিসাবে গোপন রেখে কাটিয়ে দিয়েছেন। কখনোই এই আমানতের গোপনীয়তা তিনি ফাঁস করেননি। মুনাফিকদের ব্যাপারে খলীফাগণও তাঁর শরণাপন্ন হতেন। এমনকি উমর ইবনুল খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহু কোনো মুসলিম মারা গেলে তার জানাযার সময় খোঁজ নিতেন, হুযাইফা হাজির হয়েছেন কিনা? তিনি জানাযায় উপস্থিত হয়েছেন জানলে তবেই তিনি জানাযার নামায পড়াতেন। আর যদি জানতেন হুযাইফা জানাযায় হাজির হননি তাহলে তিনি সন্দেহে পড়ে যেতেন এবং তার জানাযা পড়ানো থেকে বিরত থাকতেন।

একবার খলীফা উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু হুযাইফা রাযিয়াল্লাহু আনহুর কাছে জিজ্ঞাসা করলেন,

'আমার গভর্নরদের মধ্যে কি কোনো মুনাফিক আছে?'

তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, একজন আছে।'

খলীফা জানতে চাইলেন, 'কে সে? আমাকে একটু বলুন।'

তিনি বললেন, 'সেটা তো বলা সম্ভব নয়।'

হুযাইফা রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

'অল্প কদিন পরেই উমর সেই মুনাফিক গভর্নরকে বরখাস্ত করে দিয়েছিলেন—যেন আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁকে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছিল।'

সম্ভবত খুব অল্পসংখ্যক মানুষ জানেন, হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান রাযিয়াল্লাহু আনহু সেনাপতি হিসাবে মুসলিমজাতির জন্য পারস্যের নাহাওয়ান্দা, দাইনাওয়ার, হামাযান এবং রাই প্রভৃতি শহর জয় করেছিলেন। তা ছাড়া মুসলিমজাতি কুরআনের উচ্চারণ কেন্দ্রিক এক মতপার্থক্যকে কেন্দ্র করে অনেক ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়লে তিনিই সকলকে ঐক্যমতে এনেছিলেন। আবার সকলকে ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন একই তেলাওয়াতের ব্যাপারে।

বহু গুণে গুণান্বিত হওয়া সত্ত্বেও হুযাইফা রাযিয়াল্লাহু আনহু নিজের ওপর আল্লাহর আযাবের ভয়ে ভীষণ ভীত থাকতেন। আল্লাহর শাস্তির চিন্তায় খুবই চিন্তিত থাকতেন।

মৃত্যুশয্যায় তাঁর রোগ খুব বেড়ে গেলে মাঝরাতে কয়েকজন সাহাবী তাঁর কাছে এলে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন,

'এটা কোন সময়?'

তারা বললেন, 'একটু পরেই রাত পোহাবে। সকাল হবে।'

তিনি বললেন,

'আমি আল্লাহর নিকট এমন সকাল থেকে আশ্রয় চাই, যা আমাকে জাহান্নামের দিকে ঠেলে দেবে।'

এরপর তিনি জিজ্ঞাসা করলেন,

'আপনারা কি আমার জন্য কাফনের কাপড় নিয়ে এসেছেন?'

তারা বললেন, 'হ্যাঁ।'

তিনি বললেন,

'বেশি দামি কাপড় দিয়ে আমাকে কাফন দেবেন না। কারণ, আমার জন্য আল্লাহর কাছে ভালো কোনো পুরস্কার যদি থাকে তাহলে আপনাদের এই কাফন পরিবর্তন করে উত্তম পোশাক আমাকে পরানো হবে। আর আমার অবস্থা যদি উল্টো হয় তাহলে আপনাদের এই কাফন আমার কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হবে।'

এরপর তিনি বলতে থাকলেন,

اَللّٰهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنِّيْ كُنْتُ أُحِبُّ الْفَقْرَ عَلٰى الْغِنٰى وَأُحِبُّ الذِّلَّةَ عَلٰى الْعِزِّ وَأُحِبُّ الْمَوْتَ عَلٰى الْحَيٰوةِ

'ইয়া আল্লাহ! তুমি তো জানো আমি সম্পদের প্রাচুর্যের চেয়ে অভাব অভিযোগের জীবনকেই বেশি পছন্দ করতাম। ইজ্জত-সম্মান ও খ্যাতির জীবনের চেয়ে অতি সাধারণ-তুচ্ছ জীবনকেই বেশি প্রাধান্য দিতাম। আর জীবনের চেয়ে মৃত্যুকেই আমি ঢের বেশি ভালোবাসতাম।'

এরপর তাঁর রুহ বের হবার মুহূর্তে তিনি বললেন,

حَبِيْبٌ جَاءَ عَلٰى شَوْقٍ – لَا أَفْلَحَ مَنْ نَدِمَ

'বন্ধু (মৃত্যু) এসে গেছে, আমি আগ্রহী তার আগমনের। এই বন্ধুর আগমনে যে লজ্জিত সে তো ভীষণ ব্যর্থ।'

আল্লাহ তাআলা হুযাইফা ইবনুল ইয়ামানের প্রতি রহম করুন। তিনি ছিলেন ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্বের অধিকারী অনন্য সাহাবী।

তথ্যসূত্র :

১. *আল-ইসতীআব*, ১ম খণ্ড, ২৭৭ পৃষ্ঠা।
২. *আল-ইসাবা*, ১ম খণ্ড, ৩১৭ পৃষ্ঠা অথবা *আত্তারজামা*, ১৬৪৭।
৩. *আত্-তাবাকাতুল কুবরা*, ১ম খণ্ড, ২৫ পৃষ্ঠা।
৪. *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, ২য় খণ্ড, ২৬০ পৃষ্ঠা।
৫. *সিফাতুস সফওয়া*, ১ম খণ্ড, ২৪৯ পৃষ্ঠা।
৬. *তাহযীবুত তাহযীব*, ২য় খণ্ড. ২১৯ পৃষ্ঠা।
৭. *উসদুল গাবাহ*, ১ম খণ্ড, ২৯০ পৃষ্ঠা।
৮. *তারীখুল ইসলাম*, ২য় খণ্ড, ১৫২ পৃষ্ঠা।
৯. *আল-মাআরিফ*, ১১৪।
১০. *আন্-নুজূমুয যাহিরাহ*, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৭৬, ৮৫, ১০২।

উকবা ইবনে আমের আল-জুহানী

উকবা ইবনে আমের নিজের জীবনকে মহান দুটো কাজে ব্যয় করার সংকল্প করেছিলেন, একটি ইল্‌ম অপরটি জিহাদ।

'ঐ তো আসছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।' একজন চিৎকার করে এই ঘোষণা দিলে মদীনাবাসীদের দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান হলো। মদীনার প্রবেশপথে এগিয়ে এসে উঁচু উঁচু পাহাড়-টিলা আর গাছের মগডালে বসে সকলেই প্রিয় নবীর আগমন পথে অপেক্ষা করতেন।

আজ তো তিনি এসেই পড়েছেন। সুতরাং মদীনার সকল শ্রেণির মানুষ রহমতের নবী ও তাঁর সঙ্গী সিদ্দীকে আকবরের শুভাগমনের আনন্দ-উচ্ছাসে মদীনার পথে-প্রান্তরে, অলিতে-গলিতে নানা রকম ধ্বনি দিচ্ছেন। একবার 'আল্লাহু আকবারে'র শ্লোগান আর একবার 'লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ'র শ্লোগানে মদীনার আকাশ-বাতাস যেন কেঁপে উঠছে।

এই অভূতপূর্ব আনন্দের ক্ষণে অন্তঃপুরবাসিনী মদীনার নারীরাও তাদের ছোট ছোট শিশুবাচ্চাদের নিয়ে বাড়ি-ঘরের উঁচু ছাদে চড়ে এক নজর নবীজীকে দেখার জন্য ছটফট করছেন আর জিজ্ঞাসা করছেন,

‘কোন্টা নবী ?’ ‘হ্যাঁ, কোন্টা নবীজী?’

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে হিজরতকারী মুবারক কাফেলা বিভিন্ন বয়সের সারিবদ্ধ মানুষের মাঝ দিয়ে ধীরলয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। মদীনার হাজার হাজার নারী-পুরুষ, আবাল-বৃদ্ধ-বণিতার প্রবল উৎসাহ আর তীব্র আকাঙ্ক্ষার উল্লাস ও আনন্দাশ্রুর অভিনন্দন ও অভ্যর্থনায় সিক্ত হয়ে প্রিয় নবীর মুবারক কাফেলার যাত্রা শেষ হলো।

* * *

কিন্তু উকবা ইবনে আমের আল-জুহানী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই মুবারক কাফেলার জমজমাট আগমন দেখতে পাননি। এই মুবারক কাফেলার অভ্যর্থনায় নিজেকে শামিল করার সৌভাগ্য অর্জন করতে পারেননি। কারণ, এই নশ্বর পৃথিবীতে তার একমাত্র সম্বল বকরির পাল নিয়ে তাকে মদীনা থেকে দূরে গ্রামে অবস্থান করতে হয় বকরি চড়ানোর জন্য। উপর্যুপরি ক্ষুধায় বকরিগুলোর মৃত্যুর আশঙ্কাতে এমনটি না করে তার কোনো উপায় ছিল না।

তবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনে আনন্দ ও খুশির যে জোয়ার এসেছিল মদীনায়, অল্পদিনের মধ্যেই সেই খুশির ঢেউ আছড়ে পড়ে মদীনার কাছের ও দূরের বেদুইন পল্লীর তাঁবুগুলোতেও। এই আনন্দের সংবাদ এক সময় মদীনা শহর থেকে বহুদূরে অবস্থানকারী উকবা ইবনে আমের আল্-জুহানীর কানেও পৌঁছে যায়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে উকবা ইবনে আমের আল-জুহানীর সাক্ষাৎ কিভাবে হয়েছিল, তাঁর কাছ থেকেই শোনা যাক সেই কাহিনী :

তিনি বলেন,

‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মদীনায় এলেন, সে সময় আমি আমার বকরির পাল চড়ানোর জন্য মদীনা থেকে অনেক দূরে অবস্থান করছিলাম। সেখানেই আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামের মদীনায় পৌঁছার সংবাদ পাই। আমি কোনোরকম বিলম্ব না করেই তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য রওনা হই। তাঁর সঙ্গে যখন আমার সাক্ষাৎ হলো, আমি তাঁকে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কি আমার বাইয়াত গ্রহণ করবেন?'

তিনি আমার কথার জবাব না দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করলেন, 'তুমি কে?'

আমি বললাম, 'উকবা ইবনে আমের আল-জুহানী।'

এবার তিনি আমার আগের প্রশ্নের উত্তরে বললেন,

'কোন্ বাইয়াত তোমার কাছে পছন্দনীয়? বেদুইনদের মতো সাধারণ বাইআত? নাকি মুহাজিরদের মতো হিজরতের বাইয়াত?'

আমি বললাম, 'বরং মুহাজিরদের মতো হিজরতের বাইয়াত গ্রহণ করুন।'

এরপর তিনি আমার কাছ থেকে মুহাজির সাহাবীদের মতো বিশেষ বাইয়াত গ্রহণ করলেন। সেখানে এক রাত কাটিয়ে আমি আবার আমার বকরির পালের কাছে বেদুইন পল্লীতে ফিরে এলাম।

* * *

আমরা ছিলাম মোট বারোজন ব্যক্তি—যারা মদীনা শহর থেকে বহুদূর মরুপল্লিতে বকরি চড়াতাম। ইসলাম গ্রহণের পর আমরা পরস্পর আলোচনা করলাম,

'আমরা যদি অন্তত একদিন পরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে দীন শেখা এবং নতুন নতুন ওহীর বাণী শোনার উদ্দেশ্যে হাজির হতে না পারি, তাহলে আমাদের কি লাভ হলো?'

সুতরাং প্রতিদিনই আমাদের মধ্য থেকে কোনো একজন মদীনায় যাবে তার বকরির পাল আমরা দেখাশোনা করব। এভাবে একে একে আমরা প্রত্যেকেই মদীনায় যাব।

আমার নিজের ছোট্ট বকরির পাল নিয়ে আমি খুব শঙ্কিত ছিলাম। কারও কাছে সেগুলো রেখে নিশ্চিন্ত হতে পারতাম না। সে কারণে আমি তাদের বললাম,

'তোমরা সবাই এক এক করে রাসূলের দরবারে যাওয়া শুরু করো। যে যাবে তার বকরির পাল আমার কাছে থাকবে। আমিই সকলের বকরির দায়িত্ব পালন করব।'

* * *

এই সিদ্ধান্তের আলোকে প্রতিদিন খুব ভোরে আমার সঙ্গীরা একের পর এক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যেত। তার বকরির পাল চড়ানো ও দেখাশোনার দায়িত্ব থাকত আমার ওপর। যখন সে ফিরে আসত, আমি জিজ্ঞাসা করতাম, 'কী কী শুনেছে আর কী কী শিখেছে।' এভাবেই আমি সবকিছু সঙ্গীদের কাছ থেকে প্রতিদিন জেনে নিতাম আর শিখে নিতাম। কিন্তু এভাবে বেশি দিন যেতে পারল না। আমার চেতনায় পরিবর্তন ঘটল। আমার বিবেক আমাকে দংশন করতে থাকল। ধিক্কার দিয়ে আমি নিজেকে বলতে লাগলাম, 'ছি: ছি:, এটা কেমন কথা! কয়েকটি তুচ্ছ ছাগলের বাচ্চার জন্য তুমি নিজেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সোহবত-সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত করছ? কোনো মাধ্যম ছাড়া সরাসরি তাঁর মুবারক জবান থেকে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ তুমি হাতছাড়া করে দিচ্ছ?' বিবেকের এই দংশন আমি উপেক্ষা করতে পারলাম না। আমি স্পষ্ট বুঝতে পারলাম, আমি খুব বড় ধরনের ভুল করছি। এই উপলব্ধির পর আমি নিজেকে ছাগল পালনের দায়-দায়িত্ব থেকে মুক্ত করে নিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সার্বক্ষণিক সান্নিধ্য পাওয়ার আশায় আমি সবকিছু ছেড়ে দিয়ে মদীনার উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেলাম।

* * *

উকবা ইবনে আমের আল-জুহানী যখন এই কঠিন সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করেছিলেন তখন তাঁর কল্পনাতেও আসেনি যে মাত্র দশ বছরের ব্যবধানে তিনিই হয়ে উঠবেন একজন বিখ্যাত আলেম ও প্রবীণ কারী। ভাবতেও পারেননি যে ইসলামের ইতিহাসে বিজয়ী সেনানায়কদের তালিকায় তাঁর নাম স্মরণীয় হয়ে থাকবে এবং হাতেগোনা অল্প ক'জন বিখ্যাত শাসক ও গভর্নরদের মাঝে তিনি হবেন অন্যতম।

যেদিন তিনি নিজের ছোট্ট বকরির পালের দায়-দায়িত্ব মুক্ত হয়ে সার্বক্ষণিক রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচর্য লাভের আশায় তাঁর দরবারে রওনা করেছিলেন, সেদিন তিনি ধারণাই করতে পারেননি অদূর ভবিষ্যতে সভ্যতা-সংস্কৃতির 'মা' বলে খ্যাত 'দামেস্ক' জয়কারী সেনাদলের তিনিই হবেন প্রধান সেনাপতি। কেইবা ভাবতে পেরেছিল দামেস্কের প্রবেশ পথ 'তূমা'র পাশে মনোরম ও সবুজ বাগানগুলোর মাঝে তিনি নিজের আলীশান বাসগৃহ তৈরি করবেন?

অদূর ভবিষ্যতে তিনি হবেন সভ্যতার প্রাণকেন্দ্র মিসর-বিজেতা বিখ্যাত সেনানায়কদের অন্যতম, তিনিই হবেন মিসরের শাসক—গভর্নর। তিনিই 'আল্-মুকাত্তাম' পাহাড়ের অপরূপ সৌন্দর্যময় পাদদেশে নিজের বাড়ি তৈরির পরিকল্পনা করবেন। কেউ কখনো কল্পনাই করতে পারেনি যে উকবা ইবনে আমের আল-জুহানীর ভবিষ্যতে এত কিছু ঘটবে। কেউ কিভাবে এসব বিষয় ধারণা করতে পারবে? এগুলো তো সবই তখন ভবিষ্যতের আবরণে ঢাকা বিষয়—যা জানতেন একমাত্র আল্লাহ।

* * *

উকবা ইবনে আমের আল-জুহানী রাযিয়াল্লাহু আনহু নিবিড়ভাবে, ছায়ার মতো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচর্য লাভ করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেখানেই যেতে চাইতেন, উকবা ইবনে আমের তাঁর জন্য খচ্চরের লাগাম ধরে দাঁড়িয়ে

থাকতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এতো বেশি উকবা ইবনে আমেরকে একই বাহনের সহযাত্রী (রাদীফ) বানিয়েছেন যে, লোকমুখে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রাদীফ নামেই প্রসিদ্ধ হয়ে পড়েন। কখনো কখনো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের খচ্চর থেকে নেমে পড়েছেন আর উকবা ইবনে আমের তাতে আরোহন করেছেন।

উকবা ইবনে আমের রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

'মদীনার এক বাগানের ভেতর দিয়ে আমি রাসূলের খচ্চরের লাগাম ধরে টেনে নিয়ে যাচ্ছিলাম। তিনি আমাকে ডেকে বললেন,

'উকবা! তুমি চড়বে না?'

আমি 'না' বলতে গিয়ে চিন্তা করলাম, এতে তাঁর আদেশ অমান্য করা হবে নাতো?

এই ভাবনার কারণেই অবশেষে আমি বললাম,

'হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি উঠছি।' তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর খচ্চর থেকে নেমে পড়লেন আর আমি তাঁর আদেশ পালনার্থে তাতে চড়ে বসলাম। কিছুক্ষণ পর আবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বাহনে আরোহন করলেন। এরপর তিনি আমাকে বললেন,

'হে উকবা! আজ তোমাকে এমন দুটো সূরা শেখাব, যা অন্য যে কোনো সূরার চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।'

আমি বললাম, 'নিশ্চয় আমি শিখতে আগ্রহী ইয়া রাসূলাল্লাহ!'

এরপর তিনি আমাকে সূরা ফালাক ও সূরা নাস পড়ে শোনালেন। পরে নামাযের একামত দেওয়া হলে তিনি ইমামতের জন্য সামনে গেলেন এবং সেই সূরা দুটো দিয়েই নামায পড়ালেন। নামায শেষে আমাকে বললেন,

'যখনই ঘুমাতে যাবে এবং যখনই ঘুম থেকে উঠবে এই সূরা দুটো পড়বে।'

উকবা রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন,
'আমি যতদিন বেঁচে থাকব এই দুটো সূরা পড়া চালু রাখব।'

* * *

উকবা ইবনে আমের আল-জুহানী রাযিয়াল্লাহু আনহু নিজের জীবনকে মহান দুটো কাজে ব্যয় করার সংকল্প করেছিলেন—একটি ইলম অপরটি জিহাদ। সারা জীবন তিনি এই দুটো লক্ষ্য বাস্তবায়নেই তৎপর থেকেছেন। ইলম ও জিহাদের জন্যই তিনি জান ও মালের সকল কুরবানী ত্যাগ ও আত্মত্যাগ মেনে নিয়েছেন।

ইল্‌ম হাসিলের ক্ষেত্রে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সান্নিধ্যই ছিল তাঁর সবচেয়ে বড় অবলম্বন। সরাসরি তাঁর জবান মুবারক থেকেই কুরআন মাজীদ, হাদীস ও ইসলামের সকল হুকুম আহকাম শিখে তিনি এক সময় হয়ে ওঠেন হাফেয, কারী, মুহাদ্দিস, ফকীহ, ফারায়েয বিশেষজ্ঞ, কবি, সাহিত্যিক ও বাগ্মী।

তিনি মিষ্টি-মধুর কণ্ঠে কুরআন তেলাওয়াত করতেন। রাত যখনই গভীর হতো, বিশ্বজগতের কোলাহল যখন থেমে যেত তখন তিনি গভীর আবেগে নিবিষ্ট মনে কুরআনের তেলাওয়াত শুরু করতেন। সাহাবায়ে কেরামের হৃদয় আকৃষ্ট হতো সেই তেলাওয়াতের প্রতি। তাঁরা প্রাণভরে সেই তেলাওয়াত শুনতেন। আল্লাহর ভয়ে তাঁদের চোখ দিয়ে অশ্রুর ধারা গড়িয়ে পড়ত।

একবার উমর ফারুক রাযিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে ডেকে বললেন,
'হে উকবা! আমাকে একটু কুরআন পড়ে শোনাও।'

তিনি সানন্দে রাজি হয়ে তেলাওয়াত করতে লাগলেন। তাঁর এই তেলাওয়াত শুনে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু এত আবেগাপ্লুত হয়ে পড়লেন যে কাঁদতে কাঁদতে তাঁর দাড়ি মুবারক ভিজে গেল।

উকবা ইবনে আমের আল-জুহানী রাযিয়াল্লাহু আনহু মুসলিমজাতির জন্য রেখে যান এক অমূল্য সম্পদ। রেখে যান নিজ হাতে লিখিত কুরআন মাজীদের একটি কপি। তাঁর স্বহস্তে লিখিত কুরআনের সেই কপি মাত্র কয়েকশো বছর পূর্বেও মিসরের বিখ্যাত 'উকবা ইবনে আমের জামে মসজিদ- পাঠাগারে' সংরক্ষিত ছিল। যার শেষে লেখা ছিল,

'এই কুরআন মাজীদের কপিটি উকবা ইবনে আমের কর্তৃক স্বহস্তে লিখিত।'

উকবা ইবনে আমেরের এই কপিটিই ছিল পৃথিবীর বুকে সর্বাধিক মূল্যবান ও প্রাচীনতম ইসলামী-সভ্যতার নিদর্শন। কিন্তু কতবড় দুর্ভাগ্য যে মুসলিমজাতির অবহেলা ও অসচেতনতার সুযোগে এত বড় অমূল্য ও বরকতময় ইসলামী-ঐতিহ্যের নিদর্শনটিও অবশেষে হারিয়ে গেছে।

* * *

জীবনের দ্বিতীয় লক্ষ্য ছিল তাঁর জিহাদ। এই লক্ষ্যপূরণে তাঁর তৎপরতা ও সফলতা কতটুকু—এটা জানার জন্য সংক্ষেপে এই তথ্যটুকুই যথেষ্ট যে তিনি প্রথমবার ওহুদের যুদ্ধে শরীক হয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহযোদ্ধা হয়েছেন এরপর তাঁর জীবদ্দশায় সংঘটিত সকল জিহাদেই তিনি প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গী হয়ে একজন মরণজয়ী মুজাহিদের সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। তিনি ছিলেন যুদ্ধের সাজে সজ্জিত, দুঃসাহসী ও বিচক্ষণ যোদ্ধাদের অন্যতম। যারা দামেস্ক বিজয়ের দিন জীবনের কঠিনতম পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছিলেন। প্রধান সেনাপতি আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু উকবা ইবনে আমেরকে দামেস্ক বিজয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের পুরস্কার স্বরূপ এই বিশাল বিজয়ের আনন্দ সংবাদ খলীফা উমরের কাছে পৌছানোর গুরু দায়িত্ব অর্পণ করেন। ফলে উকবা ইবনে আমের আল-জুহানী রাযিয়াল্লাহু আনহু বিরতি ও বিশ্রাম ছাড়া এক

শুক্রবার থেকে পরের শুক্রবার পর্যন্ত সফর করে সুদূর দামেস্ক থেকে মদীনায় পৌছে খলীফাকে এই মহাবিজয়ের সুসংবাদ শোনান। মিসর যুদ্ধে তিনি ছিলেন মুসলিমবাহিনীর এক অংশের সেনাপতি। মিসর জয়ে তাঁর অসাধারণ অবদানের পুরস্কার স্বরূপ আমীরুল মুমিনীন মুআবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে মিসরের গভর্নর নিযুক্ত করেন এবং পরপর তিন বছর পর্যন্ত সেই পদে বহাল রাখেন। এরপর তাকে নতুন দায়িত্ব প্রদান করেন এবং ভুমধ্যসাগরের বিশাল 'রুড্‌স' দ্বীপ বিজয়ের অভিযানে প্রেরণ করেন।

উকবা ইবনে আমের আল-জুহানী রাযিয়াল্লাহু আনহুর জিহাদের প্রতি আগ্রহ এত বেশি ছিল যে জিহাদ বিষয়ের প্রচুর হাদীস তিনি মুখস্ত করে নিয়েছিলেন এবং জিহাদ বিষয়ক হাদীস বর্ণনাকারীদের মধ্যে তিনি বিশিষ্ট স্থান দখল করে আছেন। তীরন্দাযীতে তাঁর হাত ছিল এতই পাকা, এর দ্বারা তিনি অবসরে আনন্দ ও বিনোদন লাভ করতেন।

* * *

উকবা ইবনে আমের আল-জুহানী রাযিয়াল্লাহু আনহু মিসরে অবস্থানকালে ইন্তেকালের পূর্ব মুহূর্তে সন্তানদের ডেকে অসিয়ত করলেন,

'হে আমার ছেলেরা! আমি তোমাদের তিনটি কাজ থেকে নিষেধ করে যাচ্ছি, এগুলো মেনে চলবে।

এক ঃ তোমরা প্রিয় নবীর হাদীস গ্রহণ করার পূর্বে অবশ্যই যাচাই করে দেখবে যে বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য কিনা। নির্ভরযোগ্য না হলে তার বর্ণিত হাদীস গ্রহণ করবে না।

দুই ঃ কখনো মানুষের কাছে ধার-কর্জ করতে যেয়ো না। অভাবের তাড়নায় ছেঁড়া পোশাক পরতে হলেও।

তিন ঃ কাব্যচর্চায় মগ্ন হয়ো না। কারণ, কাব্যচর্চা তোমাদের অন্তরকে কুরআন থেকে গাফেল করে দেবে।

যখন তাঁর ইন্তেকাল হয়ে গেল, তাঁকে আল-মুকাত্তাম পাহাড়ের পাদদেশে দাফন করে সবাই ফিরে আসে। তাঁর পরিত্যক্ত সম্পদের হিসাব করতে গিয়ে দেখা গেল, তিনি সম্পদ হিসাবে রেখে গেছেন সত্তরের কিছু বেশি তীর-ধনুক আর এরই সকল সরঞ্জাম। এরই সঙ্গে রেখে গেছেন এইগুলোকে জিহাদের কাজে ব্যয় করার অসিয়তনামা।

আল্লাহ তাআলা এই কারী, আলেম ও গাজী সাহাবী উকবা ইবনে আমের আল-জুহানী রাযিয়াল্লাহু আনহুর চেহারা মুবারককে আলোকিত ও জ্যোতির্ময় করে দিন এবং ইসলাম ও মুসলিমজাতির পক্ষ থেকে তাঁকে সর্বোত্তম পুরস্কারে ভূষিত করুন।

তথ্যসূত্র :

১. *আন-নুজুমুয যাহেরা*, ১ম খণ্ড, ১৯, ২১, ৬২, ৮১ পৃষ্ঠা।
২. *তাবাকাতু উলামা-ই আফ্রীকিয়্যা ওয়া তিউনিস*, ৫৮তম খণ্ড, ৭০ পৃষ্ঠা।
৩. *আল-ইসাবা*, ২য় খণ্ড, ৪৮৯ পৃষ্ঠা অথবা *আত্তারজামা*, ৫৬০১।
৪. *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, ২য় খণ্ড, ৩৩৪ পৃষ্ঠা।
৫. *জামহারাতুল আনসাব*, ৪১৬ পৃষ্ঠা।
৬. *আল-মাআরিফ*, ১২১ পৃষ্ঠা।
৭. *কালাইদুল জুমান*, ৪১ পৃষ্ঠা।
৮. *আল-ইসতীআব*, ৩য় খণ্ড, ১০৬ পৃষ্ঠা।
৯. *উসদুল গাবাহ*, ৩য় খণ্ড, ৪১৭ পৃষ্ঠা।
১০. *ফুতুহু মিসর ওয়া আখবারুহা*, ২৮৭ পৃষ্ঠা।
১১. *তাহযীবুত তাহযীব*, ৭ম খণ্ড, ২৪২ পৃষ্ঠা।
১২. *তাযকিরাতুল হুফফায*, ১ম খণ্ড, ৪২ পৃষ্ঠা।

বেলাল ইবনে রাবাহ

আবু বকর আমাদের এক নেতা, তিনি আযাদ করেছেন আমাদের অন্য এক নেতা বেলালকে।

–উমর ফারুক রাযিয়াল্লাহু আনহু

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্বাচিত মুআযযিন বেলাল ইবনে রাবাহ রাযিয়াল্লাহু আনহুর জীবনে রয়েছে ইসলামী ও ইসলামী বিশ্বাসকে সকল নিষ্ঠুর নিপীড়ন সত্ত্বেও আঁকড়ে ধরে থাকার এক সংগ্রামমুখর জীবন কাহিনী...

যুগের পর যুগ কেটে গেলেও যে কাহিনী কখনো পুরনো হয় না...

শত শত বছর পার হয়ে গেলেও শ্রেতারা এখনো তা শুনে ক্লান্ত হয় না...

বেলালের জন্ম হয়েছিল হিজরতের প্রায় তেতাল্লিশ বছর পূর্বে 'সারাহ' নামক স্থানে। তাঁর পিতা ছিলেন 'রাবাহ' নামে পরিচিত। আর মায়ের নাম ছিল 'হামামাহ'।

তাঁর মা ছিলেন মক্কার কালো ক্রীতদাসীদের একজন। সে কারণে কেউ কেউ তাঁকে 'কালো দাসীর ছেলে' বলেও ডাকতেন।

* * *

বেলাল ইবনে রাবাহ লালিত-পালিত হন মক্কা মুকাররমায়। তিনি ছিলেন 'আবদুদ-দার' গোত্রের কয়েকজন এতীম বালকের ক্রীতদাস। মৃত্যুর পূর্বে এতীম বালকদের জন্য তাদের পিতা অভিভাবক হিসাবে কাফের নেতাদের অন্যতম শীর্ষ ব্যক্তি উমাইয়া ইবনে খালফকে নিযুক্ত করে যান।

নতুন ধর্ম ইসলামের আলোয় যখন মক্কানগরী আলোকিত হয়ে উঠল...

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বিপ্লবী কালেমার শিক্ষা প্রচার করলেন...

বেলাল ইবনে রাবাহ তখন ইসলাম গ্রহণকারী প্রথম সৌভাগ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলেন।

এমন এক সময় তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন যখন পৃথিবীর বুকে তিনি এবং সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণকারী কয়েকজন ব্যক্তি ছাড়া আর কোনো মুসলিমের অস্তিত্ব ছিল না।

সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণকারী সৌভাগ্যবান ব্যক্তিবর্গের তালিকায় শীর্ষস্থানীয় ছিলেন উম্মুল মুমিনীন খাদীজা বিনতে খুওয়াইলিদ, আবু বকর সিদ্দীক, আলী ইবনে আবী তালেব, আম্মার ইবনে ইয়াসের ও তাঁর মা সুমাইয়া, সুহাইব আর-রূমী এবং আল-মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদ রাযিয়াল্লাহু আনহুম।

বেলাল ইবনে রাবাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু মুশরিকদের এমন নিষ্ঠুর নির্যাতন ভোগ করেছেন যা আর কাউকেই করতে হয়নি।

তাদের এমন নির্মম, নির্দয় ও নৃশংস অত্যাচার তিনি সহ্য করেছেন যা অন্য কাউকেই করতে হয়নি। ইসলাম গ্রহণের কারণে তাকে যে কঠিন অগ্নি পরীক্ষার মুখোমুখি হতে হয়েছিল, সেখানে সহনশীলতার সঙ্গে সকল অসহনীয় নির্যাতন ভোগ করে ইসলামের ওপর অবিচল থাকার যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন তিনি এবং তাঁর কয়েকজন দুর্বল সঙ্গী—তা একেবারেই নজিরবিহীন।

ইসলাম গ্রহণকারী আবু বকর সিদ্দীক ও আলী ইবনে আবী তালেবের বিরুদ্ধে মুশরিক নেতৃবৃন্দ কোনো নির্যাতন করতে সাহস পায়নি। কারণ, বিপদ-আপদে তাদের পাশে এসে দাঁড়ানোর মতো শক্তিশালী স্বজন ছিল। তাঁদের হেফাজত করার মতো কওম ছিল। পক্ষান্তরে ওইসব দুর্বল দাস-দাসীর পক্ষে দাঁড়ানোর মতো কোনো স্বজন ও বন্ধু ছিল না। ফলে অসহায় ও দুর্বল পেয়ে কুরাইশ নেতৃত্বন্দ এদের ওপর চাপিয়েছে নির্যাতনের পাহাড়। এই চরম নির্যাতনের মাধ্যমে তারা সাবধানবার্তা দিতে চাচ্ছিল ওইসব লোককে যারা নতুন করে দেব-দেবী ছেড়ে মুহাম্মাদের অনুসরণ করার কথা মনে মনে ভাবছিল।

এই অসহায় লোকগুলোর ওপর নির্যাতন চালানোর দায়িত্ব নিল একদল কঠিন ও নির্দয় কুরাইশী কাফের। এই দায়িত্ব পালনে সর্বপ্রথম কৃতিত্ব দেখায় আবু জাহল (আল্লাহ তাকে লাঞ্চিত করুক) সুমাইয়া রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহাকে হত্যার মাধ্যমে। আবু জাহল প্রথমে সুমাইয়াকে নির্যাতন করে ক্ষত-বিক্ষত করে। তারপর বিশ্রী ও অশ্লীল গালাগালি করে মানসিক নির্যাতন করে। সবশেষে প্রাণনাশী আক্রমণ করে তার ধারালো বর্শা নিক্ষেপের মাধ্যমে। যা সুমাইয়া রাযিয়াল্লাহু আনহার তলপেটে ঢুকে পিঠ দিয়ে বের হয়ে যায়। সুমাইয়া রাযিয়াল্লাহু আনহা ইসলামের জন্য সর্বপ্রথম জীবন দানকারী নারী শহীদের মর্যাদা লাভ করলেন।

নির্যাতিতা ও শহীদ নারী সুমাইয়া রাযিয়াল্লাহু আনহার অন্য দুর্বল মুসলিমভাইদের প্রতি—যাদের শীর্ষে ছিলেন বেলাল ইবনে রাবাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু, দায়িত্বপ্রাপ্ত ঐ পাষাণহৃদয় কাফেরদের অত্যাচার ছিল চরম অমানবিক ও দীর্ঘ। সূর্য যখন মধ্যাকাশে এসে গনগনে আগুন ঝরাত আর সেই আগুনে তপ্ত হয়ে মরুর বালুকারাশি জ্বলন্ত অঙ্গারের রূপ নিত, তখন তাদের পোশাক খুলে লোহার বর্ম পরিয়ে সেই জ্বলন্ত আগুনে ঝলসানো হতো তাদের শরীর।

আবার কখনো তাদের খোলা পিঠে চাবুকের আঘাতে রক্তাক্ত করে বলত, 'মুহাম্মাদ কে গালি দে, নইলে চাবুক থামবে না।'

অসহ্য অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে, সহ্যের শক্তি ফুরিয়ে গেলে তাঁরা আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি পরিপূর্ণ ঈমান অক্ষুণ্ন রেখেই কাফেরদের চাহিদা পূরণ করে মৌখিক কিছু কথা বলে দিত। একমাত্র বেলাল ইবনে রাবাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন এর ব্যতিক্রম। তিনি কোনো মন্দ কথা অথবা একটি শব্দও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে বলে নিজের জীবন বাঁচানোর চেয়ে বরং সেই জীবন বিলিয়ে দেওয়াই সহজ মনে করেছিলেন।

বেলাল ইবনে রাবাহ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে নির্যাতন করার দায়িত্ব নিয়েছিল উমাইয়া ইবনে খলফ এবং তার পাষাণ হৃদয়ের সঙ্গীরা।

তারা চাবুকের আঘাতে তাঁকে রক্তাক্ত করত আর তিনি বলতেন,
'আল্লাহ এক—অদ্বিতীয়। আহাদ, আহাদ।'

তারা তাঁর বুকের ওপর চাপিয়ে দিত বড় বড় পাথর আর যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে তিনি বলতেন,
'আল্লাহ এক—অদ্বিতীয়। আহাদ, আহাদ।'

তারা যতই তাঁর কষ্টকে তীব্র করে তুলত তিনি বলতেন একটি কথাই,
'আল্লাহ এক—অদ্বিতীয়। আহাদ, আহাদ।'

তারা তাকে জোরাজুরি করত লাত, উয্যা দেব-দেবীর নাম নিতে কিন্তু তিনি অবিরাম ও অবিচলভাবে শুধু আল্লাহ ও মুহাম্মাদ নামই উচ্চারণ করতেন।

তারা বলত, 'আমরা যেভাবে আমাদের দেব-দেবীর নাম যপ করি তুইও সেইভাবে কর।'

বেলাল রাযিয়াল্লাহু আনহু জবাবে বলতেন,
'ওইগুলো আমি ঠিকমত উচ্চারণ করতে পারি না।'

একথা শুনে তারা তাকে আরও বেশি কষ্ট দিত। আরও ভয়ঙ্কর নির্যাতন চালাত। পাপিষ্ঠ ও দুর্বিনীত উমাইয়া ইবনে খলফ যখন নির্যাতন

চালাতে চালাতে ক্লান্ত হয়ে পড়ত তখন বেলাল রাযিয়াল্লাহু আনহুর গলায় মোটা রশি বেঁধে দুষ্ট বালকদের হাতে তুলে দিয়ে বলত,

'একে মক্কার পাহাড়ী উঁচু-নিচু আর উত্তপ্ত মরুর পথ ধরে টেনে হেঁচড়ে ঘুরিয়ে নিয়ে এসো।'

আল্লাহ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান আনার অপরাধে বেলাল রাযিয়াল্লাহু আনহুকে যখন এইভাবে গলায় রশি বেঁধে টেনে নেওয়া হতো, এই রকম লাঞ্ছনাদায়ক ও নৃশংস কষ্ট দেওয়া হতো, এই কষ্ট তার কাছে মজাদার লাগত আর তিনি তখন প্রকৃত ঈমানের স্বাদ উপভোগ করতেন আর অবিরাম গতিতে জান্নাতী সঙ্গীত আওড়াতে থাকতেন। বলতেন,

'আহাদ, আহাদ। আল্লাহ এক—অদ্বিতীয়। তিনিই আমার রব, তিনিই আমার সব।'

অবিরাম আর অক্লান্তভাবে চলতে থাকত তাঁর মুখের এই মধুর সুর।

* * *

আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহু উমাইয়া ইবনে খলফের নিকট থেকে বেলাল রাযিয়াল্লাহু আনহুকে কিনে নেওয়ার প্রস্তাব করলে উমাইয়া বহুগুণ বাড়িয়ে তার মূল্য চাইল। সে ভাবল, এতে আবু বকর আর তাকে কিনতে চাইবে না।

কিন্তু আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু বেলালকে চড়া দামেই অর্থাৎ নয় উকিয়া দিয়ে কিনে নিলেন।

কেনাবেচা সম্পূর্ণ হয়ে যাওয়ার পর উমাইয়া আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বলল,

'তুমি যদি বলতে এক উকিয়ার বেশি হলে কিনবে না। তাহলে আমি এক উকিয়াতেই বেচে দিতাম।'

আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহু তার একথার জবাবে বললেন,

'তুমি যদি বলতে একশো উকিয়ার কমে বেচব না, আমি তবুও তাকে কিনে নিতাম।'

আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানালেন, 'তিনি বেলালকে ক্রয় করে নির্যাতনকারীদের হাত থেকে মুক্ত করেছেন।' এই সংবাদ শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুব খুশি হয়ে বললেন,

'আবু বকর, এত বড় মহৎ কাজ করেছ! এতে আমাকে শরীক করে নাও।'

আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন,

'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি তো এরই মধ্যে তাকে আযাদ করে দিয়েছি। সে এখন মুক্ত।'

* * *

আল্লাহ তাআলা মদীনায় হিজরতের অনুমতি দিলে হিজরতকারীদের সঙ্গে বেলাল রাযিয়াল্লাহু আনহুও মদীনায় হিজরত করলেন। মদীনায় যাওয়ার পর সেখানে বেলাল, আবু বকর সিদ্দীক এবং আমের ইবনে ফেহের রাযিয়াল্লাহু আনহুমের জন্য একই ঘরে থাকার ব্যবস্থা হলো। তারা তিনজনই জ্বরে আক্রান্ত হয়ে পড়লেন। যখনই জ্বর ছেড়ে যেত বেলাল রাযিয়াল্লাহু আনহু গলা ছেড়ে মিষ্টি আওয়াজে আবৃত্তি করতেন :

أَلَا لَيْتَ شِعْرِىْ هَلْ أَبِيْتَنَّ لَيْلَةً

بِفَخٍّ وَحَوْلِىْ إِذْخَرٌ وَجَلِيْلٌ

وَهَلْ أَرِدَنْ يَوْمًا مِيَاهَ مِجَنَّةٍ

وَهَلْ يَبْدُوَنْ لِىْ شَامَةٌ وَطَفِيْلُ

'হায়রে আমার ফেলে আসা মক্কার সেই দিনগুলি কোথায় হারিয়ে গেল! মক্কার অদূরে সুগন্ধ 'ইযখির' ও 'জালীল' ঘাসের ওপর শুয়ে আমি কি আবার 'ফাখ' প্রান্তরে রাত কাটাতে পারব?'

'আবার কি কখনো সেই মধুর স্মৃতির 'মিজান্না' জলাশয়ে নামতে পারব? মক্কার স্মৃতিময় সেই শামা ও তাফীল পাহাড় কি আবার কখনো দেখার সুযোগ হবে?'

মক্কার অলি-গলি, পাহাড়-পর্বত আর উপত্যকার প্রতি বেলাল রাযিয়াল্লাহু আনহুর এই স্মৃতিকাতর হওয়ায় আশ্চর্যের কিছু নেই।

কারণ, ওইখানেই তিনি ঈমানের মিষ্টি স্বাদ উপভোগ করেছিলেন...

সেখানেই তাঁর আল্লাহর সন্তুষ্টি হাসিলের জন্য সেই নির্যাতনকে মনে হয়েছিল জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ অর্জন...

সেখানেই তিনি শয়তান আর নফসের ওপর প্রবলভাবে জয়ী হয়েছিলেন...

* * *

বেলাল রাযিয়াল্লাহু আনহু মদীনায় এসে কুরাইশের নির্যাতনমুক্ত স্বাধীন জীবনের অধিকারী হলেন। এখানে তিনি প্রিয়তম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য নিজেকে সকল ঝামেলা ও ব্যস্ততা থেকে মুক্ত করে রাখলেন।

তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গী হতেন যখন তিনি বাইরে যেতেন এবং যখন তিনি বাড়ি ফিরতেন।

নবীজী যখন নামায পড়তেন বেলালও তাঁর সঙ্গে নামায আদায় করতেন।

নবীজী যুদ্ধে গেলে বেলালও তাঁর সহযোদ্ধা হতেন।

এভাবেই ধীরে ধীরে তিনি হয়ে উঠলেন প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিত্যসঙ্গী। ছায়ার মতো তাঁকে সারাক্ষণ অনুসরণ করতেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মদীনার মসজিদ তৈরি করলেন এবং নামাযের জন্য আযানের প্রচলন শুরু হলো, বেলাল রাযিয়াল্লাহু আনহু হলেন ইসলামের সর্বপ্রথম মুআযযিন।

প্রতি ওয়াক্তেই তিনি আযান শেষ করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে বলতেন,

'হাইয়া আলাস সালাহ... হাইয়া আলাল ফালাহ...'

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নিজ কামরা থেকে বের হতেন, তাঁকে মসজিদের দিকে এগিয়ে আসতে দেখলে বেলাল রাযিয়াল্লাহু আনহু নামাযের একামত শুরু করতেন।

* * *

হাবশার বাদশা নাজাশী একবার রাজা-বাদশাদের পারস্পরিক মহামূল্যবান বস্তুর বিনিময় স্বরূপ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উপহার দেন তিনটি ছোট বর্শা। তিনি নিজের জন্য একটি রেখে অন্য দুটোর একটি দেন আলী ইবনে আবী তালেবকে এবং একটি উমর ইবনুল খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহুমাকে।

নিজের জন্য রেখে দেওয়া বর্শাটি তিনি দেন বেলাল রাযিয়াল্লাহু আনহুকে। সেটা নিয়েই তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগে আগে চলতেন।

দুই ঈদের নামাযে, এস্তেস্কার নামাযের সময়ও সেটাকে তিনি সঙ্গে রাখতেন। মসজিদ ছাড়া কোনো খোলা স্থানে নামাযের সময় তিনি সেটা রাসূলের সম্মুখে গেড়ে রাখতেন।

* * *

বেলাল রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে বদরযুদ্ধে উপস্থিত হয়েছিলেন। সেখানে তিনি নিজের চোখে দেখেন কিভাবে মহান আল্লাহ নিজের ওয়াদা পূরণ করলেন। কিভাবে আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্যকারী মুসলিমসেনাদলের সাহায্য করলেন। যারা তার ওপর মক্কায় চরম অমানবিক ও নৃশংস অত্যাচার চালাত, বদর প্রান্তরে তিনি সেই অবাধ্য মুশরিকদের পরাজয় ও পতন দেখতে পেলেন।

সেদিন তিনি বদর প্রান্তরে মক্কার দুর্জয়-দুর্বিনীত দুই মুশরিক নেতা আবু জাহল ও উমাইয়া ইবনে খলফের প্রাণহীন দেহ দুটো অবহেলায় পড়ে থাকতে দেখেন। মুসলিম-মুজাহিদদের তরবারি যাদের কুপোকাত করে ফেলেছিল আর মক্কায় তাদের হাতে নির্যাতিত দুর্বল মুসলিমদের বর্শা যাদের রক্ত পান করেছিল।

* * *

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের দিন যখন বিজয়ী বেশে মক্কায় প্রবেশ করছিলেন তখন তাঁর সঙ্গে ছিলেন নামাযের আহ্বানকারী মুআযযিন বেলাল রাযিয়াল্লাহু আনহু।

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কাবা শরীফের ভেতরে প্রবেশ করলেন তখন তাঁর সঙ্গী হওয়ার বিরল সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন মাত্র তিনজন ব্যক্তি :

কাবা শরীফের চাবি বহনকারী উসমান ইবনে তালহা রাযিয়াল্লাহু আনহু।

রাসূলের প্রিয়পাত্র ও প্রিয়পাত্রের পুত্র উসামা ইবনে যায়েদ রাযিয়াল্লাহু আনহুমা।

রাসূলের মুআযযিন বেলাল ইবনে রাবাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু।

যখন যোহরের সময় ঘনিয়ে এল, হাজার হাজার মানুষ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চারপাশে ভিড় করেছিল।

কুরাইশী কাফেরদের মধ্যে থেকে যারা ইচ্ছা বা অনিচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করেছিল, তারা রাসূলকে ঘিরে থাকা বিশাল সমাবেশকে বিস্ময়ভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখছিল।

সেই মুহূর্তে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ডাকলেন বেলাল ইবনে রাবাহ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে। তাকে আদেশ করলেন কাবার ছাদে চড়ে আল্লাহর একত্ব ও অদ্বিতীয়তার বা তাওহীদের বাণী

সম্বলিত 'আযান' সুউচ্চ কণ্ঠে প্রচার করতে। বেলাল রাযিয়াল্লাহু আনহু আদেশ মতো কাবার ছাদে চড়ে উচ্চ আওয়াজে আযান দেওয়া শুরু করলেন।

হাজার হাজার মানুষ মাথা উঁচু করে সেই দিকে তাকিয়ে রইলেন আর বেলালের বলা শেষ হলে আযানের একই বাক্য জবাব হিসাবে হাজার হাজার কণ্ঠে পুনরায় ধ্বনিত হতে থাকল।

আর যাদের অন্তরে ছিল ভেজাল ঈমানের ব্যাধি, হিংসা তাদের অন্তরগুলোকে কুঁড়ে খাচ্ছিল। বিদ্বেষ তাদের হৃদয়গুলোকে চৌচির করে দিচ্ছিল।

আযানে যখন বেলাল রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন,

أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُوْلُ اللّٰه

'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল।'

আবু জাহলের মেয়ে জুওয়াইরিয়া সেটা শুনে বলে উঠলেন,

'আমার জীবনের কসম! একথা সত্য যে, আল্লাহ আপনার (মুহাম্মাদের) মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন এবং আপনার নাম ও চর্চা সমুন্নত করে দিয়েছেন...

নামায আমরা পড়ব বটে কিন্তু আল্লাহর কসম! আমাদের আপনজনদের যারা হত্যা করেছে, তাদের আমরা কিছুতেই পছন্দ করব না।'

তার পিতা বদর যুদ্ধে নিহত হয়েছিল।

আরেকজন ভেজাল ঈমানওয়ালা খালেদ ইবনে উসাইদ বলল,

'আল্লাহর প্রশংসা ও শুকরিয়া আদায় করছি যে তিনি আমার বাবার সন্মান রক্ষা করেছেন। কারণ, আজকের এই দুর্দিন তাকে দেখতে হয়নি।'

মক্কা বিজয়ের মাত্র একদিন পূর্বেই তার বাবার মৃত্যু হয়েছিল।

হারেস ইবনে হিশাম বলল,

'হায় কী সর্বনাশ হয়ে গেল, কাবার ছাদে বেলালকে দেখার আগেই যদি মরে যেতাম!'

হাকেম ইবনে আবুল আস বলল,

'হায় হায়! কাবার মতো সন্মানজনক ঘরের উপরে উঠে এই বাঁদীর বাচ্চা গাধার মতো চিৎকার করছে, আল্লাহর কসম এটা একটা ভয়াবহ দুর্ঘটনা।'

আবু সুফিয়ান ইবনে হারব ছিলেন তাদের সঙ্গে, তিনি বললেন,

'আমি এই মুহূর্তে একটি কথাও বলব না। কারণ, আমার মুখ দিয়ে একটি কথাও যদি বের হয় তাহলে এই পাথর-কণাও গিয়ে মুহাম্মাদের কাছে বলে দিয়ে আসবে।'

* * *

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হায়াতের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত বেলাল রাযিয়াল্লাহু আনহু মসজিদে নববীতে মুআযযিন হিসাবে দায়িত্ব পালন করতে থাকেন। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেলাল রাযিয়াল্লাহু আনহুর কণ্ঠে আযান পছন্দ করতেন। কারণ, এই কণ্ঠই আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার অপরাধে চরম নিষ্ঠুর নির্যাতনে নিষ্পেসিত হয়ে বারবার উচ্চারণ করেছে, আহাদ... আহাদ, আল্লাহ... আল্লাহ।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের পর তাঁর শরীর মুবারক কাফনে জড়ানো অবস্থায় তখনো পৃথিবীর বুকে বিদ্যমান... যখন নামাযের সময় হলো, বেলাল রাযিয়াল্লাহু আনহু আযান দিতে দাঁড়ালেন। যখন বলতে গেলেন,

أَشْهَدُ أَنَّ مُحُمَّداً رَسُوْلُ اللّٰه

উদ্গাত কান্নার দমক তাঁর কণ্ঠরোধ করে দিল, আযানের আওয়াজ কণ্ঠনালিতে আটকে গেল, মুখ দিয়ে বের হতে পারল না।

[illegible] বিরহ বেদনায় বেলালের সঙ্গে অন্য মুসলিমরাও কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। এই বেদনাভেজা ঘটনার পর আরও তিন দিন তিনি আযান দেন।

সেই তিন দিন প্রত্যেকবার আযান দিতে গিয়ে যখনই বলতে গেছেন,

أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُوْلُ اللّٰه

তখনই তিনি ডুকরে কেঁদেছেন আর তাঁর কান্না দেখে মুসলিম-জাতি কেঁদেছেন।

এই তিন দিনের আযানের অভিজ্ঞতার পর তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রথম খলীফা আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহুর কাছে আযানের দায়িত্ব থেকে অব্যহতি কামনা করেন। কারণ, রাসূলের অবর্তমানে তিনি আযান দিতে পারছেন না।

তিনি জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ এবং সিরিয়ায় ইসলামী সাম্রাজ্যের সীমান্ত পাহারায় নিজেকে নিয়োজিত রাখার আগ্রহ জানিয়ে খলীফার অনুমোদন চাইলেন। আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহু বেলাল রাযিয়াল্লাহু আনহুর আবেদন গ্রহণ করতে এবং বিশেষভাবে তাকে মদীনা ছেড়ে যাওয়ার অনুমতি দিতে দ্বিধা করছিলেন। খলীফার দ্বিধা বুঝতে পেরে বেলাল রাযিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে বললেন,

'আপনি আমাকে ক্রয় করেছিলেন, সেটা যদি নিজের জন্য করে থাকেন তাহলে আমাকে আটকে রাখুন। আর যদি আল্লাহর জন্য করে থাকেন তাহলে সেই আল্লাহর জন্যই আমার রাস্তা ছেড়ে দিন।'

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন,

'আল্লাহর কসম! আমি শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য তোমাকে ক্রয় করেছিলাম এবং তাঁর জন্যই তোমাকে মুক্ত করেছিলাম।'

বেলাল রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন,

'আল্লাহর রাসূলের নির্দেশে আমি আযানের দায়িত্ব পালন করতাম। তিনি এই দুনিয়া ছেড়ে চলে গেছেন। এখন আর কারও হুকুমে আযান দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন,

'ঠিক আছে তোমার ইচ্ছা পূরণ হোক। আমি তোমাকে বাধা দেব না।'

* * *

মুসলিম-মুজাহিদবাহিনীর সঙ্গে বেলাল রাযিয়াল্লাহু আনহু মদীনা ছেড়ে চলে গেলেন এবং দামেস্কের কাছে 'দারাইয়া'তে থাকা শুরু করলেন। তিনি আর আযান দিতেন না। নিজেকে ঐ পুরাতন স্মৃতি থেকে গুটিয়ে রাখতেন। কিন্তু এর কিছুদিনের মধ্যে উমর ইবনুল খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহু সফরে এলেন সিরিয়াতে। দীর্ঘদিন পর বেলাল রাযিয়াল্লাহু আনহুর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়ে গেল।

উমর ফারুক রাযিয়াল্লাহু আনহু এমনিতেই বেলালকে খুব ভালোবাসতেন এবং খুবই মর্যাদার সঙ্গে তাঁকে স্মরণ করতেন। এমনকি আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে তাঁর সামনে আলোচনার প্রসঙ্গ এলে তিনি বলতেন,

إِنَّ أَبَا بَكْرٍ سَيِّدُنَا وَهُوَ الَّذِىْ أَعْتَقَ سَيِّدَنَا

'আবু বকর আমাদের একজন নেতা আর তিনিই আযাদ করেছিলেন আমাদের অন্য নেতা বেলালকে।'

দুইজনের এই গভীর অন্তরঙ্গতার ভিত্তিতে উপস্থিত সাহাবায়ে কেরাম চাইলেন, উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর আগমন উপলক্ষে বেলাল আরেকবার আযান দিন। তাদের ইচ্ছায় বেলাল রাযিয়াল্লাহু আনহু আযান দিলেন। সেই সুর তাদের সকলকেই স্মৃতিকাতর করে তুলল। উমর ফারুকসহ সকল সহাবী এত কাঁদলেন যে চোখের পানিতে দাড়ি ভিজে গেল।

মূলত বেলালের এই আযান তাঁদের সকলকেই কিছু সময়ের জন্য টেনে নিয়ে গিয়েছিল হারানো সেই দিনগুলোতে। মদীনায় রাসূলের সান্নিধ্যে কাটানো তাঁদের সোনালী অতীতে।

* * *

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুআযযিন বেলাল রাযিয়াল্লাহু আনহু মৃত্যুর চূড়ান্ত মুহূর্ত পর্যন্ত দামেস্ক অঞ্চলে বসবাস করতে থাকেন। মৃত্যুর পূর্বক্ষণে তাঁর পাশে বসে স্ত্রী বলছিলেন, 'হায় হায় কত কষ্ট!'

তিনি চোখ মেলে তাকিয়েই স্ত্রীর কথার জবাবে বলছিলেন,

'আহ কত আনন্দ!'

শেষ কয়েকটি নিঃশ্বাসের সঙ্গে তিনি অতি আনন্দে আবৃত্তি করছিলেন,

غَدًا نَلْقى الْأَحِبَّهْ – مُحَمَّدًا وَصَحْبَهْ

غَدًا نَلْقى الْأَحِبَّهْ – مُحَمَّدًا وَصَحْبَهْ

'এখনই অপেক্ষার পালা শেষ হবে। একটু পরেই আপনজনদের সাক্ষাৎ পাব। প্রিয় নবী আর তাঁর সাহাবীগণের সঙ্গে মিলিত হব।'

তথ্যসূত্র :

১. *আল-ইসাবা*, ১ম খণ্ড ১৬৫ পৃষ্ঠা অথবা *আত্তারজামা*, ৭৩৬।
২. *আল-ইসতীআব* (আল-ইসাবার টীকা), ১ম খণ্ড, ১৪১ পৃষ্ঠা।
৩. *উসদুল গাবাহ*, ১ম খণ্ড, ২০৬ পৃষ্ঠা।
৪. *তাহযীবুত তাহযীব*, ১ম খণ্ড, ৫০২ পৃষ্ঠা।
৫. *তাজরীদু আসমাইস সাহাবাহ*, ১ম খণ্ড, ৬০ পৃষ্ঠা।
৬. *আল-জামউ বাইনা রিজালিস সাহীহাইন*, ১ম খণ্ড, ৬০ পৃষ্ঠা।
৭. *হুলইয়াতুল আউলিয়া*, ১ম খণ্ড, ১৪৭ পৃষ্ঠা।
৮. *সিফাতুস সফওয়া*, ১ম খণ্ড, ১৭১ পৃষ্ঠা।
৯. *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, ১ম খণ্ড, ২৫১ পৃষ্ঠা।
১০. *ইবনে কাসীর*, ৭ম খণ্ড, ১০২ পৃষ্ঠা।
১১. *তারীখুল ইসলাম লিয-যাহাবী*, ২য় খণ্ড, ৩১ পৃষ্ঠা।
১২. *আল-আলাম ওয়া তারাজিমুহু* ।

হাবীব ইবনে যায়েদ আল-আনসারী

আল্লাহ তোমাদেরকে বরকত দান করুন, আল্লাহ তোমাদের ওপর রহম করুন। আহলে বাইতের পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য এই কৃতজ্ঞতা ও প্রার্থনা।

–হাবীব ও তাঁর পরিবারের জন্য রাসূলের প্রশংসা ও দুআ।

এমন একটি ঘর ও পরিবার যার প্রতিটি কোণ ঈমানের সুবাস ছড়ায়...

যার প্রতিটি সদস্যের কপালের লেখা (ভাগ্য) থেকে ত্যাগ ও আত্মোৎসর্গের নানানচিত্র প্রকাশ পায়...

এমনই একটি মহৎ পরিবারে হাবীব ইবনে যায়েদের জন্ম হয় এবং এই পরিবারের আলো-বাতাসেই তিনি বেড়ে ওঠেন।

* * *

তাঁর পিতার নাম যায়েদ ইবনে আসেম। যিনি মদীনা থেকে ইসলাম গ্রহণকারীদের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিত্ব। যে সত্তরজন মদীনাবাসী 'আকাবায়' উপস্থিত হয়ে রাসূলের হাতে হাত রেখে বাইয়াত গ্রহণ করেছিলেন, তিনি ছিলেন তাদের অন্যতম। তাঁর সঙ্গী তাঁর স্ত্রী ও দুই সন্তান।

হাবীব ইবনে যায়েদের মা উম্মে উমারা নাসীবা আল-মাযেনিয়্যা। যিনি দীনুল্লাহর (ইসলামের) হেফাজত ও রাসূলুল্লাহর ওপর থেকে শত্রুদের আক্রমণ ফেরানোর উদ্দেশ্যে অস্ত্রধারণকারিনী সর্বপ্রথম নারী।

তাঁর ভাই আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ যিনি 'ওহুদ' যুদ্ধের দিন নিজের গলা ও বুককে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গলা ও বুক থেকে কাফেরদের আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য ঢাল হিসাবে ব্যবহার করেছিলেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই সকল কারণে এই পরিবারের প্রশংসা ও দুআ করে বলেন,

'আল্লাহ তোমাদেরকে বরকত দান করুন, আল্লাহ তোমাদের ওপর রহম করুন। আহলে বাইতের পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য রইল এই কৃতজ্ঞতা ও প্রার্থনা।'

* * *

তরতাজা ও দূরন্ত বালক বয়সেই হাবীব ইবনে যায়েদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর অন্তরে প্রবেশ করেছিল ঈমানের নূর। সে কারণে তাঁর হৃদয়ে ঈমানের শক্তি ছিল সুদৃঢ় ও মজবুত।

ভাগ্যের লিখন হিসাবে অদূর ভবিষ্যতে ইতিহাস গড়বেন বলে ছোট্ট বালক বয়সেই তিনি পিতা-মাতা, খালা ও ভাইয়ের সঙ্গে সত্তরজন ব্যক্তির মর্যাদাবান কাফেলায় শরীক হয়ে মক্কায় গিয়েছিলেন। রাতের অন্ধকারে নিজের ছোট্ট হাত বাড়িয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে হাত রেখে আকাবার বাইয়াত গ্রহণ করেছিলেন।

সেই মুহূর্ত থেকেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হয়ে ওঠেন তাঁর কাছে পিতা-মাতার চেয়ে বেশি আপন আর ইসলাম হয়ে ওঠে জীবনের চেয়েও বেশি মূল্যবান।

* * *

খুব বেশি ছোট হওয়ার কারণে হাবীব ইবনে যায়েদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বদর যুদ্ধে অংশ নিতে পারেননি

'ওহুদ' যুদ্ধে অংশগ্রহণের মর্যাদা তার নামে লিখিত না হওয়ার কারণও এটাই যে তখন পর্যন্ত তিনি অস্ত্রধারণের যোগ্য হয়ে ওঠেননি।

তবে পরবর্তী সবগুলো যুদ্ধেই তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে অংশ নিয়েছিলেন। সবগুলো যুদ্ধে তিনি মুসলিমবাহিনীর পতাকার মর্যাদা সমুন্নত করেছিলেন...

সাহস আর বীরত্ব প্রদর্শন করে...
কৌশল আর নৈপুণ্য দেখিয়ে ....
দৃঢ়তা, ত্যাগ ও আত্মত্যাগের সাক্ষর রেখে।

তবে হাবীব ইবনে যায়েদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর পরবর্তী জীবনের যে কাহিনীটি আমি একটু পরেই বলতে যাচ্ছি, সেটার সঙ্গে তুলনা করলে এই সকল ভয়াবহ ও বিস্ময়কর যুদ্ধের অভিজ্ঞতাকে 'পূর্বপ্রস্তুতি'র চেয়ে বেশি কিছু বলা যায় না। সেই লোমহর্ষক কাহিনী পাঠকের হৃদয়ে সুনামির মতো ঝড় তুলবে যেমন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগ থেকে আমাদের এই আজকের যুগ পর্যন্ত লক্ষ লক্ষ মুমিন-মুসলিমের হৃদয়ে তুলেছে।

সে হৃদয় বিদারক কাহিনী পাঠককে হতবাক করবে যেমন করেছে যুগের পর যুগ, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে কোটি কোটি মুসলিম অন্তরকে।

তাহলে আসুন শুরু করা যাক সেই নৃশংস ও বর্বর কাহিনী একেবারে শুরু থেকে।

* * *

হিজরতের নবম বর্ষে। ততদিনে ইসলাম ও ইসলামী রাষ্ট্র সগৌরবে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে গেছে। তখন আরবের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিভিন্ন

গোত্রের প্রতিনিধি দল মদীনায় এসে ভিড় করছিল। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ইসলাম কবুলের ঘোষণা দেওয়া এবং তাঁর হাতে আনুগত্যের বাইয়াত করাই ছিল এই সকল গোত্রের কাজ। এই সকল প্রতিনিধি দলের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ্য হানীফা গোত্রের দল। যারা এসেছিল নজদের উঁচু অঞ্চল থেকে।

* * *

এই প্রতিনিধি দলের লোকেরা মদীনার কাছাকাছি এসে তাদের উটবহর থামাল এবং উটবহর ও মালামাল পাহারা দেওয়ার জন্য 'মুসাইলামা ইবনে হাবীব আল হানাফী'কে দায়িত্বে রেখে তারা সকলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে চলে গেল। তারা নিজেদের ও তাদের কওমের ইসলাম কবুল করার ঘোষণা দিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই প্রতিনিধি দলের আগমনে খুব খুশি হলেন এবং এই প্রতিনিধি দলের প্রত্যেককে হাদিয়া দেওয়ার নির্দেশ দিলেন এমনকি উটবহরের কাছে রেখে আসা সদস্যের জন্যেও একই রকম হাদিয়া পাঠানোর ব্যবস্থা করলেন।

* * *

ফেরার পথে এই প্রতিনিধি দল 'নজদে' পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গেই সেই পাহারাদার সদস্য 'মুসাইলামা ইবনে হাবীব' ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে মুরতাদ হয়ে গেল।

লোকজনের কাছে প্রচার করতে লেগে গেল :

'আমি একজন প্রেরিত নবী। আল্লাহ আমাকে হানীফা গোত্রের জন্য নবী হিসাবে পাঠিয়েছেন যেমনি ভাবে মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহকে কুরাইশ বংশের কাছে নবী হিসাবে পাঠিয়েছেন।'

এই ঘোষণার পর তার কওমের লোকেরা নানা অজুহাতে তাকে সমর্থন দিয়ে তার পাশে এসে সমবেত হতে থাকল। প্রধান অজুহাতটি

ছিল বংশ ও গোত্রপ্রীতি। এ কথার প্রমাণ মেলে তার জনৈক সমর্থকের কথায়। সে বলে,

أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا لَصَادِقٌ وَأَنَّ مُسَيْلَمَةَ لَكَذَّابٌ، وَلكِنَّ كَذّابَ رَبِيْعَةَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ صَادِقِ مُضَرَ.

'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ অবশ্যই সত্যবাদী আর মুসাইলামা মিথ্যুক, কিন্তু রাবীআ গোত্রের মিথ্যাবাদীই আমার কাছে কুরাইশ গোত্রের সত্যবাদী নবীর চেয়ে বেশি পছন্দনীয়।'

* * *

ভণ্ড নবুওয়াতের দাবিদার মুসাইলামার প্রতি সমর্থন দানকারী ও তার অনুসারীর দল বেশ বড়সড় হয়ে গেলে সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট একটি চিঠি পাঠায়। সেই চিঠি ছিল এই রকম,

مِنْ مُسَيْلَمَةَ رَسُوْلِ اللهِ إِلى مُحَمَّدٍ رَسُوْلِ اللهِ، سَلَامٌ عَلَيْكَ .....

أَمَّا بَعْدُ! فَإِنِّيْ أُشْرِكْتُ فِيْ الْأَمْرِ مَعَكَ، وَإِنَّ لَنَا نِصْفَ الْأَرْضِ وَلِقُرَيْشٍ نِصْفَ الْأَرْضِ، وَلكِنَّ قُرَيْشًا قَوْمٌ يَعْتَدُوْنَ .

'আল্লাহর রাসূল মুসাইলামার পক্ষ থেকে আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদের প্রতি-

আস্‌সালামু আলাইকুম,

বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ এই যে, আমাকেও আপনার মতো নবুওয়াত দান করে আপনার সঙ্গে নবুওয়াতের দায়িত্ব পালনের আদেশ করা হয়েছে। আরব ভূখণ্ডের অর্ধেক থাক.ব আমাদের আর বাকি অর্ধেক কুরাইশের। তবে কুরাইশ একটি সীমা৷ লঙ্ঘনকারী কওম।'

মুসাইলামা তার দু'জন অনুসারীর মাধ্যমে এই চিঠি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে পৌঁছে দিল। তাঁকে যখন চিঠিটা পড়ে শোনানো হলো, তিনি মুসাইলামার সমর্থক লোক দুটোকে প্রশ্ন করলেন,

'তোমাদের বক্তব্য কী?'

তারা জবাব দিল,

'আমাদের আলাদা কোনো বক্তব্য নেই। মুসাইলামার কথাই আমাদের কথা।'

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের বললেন,

'দূতদের হত্যা নিষিদ্ধ না হলে আমি তোমাদের দু'জনেরই শিরচ্ছেদ করে ফেলতাম।'

এরপর তিনি মুসাইলামার কাছে চিঠি লিখলেন,

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ

مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُوْلِ اللهِ إِلى مُسَيْلَمَةَ الْكَذَّابِ .

أَلسَّلَامُ عَلى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدى، أَمَّا بَعْدُ.... فَإِنَّ الْأَرْضَ لِلّهِ يُوْرِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِه وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ .

'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদের পক্ষ থেকে ভণ্ড ও মিথ্যুক মুসাইলামার প্রতি।

ইসলাম ও হেদায়াতের অনুসারীর প্রতি সালাম। সন্দেহ নেই যে সমগ্র ভূখণ্ডের নিরঙ্কুশ মালিক একমাত্র আল্লাহ। তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে যাকেই তাঁর ইচ্ছা এর আধিপত্য দান করেন। আর চূড়ান্ত শুভ পরিণতি শুধু তাদের জন্য যারা আল্লাহকে ভয় করে এবং তাঁর হুকুম মেনে চলে।'

মুসাইলামার উদ্দেশ্যে লেখা এই চিঠি তিনি দূত দু'জনের মাধ্যমেই পাঠিয়ে দিলেন।

* * *

মুসাইলামাতুল কায্যাবের মিথ্যা নবুওয়াতের দাবি এবং তার প্রতি সমর্থন দানকারী গোষ্ঠীর সংখ্যা দিন দিন বাড়তে লাগল। মিথ্যা নবুওয়াতের ফেতনা চারদিক ছড়িয়ে পড়ল। সেই সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে এই অশুভ তৎপরতা থেকে নিবৃত্ত হওয়ার জন্য সতর্ক করে তার উদ্দেশ্যে চিঠি লিখলেন। এই চিঠি পৌঁছানোর জন্য নির্বাচন করলেন আমাদের এই কাহিনীর প্রাণপুরুষ হাবীব ইবনে যায়েদ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে।

সে সময় তিনি ছিলেন পরিপূর্ণ এক টগবগে যুবক। ছিলেন আপাদ-মস্তক পূর্ণাঙ্গ ঈমানের এক জীবন্ত প্রতিচ্ছবি।

* * *

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশে তাঁর চিঠি নিয়ে হাবীব ইবনে যায়েদ রাযিয়াল্লাহু আনহু রওনা হলেন। কোনো বিশ্রাম ও বিলম্ব না করে পাহাড়-পর্বত, উঁচু-নিচু, সমতল-অসমতল সকল কিছু পেরিয়ে এক সময় তিনি নজদের উঁচু এলাকায় হানীফা গোত্রের জনবসতিতে পৌঁছলেন। রাসূলের চিঠি মুসাইলামার উদ্দেশ্যে সমর্পণ করলেন।

রাসূলের চিঠির বক্তব্য শোনার সঙ্গে সঙ্গেই মুসাইলামার বুকের মধ্যে হিংসা ও বিদ্বেষের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। তার চোখে মুখে নৃশংসতা ও কুৎসিত হত্যার ইঙ্গিত ফুটে উঠল। সে হাবীব ইবনে যায়েদ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বন্দী করে পরের দিন দুপুরে তার দরবারে হাজির করার নির্দেশ দিল।

পরের দিন মুসাইলামাতুল কায্যাব মজলিসের সভাপতির আসনে বসল। তার ডানে ও বামে কয়েকজন প্রধান মুরতাদ আনুসারীকে বসাল। সর্ব সাধারণের জন্য সেখানে প্রবেশের সুযোগ রাখা হলো। এরপর মুসাইলামার নির্দেশে সেখানে হাবীব ইবনে যায়েদ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে হাজির করা হলো। ভারী শিকল পরানো সাহাবী ধীর পায়ে হাঁটছিলেন।

* * *

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাঠানো দূত হাবীব ইবনে যায়েদ রাযিয়াল্লাহু আনহু সেই বিশাল, বিদ্বেষী সমাবেশের মাঝে শিকলবন্দী অবস্থায় বুক ফুলিয়ে, মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে রইলেন একজন নির্ভিক লৌহমানবের মতো।

মুসাইলামা তাঁকে লক্ষ্য করে বলল,
'তুমি কি মুহাম্মাদকে আল্লাহর রাসূল বলে সাক্ষ্য দাও?'

হাবীব ইবনে যায়েদ রাযিয়াল্লাহু আনহু উত্তরে বললেন,
'অবশ্যই আমি সাক্ষ্য দেই যে মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল।'

রাগে ও কষ্টে মুসাইলামার গায়ে যেন আগুন লেগে গেল। সে আবার প্রশ্ন করল,
'তুমি কি এটা স্বীকার করো, আমি আল্লাহর রাসূল?'

হাবীব ইবনে যায়েদ রাযিয়াল্লাহু আনহু এই প্রশ্নের উত্তরে পরিহাস করে বললেন, 'আমার কানে সমস্যা আছে, তোর কথা শুনতে পাচ্ছি না।'

এই রকম নির্ভিক ঠাট্টা মুসাইলামাকে উন্মাদ করে দিল। রাগের চোটে তার চেহারার রঙ পাল্টে গেল, ঠোঁট কাঁপতে থাকল। চিৎকার করে জল্লাদকে হুকুম দিল,

'ওর ডান হাত কেটে ফেল।'

জল্লাদ তরবারির এক কোপে তাঁর ডান হাত কেটে ফেলল। কেটে ফেলা হাত মাটির ওপর গড়াগাড়ি খেতে থাকল।

মুসাইলামা একই প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করে বলল,
'তুমি কি সাক্ষ্য প্রদান করো যে মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল?'

জবাবে তিনি বললেন,
'অবশ্যই সাক্ষ্য প্রদান করি যে মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল।'

মুসাইলামা আবার প্রশ্ন করল,
'তুমি কি বিশ্বাস করো যে আমি আল্লাহর রাসূল?'

হাবীব ইবনে যায়েদ রাযিয়াল্লাহু আনহু আবারও নির্ভয়ে নিঃসংকোচে উত্তর দিলেন,
'আমি তো আগেই বলেছি, তোর কথা আমার কানে ঢুকছে না।'

তখন সে জল্লাদকে হুকুম দিল বাম হাত কেটে ফেলতে। এক কোপে বাম হাত কেটে ফেলা হলে সেই কাটা হাতটি গড়াতে গড়াতে আগের হাতটির কাছে গিয়ে থামল।

উপস্থিত সকলে আতঙ্কিত দৃষ্টিতে এই নিদারুন, নিষ্ঠুর, অমানবিক, পৈশাচিক ও ঘৃণ্য আচরণ হা করে দেখতে থাকল। তার জিদ ও গোঁয়ার্তুমিতে সকলেই হতবাক হয়ে রইল।

এভাবেই মুসাইলামাতুল কায্‌যাব প্রশ্নের ধারা চালু রাখল, আর জল্লাদ একটার পর একটা অঙ্গ কাটতে থাকল। অন্যদিকে হাবীব ইবনে যায়েদ রাযিয়াল্লাহু আনহু ঈমানের অগ্নিপরীক্ষায় পরিপূর্ণ সফলতার সাক্ষর রেখে প্রতিবার প্রশ্নের উত্তরে বলতে থাকলেন,

'আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ।'

এভাবেই এক এক করে তাঁর দেহের কেটে ফেলা অর্ধেক অংশ খণ্ড খণ্ড হয়ে পাশেই মাটির ওপর পড়ে রইল আর বাকি অর্ধেক দেহ একটি বড় অংশের আকারে কালেমা শাহাদাত বলতে থাকল...

প্রাণপাখি দেহ মোবারক ছেড়ে উড়ে গেল জান্নাতের পথে, জবান মোবারকে তখনও লেগে থাকল প্রিয়তম সেই নবীর নাম যাঁর হাতে আকাবার রাতে আমরণ আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ঈমানকে আঁকড়ে ধরে থাকার শপথ নিয়েছিলেন...

লেগে থাকল মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম...

* * *

হাবীব ইবনে যায়েদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর এই নৃশংস শাহাদাতের সংবাদ শুনলেন তাঁর মা নাসীবাহ আল-মাযেনিয়্যাহ রাযিয়াল্লাহু আনহা। এত বড় শোক সংবাদ শুনে তিনি বিন্দুমাত্র বিচলিত হলেন না। সকল দুঃখ-কষ্ট ও বেদনাকে বুকের মাঝে লুকিয়ে রেখে উত্তম ধৈর্যধারণের নজির সৃষ্টি করলেন। আল্লাহর কাছে এর জন্য সর্বোত্তম বিনিময় পাবার আশায় বুক বাঁধলেন।

ইয়ামামা যুদ্ধের ঘোষণা দিলেন আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহু। মুসাইলামাতুল কায্যাব ও তার মুরতাদবাহিনীকে চিরতরে খতম করার জন্য প্রস্তুত করলেন ইসলামীবাহিনী। এই বাহিনীর নেতৃত্বের দায়িত্ব ও পতাকা তুলে দিলেন আল্লাহর তরবারি নামে খ্যাত খালেদ ইবনুল ওয়ালীদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর হাতে।

এই বাহিনীর সঙ্গে অন্যদের পাশাপাশি বিশেষভাবে শামিল হলেন দুর্জয় ও দুঃসাহসী নারী মুজাহিদ নাসীবা আল-মাযেনিয়্যাহ এবং তাঁর বড় ছেলে আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ রাযিয়াল্লাহু আনহুম। তাদের দু'জনের ইচ্ছা ছিল আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করার।

আরও একটি ইচ্ছা ছিল, আল্লাহর দুশমন ও শহীদ হাবীব ইবনে যায়েদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর প্রতি লোমহর্ষক নির্যাতনকারী মুসাইলামা থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করা।

* * *

ইয়ামামার প্রচণ্ড যুদ্ধের দিন দেখা গেল নাসীবা আল-মাযেনিয়্যাহ আহত সিংহীর মতো শত্রুদের কাতার ভেদ করে সামনে এগিয়ে যাচ্ছেন আর চিৎকার করছেন,

'কোথায় আল্লাহর দুশমন? আমাকে চিনিয়ে দাও...'

যখন তিনি মুসাইলামার কাছে পৌঁছে গেলেন, দেখলেন তার নিহত দেহ মাটিতে পড়ে আছে। মুসলিম-মুজাহিদদের তরবারি তার রক্ত পান করে আগেই তৃষ্ণা মিটিয়ে ফেলেছে। দেখে তিনি খুশি হলেন...

তাঁর চোখ জুড়িয়ে গেল... কেন হবে না?

আল্লাহ কি তাঁর তরুণ বয়সী নেক সন্তানের হত্যার শাস্তি হতভাগা, জালেম হত্যাকারীকে দেননি?

অবশ্যই... তারা দু'জনেই পৌঁছে গেছে আল্লাহর দরবারে...

তবে একজনের ঠিকানা হয়েছে জান্নাতে...

আর অন্যজনের জাহান্নামের অতল তলে...

তথ্যসূত্র :

১. *উসদুল গাবাহ*, ১ম খণ্ড, ৪৪৩ পৃষ্ঠা অথবা *আত্তারজামা*, ১০৪৯।
২. *আনসাবুল আশরাফ*, ২৫০ ও ৩২৫ পৃষ্ঠা।
৩. *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, ৪র্থ খণ্ড, ৩১৬ পৃষ্ঠা।
৪. *আস-সীরাতুন্নববিয়্যাহ* লিবনি হিশাম, সূচিপত্র দ্রষ্টব্য।
৫. *আল-ইসাবা*, ১ম খণ্ড, ৩০৬ পৃষ্ঠা অথবা *আত্তারজামা*, ১৫৮৪।
৬. *শুহাদাউল ইসলাম ফী আহদিন নবুওয়াহ লিন নাশার*।
৭. *আল-ইসতীআব* (*বিহামিশিল ইসাবা*), ১ম খণ্ড, ৩২৮ পৃষ্ঠা।

আবু তালহা আল-আনসারী

(মূল নাম : যায়েদ ইবনে সাহাল)

আবু তালহা জীবন কাটিয়েছেন রোযাদার আর মুজাহিদ হিসাবে...
মৃত্যুর সময়ও তিনি ছিলেন একই রকম, রোযাদার ও মুজাহিদ...

নাজ্জার গোত্রের যায়েদ ইবনে সাহাল ওরফে আবু তালহা জানতে পারলেন, নাজ্জার বংশের মিলহানের মেয়ে রুমাইসা ওরফে উম্মে সুলাইম স্বামীর মৃত্যুর কারণে বিধবা হয়ে গেছেন। এই সংবাদ শুনে আবু তালহা যে আনন্দের আতিশয্যে উড়াল দেবেন সেটা অস্বাভাবিক কিছুই নয়। কারণ, উম্মে সুলাইম ছিলেন দৃঢ়চেতা, গাম্ভীর্যপূর্ণ, বুদ্ধিদীপ্ত, রূপবতী ও গুণবতী এক অনন্যা নারী—এমন একজন নারীর প্রতি যে কোনো পুরুষের আগ্রহী হওয়া বিস্ময়কর নয় মোটেই।

সংবাদ শুনেই তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন, এখনই গিয়ে তাকে প্রস্তাব দেবেন, অন্য কোনো আগ্রহী পুরুষ তার কাছে পৌঁছার আগেই। অবশ্য আবু তালহার আত্মবিশ্বাস ছিল, উম্মে সুলাইম তার প্রস্তাব পেলে আর কাউকে গ্রহণ করবেন না।

কারণ, তিনি প্রচুর সম্পদশালী ও উঁচু মর্যাদা সম্পন্ন একজন সুপুরুষ...

তদুপরি তিনি নাজ্জার গোত্রের একজন সাহসী ঘোড়সওয়ার যোদ্ধা এবং মদীনার হাতে গোনা অল্পকজন তীরন্দাজদের একজন।

* * *

সিদ্ধান্ত মতো আবু তালহা তখনই রওনা হলেন উম্মে সুলাইমের বাড়ির দিকে...

কিছুদূর যাওয়ার পর তার মনে পড়ে গেল উম্মে সুলাইম মক্কার ইসলাম প্রচারক মুসআব ইবনে উমাইরের দাওয়াতে মুহাম্মাদের প্রতি ঈমান এনে তাঁর ধর্মের অনুসারী হয়ে গেছেন।

অল্প একটু চিন্তা করেই তিনি মনে মনে এই সমস্যার সমাধান করে ফেললেন। নিজেকেই প্রশ্ন করলেন, তাতে কী আসে যায়? তার মৃত স্বামীও তো পূর্বপুরুষের ধর্মের অনুসারী ছিল এবং মুহাম্মাদের ধর্মকে অবজ্ঞা করে চলত। তারপরও তো তার সঙ্গে উম্মে সুলাইম সংসার করেছে।

* * *

মনে মনে এই হিসাব নিকাশ করতে করতেই আবু তালহা পৌঁছে গেলেন উম্মে সুলাইমের বাড়ির দরজায়। তিনি উম্মে সুলাইমের কাছে সাক্ষাৎ প্রার্থনা করলে তিনি রাজি হয়ে তাকে বাড়ির ভেতরে নিয়ে বসতে দিলেন। উম্মে সুলাইমের ছেলে আনাস ইবনে মালেকের উপস্থিতিতে কুশল বিনিময়ের পর আবু তালহা নিজের আগ্রহের কথা প্রকাশ করলেন। প্রস্তাবের উত্তরে উম্মে সুলাইম সোজাসুজি বললেন,

'আবু তালহা! আপনার মতো মানুষের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করা যায় না। কিন্তু আপনি একজন কাফের—সে কারণে আপনার সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া আমার পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়।'

আবু তালহা মনে করল এটা উম্মে সুলাইমের একটা অজুহাত মাত্র। আসল কারণ সম্ভবত সে আমার চেয়ে বেশি সম্পদশালী ও প্রভাবশালী কোনো সুপুরুষের প্রস্তাব পেয়ে গেছে। তাই ঐ অজুহাতে আমাকে বিদায় করতে চাইছে।

আবু তালহা সন্দেহের কথাটি প্রকাশ করে বললেন,
'উম্মে সুলাইম! আমার তো মনে হচ্ছে, প্রস্তাব গ্রহণের ক্ষেত্রে ধর্মের এই ব্যাপারটিই তোমার আসল বাধা নয়।'

উম্মে সুলাইম অবাক হয়ে জানতে চাইলেন,
'তাহলে আসল বাধা কোন্‌টা?'

আবু তালহা বললেন,
'আসল বাধা হলো সোনা-রূপা, ধন-সম্পদ...'

উম্মে সুলাইম আশ্চর্য হয়ে বললেন,
'সোনা-রূপা, ধন-সম্পদ আমার জন্য প্রতিবন্ধক?'

আবু তালহা বললেন,
'আমার তো তাই মনে হচ্ছে।'

উম্মে সুলাইম অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করলেন,
'ওইসব ধন-সম্পদ আর সোনা-দানার পরোয়া আমি করি না। আমি আল্লাহকে সাক্ষী রেখে ঘোষণা করছি, আপনি যদি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন, যদি মুসলিম হয়ে যান তাহলে কোনো সোনা-দানা ও ধন-সম্পদ ছাড়াই বিনা মহরে আমি আপনার স্ত্রী হতে রাজি। আপনার 'ইসলাম'কেই আমি আমার মহর হিসাবে মেনে নেব।'

* * *

আবু তালহা উম্মে সুলাইমের মুখে এই প্রস্তাব শোনামাত্রই তার মনে পড়ে গেল সুগন্ধ ও দামি চন্দন কাঠের তৈরি ব্যক্তিগত দেবীমূর্তির কথা। ব্যক্তিগত দেব-দেবীর মূর্তি রাখার অভ্যাস কওমের অন্য সরদারদের

মতো তারও ছিল। উম্মে সুলাইমের কথা শুনেই তার মনে প্রশ্ন জাগল আমি যদি ইসলাম গ্রহণ করি তাহলে আমার এই দেবীর কি হবে?

উম্মে সুলাইম রাযিয়াল্লাহু আনহা আবু তালহার মনোভাব আন্দাজ করে 'ঝোঁপ বুঝে কোপটা মারলেন' এবং প্রশ্নটা করে বসলেন,

'আবু তালহা! আপনি কি বুঝতে পারেন না, কাঠের তৈরি যেই দেবীর আপনি পূজা করেন সেটা মাটি থেকে উৎপন্ন কোনো গাছের অংশ?'

আবু তালহা বললেন,
'কেন বুঝব না, অবশ্যই বুঝি।'

উম্মে সুলাইম রাযিয়াল্লাহু আনহা আবার বললেন,
'আপনার কি লজ্জা লাগে না! একটি গাছের এক টুকরো কাঠ দিয়ে দেবী বানিয়ে আপনি তার পূজা করেন, অথচ সেই গাছের অন্য অংশগুলো অন্য মানুষ জ্বালানি বানিয়ে পুড়িয়ে ফেলে।

আবু তালহা! আপনি যদি দেব-দেবীদের ত্যাগ করে ইসলাম কবুল করেন তাহলে আমি আনন্দের সঙ্গে আপনাকে স্বামী হিসাবে বরণ করে নেব। আমি এই ইসলাম গ্রহণের বাইরে এমনকি অন্য কোনো মহরানাও চাই না।'

আবু তালহা বললেন,
'আমাকে ইসলাম গ্রহণ করাবে কে?'

উম্মে সুলাইম রাযিয়াল্লাহু আনহা খুশি হয়ে বললেন,
'আমিই এর জন্য (আপনার ইসলাম কবুলের পর্ব সম্পন্ন করার জন্য) যথেষ্ট।'

আবু তালহা, 'কীভাবে?'

'আপনি মহাসত্যের কালিমা শাহাদাত উচ্চারণ করবেন। বলবেন,

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ

'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ ছাড়া ইবাদতের উপযুক্ত আর কোনো মাবুদ নেই, আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর রাসূল।'

এরপর চলে যাবেন সোজা আপনার বাড়ি এবং আপনার ঐ দেবীমূর্তি ভেঙ্গে চুরমার করে ছুঁড়ে ফেলে দেবেন।'

এবার আবু তালহার চোখে-মুখে আনন্দ ও খুশি নেচে উঠল। স্বাচ্ছন্দে তিনি বলে উঠলেন,

'আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ।'

কালিমা পড়ে মুসলিম হয়ে যাওয়ার পর তিনি উম্মে সুলাইমকে বিয়ে করলেন।

তখন থেকে মুসলিমসমাজের নারী-পুরুষ সবাই বলাবলি করত, উম্মে সুলাইমের মহরের মতো এমন সন্মানজনক ও গৌরবময় মহরের কথা আর শুনিনি। তিনি নিজের মহরের অধিকার ত্যাগ করেছেন ইসলামের স্বার্থে।

* * *

সেইদিন থেকে আবু তালহা রাযিয়াল্লাহু আনহু ইসলামের পতাকা তলে সামিল হয়ে গেলেন এবং তার সর্বশক্তি ইসলামের সেবায় নিয়োজিত করলেন।

তিনি স্ত্রী উম্মে সুলাইম রাযিয়াল্লাহু আনহাসহ সেই সৌভাগ্যবান সত্তর নারী-পুরুষের অংশ ছিলেন যারা আকাবার রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুবারক হাতে হাত রেখে বাইয়াত গ্রহণ করেছিলেন।

তিনি ছিলেন সেই বারো সরদারের একজন, যাদের রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই রাতে মদীনার মুসলিমদের আমীর বানিয়ে ছিলেন।

তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে সকল যুদ্ধে শরীক হয়েছিলেন এবং সকল যুদ্ধেই ত্যাগ ও কুরবানীর নজির স্থাপন করেছিলেন।

তবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে আবু তালহা রাযিয়াল্লাহু আনহুর সেরা স্মরণীয় দিন হলো ওহুদ যুদ্ধের দিন।

পাঠকের জন্য এবার তুলে ধরছি সেদিনের সেরা স্মরণীয় কাহিনী।

* * *

আবু তালহা রাযিয়াল্লাহু আনহু প্রিয়তম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হৃদয়ের সবটুকু আবেগ ও উত্তাপ দিয়ে ভালোবাসতেন। নবীপ্রেমের সেই উত্তাপ নিয়েই তাঁর প্রতিটা রক্তকণা প্রবাহিত হতো শিরায় শিরায়। ভক্তি-ভালোবাসা ভরা আবেগ নিয়ে তিনি প্রিয় নবীর চেহারার দিকে বারবার তাকাতেন, তাঁর এই দৃষ্টির তৃষ্ণা কখনোই মিটত না। প্রিয় নবীর মিষ্টি-মধুর কথা তিনি কান লাগিয়ে তন্ময় হয়ে শুনতেন। যতই শুনতেন শ্রবণ-ক্ষুধা তাঁর মিটত না কখনোই। যখনই তিনি নবীজীর কাছে থাকতেন হাঁটু গেড়ে তার সামনে বসে থাকতেন আর বলতেন,

نَفْسِيْ لِنَفْسِكَ الْفِدَاءُ، وَوَجْهِيْ لِوَجْهِكَ الوِقَاءُ

‘আমার জীবন আপনার জন্য উৎসর্গীত, আমার সম্মান আপনার সম্মান ও গৌরব রক্ষার জন্য কুরবান করলাম।’

ওহুদ যুদ্ধের দিন। যুদ্ধের একটা পর্যায়ে মুসলিমমুজাহিদরা তাদের বিজয় সুনিশ্চত দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অরক্ষিত রেখে গনিমতের মাল নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। পলায়নপর

মুশরিকবাহিনী এই সুযোগে আবার ফিরে এসে হঠাৎ করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর চারদিক দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তাদের প্রচণ্ড আক্রমণে এক সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি মুবারক দাঁত ভেঙে যায়, চেহারা মুবারক আহত ও রক্তে রঞ্জিত হয়ে পড়ে। পবিত্র ঠোঁট আঘাতপ্রাপ্ত হয়। পবিত্র মুখমণ্ডলে রক্তধারা বইতে থাকে। মুশরিকবাহিনী মিথ্যাগুজব ছড়িয়ে দেয়—মুহাম্মাদ নিহত হয়েছে। মুসলিমবাহিনীর নিশ্চিত বিজয় দেখতে দেখতেই পরাজয়ের রূপ ধারণ করে। প্রিয় নবীর নিহত হওয়ার গুজবে মুসলিমমুজাহিদরা ভীষণভাবে মুষড়ে পড়েন এবং শত্রুবাহিনীকে পিঠ দেখিয়ে ময়দান ছেড়ে পালাতে থাকেন।

এইরূপ চরম দুঃসময়ে যে কয়েকজন জানবাজ মুজাহিদ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাশে শক্ত মানবপ্রাচীর তৈরি করে পাহাড়ের মতো দাঁড়িয়ে যান—আবু তালহা রাযিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন তাদের অন্যতম।

* * *

আবু তালহা রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখে পাহাড়ের মতো দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে যান এবং শত্রুদের ছুঁড়ে দেওয়া তীর ও বর্শার আঘাত থেকে তাঁকে হেফাজত করতে থাকেন।

আবু তালহা রাযিয়াল্লাহু আনহু তাঁর অপরাজেয় ধনুকে অভ্রান্ত তীর জুড়ে আক্রমণকারী মুশরিক সৈনিকদের একটা একটা করে খতম করতে থাকেন। আবু তালহার তীর কাকে ধরাশায়ী করছে, সেটা দেখার জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বারবার আবু তালহার পেছন থেকে মাথা উঁচু করে দেখছিলেন। এতে তাঁর প্রতি শঙ্কিত হয়ে আবু তালহা রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

'আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য কুরবান হোক ইয়া রাসূলাল্লাহ! ওভাবে মাথা উঁচু করবেন না। শত্রুদের নিক্ষিপ্ত তীর আপনাকে আহত করতে পারে। আমার বুক আপনার বুকের জন্য আমার মাথা আপনার সম্মান রক্ষার জন্য নিবেদিত। আমি আমাকে আপনার জন্য কুরবান করে দিয়েছি, আপনার ওপর কোনো আঘাত আমি সহ্য করতে পারব না।'

সেই মুহূর্তে এক মুসলিমসৈনিক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সামনে দিয়ে দৌড়ে পালাচ্ছিল যার পিঠে বাঁধা ছিল তীরভরা তূণীর। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উচ্চস্বরে তাকে ডেকে বললেন,

أُنْثُرْ سِهَامَكَ بَيْنَ يَدَىْ أَبِىْ طَلْحَةَ وَلَا تَمْضِ بِهَا هَارِبًا

'তোমার তীরগুলো আবু তালহাকে দিয়ে যাও, ওগুলো নিয়ে পালিও না।'

আবু তালহা রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর থেকে মুশরিকদের আক্রমণ ঠেকানোর জন্য প্রতিরোধ যুদ্ধ চালাতে চালাতে তিনটি ধনুক ভেঙে যায়। এরই মধ্যে তিনি আল্লাহর ইচ্ছায় শত্রুবাহিনীর উল্লেখযোগ্য সংখ্যক যোদ্ধাকে খতম করে ফেলেন। যুদ্ধ ধীরে ধীরে থেমে যায়। আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হেফাজত করেন। আবু তালহা রাযিয়াল্লাহু আনহুর অসাধারণ ত্যাগ ও কুরবানীকে আল্লাহ তাআলা কবুল করে নেন।

* * *

আবু তালহা রাযিয়াল্লাহু আনহু যেমন জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর ময়দানে চরম সঙ্কটকালে ছিলেন বীরযোদ্ধা, একইভাবে আল্লাহর রাস্তায় দান খয়রাতের ব্যাপারেও ছিলেন মহাদানবীর।

তাঁর ছিল খেজুর ও আঙ্গুরের একটি অতি চমৎকার বাগান। শীতল ও সুমিষ্টপানি, উন্নতজাতের বৃক্ষ ও ফল সমৃদ্ধ এমন সুবিশাল আঙ্গুর ও খেজুরের বাগান মদীনাতে দ্বিতীয় আর একটিও ছিল না।

একদিন এই চমৎকার বাগানের মিষ্টি ছায়াঘেরা শীতল বাতাসের মোহময় পরিবেশে এই অমূল্য নেয়ামতদাতা মহান আল্লাহ তাআলার স্মরণে ও প্রেমে আবু তালহা রাযিয়াল্লাহু আনহু দাঁড়িয়ে গেলেন নামাযে। নামাযের মধ্যে এক অসতর্ক মুহূর্তে তাঁর দৃষ্টি পড়ল লাল ঠোঁট, রঙিন পা ও সবুজ রঙের সুন্দর একটি পাখির ওপর। পাখিটা গাছের ডালে ডালে ফুরুৎ ফুরুৎ করে নেচে নেচে মধুর সুরে গান গাচ্ছিল। মনকাড়া অপূর্ব এই দৃশ্যে আবু তালহা রাযিয়াল্লাহু আনহুর একাগ্রতা নষ্ট হলো।

কিছুক্ষণের মধ্যেই যখন তাঁর মনোযোগ আবার নামাযে নিমগ্ন করলেন এবার কত রাকাত পড়েছেন সেটা আর মনে করতে পারলেন না। এতে তিনি ভীষণ মর্মাহত হলেন।

নামায শেষ করে সোজা চলে গেলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে। তাঁর কাছে তিনি অভিযোগ পেশ করলেন নিজের মনের বিরুদ্ধে। তিনি বললেন,

'মিষ্টি ছায়াঘেরা ফলের বাগানে মধুর পাখির গান আমার নামাযের একাগ্রতা নষ্ট করেছে। ব্যাঘাত ঘটিয়েছে মনোনিবেশে।

অতএব, আপনাকে সাক্ষী রেখে বলছি ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার এই বাগান আমি আল্লাহর জন্য দান করে দিলাম। এটাকে আপনি আল্লাহ ও রাসূলের সন্তুষ্টি মতো খরচ করুন।'

* * *

আবু তালহা রাযিয়াল্লাহু আনহু জীবন কাটিয়েছেন রোযাদার ও মুজাহিদ হিসাবে...

মৃত্যুর সময়ও তিনি ছিলেন একই রকম—রোযাদার ও মুজাহিদ।

তাঁর সম্পর্কে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের পর প্রায় ত্রিশ বছর ধরে তিনি একাধারে রোযা রেখেছেন।

ঈদের যেই দিনগুলোতে রোযা রাখা হারাম, সেই নিষিদ্ধ দিনগুলো ছাড়া কখনোই তিনি রোযাহীন অবস্থায় থাকতেন না।

তিনি দীর্ঘায়ূ লাভ করেছিলেন। এমনকি অতিবয়স্ক ও খুনখুনে বুড়ো হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু এই অতিবার্ধক্যেও তাঁর উদ্যম ও সাহসে একটুও ভাটা পড়েনি। অতিবার্ধক্য কখনোই জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর পথে অন্তরায় হতে পারেনি। পারেনি আল্লাহর বাণীকে সমুন্নত করার লক্ষ্যে দূর-দূরান্ত সফরের প্রতিবন্ধক হতে।

উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহুর শাসনামলে মুসলিমবাহিনী যখন সমুদ্রপথে জিহাদের পরিকল্পনা ও উদ্যোগ গ্রহণ করেন তখন আবু তালহা রাযিয়াল্লাহু আনহু একজন যোদ্ধা হিসাবে সেই দলে অংশগ্রহণের জন্য প্রস্তুত হন। তাঁর এই প্রস্তুতি দেখে তাঁর ছেলেরা বিনয়ের সঙ্গে বলেন,

'হে আমাদের পিতা! আল্লাহ আপনার ওপর রহম করুন। এখন আপনি বয়সের হিসাবে অতিবৃদ্ধ হয়ে পড়েছেন। এর পূর্বে আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে, আবু বকর সিদ্দীক ও উমর ফারুক রাযিয়াল্লাহু আনহুমের যুগে সব যুদ্ধেই শরীক হয়েছেন। এখন কি আপনি বয়সের দিকে লক্ষ্য করে একটু বিশ্রামে যেতে পারেন না? আপনি আমাদের সুযোগ করে দিন—আপনার পক্ষ থেকে আমরাই জিহাদ করব।'

আবু তালহা রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

اِنْفِرُوْا خِفَافًا وَّثِقَالًا

'তোমরা বের হও হাল্কা হলেও এবং ভারী হলেও।'

–সূরা তাওবা : ৪১

এই আয়াতে তিনি আমাদের সকলকেই জিহাদে বের হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। বৃদ্ধদের এবং যুবকদেরও। কোনো বয়স নির্দিষ্ট করে তিনি বলেননি যে অমুক বয়সী মানুষ জিহাদে বের হবে আর অমুক বয়েসীরা বের হতে পারবে না। মোটকথা তিনি সমুদ্রপথের সেই জিহাদে শরীক হয়েই ছাড়লেন।

* * *

অশীতিপর সাহাবী আবু তালহা রাযিয়াল্লাহু আনহু মুসলিমসৈনিকদের সঙ্গে মধ্যসাগরে চলন্ত জাহাজে কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়লেন এবং এর পরপরই তিনি ইন্তেকাল করলেন।

তার সঙ্গী মুসলিমমুজাহিদরা হন্যে হয়ে একটি দ্বীপ খুঁজতে থাকলেন তাকে দাফন করার জন্য। খুঁজতে খুঁজতে তারা একটি দ্বীপের সন্ধান পেলেন সাতদিন পর। এই দীর্ঘ সাতদিন পর্যন্ত তাঁর মৃতদেহটি ছিল একেবারেই অপরিবর্তিত ও অক্ষত। যেন তিনি ঘুমিয়ে আছেন।

সাগরের মধ্যখানে...
স্বজন, স্বদেশ থেকে দূরে...
দাফন করা হলো আবু তালহা রাযিয়াল্লাহু আনহুকে।

কী ক্ষতি তার মানুষের এই দূরত্বে! যখন পেয়ে গেছেন আল্লাহর নৈকট্য।

তথ্যসূত্র :

১. *হায়াতুস সাহাবাহ,* (আল্-ফাহারিস ফির রাবে)।
২. *উসদুল গাবাহ, আত্তারজামা,* ১৮৪৩।
৩. *আল-ইসতীআব* (বিহামিশিল ইসাবা), ১ম খণ্ড, ৫৪৯ পৃষ্ঠা।
৪. *আত-তবাকাতুল কুবরা,* ৩য় খণ্ড, ৫০৪ পৃষ্ঠা।
৫. *সিফাতুস সফওয়া,* ১ম খণ্ড, ১৯০ পৃষ্ঠা।
৬. *তাহযীবুত তাহযীব,* ৩য় খণ্ড, ৪১৪ পৃষ্ঠা।
৭. *তারীখুত তাবারী* (তাবআ দারুল মাআরিফ), ২য় খণ্ড, ৬১৯ পৃষ্ঠা। ৩য় খণ্ড, ১২৪ ও ১৮৪ পৃষ্ঠা, ৪র্থ খণ্ড, ১৯২ পৃষ্ঠা (১০ খণ্ডের সূচি দ্রষ্টব্য)।
৮. *তাহযীবু ইবনি আসাকির,* ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৪র্থ পৃষ্ঠা।
৯. *আস-সীরাহ লিবনি হিশাম।*
১০. *আল-ইসাবা,* ১ম খণ্ড, ৫৬৬ অথবা *আত্তারজামা,* ২৯০৫।

ওয়াহ্‌শী ইবনে হারব

(মূল নাম : যায়েদ ইবনে সাহাল)

যিনি উম্মতে মুহাম্মাদীর শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তির হত্যাকারী আবার কাফফারা হিসাবে নিকৃষ্টতম ব্যক্তিরও হত্যাকারী।

—ঐতিহাসিকদের মতামত

কে এই ব্যক্তি যিনি ওহুদের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয় চাচা হামযা রাযিয়াল্লাহু আনহুকে হত্যা করে তাঁর হৃদয়ের রক্তক্ষরণ ঘটিয়েছিলেন?

এরপর ইয়ামামার যুদ্ধে ভণ্ড মুসাইলামাতুল কায্‌যাবকে হত্যার মাধ্যমে মুসলিমজাতির ব্যথিত ও রক্তাক্ত হৃদয়ের উপশম ঘটিয়েছিলেন?

তিনিই হলেন ওয়াহশী ইবনে হারব আল-হাবাশী, ডাকনাম আবু দাসমা...

তাঁর জীবনের রয়েছে রক্তের আখরে লেখা এক ভয়ানক ও বেদনাবিধূর কাহিনী।

প্রিয়পাঠক! একটু মনোনিবেশ করুন, নিজের জবানীতেই ওয়াহশীর সেই কাহিনী শোনার জন্য।

ওয়াহশী বলেন,

'আমি ছিলাম বিখ্যাত কুরাইশ নেতা জুবাইর ইবনে মুতঈমের বালক ক্রীতদাস। বদরের যুদ্ধে তার চাচা 'তুআইমা' নিহত হয়েছিল হামযা ইবনে আবদুল মুত্তালিব রাযিয়াল্লাহু আনহুর হাতে। জুবাইর নিহত চাচার শোকে চরম ক্ষিপ্ত হয়ে 'লাত' ও 'উয্যা' দেবীর নামে শপথ করেছিল, অবশ্যই সে এর প্রতিশোধ নেবে, হত্যাকারীকে অবশ্যই হত্যা করে ছাড়বে। তখন থেকেই সে হামযাকে হত্যার সুযোগ খুঁজতে থাকে।

* * *

এর অল্প কিছুদিন পর কুরাইশ নেতৃবৃন্দ সিদ্ধান্ত নিল, মুহাম্মাদকে চিরতরে খতম করে দিতে এবং বদরে নিহতদের বদলা নিতে ওহুদের যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হবে। সিদ্ধান্ত মতো সেনা ও যোদ্ধা সংগ্রহ শুরু করা হলো। নিজেদের ও বিভিন্ন মিত্র-গোত্র থেকে যোদ্ধা সংগ্রহ করে ওহুদ যুদ্ধের কুরাইশী সেনাদল গড়ে তোলা হলো। কুরাইশ নেতৃবৃন্দ এই সেনাদলের সেনাপতি নিযুক্ত করল বিখ্যাত বীর আবু সুফিয়ান ইবনে হারবকে।

সেনাপতি আবু সুফিয়ান যুদ্ধের ময়দানে সৈনিকদের উত্তেজিত করা এবং যুদ্ধ ছেড়ে পালাতে গেলে তাদের বাধা দিয়ে ময়দানে ফিরিয়ে আনার একটি উদ্যোগ গ্রহণ করেন। বদর যুদ্ধে যাদের বাপ, ভাই, সন্তান অথবা কোনো স্বজন নিহত হয়েছে, সেই সকল পরিবারের নারীদের দিয়ে গঠিত একটি নারীদলকে তিনি যুদ্ধের ময়দানে নিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দেন। এই ঘোষণায় যেসব নারী তার সঙ্গে যুদ্ধের ময়দানে যাওয়ার জন্য এগিয়ে আসে, তাদের সর্বাগ্রে ছিলেন তার স্ত্রী হিন্‌দ বিনতে উতবা। কারণ, বদর যুদ্ধে তার পিতা, চাচা ও ভাই সকলেই নিহত হয়েছিল।

ওয়াহ্‌শী ইবনে হারবের বর্ণনা অব্যাহত রয়েছে। তিনি বলেন,

সেনাদল রওনার মুহূর্তে জুবাইর ইবনে মুতঈম আমার দিকে মনোযোগী হয়ে বললেন,

'হে আবু দাসমা! নিজেকে দাসত্ব থেকে মুক্ত করার কোনো আগ্রহ কি তোমার আছে?

আমি বললাম,
'আমার কে আছে যে আমাকে মুক্ত করবে?'

জুবাইর,
'আমি আছি তোমাকে মুক্ত করার জন্য।'

আমি জানতে চাইলাম,
'কীভাবে?'

তিনি বললেন,
'আমার নিহত চাচা 'তুআইমা ইবনে আদীই'-এর হত্যার বদলা হিসাবে তার হত্যাকারী মুহাম্মাদের চাচা হামযাকে যদি খতম করে দিতে পারো, তাহলে তুমি মুক্ত।'

আমি বললাম,
'আপনি যে আপনার কথা রক্ষা করবেন তার নিশ্চয়তা কি?'

তিনি জবাব দিলেন,
'তুমি যাকে চাও সাক্ষী রাখতে পারো। আমি প্রকাশ্যে জনসম্মুখে আমার এই প্রতিশ্রুতির ঘোষণা দিতে পারি।'

আমি বললাম,
'ঠিক আছে, আমি করব আপনার কাজ।'

ওয়াহ্শী বর্ণনা করেন,
'আমি একজন হাবশী। হাবশীরা সাধারণভাবেই বর্শা-নিক্ষেপে খুব দক্ষ আর আমি ছিলাম তাদের মধ্যেও অতি নির্ভুল বর্শা-নিক্ষেপকারী। লক্ষে আঘাত করতে আমার বর্শা কখনোই ভুল করে না।

মুক্তির আকাঙ্ক্ষা পূরণের নিশ্চয়তা পাওয়ার পর আমি আমার বর্শাটা হাতে নিয়ে কুরাইশবাহিনীর সঙ্গে চলতে থাকলাম। তবে আমি

সেনাদলের একেবারে পেছন দিকে নারীদের প্রায় কাছাকাছি হয়ে চলতে লাগলাম। কারণ, যোদ্ধাদের সঙ্গী হলেও যুদ্ধের বিষয়ে আমার কোনো আগ্রহ ছিল না। ছিল না যুদ্ধে জয়-পরাজয় নিয়েও কোনো ভাবনা।

যতবারই আমি আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্‌দ বিনতে উতবার পাশ দিয়ে গেছি অথবা তিনি আমার পাশ দিয়ে গেছেন, আমার বর্শার চকচকে ফলায় সূর্যালোকের ঝিলিক দেখেই তিনি বলে উঠতেন,

'আবু দাসমা! (হামযা ও তার ভাতিজার প্রতি) আমাদের অন্তরে দাউ দাউ করে জ্বলা আগুন একমাত্র তুমিই নেভাতে পারো?'

আমরা সকলেই যখন ওহুদের ময়দানে পৌঁছলাম এবং উভয় দল মুখোমুখি হয়ে যুদ্ধ শুরু করল, তখন আমি হামযা ইবনে আবদুল মুত্তালিবের খোঁজ শুরু করলাম। আমি তাঁকে আগে থেকেই চিনতাম। অবশ্য হামযা এমন কোনো অখ্যাত, অজ্ঞাত মানুষ ছিলেন না যে তাকে কেউ না চিনবে। কেননা, তিনি আরবের বিখ্যাত বীর ও দুঃসাহসী যোদ্ধাদের মতো মাথায় পরতেন পালকের তৈরি বিশেষ 'বীরমুকুট'।

অল্প কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজির পর আমি দেখতে পেলাম হামযা ইবনে আবদুল মুত্তালিবকে। ছাইরঙা বিশালদেহী শক্তিশালী উটের গর্জনে আশপাশের মানুষ যেমন ভয় পেয়ে ছুটতে থাকে, একইভাবে হামযার গর্জন আর তার তরবারির আঘাতে চারপাশের শত্রুসৈন্যরা একের পর এক কচুকাটা হয়ে ধপাস ধপাস করে মাটিতে ছুটে পড়ছিল। কেউই তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে টিকতে পারছিল না। কেউই তাকে আঘাত করতে পারছিল না।

আমি কিছুটা দূর থেকে তাঁকে আঘাত হানার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলাম আর কোনো গাছ বা পাথরের মাধ্যমে তাঁর দৃষ্টি থেকে নিজেকে আড়াল করে অপেক্ষা করছিলাম যেন আরও খানিকটা কাছাকাছি তাঁকে পাই। এরই মধ্যে সিবা ইবনে আবদুল উয্‌যা নামের একজন কুরাইশী যোদ্ধা হামযাকে আমার কাছাকাছি এনে দিল এই চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়ে,

‘এই হামযা! সাহস থাকলে আমার কাছে আয়।’

হামযা রাযিয়াল্লাহু আনহু বাঘের মতো গর্জে উঠে বললেন,
‘আরে মুশরিক মায়ের পুত! আয় দেখি তোর সখ পূরণ করে দেই...’

হামযা রাযিয়াল্লাহু আনহু চোখের পলকে তরবারির এমন আঘাত হানলেন যে সঙ্গে সঙ্গে সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল, রক্তাক্ত দেহ ছটফট করতে করতে থেমে গেল।

এই সময়টাকেই আমার মনে হলো তাঁর ওপর আঘাত করার মোক্ষম সুযোগ। আমার পছন্দনীয় জায়গায় দাঁড়িয়ে লক্ষ স্থির করলাম। বর্শা সামনে ও পেছনে দোলাতে দোলাতে যেই লক্ষ্যভেদের ব্যাপারে আশ্বস্ত হলাম। অমনি সাজোরে তার দিকে ছুঁড়ে মারলাম। বর্শাটা তাঁর তলপেট দিয়ে ঢুকে পেছনে দিয়ে বের হয়ে গেল। বর্শাবিদ্ধ দেহেই তিনি আমার দিকে কিছুটা এগিয়ে এসে মাটিতে পড়ে গেলেন। মৃত্যু সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার জন্য আমি কিছুক্ষণ দূরে দাঁড়িয়ে থাকলাম। তারপর মৃতদেহ থেকে বর্শাটি বের করে নিয়ে তাঁবুতে ফিরে নিশ্চিন্তে বসে রইলাম। কারণ, আমার মূল উদ্দেশ্য ছিল হামযাকে হত্যা করে দাসত্ব থেকে মুক্তি লাভ করা। এছাড়া আমার আর কোনো আগ্রহ ছিল না। যুদ্ধের জয়-পরাজয় নিয়েও আমার কোনো মাথা ব্যথা ছিল না।

* * *

এরপর উভয় পক্ষের চরম যুদ্ধের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। আক্রমণ প্রতিআক্রমণ ও ধাওয়া পাল্টাধাওয়া বেড়ে গেল। তবে যুদ্ধের ময়দানের নিয়ন্ত্রণ চলে গেল মুসলিমবাহিনীর বিরুদ্ধে। প্রচুর মুসলিমসৈনিক শহীদ হলেন।

সে সময় হিন্দ বিনতে উতবা একদল নারীকে সঙ্গে নিয়ে শহীদ সৈনিকদের মাঝে চলে গেলেন। তিনি নিহত লাশগুলির বিকৃতি ঘটাতে লাগলেন—পেট ফেঁড়ে ফেললেন, চোখ উপড়ালেন, নাক ও কান কেটে নিলেন।

এরপর কর্তিত নাক-কান সুতায় গেঁথে গলার হার ও কানের দুল বানিয়ে সেগুলো গলায় ও কানে পরলেন। তাঁর গলার সোনার হার ও কানের সোনার দুল খুলে আমাকে দিয়ে বললেন,

'এগুলো তোমাকে দিলাম আবু দাসমা! এগুলো খুব দামি অলঙ্কার, যত্ন করে রেখো।'

যুদ্ধ থেমে গেল। কুরাইশী বাহিনীর সঙ্গে আমিও মক্কায় ফিরে এলাম। জুবাইর ইবনে মুতঈম তার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে আমাকে মুক্ত করে দিলেন। সেদিন থেকেই আমি হলাম একজন স্বাধীন ও মুক্ত মানুষ।

* * *

কিন্তু এরপর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শক্তি ও প্রভাব দিনদিন বাড়তে লাগল। তাঁর অনুসারী মুসলিমদের সংখ্যা প্রতি মুহূর্তেই বৃদ্ধি পেতে থাকল। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রভাব ও শক্তি যতই বাড়তে লাগল আমার ভয় ও দুশ্চিন্তা ততই বাড়তে থাকল। ভয় ও আতঙ্ক ধীরে ধীরে আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল।

আমার এই রকম দুশ্চিন্তা ও দুর্ভাবনার সময়েই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বিশাল বাহিনী নিয়ে বিজয়ী বেশে মক্কায় প্রবেশ করলেন।

আমি তখন তায়েফে পালিয়ে গেলাম। আশা করেছিলাম সেখানে নিরাপদ থাকব।

কিন্তু আমার ধারণা মিথ্যা প্রমাণ করে তায়েফবাসী অল্পকদিন পরেই ইসলাম কবুল করার জন্য তৈরি হয়ে গেল। দেখলাম, তারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তায়েফবাসীর ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দেওয়ার উদ্দেশ্যে একটি প্রতিনিধি দল পাঠাল।

তখন আমি ভীষণ দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলাম। বিশাল-বিস্তীর্ণ পৃথিবী আমার কাছে ছোট হয়ে গেল। কোথাও গিয়ে আশ্রয় নেওয়ার মতো

কোনো পথ আমার সামনে খোলা রইল না। আমি মনে মনে চিন্তা করতে থাকলাম—সিরিয়ায় গিয়ে লুকিয়ে থাকি। আবার মনে হলো, না সিরিয়া নয় বরং ইয়েমেনে চলে যাই। অন্যান্য দেশের কথাও মনে হলো।

আমি যখন আমার এই চরম দুশ্চিন্তার মহাসাগরে হাবুডুবু খাচ্ছিলাম, তখন একজন হিতাকাঙ্ক্ষী আমার প্রতি কোমল হয়ে বললেন,

আহারে ওয়াহ্শী! কি ভুলটাই না তুমি করে যাচ্ছ! আল্লাহর কসম!! মুহাম্মাদ এমন কোনো মানুষকে হত্যা করে না যে ব্যক্তি কালেমা শাহাদাত পড়ে তাওহীদ ও রিসালাত অর্থাৎ আল্লাহর একত্ব ও মুহাম্মাদের [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] নবুওয়াতের সত্যতা স্বীকার করে নেয়।

আমি তার এই বক্তব্য শোনার সঙ্গে সঙ্গেই মদীনার পথে রওনা হয়ে গেলাম মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে। মদীনায় পৌঁছার পর অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে তাঁর খোঁজ নিয়ে জানতে পারলাম, তিনি মসজিদে অবস্থান করছেন। আমি মসজিদে প্রবেশ করে সতর্ক ও ভীত মনে তাঁর দিকে এগিয়ে গেলাম। তাঁর একেবারে কাছে গিয়ে ঘোষণা করলাম,

'আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহ।'

কালেমা শাহাদাতের আওয়াজ শুনতেই তিনি আমার দিকে চোখ তুলে তাকালেন। আমাকে চিনতে পেরে তাঁর দৃষ্টি আমার ওপর থেকে সরিয়ে নিয়ে বললেন,

'তুমিই কি ওয়াহ্শী?'

আমি বললাম,

'হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ!'

তিনি বললেন,

'তুমি বসো, আমাকে শোনাও কীভাবে চাচা হামযাকে হত্যা করেছিলে।'

আমি বসে হামযাকে হত্যার বিস্তারিত ঘটনা তাঁকে শোনালাম। আমার বলা শেষ হলে তিনি আমার দিক থেকে চেহারা মোবারক ঘুরিয়ে নিলেন এবং বললেন,

'ধিক্ তোমাকে হে ওয়াহ্শী! আমার দৃষ্টি থেকে তুমি নিজেকে দূরে রাখবে। আজকের পর আমি আর কখনোই তোমার চেহারা দেখতে চাই না। (নিজের প্রিয় চাচা হামযাকে হত্যাকারী ওয়াহ্শীর প্রতি প্রিয় নবীর বিরক্ত হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু 'রাহমাতুল লিল আলামীন' এর শান, মান ও আখলাকের সঙ্গে একথাটি বেমানান। এজন্যই 'আমার দৃষ্টি থেকে তুমি নিজেকে দূরে রাখবে। আজকের পর আমি আর কখনোই তোমার চেহারা দেখতে চাই না ' এই বর্ণনা সঠিক নয়।–*আসাহহুর সিয়ার*)

সেদিন থেকে আমি নিজেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দৃষ্টি থেকে দূরে দূরে রাখতাম। সাহাবীরা তাঁর সম্মুখে বসতেন আর আমি হতভাগা বসতাম তাঁর পেছনে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকাল পর্যন্ত আমি এই নিয়ম মেনে চলেছি।'

* * *

ওয়াহ্শী রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূলের ইন্তেকাল পরবর্তী জীবনের অবস্থা বর্ণনা করে বলেন,

'যদিও আমি জানতাম ইসলাম গ্রহণ করলে তার পূর্ববর্তী সকল গুনাহ মাফ হয়ে যায়, তারপরও আমি (হামযা রাযিয়াল্লাহু আনহুকে হত্যার মাধ্যমে) যে জঘন্য ও বীভৎস অপকর্ম করেছি, ইসলাম ও মুসলিমজাতির যে অপূরণীয় ক্ষতি সাধন করেছি, সেই অনুশোচনার আগুনে আমি ভীষণভাবে জ্বলতে থাকলাম। পাশাপাশি আমি খুঁজতে থাকলাম ঐ কৃতকর্মের প্রায়শ্চিত্ত করার একটি সুযোগ। পূর্ববর্তী পাপ মোচনের কোনো ব্যবস্থা।

* * *

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ইন্তেকাল করলেন এবং তাঁর প্রধান সাহাবী আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহুর হাতে মুসলিমজাহানের খেলাফতের দায়িত্বভার অর্পিত হলো এবং ভণ্ড মুসাইলামাতুল কায্যাবের অনুসারী হানীফা গোত্রের লোকজন দলে দলে ইসলাম ধর্ম ছেড়ে মুরতাদ হতে থাকল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খলীফা আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহু মুসাইলামার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য এবং তার কওম হানীফা গোত্রের মুরতাদদের ইসলাম ধর্মে ফিরিয়ে আনার উদ্দেশ্যে একটি বাহিনী তৈরি করলেন।

আমি তখন মনে মনে নিজেকে বললাম,

'হে ওয়াহ্শী! এটাই তোমার সুযোগ, এই সুবর্ণ সুযোগকে কাজে লাগাও। এই সুযোগকে কিছুতেই হাতছাড়া হতে দিও না।'

আমি মুসলিমবাহিনীর সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম। আমার সেই বর্শাটিই হাতে তুলে নিলাম, যা দ্বারা একদিন হত্যা করেছিলাম সাইয়েদুশ শুহাদা হামযা ইবনে আবদুল মুত্তালিব রাযিয়াল্লাহু আনহুকে। মনে মনে শপথ করলাম, এই বর্শা দিয়ে হয়তো আমি মুসাইলামাকে হত্যা করব আর না হয় শাহাদাতকেই বরণ করে নেব।

মুসলিমবাহিনী মুসাইলামা ও তার মুরতাদ দলের ওপর আক্রমণ করলে মুরতাদবাহিনী অবস্থা খারাপ দেখে উঁচু প্রাচীরঘেরা এক বিশাল বাগানে ঢুকে প্রবেশদার বন্ধ করে আত্মরক্ষার চেষ্টা করল। কিন্তু মুসলিমবাহিনী অপ্রতিরোদ্ধ। প্রবেশদুয়ার বন্ধ করে তাদের গতিরুদ্ধ করা কি আদৌ সম্ভব? তারা সেখানে ঢুকে পড়ল। মরণজয়ী মুসলিম-মুজাহিদবাহিনীর হাতে কচুকাটা হতে থাকল মুরতাদবাহিনী। 'হাদীকাতুল মউত' বা মৃত্যুউপত্যকা নামে খ্যাত এই বাগানে আমি ভণ্ড মুসাইলামাকে খুঁজতে খুঁজতে পেয়ে গেলাম। দেখলাম, সে তরবারি হাতে নিয়ে এক পাশে দাঁড়িয়ে আছে। আরও দেখলাম আনসারী এক ভাই আমার মতোই

মুসাইলামাকে হত্যার পরিকল্পনা করে অপেক্ষা করছেন। আমাদের দু'জনেরই লক্ষ্য মুসাইলামাকে হত্যা করা।

আমি মনমতো স্থানে (পজিশন নিয়ে) দাঁড়ালাম, টার্গেট ঠিক করে বর্শা দুলাতে লাগলাম, নিশ্চিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সজোরে ছুঁড়ে মারলাম। সোজা গিয়ে তাকে এফোঁড়-ওফোঁড় করে ফেলল।

মুসাইলামার উদ্দেশ্যে আমি যখন বর্শা ছুড়েছি, একই সঙ্গে আনসারী ভাই তরবারি নিয়ে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন।

আল্লাহই ভালো জানেন আমাদের মধ্যে আসলে কে তার হত্যাকারী।

যদি আমিই মুসাইলামার হত্যাকারী হয়ে থাকি তাহলে আমি হলাম এই উম্মতের শ্রেষ্ঠ একব্যক্তি হামযা রাযিয়াল্লাহু আনহুর হত্যাকারী আবার নিকৃষ্টতম ব্যক্তি মুসাইলামারও হত্যাকারী।

তথ্যসূত্র :

১. *আল-ইসাবা*, ৩য় খণ্ড, ৬৩১ পৃষ্ঠা, *আত্তারজামা*, ৯১০৯।
২. *উসদুল গাবাহ*, ৫ম খণ্ড, ৪৩৮ পৃষ্ঠা।
৩. *আল-ইসতীআব*, ৩য় খণ্ড, ৬৪৪ পৃষ্ঠা।
৪. *আত-তারীখুল কাবীর*, ৪র্থ খণ্ড, ১৮০ পৃষ্ঠা।
৫. *আল-জামউ বাইনা রিজালিস সহীহাইন*, ২য় খণ্ড, ৫৪৬ পৃষ্ঠা।
৬. *তাজরীদু আসমাইস সাহাবা*, ২য় খণ্ড, ১৩৬ পৃষ্ঠা।
৭. *তাহযীবুত তাহযীব*, ১১শ খণ্ড, ১১৩ পৃষ্ঠা।
৮. *আস-সীরাহ* লিবনি হিশাম, (উনযুর আল-ফাহারিস)।
৯. *মুসনাদু আবী দাউদ*, ১৮৬ পৃষ্ঠা।
১০. *আল-কামিল* লিবনিল আসীর, ২য় খণ্ড, ১০৮ পৃষ্ঠা।
১১. *তারীখুত তবারী*, (আল-ফাহারিস ফিল আশির)।
১২. *ইমতাউল আসমা*, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৫২-১৫৩।
১৩. *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১২৯-১৩০।
১৪. *আল-মাআরিফ* লিবনি কুতাইবা, ১৪৪ পৃষ্ঠা।
১৫. *তারীখুল ইসলাম* লিয-যাহাবী, ১ম খণ্ড ২৫২ পৃষ্ঠা।

হাকীম ইবনে হাযাম

মক্কায় এমন চারজন বিশেষ মানুষ রয়েছেন, যাদের মুশরিক থাকা আমার পছন্দ নয়, আমি সবসময় তাদের ইসলাম কবুল করার কামনা করেছি। তাদেরই একজন হলেন হাকীম ইবনে হাযাম।

–মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

এই মহান সাহাবীর কথা কি আপনি জানেন প্রিয় পাঠক?

তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যিনি ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন পবিত্র কাবা ঘরের একবারে ভেতরে।

ঘটনা কী? হ্যাঁ ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই : একটি বিশেষ উৎসব উপলক্ষে সেদিন সর্বসাধারণের জন্যে পবিত্র কাবা ঘরের দুয়ার উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছিল। হাকীম ইবনে হাযামের মা এই বিরল সুযোগ হাতছাড়া করতে রাজি হলেন না। কাবা ঘরের ভেতরে প্রবেশের দীর্ঘদিনের আকাঙ্ক্ষা পূরণের উদ্দেশ্যে কয়েকজন আত্মীয়া ও বান্ধবীকে সঙ্গে নিয়ে তিনি ঘুরতে গেলেন সেখানে। সে সময় তিনি ছিলেন সন্তান প্রসবের একেবারে কাছাকাছি সময়ে। কাবা ঘরের ভেতরেই হঠাৎ শুরু

হলো তার তীব্র প্রসব বেদনা। এমন অবস্থা হলো যে সেখান থেকে নড়াচড়া করা তার পক্ষে সম্ভব নয়।

অগত্যা একটি চামড়ার বিছানা হাজির করা হলো এবং সেখানেই তিনি নিজের সন্তান প্রসব করলেন।

সেই সন্তাটিই ছিলেন খুওয়াইলিদের নাতি হাযামের ছেলে হাকীম। হাকীম ইবনে হাযাম ইবনে খুওয়াইলিদ।

সম্পর্কের দিক থেকে এই হাকীম ছিলেন খাদীজা বিনতে খুওয়ালিদের ভাতিজা। খুওয়াইলিদের মেয়ে মহিয়সী খাদীজা রাযিয়াল্লাহু আনহা ছিলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রথম স্ত্রী।

* * *

হাকীম ইবনে হাযাম লালিত-পালিত হন এমন এক পরিবারে, যার পূর্বপুরুষ ছিলেন সর্বোচ্চ মর্যাদাশীল। সম্ভ্রান্ত ও সম্পদশালী এই পরিবারেই হাকীম ইবনে হাযাম বেড়ে ওঠেন ও বিকশিত হন।

পারিবারিক ঐতিহ্য ছাড়াও বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মাঝে ফুটে উঠতে দেখা যায় জ্ঞান-বুদ্ধি, ধৈর্য-সহনশীলতাসহ নেতৃত্বের নানাগুণ। এর ফলে তার কওমের লোকেরা তাকেই নির্বাচিত করেন নিজেদের সরদার। কওমের লোকেরা তাকে মনোনীত করেন দুঃস্থ ও সর্বহারা হাজীদের সাহায্য-কাজের প্রধান।

এর কারণে জাহেলী যুগেই তিনি আল্লাহর ঘরের মেহমান, হজ করতে আসা হাজীদের মধ্যে দুঃস্থ এবং দস্যুদের কবলে পড়ে নিঃস্ব ও সর্বহারাদের নিজের ব্যক্তিগত সম্পদ অকাতরে বিলিয়ে সার্বিক সাহায্য করতেন।

নবুওয়াত লাভের পূর্বে তিনি ছিলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্তরঙ্গ ও ঘনিষ্ঠ মানুষ। তিনি যদিও রাসূল সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেয়ে বয়সে পাঁচ বছরের বড় ছিলেন, তারপরও তিনি রাসূলের সঙ্গে বন্ধুর মতো মেলামেশা করতেন, তাঁকে খুব ভালোবাসতেন, তাঁর সঙ্গে ওঠা-বসা ও চলা-ফেরা করে আনন্দ পেতেন।

এরপর যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাকীম ইবনে হাযামের ফুফু খাদীজা বিনতে খুওয়াইলিদকে বিয়ে করলেন, তখন এই আত্মীয়তা তাদের পরস্পরের বন্ধুত্ব ও অন্তরঙ্গতাকে আরও সুদৃঢ় করে তুলল।

* * *

প্রিয় পাঠক! রাসূলের সঙ্গে হাকীম ইবনে হাযামের অন্তরঙ্গতার যে দীর্ঘ চিত্র তুলে ধরলাম, সেটা জানার পর আপনি হতবাক ও বিস্মিত হয়ে যাবেন যখন জানবেন যে এই হাকীম ইবনে হাযাম ইসলাম গ্রহণ করেছেন শেষমেষ মক্কা বিজয়ের দিনে। অর্থাৎ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াত লাভের প্রায় বিশ বছর পরে।

হাকীম ইবনে হাযামের মতো এমন মানুষ—যাকে আল্লাহ তাআলা জ্ঞান- বুদ্ধি ও বিচক্ষণতা দান করেছিলেন, যাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে এত অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব ও এত ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার সম্পর্ক দান করেছিলেন—এমন একজন মানুষের ব্যাপারে সাধারণ ধারণা এমনই ছিল যে তিনিই হবেন রাসূলের প্রতি সর্বপ্রথম বিশ্বাস স্থাপনকারী, তিনিই হবেন তাঁর দাওয়াতে সর্বপ্রথম সাড়াদানকারী মুমিন, তিনিই হবেন তাঁর আদর্শের পতাকাবাহী প্রথম সৈনিক।

কিন্তু সকল ধারণাই হয়েছে ভুল, সকল হিসাব-নিকাশ হয়েছে ভ্রান্ত।

আল্লাহ তাআলার অভিপ্রায় ছিল অন্যরকম...

ফলাফল হয়েছে সেটাই যা ছিল আল্লাহর ইচ্ছা...

* * *

হাকীম ইবনে হাযাম রাযিয়াল্লাহু আনহুর বিলম্বে ইসলাম গ্রহণে যেমন আমরা অবাক ও বিস্মিত হই, তিনি নিজেও এজন্য নিজের প্রতি অবাক ও বিস্মিত।

তিনি ইসলাম গ্রহণ করার পর যেইমাত্র ঈমানের মিষ্টি স্বাদ আস্বাদন করলেন, সঙ্গে সঙ্গেই শিরকের অন্ধকার ও রাসূলের বিরুদ্ধে কাটানো দিনগুলোর প্রতিটা মুহূর্তের জন্য চরম অনুশোচনায় আঙ্গুল কামড়াতেন।

ইসলাম কবুল করার পর একদিন তাঁর ছেলে তাকে কাঁদতে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি ব্যাপার বাবা! তুমি কাঁদছ?'

তিনি বললেন,
'বেটা! কয়েকটি বিষয় আমাকে খুব ভাবায় এবং কাঁদায়...

এক. আমার বিলম্বে ইসলাম গ্রহণের কারণে এত অসংখ্য নেক আমল ও ফজিলত থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়েছি যে আজ যদি আমি দুনিয়া ভরা সোনা-রূপা দান করে দিই তবুও তার ধারে কাছেও যেতে পারব না।

দুই. বদর ও ওহুদের যুদ্ধে যখন আল্লাহ তাআলা আমাকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন, তখন আমি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, আর কখনো রাসূলুল্লাহর বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য কুরাইশের সঙ্গী হব না। কিন্তু আমার সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। কুরাইশীবাহিনীর সাহায্যের জন্য আমাকে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

তিন. বহুবার আমি মনে মনে ইসলাম গ্রহণ করার পরিকল্পনা করেছি। যখনই মনে মনে এই ইচ্ছা নিয়ে সামনে এগিয়েছি, আমার সামনে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে—কুরাইশের প্রবীণ লোকদের আঁকড়ে ধরে রাখা জাহেলী যুগের নীতি-আদর্শ। আমি হাজার চাইলেও ইসলামের দিকে আর অগ্রসর হতে পারিনি। বরং ঐ প্রবীণদের মতো আমিও জাহেলী যুগের নীতি-আদর্শকে আঁকড়ে ধরে থাকতে বাধ্য হয়েছি।

হায় আমার কপাল! যদি আমি তাদের অনুসরণ না করতাম! আরও আগেই যদি ইসলাম গ্রহণ করতাম!

মৃত পূর্বপুরুষ আর জীবিত নেতৃবৃন্দের অন্ধানুসরণই আমার জীবনটা বরবাদ করে দিয়েছে।

এরপরও হে আমার বেটা! কেন আমি কাঁদব না, বলো?'

* * *

আমরা যেমন হাকীম ইবনে হাযামের ইসলাম গ্রহণে বিলম্বের কারণে অবাক হই, যেভাবে তিনি নিজেও এতে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন, একইভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও হাকীম ইবনে হাযামের মতো এমন বিচক্ষণ ব্যক্তির ব্যাপারে বিস্ময় প্রকাশ করতেন। তিনি অবাক হয়ে প্রশ্ন করতেন, এমন বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ ব্যক্তির কাছে কীভাবে ইসলামের সৌন্দর্য গোপন থাকে? কীভাবে ইসলামের মতো এমন সার্বজনীন ধর্ম থেকে তাঁর মতো মানুষ দূরে থাকে? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুবই আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করতেন যে হাকীম ইবনে হাযাম এবং তার মতো লোকেরা যেন দ্রুত ইসলাম গ্রহণ করেন।

মক্কা বিজয়ের আগের রাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের বললেন,

'মক্কাতে এমন চারজন মানুষ রয়েছেন যাদের মুশরিক থাকা মুহূর্তের জন্যও আমার পছন্দ নয়। আমি সবসময় তাদের ইসলাম কবুলের কামনা করি।'

কেউ প্রশ্ন করলেন,
'সেই চার ব্যক্তি কারা ইয়া রাসূলাল্লাহ?'

তিনি উত্তর দিলেন,

'আত্তাব ইবনে উসাইদ, জুবাইর ইবনে মুতঈম, হাকীম ইবনে হাযাম এবং সুহাইল ইবনে আমর।'

আল্লাহ তাআলার অশেষ মেহেরবানীতে তারা সকলেই ইসলাম কবুল করেছেন।

* * *

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বিজয়ীর বেশে মক্কায় প্রবেশ করছিলেন তখন তিনি চাইলেন হাকীম ইবনে হাযামের প্রতি বিশেষ মর্যাদা প্রদর্শন করা হোক। তিনি এই মর্মে সর্বসাধারণের মাঝে ঘোষণা করার আদেশ দিলেন,

(ক) 'যে সাক্ষ্য দেবে যে আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই, তিনি এক ও অদ্বিতীয়—তাঁর কোনো শরীক নেই এবং মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসূল, সে নিরাপদ।

(খ) যে অস্ত্রত্যাগ করে কাবার সামনে বসে থাকবে, সে নিরাপদ।

(গ) যে নিজের বাড়ির দরজা বন্ধ করে ভেতরে অবস্থান করবে, সেও নিরাপদ।

(ঘ) যে ব্যক্তি আবু সুফিয়ানের বাড়িতে প্রবেশ করবে, সেও নিরাপদ এবং

(ঙ) যে ব্যক্তি হাকীম ইবনে হাযামের গৃহে আশ্রয় নেবে, সেও নিরাপদ।'

হাকীম ইবনে হাযামের বাড়ি ছিল মক্কার সমতল ভূমিতে আর আবু সুফিয়ানের বাড়ি উঁচু ভূমিতে।

* * *

হাকীম ইবনে হাযাম আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ঈমান আনলেন এবং ইসলামের আদেশ-নিষেধ মেনে এমনভাবে বদলে গেলেন যে ঈমান ও ইসলাম তার প্রতিটি রক্তকণার সঙ্গে মিশে গেল, তাঁর হৃদয় ও মন, বুদ্ধি ও বিবেকের ওপর প্রভাব বিস্তার করে থাকল।

তিনি মনে মনে দৃঢ় শপথ ও সংকল্প করে নিলেন, জাহেলিয়াতের সময়ে কৃত সকল অপকর্মের কাফ্‌ফারা করবেন সমপরিমাণ নেক আমল করে এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শত্রুতায় ব্যয়িত অর্থের সমপরিমাণ ব্যয় করবেন তাঁর দাওয়াতের কাজ সম্প্রসারণের কাজে।

তিনি তাঁর এই শপথ পূর্ণ করেছিলেন।

বহু প্রাচীন ঘটনার সাক্ষী, ঐতিহাসিক 'দারুন্‌-নাদওয়াহ' মিলনায়তনের তিনিই ছিলেন মালিক। যেখানে জাহেলী যুগে কুরাইশ নেতৃবৃন্দ তাদের সম্মেলন ও পরামর্শ সভাগুলোর আয়োজন করত। এখানেই কুরাইশের শীর্ষ ব্যক্তিরা সমবেত হয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে নানা রকমের ষড়যন্ত্র করত।

হাকীম ইবনে হাযাম পরিকল্পনা করলেন অভিশপ্ত এই মিলনায়তনের মালিকানা থেকে মুক্ত হওয়ার। অভিশপ্ত অতীতের ওপর টেনে দিতে চাইলেন বিস্মৃতির পর্দা। তাই সেটা বিক্রি বরে দিলেন এক লক্ষ দেরহামে। এই দেখে কুরাইশী এক যুবক বলে বসল,

'চাচা! কুরাইশী ঐতিহ্যের এই স্মৃতিচিহ্নটুকুও বেচে দিলেন?'

হাকীম ইবনে হাযাম রাযিয়াল্লাহু আনহু তার উত্তরে বললেন,

'হায় হায়! এখনো তুমি সেই প্রাচীন অন্ধকারেই ডুবে আছ? পুরোনো দিনের সব মর্যাদা ও ঐতিহ্যের দিন খতম হয়ে গেছে। বাকি রয়েছে শুধু তাকওয়া ও আল্লাহভীতির চিরন্তন মর্যাদা। ঐ মিলনায়তন আমি শুধু জান্নাতী বালাখানা কেনার জন্যই বিক্রি করেছি।

তোমরা সাক্ষী থেক, আমি ওটার মূল্য সম্পূর্ণ আল্লাহর জন্য দান করে দিলাম।'

* * *

হাকীম ইবনে হাযাম রাযিয়াল্লাহু আনহু ইসলাম গ্রহণের পর হজ করলেন। মূল্যবান কাপড় জড়িয়ে একশো উটের এক বিশাল বহর নিয়ে গেলেন এবং সবগুলো আল্লাহর সন্তুষ্টি ও নৈকট্য কামনায় কুরবানী করে দিলেন।

পরে যখন দ্বিতীয়বার হজের উদ্দেশ্যে আরাফার ময়দানে হাজির হলেন। এবার তাঁর সঙ্গে ছিল একশো ক্রীতদাস। যাদের প্রত্যেকের গলায় ঝোলানো ছিল রূপার ফিতা। যাতে খোঁদাই করে লেখা ছিল,

'হাকীম ইবনে হাযামের পক্ষ থেকে আল্লাহর জন্য মুক্ত।'

এদের সকলকেই তিনি দিলেন মুক্ত ও স্বাধীন করে।

তৃতীয়বার হজের সময় তিনি নিয়ে গেলেন এক হাজার বকরি—হ্যাঁ, এক হাজার বকরির বিশাল পাল। মিনায় সবগুলো কুরবানী করে একমাত্র আল্লাহর কাছে প্রতিদান পাওয়ার আশায় গরিব মুসলিমদের খাওয়ালেন।

* * *

হুনাইনের যুদ্ধের পর হাকীম ইবনে হাযাম রাযিয়াল্লাহু আনহুর অবস্থা এমন হলো যে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গনিমতের মালের জন্য আবেদন করলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার আবেদন কবুল করলেন এবং তাকে গনিমতের মাল দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। পরে তিনি আবার আবেদন করলেন এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবারও দিলেন। এভাবে দিতে দিতে একশো উটে গিয়ে দাঁড়ায় তাকে দেওয়া গনিমতের মাল। এসময় তিনি

ছিলেন ইসলামে নবদীক্ষিত। নতুন মুসলিম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বললেন,

‘হে হাকীম! এইসব মাল ও সম্পদ মানুষের কাছে খুবই প্রিয় ও আকর্ষণীয়, যারা তা কানাআতের (অল্পেতুষ্টির) সঙ্গে গ্রহণ করে আল্লাহ তাদের জন্য মালের মধ্যে বরকত ও প্রাচুর্য দান করেন।

আর যারা তা হৃদয়ের লালসা ও অতৃপ্তির সঙ্গে গ্রহণ করে আল্লাহ তাদের জন্য মালের মধ্যে কোনো বরকত রাখেন না। সে হয়ে যায় সেই পেটের মতো বারবার খেলেও যা পরিতৃপ্ত হয় না।

মনে রেখো, উপরের (দাতা) হাত নিচের (গ্রহণকারী) হাতের চেয়ে সর্বদাই উত্তম।’

হাকীম ইবনে হাযাম রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র মুখ থেকে এই উপদেশ শোনার সঙ্গে সঙ্গেই বললেন,

‘ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনাকে যিনি সত্য দীন দিয়ে পাঠিয়েছেন, সেই মহান আল্লাহর শপথ করে বলছি, আজকের পর আর কখনোই কারও কাছে কিছু চাইব না। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত কারও কাছ থেকে কোনো সাহায্য গ্রহণ করব না।’

হাকীম ইবনে হাযাম রাযিয়াল্লাহু আনহু এই শপথের ওপর মৃত্যু পর্যন্ত অনড় ছিলেন।

আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতকালে হাকীম ইবনে হাযাম রাযিয়াল্লাহু আনহুকে একাধিকবার বাইতুল মাল থেকে নাগরিক ভাতা গ্রহণের জন্য আহ্বান জানানো হলেও তিনি তা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানান।

এরপর দ্বিতীয় খলীফা উমর ফারুক রাযিয়াল্লাহু আনহুর শাসনামলেও একই ঘটনার পুনারাবৃত্তি ঘটে। খলীফা তাঁকে ভাতা গ্রহণের আহ্বান জানালে তিনি এবারও তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন।

ফলে উমর ফারুক রাযিয়াল্লাহু আনহু জনসম্মুখে এর ব্যাখ্যায় ঘোষণা করেন,

'হে মুসলিম-জনসাধারণ! আপনাদের অবগতির জন্য ঘোষণা করছি যে, আমি হাকীম ইবনে হাযামকে [রাযিয়াল্লাহু আনহু] বারবার তাঁর প্রাপ্য গ্রহণের আহ্বান করেছি কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছেন।'

এভাবেই তিনি মৃত্যু পর্যন্ত কারও কাছ থেকে কোনো সাহায্য বা কোনোপ্রকার অর্থ ও সম্পদ গ্রহণ করেননি।

তথ্যসূত্র :

১. *আল-ইসতীআব*, ১ম খণ্ড, ৩২০ পৃষ্ঠা।
২. *আল-ইসাবা*, ১ম খণ্ড, ৩৪৯, *আত্তারজামা*, ১৮০০।
৩. *আল-মিলালু ওয়ান-নিহাল*, ১ম খণ্ড, ২৭ পৃষ্ঠা।
৪. *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, ১ম খণ্ড, ২৬ পৃষ্ঠা।
৫. *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, ৩য় খণ্ড, ১৬৪ পৃষ্ঠা।
৬. *যুআমাউল ইসলাম*, ১৯০-১৯৬ পৃষ্ঠা।
৭. *হামাতুল ইসলাম*, ১ম খণ্ড, ১২১ পৃষ্ঠা।
৮. *তারীখুল খুলাফা*, ১২৬ পৃষ্ঠা।
৯. *সিফাতুস সফওয়া*, ১ম খণ্ড, ৩১৯ পৃষ্ঠা।
১০. *আল-মাআরিফ*, ৯২-৯৩ পৃষ্ঠা।
১১. *উসদুল গাবাহ*, ২য় খণ্ড, ৯-১৫ পৃষ্ঠা।
১২. *মুহায়ারাতুল উদাবা*, ৪র্থ খণ্ড, ৪৭৮ পৃষ্ঠা।
১৩. *মুরাওবিজুয যাহাব*, ২য় খণ্ড, ৩০২ পৃষ্ঠা।

আব্বাদ ইবনে বিশ্‌র

> আনসার সাহাবীদের মাঝে এমন তিনজন মহান মানুষ আছেন, যাঁদের ফজিলত ও উঁচু মর্যাদার কাছাকাছি আর কেউ যেতে পারেনি। তাঁরা হলেন সাদ ইবনে মুআয, উসাইদ ইবনুল হুযাইর ও আব্বাদ ইবনে বিশ্‌র।
>
> –উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা।

ইসলামী দাওয়াত ও প্রচারের ইতিহাসে আব্বাদ ইবনে বিশর রাযিয়াল্লাহু আনহু একটি আলোকিত ও উজ্জ্বল নক্ষত্রের নাম।

তাঁকে যদি আপনি ইবাদতগুজারদের তালিকায় খোঁজেন, তাহলে দেখতে পাবেন তিনি একজন মুত্তাকী পরহেজগার এবং রাতে কুরআনের বিভিন্ন অংশ তেলাওয়াত করে দীর্ঘসময় ধরে তাহাজ্জুদ আদায়কারী।

আর যদি তাঁকে বীরযোদ্ধাদের মাঝে খোঁজ করেন, তাহলেও আপনি নিরাশ হবেন না। আল্লাহর কালিমা বুলন্দ করার জন্য, আল্লাহর দীন ইসলামকে বিজয়ী করার লক্ষ্যে যুদ্ধের ময়দানে তাঁকে পাবেন দুর্ধর্ষ, দুঃসাহসী লড়াকু সৈনিক হিসাবে।

আবার যদি তাঁর সন্ধান করেন আঞ্চলিক শাসক বা গভর্নরদের মাঝে, তাহলে দেখবেন, তিনি শান্তি-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা রক্ষার একজন

আপসহীন ও শক্তিশালী শাসক এবং বাইতুল মালের সম্পদ হেফাজতের প্রশ্নে একজন বিশ্বস্ত ও আমানতদার গভর্নর।

এমনকি উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা তাঁর এবং তাঁর বংশের আরও দু'জনের প্রশংসা করে বলেন,

'আবদুল আশহাল গোত্রে এমন মহান তিনজন আনসার সাহাবী আছেন, যাঁদের ফজিলত ও উঁচু মর্যাদাকে আর কেউই ছুঁতে পারেনি। তাঁরা হলেন সাদ ইবনে মুআয, উসাইদ ইবনুল হুযাইর ও আব্বাদ ইবনে বিশ্‌র।'

* * *

মদীনাতে যখন মুহাম্মাদী হিদায়াতের প্রথম সোনালী সূর্যালোক ছড়িয়ে পড়ে, তখন আব্বাদ ইবনে বিশর ছিলেন তারুণ্যদীপ্ত এক টগবগে যুবক। তাঁর চেহারায় প্রকাশ পেত নিষ্পাপ ও পবিত্র চরিত্রের সজীবতা আর তাঁর কাজকর্মে ফুটে উঠত পোড়খাওয়া বয়স্ক মানুষদের মতো বুদ্ধি ও বিচক্ষণতার ছাপ। অথচ তখন পর্যন্ত তিনি নিজের সুখী জীবনের পঁচিশ বছরও পার করেননি।

* * *

মক্কা থেকে আসা তরুণ ইসলাম প্রচারক মুসআব ইবনে উমাইর রাযিয়াল্লাহু আনহুর সঙ্গে সাক্ষাতে মিলিত হলেন। ফলে ঈমানের বন্ধন দ্রুত তাদের দুটো হৃদয়কে কাছে টেনে আনল। উত্তম চরিত্র ও উন্নত স্বভাব তাদের দুটো প্রাণকে যেন একাকার করে দিল।

তিনি মুসআব ইবনে উমাইর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে মিষ্টি, আবেগঘণ ও সুস্পষ্ট সুরে কুরআন তেলাওয়াত করতে শুনে আল্লাহর কালাম কুরআনের ভালোবাসায় পাগলপারা হয়ে ওঠেন। কুরআনের জন্য হৃদয়ের গভীরে প্রশস্ত স্থান তৈরি করে নেন। কুরআন তিলাওয়াকেই বানিয়ে নিলেন জীবনের প্রধান কাজ। ফলে দিনে-রাতে, দেশে-বিদেশে সর্বত্র, সর্বক্ষণ

গুনগুন করে কুরআন তিলাওয়াত করতেই থাকেন। এরই কারণে অবশেষে আব্বাদ ইবনে বিশর রাযিয়াল্লাহু আনহু সাহাবায়ে কেরামের মাঝে পরিচিত হয়ে ওঠেন 'ইমাম' ও 'কুরআনের বন্ধু' নামে।

* * *

কোনো এক গভীর রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাজ্জুদ নামায আদায় করছিলেন মসজিদে নববী সংলগ্ন আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার ঘরে। তখন আব্বাদ ইবনে বিশ্‌র রাযিয়াল্লাহু আনহু মসজিদে কুরআন তেলাওয়াত করছিলেন। তাঁর প্রাণবন্ত কুরআন তেলাওয়াতের আওয়াজ শুনতে পেয়ে তিনি আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহাকে জিজ্ঞাসা করলেন,

'আয়েশা! এটা কি আব্বাদ ইবনে বিশ্‌রের তেলাওয়াত? কত মধুর ও প্রাণবন্ত তেলাওয়াত শুনতে পাচ্ছি।'

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা উত্তর দিলেন, 'হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ!'

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার সমর্থনে নিশ্চিত হওয়ার পর আব্বাদ ইবনে বিশ্‌র এর জন্য দুআ করলেন-

'ইয়া আল্লাহ! তার সকল গুনাহ মাফ করে দাও।'

* * *

আব্বাদ ইবনে বিশ্‌র রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনকালের সকল যুদ্ধেই শরীক হয়েছেন। সেই সকল যুদ্ধেই তাঁর বিশেষ ভূমিকা ও অবদান ছিল একজন কুরআনের প্রেমিক ও বাহক হিসাবে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন 'যাতুররিকা' অভিযান থেকে ফিরছিলেন, তখন মুসলিমবাহিনী রাত কাটানোর জন্য কোনো এক পাহাড়ী উপত্যকায় অবতরণ করল।

ওদিকে জনৈক মুসলিমসৈনিক যুদ্ধের ময়দানে এক মুশরিক নারীযোদ্ধাকে বন্দী করে নিয়ে আসে। স্ত্রী বন্দী হওয়ার খবর শোনামাত্র স্বামী লাত ও উয্যা দেবীর শপথ করে বলে, 'সে মুহাম্মাদ ও তার বাহিনীর পিছু নেবে এবং তাদের রক্ত না ঝরিয়ে ফিরবে না।'

* * *

মুসলিমবাহিনী নিজ নিজ বাহন থেকে নেমে সেগুলো বেঁধে রাখার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবাইকে ডেকে বললেন,

'আজ রাতে কে আমাদের পাহারার দায়িত্ব নেবে?'

আব্বাদ ইবনে বিশ্‌র এবং আম্মার ইবনে ইয়াসির রাযিয়াল্লাহু আনহুমা দাঁড়িয়ে বললেন,

'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা দু'জন পাহারা দেব।'

মক্কা থেকে মুহাজির সাহাবীরা যখন মদীনায় এসেছিলেন, সে সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দুই সাহাবীকেও পরস্পর ভাই ভাই বানিয়ে দিয়েছিলেন।

পাহারা দেওয়ার উদ্দেশ্যে তাঁরা দু'জন যখন উপত্যকার মুখে পৌঁছে গেলেন, তখন আব্বাদ ইবনে বিশ্‌র রাযিয়াল্লাহু আনহু তাঁর ভাই আম্মার ইবনে ইয়াসির রাযিয়াল্লাহু আনহুকে জিজ্ঞাসা করলেন,

'ভাই আম্মার! আপনি কোন্ অংশে ঘুমাতে চান? রাতের শুরুতে নাকি শেষে?'

আম্মার রাযিয়াল্লাহু আনহু জবাব দিলেন,

'আমি বরং প্রথম অংশে ঘুমিয়ে নিই আপনি পাহারায় থাকুন এরপর শেষ অংশে আমি পাহারায় থাকব, তখন আপনি ঘুমাবেন।'

সিদ্ধান্ত মতো তিনি একটু দূরে গিয়ে শুয়ে পড়লেন।

* * *

চারদিকে সুনসান নীরবতার মধ্যে শান্ত-নিঝুম এই রাত। আব্বাদ ইবনে বিশ্‌র রাযিয়াল্লাহু আনহুর অনুভূতিকে নাড়িয়ে দিল প্রকৃতি। তিনি চিন্তা করলেন, অসংখ্য তারকা, গাছপালা, পাথর ও বালুকণা সকলেই প্রভুর পবিত্রতা গেয়ে চলেছে। তাঁর হৃদয়েও মহান প্রভুর ইবাদতের আগ্রহ জেগে উঠল। তাঁর প্রাণ তেলাওয়াতে কুরআনের জন্য ব্যাকুল হলো। এমনি তেলাওয়াতের চেয়ে নামাযের তেলাওয়াতে তিনি মজা পেতেন অনেক বেশি। কারণ, এতে নামাযের মজা আর তেলাওয়াতের মজা একসঙ্গে পেতেন। সুতরাং আর দেরি কিসের! তিনি কেবলামুখী হয়ে নামাযে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং তাঁর মিষ্টি প্রাণবন্ত আওয়াজে তেলাওয়াত শুরু করলেন সূরা কাহাফ।

তিনি যখন এই ঐশী নূরের উজ্জ্বল সরোবরে অবগাহন করছিলেন, তার আলোকিত কিরণমালায় সাঁতার কাটছিলেন, এমনি সময়ে দ্রুত গতিতে ছুটতে ছুটতে সেখানে এসে থামল স্ত্রী হারিয়ে রক্ত ঝরানো-শপথকারী সেই লোকটি। উপত্যকার প্রবেশ মুখে একজনকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে লোকটি বুঝে গেল যে এখানেই ভেতরে মুহাম্মাদ ও তাঁর সঙ্গীরা আছে আর ঐ লোকটি পাহারা দিচ্ছে। সুতরাং আগন্তুক লোকটি ধনুক বের করল। তূণীর থেকে তীর বের করে ছুঁড়ে দিল। তীরটি নামাযরত আব্বাদ ইবনে বিশ্‌র রাযিয়াল্লাহু আনহুর শরীরে বিঁধে গেল। তীরটি তিনি টেনে বেড় করে ফেলে দিলেন। তেলাওয়াত চালু রাখলেন, নামাযে ডুবে থাকলেন।

লোকটি দ্বিতীয় তীর ছুঁড়ল এবং তাঁর শরীরে বিদ্ধ করল। আব্বাদ ইবনে বিশ্‌র রাযিয়াল্লাহু আনহু এবারও তীরটি বের করে ফেলে দিলেন। লোকটি আবারও তীর ছুঁড়লে তিনিও আগের মতো শরীর থেকে তীরটি অপসারণ করে ফেললেন। হামাগুড়ি দিয়ে ঘুমন্ত আম্মার বিন ইয়াসিরের কাছাকাছি পৌঁছে তাকে ডেকে বললেন,

'ভাই আম্মার! উঠুন, প্রচুর রক্তক্ষরণে আমি একদম নিস্তেজ হয়ে পড়েছি।'

একজনের সঙ্গে দ্বিতীয় আরও একজনকে দেখতে পেয়ে আক্রমণকারী আরও অনেক পাহারাদার আছে ভেবে পালিয়ে গেল।

* * *

আব্বাদ ইবনে বিশ্‌র রাযিয়াল্লাহু আনহুর প্রতি আম্মার ইবনে ইয়াসির রাযিয়াল্লাহু আনহুর চোখ পড়ামাত্রই দেখলেন তিনটি যখম থেকেই প্রচুর রক্ত ঝড়ছে। এটা দেখে তিনি ব্যাকুল হয়ে বলে উঠলেন,

'কী আশ্চর্য, প্রথম তীরটি লাগার সঙ্গে সঙ্গে কেন আমাকে ডাকেননি!'

আব্বাদ ইবনে বিশ্‌র রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন,

'নামাযে যে সূরাটি তেলাওয়াত করছিলাম, তাতে এত মজা ও স্বাদ পাচ্ছিলাম যে শেষ না করে থামতেই ইচ্ছা হচ্ছিল না। আল্লাহর কসম! আল্লাহর রাসূল ও তাঁর সাহাবীদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কা না হলে আমি মরে গেলেও তেলাওয়াত বন্ধ করতাম না।'

* * *

আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহুর শাসনামলে যখন চারদিকে 'রিদ্দত' (মুরতাদ হওয়ার) এর ফিতনা ছড়িয়ে পড়ল, তখন খলীফাতুল মুসলিমীন সিদ্দীকে আকবার রাযিয়াল্লাহু আনহু ভণ্ড মুসাইলামাতুল কায্যাবকে সমূলে উৎখাত এবং তার সহযোগী মুরতাদদের দমন ও তাদের ইসলাম ধর্মে ফিরিয়ে আনার উদ্দেশ্যে এক বিশাল বাহিনী প্রস্তুত করলেন। আব্বাদ ইবনে বিশ্‌র রাযিয়াল্লাহু আনহু সেই বাহিনীর অগ্রভাগে শরীক থাকলেন।

মুসাইলামার বিরুদ্ধে এই যুদ্ধে মুসলিমবাহিনী উল্লেখযোগ্য কোনো নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে না পারায় আব্বাদ ইবনে বিশ্‌র রাযিয়াল্লাহু আনহু গভীরভাবে পর্যালোচনা করে দেখলেন যে এর কারণ হলো, মুহাজির ও আনসারদের পারস্পারিক দোষারোপ। বিষয়টি তাঁকে ভীষণ ব্যথিত ও

ক্রুদ্ধ করে তুলল। এই চরম ও নাজুক অবস্থা দেখে-শুনে তিনি নিশ্চিত হলেন যে মুসলিমবাহিনীর বিজয়ী হওয়ার একটিমাত্র পথ আছে। মুহাজির ও আনসারদের দুটো আলাদা দলে ভাগ করে দেওয়া। যেন প্রত্যেক দল নিজ নিজ দায় স্বীকার করে নিতে পারে। একে অন্যের ওপর দোষ চাপাতে না পারে।

এতে বোঝা যাবে যুদ্ধের ময়দানে আসল লড়াকু কে কে।

* * *

চূড়ান্ত যুদ্ধের আগের রাতে আব্বাদ ইবনে বিশ্‌র রাযিয়াল্লাহু আনহু স্বপ্নে দেখলেন, 'তাঁর জন্য আসমানের দরজা খুলে দেওয়া হলো। তিনি ভেতরে প্রবেশ করলে আসমান তাঁকে কাছে টেনে নিল এবং দরজা বন্ধ করে দেওয়া হলো।'

সকালে আব্বাদ ইবনে বিশ্‌র রাযিয়াল্লাহু আনহু আবু সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লাহু আনহুর কাছে স্বপ্নের আলোচনা করলেন। এর ব্যাখ্যায় তিনি আবু সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বললেন,

'আবু সাঈদ! নিশ্চিত এটা শাহাদাতের সংবাদ।'

* * *

পরদিন সূর্যোদয় হলে যুদ্ধ শুরু হলো নতুন করে। আব্বাদ ইবনে বিশ্‌র রাযিয়াল্লাহু আনহু একটি উঁচু টিলার ওপর দাঁড়িয়ে চিৎকার করে ঘোষণা করলেন,

'হে আনসার ভাইয়েরা! তোমরা অন্যদের থেকে আলাদা হয়ে এসো,
তোমাদের তরবারির খাপগুলো ভেঙে ফেলো...
তোমাদের দিক থেকে যেন ইসলামের ওপর আঘাত আসতে না পারে।'

তিনি বারবার এই ঘোষণা দিতে থাকলেন, প্রায় চারশো যোদ্ধা তার আশপাশে সমবেত হয়ে গেলেন। যাঁদের শীর্ষে ছিলেন : সাবেত ইবনে

কায়েস, বারা ইবনে মালেক এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরবারি রক্ষক সাহাবী আবু দুজানা রাযিয়াল্লাহু আনহুম।

এই চারশো মরণজয়ী যোদ্ধাকে সঙ্গে নিয়ে আব্বাদ ইবনে বিশ্‌র রাযিয়াল্লাহু আনহু মুসাইলামার সুশৃঙ্খল বাহিনীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তরবারি চালিয়ে শত্রুদের ব্যূহ ভেদ করতে থাকলেন। দুশমনের সকল আক্রমণ বুক পেতে নিয়ে দুর্জয় ও দুর্বিনীত এই ভঙ্গিতে এগিয়ে যাওয়াতে মুসাইলামার সুরক্ষিত ও প্রশিক্ষিত বাহিনী দেখতে না দেখতেই এলোমেলো ও ছত্রভঙ্গ হয়ে পালাতে লাগল। মুসাইলামা বিপদে পড়ে তার দলবল নিয়ে পার্শ্ববর্তী বিশাল প্রাচীর ঘেরা বাগানে আশ্রয় নিলে সেখানে ঢুকে মুসলিমবাহিনী তাদের কচুকাটা করতে থাকে। মুরতাদবাহিনীর অসংখ্য ও অগণিত লাশের কারণে এই বাগানটি 'মৃত্যুর বাগান' নামে পরিচিত হয়।

সেই সুরক্ষিত মৃত্যুবাগানের উঁচু প্রাচীরেরই পাশে আব্বাদ ইবনে বিশ্‌র রাযিয়াল্লাহু আনহু রক্তস্রোতে ভেসে শহীদ হয়ে পড়ে রইলেন।

তাঁর শরীরে ছিল তীর, তরবারি ও বর্শার এত অসংখ্য আঘাত যে তাঁকে চেনাই যাচ্ছিল না।

অবশেষে একটি চিহ্ন দেখে তাকে শনাক্ত করা সম্ভব হয়।

তথ্যসূত্র :

১. *আল-ইসাবা*, ২য় খণ্ড, ২৬৩ পৃষ্ঠা, অথবা *আত্তারজামা*, ৪৪৫৫।
২. *আল-ইসতীআব*, বিহামিশিল ইসাবা, ২য় খণ্ড, ৫৫২ পৃষ্ঠা।
৩. *তারীখুল ইসলাম* লিয্-যাহাবী, ১ম খণ্ড, ৩৭০ পৃষ্ঠা।
৪. *তাহযীবুত তাহযীব*, ৫ম খণ্ড, ৯০ পৃষ্ঠা।
৫. *আত-তাবাকাতুল কুবরা* লিবনি সাআদ, ৩য় খণ্ড, ৪৪০ পৃষ্ঠা।
৬. *আল-মুহাব্বারু ফিত-তারীখ*, ২৮৩ পৃষ্ঠা।
৭. *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, ১ম খণ্ড, ২৪৩ পৃষ্ঠা।
৮. *হায়াতুস সাহাবা*, ১ম খণ্ড, ৭১৬ পৃষ্ঠা।

যায়েদ ইবনে সাবেত আল-আনসারী

হাস্‌সান ও তার পুত্রের পরে ছন্দ ও কাব্যের জগতে আর কেউ নেই, কুরআনের গভীর ও নিগূঢ় জগতে যায়েদ ইবনে সাবেতের পরেও কেউ নেই।

-কবি হাস্‌সান ইবনে সাবেত।

হিজরতের দ্বিতীয় বর্ষের কথা...

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শহর মদীনা একেবারে লোকে লোকারণ্য হয়ে উঠেছে বদর যুদ্ধের প্রস্তুতি উপলক্ষ্যে।

আল্লাহর জমিনে আল্লাহর কালেমা ও আইন প্রতিষ্ঠা এবং রাসূলুল্লাহর নেতৃত্বে আল্লাহর পথে জিহাদ-সংগ্রাম করার উদ্দেশ্যে গড়ে তোলা সর্বপ্রথম মুজাহিদবাহিনীর সদস্যদের সর্বশেষ (ফিটনেস) উপযোগিতার পরীক্ষা চলছে। সেই উদ্দেশ্যেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লাইন ধরে দাঁড়ানো মুজাহিদ সদস্যদের ওপর একে একে দৃষ্টি বোলাচ্ছেন।

এমন সময় প্রায় তেরো বছর বয়সী এক কিশোর বালক সেখানে এগিয়ে এল। বালকটির চোখ-মুখ দিয়ে ঠিকরে বেরুচ্ছিল তীক্ষ বুদ্ধিমত্তা আর মেধার আভাস।

তার হাতে ধরা ছিল তার চেয়েও লম্বা এক তরবারি। সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছাকাছি এসে বলে উঠল,

'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার জন্য আমার জীবন উৎসর্গিত। আমি আপনার পতাকাতলে শামিল হয়ে আল্লাহর দুশমনদের বিরুদ্ধে আপনার সঙ্গী হয়ে যুদ্ধ করতে চাই। আমাকে দয়া করে অনুমতি দিন।'

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুগ্ধ চোখে বালকটির দিকে তাকালেন। তার পিঠ চাপরে বাহবা দিলেন। তার এই জিহাদী চেতনা ও আবেগের প্রশংসা করে অবশেষে অল্প বয়সের কথা বলে তাকে ফিরিয়ে দিলেন।

* * *

ছোট্ট কিশোর ভীষণ বেদনা বুকের মধ্যে লুকিয়ে ফিরে এল। কেননা, সে আজ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসলামের সর্বপ্রথম যে যুদ্ধাভিযান পরিচালনা করবেন বদর প্রান্তরে, তাতে সে রাসূলের সঙ্গী হওয়ার গৌরব থেকে বঞ্চিত হয়েছে বয়সের স্বল্পতার কারণে।

তার পিছে পিছে তার মা 'নাওয়ার বিনতে মালেক'ও ফিরে এলেন। পুত্রের চেয়ে মাও আজ কম ব্যথিত নন।

কারণ, তিনি আজ তীব্র আকাঙ্ক্ষা নিয়ে পুত্রকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হাজির করেছিলেন। তাঁর আশা ছিল, রাসূলের পতাকাতলে শামিল হয়ে অন্য যোদ্ধাদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে তার একমাত্র পুত্র মুজাহিদ বেশে এগিয়ে যাচ্ছে—এমন একটি দৃশ্য দেখে প্রাণ জুড়াবেন।

তিনি মনে মনে কত আশা করেছিলেন যে এই পুত্র আজ প্রিয় নবীর কাছে সেই স্থান দখল করবে যা তার মরহুম পিতা বেঁচে থাকলে লাভ করতেন।

* * *

আনসারী বালক যখন বুঝতে পারল যে, সে বয়সের স্বল্পতার কারণে যুদ্ধের ময়দানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নৈকট্য পেতে ব্যর্থ হয়েছে, এতে সে দমে গেল না। বরং চিন্তা-ভাবনা করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নৈকট্য লাভের এমন একটি উপায় খুঁজে বের করল যেখানে বয়সের স্বল্পতা কোনো প্রতিবন্ধক নয়।

সেটা হলো কুরআনের হিফয এবং কুরআন-হাদীসের জ্ঞানার্জন।

সে এই চিন্তা ও পরিকল্পনার কথা মাকে জানাল। তিনি শুনে খুব খুশি হলেন এবং সেটা বাস্তবায়নের তৎপরতা শুরু করলেন।

* * *

ছেলেটির মা 'নাওয়ার বিনতে মালেক' কওমের কয়েকজন শীর্ষ ব্যক্তির কাছে ছেলের আগ্রহের বিষয়টি আলোচনা করলেন, ছেলের পরিকল্পনার কথাও তাদের সামনে তুলে ধরে বললেন, 'রাসূলের সান্নিধ্য লাভ করতে সে প্রচণ্ড আগ্রহী।'

তারা ছেলেটিকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গিয়ে বললেন 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! এটা আমাদেরই বংশের এক এতীম ও পিতৃহারা সন্তান। এর নাম যায়েদ ইবনে সাবেত। সে এই অল্প বয়সেই কুরআনের সতেরোটি সূরা হিফয করেছে। সে খুব সহীহ-শুদ্ধভাবে তেলাওয়াত করতে পারে।

তার সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, সে লেখার ক্ষেত্রে দক্ষতা অর্জন করেছে। সুন্দর লিখতে পারে এবং পড়তেও পারে। এসব কিছুই সে করেছে শুধু আপনার কাছে আসার জন্য। ওর গুণ ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে যা বললাম, আপনি দয়া করে একটু পরীক্ষা করে দেখুন।'

* * *

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিশোর যায়েদ ইবনে সাবেতকে হিফ্য করা অংশ থেকে তেলাওয়াত করতে বললেন। যায়েদ

তেলাওয়াত করলে তা শুনে তিনি মুগ্ধ হলেন। চমৎকার, শুদ্ধ ও স্পষ্ট উচ্চারণ। আকাশের গায়ে তারকারাজি যেমন ঝলমল করে জ্বলে তার দুই ঠোঁটে কুরআনের শব্দগুলোও সেইভাবে আলোকিত ও ঝলমলে হয়ে উচ্চারিত হলো।

তার তেলাওয়াতকৃত আয়াতের বিষয় ও ঘটনা জীবন্ত হয়ে উঠছিল...

তার 'ওয়াক্‌ফ' বা থামার ভঙ্গিতে স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছিল যে আয়াতের বক্তব্য সে কত চমৎকারভাবে হৃদয়ঙ্গম করেছে।

তার বিশুদ্ধ ও স্পষ্ট উচ্চারণ, চমৎকার শ্রুতিমধুর আওয়াজ, ওয়াক্‌ফরীতির সঠিক অনুসরণ এবং মর্ম বুঝে নির্ভুল তেলাওয়াত শুনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুবই আনন্দিত হলেন। তার যত গুণের কথা শুনেছিলেন, বাস্তবে দেখলেন সে তারচেয়েও ঊর্ধ্বে। তার প্রতি নবীজীর মুগ্ধতা আরও বেশি বেড়ে গেল তার লেখার দক্ষতায়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদর করে বললেন,

'হে যায়েদ! তুমি ইহুদীদের ইবরানী ভাষাটা শিখে নাও। তাহলে আমাকে সাহায্য করতে পারবে। তাদের কাছে আমার যেসব চিঠিপত্র যায়, সেগুলোর যথাযত ইবরানী অনুবাদ তারা করে কিনা—এ ব্যাপারে আমি আশ্বস্ত হতে পারি না।'

তিনি নিজের মেধা, শ্রম ও মনোযোগসহ সর্বশক্তি ব্যয় করে অল্প সময়ে ইবরানী ভাষা ভালোভাবে রপ্ত করে নিলেন। এরপর যখন রাসূলের প্রয়োজন দেখা দিত ইহুদীদের কাছে চিঠি লেখার, তখন যায়েদ ইবনে সাবেত রাযিয়াল্লাহু আনহু তাঁর পক্ষ থেকে ওদের কাছে চিঠি লিখে দিতেন। আবার ইহুদীরা রাসূলের কাছে কোনো চিঠি পাঠালে যায়েদ ইবনে সাবেত রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সেটা পড়ে শোনাতেন। এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামেরই নির্দেশে তিনি সুরয়ানী ভাষা শিখলেন।

এভাবে এক সময় তরুণ যায়েদ ইবনে সাবেত রাযিয়াল্লাহু আনহু হয়ে উঠলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখপাত্র।

* * *

যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার দৃঢ়তা, আমানতদারী, মেধা ও প্রজ্ঞার ব্যাপারে আশ্বস্ত হলেন, তখন তাকে আসমান থেকে জমীনের উদ্দেশ্যে পাঠানো পয়গামের জন্য উপযুক্ত আমানতদার মেনে নিলেন এবং 'ওহী লেখকে'র গুরুদায়িত্ব তার ওপর অর্পণ করলেন।

যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর কুরআনের কোনো আয়াত বা কোনো অংশ নাজিল হতো, তিনি যায়েদ ইবনে সাবেত রাযিয়াল্লাহু আনহুকে ডেকে পাঠাতেন এবং বলতেন,

'হে যায়েদ! লিখে নাও।'

তিনি রাসূলের নির্দেশমতো সঙ্গে সঙ্গে নাজিল হওয়া আয়াত লিখে নিতেন।

এভাবেই যায়েদ ইবনে সাবেত রাযিয়াল্লাহু আনহু সরাসরি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট থেকে বিভিন্ন সময়ে একটু একটু করে কুরআন লিখতে থাকেন। কুরআনের আয়াত সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁর হিফয বা মুখস্থের পরিমাণও বৃদ্ধি হতে থাকে। তিনি সরাসরি রাসূলের মুখ থেকে কুরআনের শিক্ষা অর্জন করতে থাকেন শানে নুযুলসহ। এতে শরীয়তের সুক্ষ্ম রহস্যজ্ঞানে আলোকিত হয়ে ওঠে তাঁর মেধা আর কুরআনী শিক্ষার আলোকমালায় গড়ে ওঠে তার জীবন ও নির্মল চরিত্র।

এই ভাগ্যবান তরুণ একদিন হয়ে উঠলেন কুরআনের জ্ঞানে সর্বশ্রেষ্ঠ বিশেষজ্ঞ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পর তিনিই হয়ে যান কুরআনের যে কোনো বিষয়ে এই উম্মতের প্রধান উৎস ব্যক্তি।

ফলে আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহুর শাসনামলে যখন বিভিন্ন সাহাবীর কাছে কুরআনের বিক্ষিপ্ত বিভিন্ন অংশকে একত্রে গ্রন্থের আকারে কুরআন সংকলনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়, তখন সেই সংকলন কাজের গুরুদায়িত্বপ্রাপ্ত মহান ব্যক্তিদের প্রধান হিসাবে নির্বাচিত হয়েছিলেন তিনিই।

একইভাবে তৃতীয় খলীফা উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহুর শাসনামলে বিভিন্ন অনারব দেশেও ইসলাম ছড়িয়ে পড়ার ফলে বিভিন্ন অঞ্চলে আলাদা আলাদা আঞ্চলিক উচ্চারণের কুরআন চালু হয়ে যায়। এরই পরিপেক্ষিতে সমগ্র মুসলিমবিশ্বে একই উচ্চারণ ও একই লিখনরীতির মুসহাফ চালুর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। কুরআন কেন্দ্রীক এই দ্বিতীয় উদ্যোগেও প্রধান ব্যক্তি নির্বাচিত হন তিনিই।

এত বড় সম্মান ও এত বড় বিরল মর্যাদা লাভের পর একজন মানুষের চাওয়ার আর কী থাকে?!

* * *

কুরআন বিশেষজ্ঞ যায়েদ ইবনে সাবেত রাযিয়াল্লাহু আনহুর জীবনে কুরআনী জ্ঞানের সুফল প্রকাশ পেয়েছে। যে সকল জটিল সংকটের সমাধান দিতে বড় বড় জ্ঞানী-গুণীরা অপারগ হয়ে পড়েছেন, সেখানে সর্বজনগ্রাহ্য, সুষ্ঠু সমাধানের পথ দিয়েছেন তিনি। সায়েদা গোত্রের মিলনায়তনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খলীফা নির্বাচনের ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরাম যখন ভীষণ মতানৈক্যে লিপ্ত হয়ে পড়েছিলেন,

মুহাজিরদের দাবি : রাসূলের খলীফা মুহাজিরদের মধ্য থেকেই হতে হবে। মুহাজিররাই খলীফা হওয়ার বেশি যোগ্য।

আনসারদের একাংশের দাবি : খেলাফত থাকতে হবে আমাদের মধ্যে। আমরাই এর অধিক হকদার।

অন্য অংশের দাবি : খলীফা মুহাজির ও আনসার মিলিয়ে যৌথভাবে হওয়া উচিত। কারণ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন গুরুত্বপূর্ণ কোনো কাজে কোনো মুহাজিরকে নিয়োগ করতেন তখন তার সঙ্গে একজন আনসারকেও যুক্ত করে দিতেন।

খলীফা নির্ধারণকে কেন্দ্র করে সাহাবায়ে কেরামের মতামত তিন দিকে বিভক্ত হয়ে পড়ল। দলাদলি, বিরোধ ও বিশৃঙ্খলার সম্ভাবনা দেখা যেতে লাগল। তখনো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাফন সম্পন্ন হয়নি। তাঁর দেহ মোবারক কাফন পরানো অবস্থায় তাঁদের চোখের সামনেই হাজির ছিল। অতএব, উদ্ভূত এই মহা-ফেতনার সম্ভাবনাকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করে দেওয়ার জন্য এবং খলীফা নির্ধারণী বিষয়ে একটি বাস্তবসম্মত ও সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য, সুস্পষ্ট ও সুদৃঢ় বক্তব্য অনিবার্য হয়ে পড়েছিল।

সেই নাজুক বক্তব্যটি দিলেন যায়েদ ইবনে সাবেত আল-আনসারী রাযিয়াল্লাহু আনহু। তিনি আনসার ভাইদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন,

‘হে আমার আনসার ভাইয়েরা! নিঃসন্দেহে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন একজন মুহাজির। সুতরাং তাঁর খলীফাও হবেন তাঁরই মতো একজন মুহাজির।

আর আমরা ছিলাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনসার ও সাহায্যকারী। অতএব, এখনো আমরা তাঁর খলীফার আনসার ও সাহায্যকারী থাকব। আমরা রাসূলের খলীফাকে হক পথে চলার ক্ষেত্রে সহায়তা করব।’

এই সংক্ষিপ্ত ভূমিকার পর তিনি আরও সুনির্দিষ্ট করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের সুরে আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহুর হাতে বাইয়াতের উদ্দেশ্যে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন-,

‘ইনিই হচ্ছেন আমাদের খলীফা, সবাই তাঁর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করুন।’

যায়েদ ইবনে সাবেত রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দীর্ঘ সংশ্রবের ফলে কুরআনের সর্বাধিক চর্চা ও কুরআনী জ্ঞানের গভীরতা লাভের কল্যাণে পরবর্তী জীবনে হয়ে ওঠেন মুসলিমজাতির জন্য আলোর মিনার। তাদের মুরশিদ ও পথপ্রদর্শক। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরবর্তী খলীফাগণ বিভিন্ন জটিল সমস্যার ক্ষেত্রে যায়েদ ইবনে সাবেত রাযিয়াল্লাহু আনহুর শরণাপন্ন হতেন। সমাধানের জন্য তাঁর কাছে পরামর্শ চাইতেন। কঠিন কঠিন মাসায়েলের ক্ষেত্রে জনসাধারণ তাঁরই কাছে ফতোয়া জিজ্ঞাসা করতেন। মীরাস বণ্টন ও ফারায়েয সম্পর্কে লোকেরা তাঁরই কাছে ছুটে আসত। কারণ, সে সময় মীরাস ও বণ্টনের আহকাম সম্পর্কে মুসলিমজাতির মধ্যে তাঁর চেয়ে বড় জ্ঞানী ও বিচক্ষণ আর কেউ ছিল না।

পশ্চিম দামেস্কের 'জাবিয়া' গ্রামে মুসলিমবাহিনীর বিজয় সংক্রান্ত সাহাবায়ে কেরামের সঙ্গে এক মতবিনিময় সমাবেশে উমর ফারুক রাযিয়াল্লাহু আনহু বক্তব্যের একপর্যায়ে ঘোষণা করেন,

'আপনাদের কেউ যদি কুরআন সংক্রান্ত কোনো বিষয়ে যেমন অর্থ, ব্যাখ্যা, শানে নুযূল বা কোনো রহস্য ও নিগূঢ় তত্ত্ব জানতে চান, তাহলে তিনি যায়েদ ইবনে সাবেতের কাছে জেনে নিতে পারেন।

ফিকাহশাস্ত্রের কোনো বিষয়ে যদি কারও জানার প্রয়োজন হয়, তাহলে সেটা মুআয ইবনে জাবালের কাছে জিজ্ঞাসা করুন।

আর যদি কারোর প্রয়োজন হয় আর্থিক সাহায্যের, তাহলে তিনি চলে আসুন আমার কাছে। কেননা, আল্লাহ তাআলা মুসলিমজাতির বাইতুল মালের হেফাজত ও সুষ্ঠু বণ্টনের দায়িত্ব অর্পণ করেছেন আমার ওপর।'

*　*　*

সাহাবী ও তাবেঈ তালিবুল ইল্‌ম বা জ্ঞানপিপাসুগণ যায়েদ ইবনে সাবেত রাযিয়াল্লাহু আনহুকে তাঁর অগাধ জ্ঞান ও গভীর পাণ্ডিত্যের কারণে সীমাহীন শ্রদ্ধা করতেন। তাঁর প্রতি ভক্তি ও ভালোবাসা প্রদর্শন করতেন।

যায়েদ ইবনে সাবেত রাযিয়াল্লাহু আনহুর প্রতি তাঁদের ভক্তি ও শ্রদ্ধার একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত মেলে এই উম্মতের 'বাহরুল ইল্‌ম' বা বিদ্যার সাগর বলে পরিচিত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুমার আচরণে।

একদিন আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুমা দেখলেন যে, যায়েদ ইবনে সাবেত রাযিয়াল্লাহু আনহু ঘোড়ায় চড়তে যাচ্ছেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি ছুটে গিয়ে একহাতে ঘোড়ার লাগাম ধরলেন আর অন্য হাতে পাদানী ধরে তাঁকে ঘোড়ায় চড়তে আহ্বান জানালেন।

যায়েদ ইবনে সাবেত রাযিয়াল্লাহু আনহু থেমে গিয়ে বললেন,
'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচাতো ভাই, দয়া করে আপনি সরে যান।'

ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন,
'আমাদের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের এভাবেই আলেম-উলামাদের সম্মান ও সেবা করার নির্দেশ করেছেন।'

যায়েদ ইবনে সাবেত রাযিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে বললেন,
'আপনার হাতটা একটু দেখি!'

ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু তাঁর দিকে নিজের হাত বাড়িয়ে ধরলে যায়েদ ইবনে সাবেত রাযিয়াল্লাহু আনহু একটু ঝুঁকে সেই হাতে মুহাব্বত ও ভালোবাসার চুমু দিয়ে বললেন,

'রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পরিবারবর্গের সদস্যদের প্রতি এভাবেই আমাদের ভালোবাসা প্রকাশ করার নির্দেশ দিয়েছেন।'

* * *

যায়েদ ইবনে সাবেত রাযিয়াল্লাহু আনহুর যখন ইন্তেকাল হলো, তখন মুসলিমজাতি প্রচুর অশ্রুপাত করল। কারণ, তাঁর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর অগাধ জ্ঞান ও পাণ্ডিত্বেরও কবর হয়ে গেল। তখন আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন,

'আজ এই উম্মতের একজন মহান ও বিদগ্ধ আলেমের ইন্তেকাল হয়ে গেল। আল্লাহ তাআলা ইবনে আব্বাসকে তাঁর উত্তরসূরী হিসাবে কবুল করুন।' হাস্‌সান ইবনে সাবেত রাযিয়াল্লাহু আনহু যায়েদ ইবনে সাবেতের মৃত্যুতে শোক কবিতা রচনা করেন। তাঁর পাশাপশি তিনি নিজেরও কোনো উত্তরসূরী না থাকার কথা আক্ষেপ করে বলেন,

فَمَنْ لِلْقَوَافِيْ بَعْدَ حَسَّانَ وَابْنِه – وَمَنْ لِلْمَعَانِيْ بَعْدَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ

'হাস্‌সান ও তার পুত্রের পর ছন্দ ও কাব্যজগতে কেউ নেই,

কুরআনের গভীর ও নিগূঢ় জ্ঞানের জগতেও যায়েদ ইবনে সাবেতের পর কেউ নেই।'

তথ্যসূত্র :

১. *আল-ইসাবা*, ১ম খণ্ড, ৫৬১ পৃষ্ঠা, *আত্তারজামা*, ২৮৮০।
২. *আল-ইসতীআব*, ১ম খণ্ড, ৫৫১ পৃষ্ঠা।
৩. *গায়াতুন্নিহায়া*, ১ম খণ্ড, ২৯৬ পৃষ্ঠা।
৪. *সিফাতুস সফওয়া*, ১ম খণ্ড, ৭০৪ পৃষ্ঠা।
৫. *উসদুল গাবাহ*, *আত্তারজামা*, ১৮২৪।
৬. *তাহযীবুত তাহযীব*, ৩য় খণ্ড, ৩৯৯ পৃষ্ঠা।
৭. *তাকরীবুত তাহযীব*, ১ম খণ্ড, ২৭২ পৃষ্ঠা।
৮. *আত্-তাবাকাত* লিবনি সাআদ, সূচিপত্র দ্রষ্টব্য।
৯. *আল-মাআরিফ*, ২৬০ পৃষ্ঠা।
১০. *হায়াতুস সাহাবা*, সূচিপত্র দ্রষ্টব্য।
১১. *আস্-সীরাহ* লিবনি হিশাম, সূচিপত্র দ্রষ্টব্য।
১২. *তারীখুত তবারী*, সূচিপত্র দ্রষ্টব্য।
১৩. *আখবারুল কাযা লিওয়াকী*, ১ম খণ্ড, ১০৭-১১০।

রাবীআ ইবনে কাআব

রাবীআ ইবনে কাআব পৃথিবীতে যেমন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমত ও সোহবত লাভে নিজেকে ধন্য করেছিলেন, তেমনই জান্নাতেও তাঁর বন্ধুত্বপূর্ণ সাহচর্যের আশায় কঠোর ইবাদত-বন্দেগীতে আত্মনিয়োগ করেছিলেন।

রাবীআ ইবনে কাআব রাযিয়াল্লাহু আনহু নিজের সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন,

'আমি ছিলাম সদ্যযৌবনে পদার্পণকারী এক অল্প বয়সী তরুণ, আমার অন্তর সেই সময় ঈমানের চেতনায় আলোকিত হয়ে উঠল আর ইসলামের মহৎ শিক্ষায় আমার প্রাণ জুড়িয়ে গেল।'

'প্রথম দর্শনেই আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মনেপ্রাণে ভালোবাসতে শুরু করি। সেই ভালোবাসা অতি অল্প সময়ে আমার মন-মস্তিষ্কে ছাপিয়ে ওঠে এবং দেখতে না দেখতেই আগুনের মতো সারা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে। আমি তাঁর ভালোবাসায় এত পাগল হয়ে উঠি যে অন্য সবকিছু থেকেই নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলি।'

একদিন আমি মনে মনে নিজেকে ধিক্কার দিয়ে বললাম,

'ছি: রাবীআ! কেন তুমি নিজেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে নিয়োজিত করছ না?

তুমি নিজেকে তাঁর কাছে পেশ করো, খেদমতের আগ্রহের কথা জানাও, তিনি তোমাকে গ্রহণ করলে তোমার কপাল খুলে যাবে। তাঁর ভালোবাসা আর নৈকট্যে ধন্য হয়ে যাবে তোমার জীবন। পেয়ে যাবে তুমি দুনিয়া ও আখেরাতের সকল কল্যাণ।'

এরপর আর দেরি না করে সোজা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আমার মনের কথাটি প্রকাশ করে বললাম, 'আমি আপনার খাদেম হতে চাই, দয়া করে আমাকে কবুল করুন।'

তিনি আমাকে নিরাশ করেননি। তাঁর খাদেম হিসাবে আমাকে মনোনীত করলেন।

সেইদিন থেকে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ছায়ার মতো অনুসরণ করতে শুরু করলাম।

তিনি যেখানেই যেতেন, আমিও তাঁর সঙ্গে যেতাম। তিনি যেমন চাইতেন, যেমন বলতেন আমি ঠিক ঠিক সেভাবেই সবকিছু পালন করতে চেষ্টা করতাম।

এমনকি তিনি আমার দিকে তাকালেই আমি ছুটে এসে তাঁর পাশে দাঁড়াতাম তাঁর আদেশের অপেক্ষায়।

তিনি কোনো প্রয়োজন অনুভব করার সঙ্গে সঙ্গেই সেই প্রয়োজন পূরণ করার জন্য আমাকে সামনে হাজির পেতেন।

এভাবেই তাঁর কর্মব্যস্ত দিনের সবটুকু সময়ে সারাক্ষণ আমি তাঁর খেদমতে নিয়োজিত থাকতাম। দিন শেষে এশার নামায আদায়ের পর যখন তিনি বাড়ির ভেতর প্রবেশ করতেন কেবল তখনই আমি বাড়ি ফেরার চিন্তা করতাম।

কিন্তু এর পরপরই আমি মনে মনে নিজেকে বললাম,

'হে রাবীআ! তুমি কোথায় যাও? কেন যাও?

রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যদি কোনো প্রয়োজন এসে পড়ে?'

এই চিন্তার পর থেকে আমি রাতেও ফেরা বন্ধ করে দিলাম। তখন থেকে আমি রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরজার পাশে বসে থাকতাম। তাঁর চৌকাঠ ছেড়ে কোথাও দূরে যেতাম না।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অভ্যাস ছিল, রাতের দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে নামায আদায় করতেন। আমি প্রায়ই শুনতে পেতাম তিনি সূরা ফাতিহা পাঠ করছেন। তিনি বারবার এ সূরা পাঠ করতে থাকতেন। কখনো তাঁকে 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ' (আল্লাহ তাঁর প্রশংসাকারীর প্রার্থনা কবুল করুন।) বলতে শুনতাম। সূরা ফাতিহার চেয়েও দীর্ঘ সময় ধরে তিনি এটারই বারবার পুনারাবৃত্তি করতে থাকতেন। শুনতে শুনতে কখনো কখনো আমি ক্লান্ত হয়ে পড়তাম। কখনো ঘুমে ঢলে পড়তাম।

* * *

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি বৈশিষ্ট ছিল এই, কেউ তাঁর জন্য ভালো ও কল্যাণকর কিছু করলে প্রতিদান স্বরূপ তিনি তার চেয়েও ভালো কিছু করতে চাইতেন।

তাঁর জন্য আমার খেদমতের পুরস্কার হিসাবে তিনি আমাকেও বড় কিছু দেওয়ার ইচ্ছা করলেন। সেজন্যই কোনো একদিন তিনি আমাকে বললেন,

'হে রাবীআ ইবনে কাআব!'

আমি বলালাম,

'লাব্বাইক ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি হাজির ইয়া রাসূলাল্লাহ!'

তিনি বললেন,

'আমার কাছে তুমি কিছু চাও। তোমার যা ইচ্ছা চাও আমি তোমাকে দেব।'

আমি অল্প একটু চিন্তা করেই বললাম,

'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে একটু চিন্তা করার সুযোগ দিন। আমি চিন্তা করে পরে আপনাকে বলব।'

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

'ঠিক আছে কোনো সমস্যা নেই। চিন্তা-ভাবনা করে তুমি পরেই বলো।'

সে সময় আমি ছিলাম একজন চরম দরিদ্র ও অসহায় যুবক। নেই কোনো অর্থ-সম্পদ, ঘর-বাড়ি ও আত্মীয়-স্বজন। তখন আমার থাকার জায়গা ছিল অন্যান্য নিঃস্ব, অসহায় গরিব মুসলিমভাইদের মতোই মসজিদে সুফ্ফায়।

মানুষ আমাদের ডাকত 'ইসলামের মেহমান' বলে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট কেউ সাদাকা স্বরূপ কোনো খাবার নিয়ে আসলে তিনি সেটা সম্পূর্ণই আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিতেন। আবার কেউ তাঁকে হাদিয়া হিসাবে কিছু দিলে সেখান থেকে কিছুটা রেখে বাকি সবটুকুই তিনি আমাদের জন্য পাঠিয়ে দিতেন।

এই রকম দুঃসময়ের কথা চিন্তা করেই একবার আমার ইচ্ছা হলো, অভাবমুক্ত হওয়ার জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পার্থিব কোনো অর্থ-সম্পদ চাই—যেন অন্যদের মতো আমিও স্বাবলম্বি হতে পারি।

কিন্তু একটু পরেই আমার বিবেক আমাকে ডেকে বলতে লাগল,

'ছিঃ রাবীআ ইবনে কাআব! এটা তুমি কী ভাবছ? এই দুনিয়ার জীবন অতি ক্ষণস্থায়ী, কদিন পরেই শেষ হয়ে যাবে। এখানে যে কয়দিন তুমি বাঁচবে, আল্লাহ তাআলা নিজেই তোমার রিযিকের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন এবং তোমার জন্য বরাদ্দকৃত রিযিক অবধারিতভাবে তুমি পাবেই।

আর যেহেতু আল্লাহর কাছে তাঁর প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিশেষ মর্যাদা রয়েছে, যার কারণে তাঁর কোনো দুআই

আল্লাহ ফেরত দেবেন না। সুতরাং ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার কোনো কিছু নয়, তুমি তাঁর কাছে চাও আখারাতের বড় কোনো কল্যাণের দুআ।'

আমি পরকালীন মঙ্গলের দুআ চাওয়ার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হাজির হলাম। তিনি আমাকে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন,

'কী চিন্তা করেছ বলো?'

আমি বললাম,

'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আমার জন্য দুআ করুন, যেন আল্লাহ জান্নাতে আমাকে আপনার সঙ্গী হিসাবে কবুল করেন।'

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন,

'এটা তোমাকে কে শিখিয়ে দিয়েছে?'

আমি বললাম,

'আল্লাহর কসম! একথা আমাকে কেউই শিখিয়ে দেয়নি। আপনি যখন আমাকে কিছু চাওয়ার কথা বলেছিলেন, তখন আমি একবার ভেবেছিলাম দুনিয়ার কোনো কল্যাণ চাইব। কিন্তু এরপরই আল্লাহই আমাকে বুঝ দান করলেন যে ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার চেয়ে চিরস্থায়ী আখেরাতকেই বেশি গুরুত্ব দেওয়া উচিৎ। সেজন্যই আপনার কাছে দুআ চাইলাম যেন আল্লাহ তাআলা জান্নাতে আমাকে আপনার সঙ্গী বানিয়ে দেন।'

এই কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছুক্ষণ নীরব হয়ে রইলেন এরপর জিজ্ঞাসা করলেন,

'হে রাবীআ! আর কিছু চাইবে না?'

আমি জবাব দিলাম,

'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি যা চেয়েছি সেটা ছাড়া আর কোনো কিছুই আমি চাওয়ার উপযুক্ত মনে করি না। জান্নাতে আপনার সঙ্গী হওয়া ছাড়া চাওয়ার মতো আর কিছুই নেই আমার।'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

'তাহলে আমাকে সাহায্য করতে হবে বেশি বেশি সেজদার মাধ্যমে।'

এরপর থেকেই আমি কঠোরভাবে ইবাদতে আত্মনিয়োগ করলাম, যেন দুনিয়াতে যেমন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সোহবত ও খেদমতের সৌভাগ্য লাভে ধন্য হয়েছি, একইভাবে জান্নাতেও তাঁর বন্ধুত্বপূর্ণ সাহচর্য লাভে ধন্য হতে পারি।'

* * *

অল্প ক'দিন পরেই আমাকে ডেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন,

'হে রাবীআ! তুমি বিয়ে করবে না?'

আমি তাঁর উত্তরে বললাম,

'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার খেদমত থেকে আমাকে দূরে সরিয়ে দেবে এমন কোনো কিছুই আমি পছন্দ করি না। তা ছাড়া স্ত্রীর মহর পরিশোধ করার মতো অর্থ-সম্পদ আমার কাছে নেই। নেই তাকে থাকতে দেওয়ার মতো কোনো ঘর-বাড়ি।'

আমার এই কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নীরব হয়ে থাকলেন।

দ্বিতীয়বার যখন দেখা হলো, তিনি আবার আমাকে প্রশ্ন করলেন,

'হে রাবীআ! তুমি বিয়ে করবে না?'

এর উত্তরে প্রথমবার আমি যা যা বলেছিলাম, এবারও তাই বললাম।

কিন্তু একটু পরেই আমি একা একা বসে যখন চিন্তা করলাম, তখন আমার মনে হলো যে একথা বলা আমার উচিৎ হলো না। এতে আমার মধ্যে লজ্জা ও অনুশোচনা জেগে উঠল। আমি নিজেকে ধিক্কার দিয়ে বললাম,

‘হে রাবীআ! তোমার দীন-দুনিয়ার ভালো ও মন্দ সম্পর্কে তোমার চেয়ে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেশি জানেন। এমনকি তোমার অর্থ-সম্পদ কি আছে কি নেই সেটাও তিনি খুব ভালোভাবে অবগত। এসব কথা ভেবে আমি মনে মনে সিদ্ধান্ত নিয়ে রাখলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার যদি ঐ প্রশ্ন করেন তাহলে অবশ্যই এবার ‘হ্যাঁ’ বলে দেব।

কয়েকদিন যেতে না যেতেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে আবারও জিজ্ঞাসা করলেন,

‘হে রাবীআ! তুমি বিয়ে করবে না?’

আমি সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলাম,

‘কেন নয়? অবশ্যই করব ইয়া রাসূলাল্লাহ! কিন্তু আমার অবস্থা তো আপনি ভালোভাবেই জানেন, এ অবস্থায় আমাকে মেয়ে দেবে কে?’

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার কথা শুনে বললেন,

‘তুমি অমুক পরিবারের অমুক ব্যক্তির নিকট গিয়ে বলো, আপনার অমুক মেয়েকে আমার সঙ্গে বিয়ে দেওয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] নির্দেশ দিয়েছেন।’

আমি খুবই লজ্জার সঙ্গে সেই পরিবারে গিয়ে হাজির হলাম। নির্দিষ্ট ব্যক্তির কাছে বললাম,

‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন, যেন আপনার অমুক মেয়েকে আমার সঙ্গে বিয়ে দেন।’

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, ‘অমুক মেয়ের কথাই বলেছেন?’

আমি বললাম,

‘জি হ্যাঁ, অমুক মেয়ের কথাই বলেছেন।’

তিনি বললেন,

‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শুভেচ্ছা এবং তাঁর পাঠানো ব্যক্তিকেও শুভেচ্ছা।

আল্লাহর কসম! আমরা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাঠানো ব্যক্তিকে খালি খালি ফিরে যেতে দেব না। অবশ্যই তাঁর উদ্দেশ্য সফল হবে। তারা সেই মেয়েটির সঙ্গেই আমাকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করে দিলেন।'

আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ফিরে এসে বললাম,

'ইয়া রাসূলাল্লাহ! অতি উত্তম এক পরিবারের কাছ থেকে এলাম। আমার কথা বিশ্বাস করে তারা আমাকে আন্তরিকভাবে স্বাগত জানিয়েছেন এবং তাদের মেয়েকে আমার সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করে দিয়েছেন। আমি এখন মহর দেব কোত্থেকে?'

তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার কওম 'আসলামে'র সরদার বুরাইদা ইবনুল হুসাইবকে ডেকে বললেন,

'হে বুরাইদা! রাবীআর জন্য খেজুরের আঁটি পরিমাণ সামান্য স্বর্ণের ব্যবস্থা করে দাও।'

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশমতো বুরাইদা স্বর্ণের ব্যবস্থা করে দিলেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই স্বর্ণ আমাকে দিয়ে বললেন,

'এই স্বর্ণ নিয়ে ওদের কাছে চলে যাও। গিয়ে ওদের বলো, এইটা আপনাদের মেয়ের মহর।'

আমি তাদের কাছে গিয়ে হাজির হলাম। স্বর্ণের টুকরা তাদের হাতে দিলে সেই সামান্য স্বর্ণের টুকরাটাই তারা অতি আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করে বলতে লাগলেন,

'এটাতো অনেক এবং উত্তম মহর।'

আমি সেখান থেকে ফিরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললাম,

'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি জীবনে এত সম্ভ্রান্ত ও মর্যাদাশীল কওম আর একটিও দেখিনি। তারা আমার সামান্য মহরটুকুও খুবই খুশি হয়ে কবুল করেছেন এবং আনন্দের সঙ্গে বলেছেন- 'এটাতো অনেক উত্তম মহর।'

ইয়া রাসূলাল্লাহ! এখন ওলীমার ব্যবস্থা করব কীভাবে?'

তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবারও বুরাইদাকে ডেকে বললেন,

'রাবীআর জন্য একটি দুম্বার মূল্য সংগ্রহ করো।' রাসূলের নির্দেশে তারা শেষ পর্যন্ত একটি মোটাসোটা ও বড়সড় দুম্বা কিনে আনলেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন,

'আয়েশার কাছে যাও এবং তার কাছে যে যব আছে, সেগুলো তোমাকে দিতে বলো।'

আমি উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার নিকট গিয়ে রাসূলের কথাটি জানালাম। তিনি বললেন- 'এই নাও ব্যাগ, এতে সাত সা পরিমাণ (১ সা ৩.২ কেজি × ৭ = ২৩.৪ কেজি) যব আছে। এছাড়া আমার কাছে আর কিছু নেই।'

যব আর দুম্বা নিয়ে আমি চলে গেলাম শ্বশুর বাড়ি। তারা বললেন,

'যব পিশে আটা ও রুটি বানানোর ব্যবস্থা আমরা করব।

আর দুম্বার ব্যবস্থা আপনি বন্ধুদের সঙ্গে নিয়ে করুন।'

আমি তখন আমার গোত্রের কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে জবাই করে, রান্না করে ফেললাম। রুটি ও গোস্তের আয়োজন সম্পূর্ণ হয়ে গেল।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ওলীমার দাওয়াত দিলাম। তিনি কবুল করে আমার ওলীমার অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করলেন। চমৎকার ভাবে আমার ওলীমার অনুষ্ঠান সু-সম্পন্ন হয়ে গেল।

∴ * ∴

এরপরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার জন্য আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহুর জমি সংলগ্ন একখণ্ড জমির বরাদ্দ দিলেন। সেখানেই আমি বসবাস শুরু করে দিলাম। ধীরে ধীরে আমার মধ্যে দুনিয়াদারির মোহ-মায়া ঢুকতে লাগল। এমনকি একটি খেজুর গাছকে কেন্দ্র করে আমি আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহুর সঙ্গে বিবাদ ও বিতর্কে জড়িয়ে পড়লাম।

আমি দাবি করলাম, 'গাছটি আমার জমিতে, আমার সীমানার মধ্যে।'

আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহু আমার দাবি অস্বীকার করে বললেন, 'না, সেটা আমার জমিতে, আমার সীমানায়।'

এতে আমি তাঁর সঙ্গে ঝগড়ায় জড়িয়ে পড়লাম। তিনি একটি কষ্টদায়ক কথা বলে ফেললেন। আপত্তিকর কথাটি মুখ থেকে বের হয়ে যাওয়ার পর সঙ্গে সঙ্গেই তিনি লজ্জিত হয়ে বললেন,

'হে রাবীআ! তুমি আমাকে একই কথা বলে কিসাস নিয়ে নাও। মিটমাট হয়ে যাক।'

আমি বললাম,
'অসম্ভব, ঐ কথা কিছুতেই আমি আপনাকে বলতে পারব না।'

তিনি বললেন,
'তাহলে আমি এখনই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করব যে তুমি কিসাস গ্রহণ করতে অস্বীকার করছ এবং বিষয়টি দুনিয়াতেই মিটমাট করে ফেলতে চাচ্ছ না।'

একথা বলেই তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেলেন। আমিও তাঁর পিছে পিছে যেতে থাকলাম।

এই অবস্থা দেখে আমার কওমের কয়েকজন লোকও আমার সঙ্গে রওনা হলো। তারা বলতে লাগল,

'এটা কেমন কথা, শুরুও তিনিই করলেন, কটু কথাটাও তোমাকে তিনিই বললেন, এখন আবার তিনিই আগে আগে যাচ্ছেন রাসূল

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে তোমার নামে নালিশ করতে! কী আশ্চর্য ব্যাপার!'

আমি তাদের তিরস্কার করে বললাম,
'তোমরা কি জানো কে এই ব্যক্তি?

ইনিই হচ্ছেন এই উম্মতের শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি সিদ্দীক...
রাসূলের পরে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রজ্ঞাবান ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিত্ব...

তোমাদের দেখে ফেলার আগেই তোমরা ফিরে যাও। নইলে তিনি মনে করবেন তোমরা তাঁর বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য করতে এসেছ। এতে তিনি রেগে যেতে পারেন। তাঁর রাগত চেহারা দেখে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও রেগে যাবেন। আর তাঁদের রাগের কারণে আল্লাহ তাআলাও ক্রুদ্ধ হয়ে যাবেন। পরিণতিতে রাবীআর ইহকাল-পরকাল সব বরবাদ হয়ে যাবে।'

এসব কথা শুনে তারা ফিরে গেল।

আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে যথাযথ ভাবে ঘটনার বিবরণ দিলেন। সবকথা শোনার পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাথা উঁচু করে আমার দিকে তাকালেন এবং প্রশ্ন করলেন,
'হে রাবীআ! তোমার সঙ্গে সিদ্দীকের কী হয়েছে?'

আমি বললাম, 'তিনি আমাকে একটু কটু কথা বলে ফেলেছেন তারপর আমাকেও সেই কথাটি তার উদ্দেশ্যে বলার জন্য চাপ দিয়ে যাচ্ছেন। অথচ তাঁকে সেই কথাটি আমি কিছুতেই বলতে চাই না।'

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন আমাকে বললেন,
'ঠিক আছে, সে তোমাকে যা বলেছে সে কথাটা তাকে বলো না। কিন্তু তুমি তাকে এই কথাটি বলো, 'আল্লাহ আবু বকরকে ক্ষমা করে দিন।'

তখন আমি তাঁর কাছে গিয়ে বললাম,

'হে আবু বকর! আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করে দিন।'

আমার একথাটা শোনার পর তিনি যেন বিরাট বোঝামুক্ত হলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট থেকে কাঁদতে কাঁদতে বিদায় নিলেন আর বলতে থাকলেন,

'হে রাবীআ ইবনে কাআব! আল্লাহ তাআলা আমার পক্ষ থেকে তোমাকে সর্বোত্তম বিনিময় দান করুন। আমার পক্ষ থেকে তোমাকে উত্তম পুরস্কার দান করুন।'

তথ্যসূত্র :

১. *উসদুল গাবাহ*, ২য় খণ্ড, ১৭১ পৃষ্ঠা।
২. *আল-ইসাবা*, ১ম খণ্ড, ৫১১ পৃষ্ঠা, অথবা *আত্তারজামা*, ২৬২৩।
৩. *আল-ইসতীআব*, ১ম খণ্ড, ৫০৬ পৃষ্ঠা।
৪. *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৩৩৫-৩৩৬ পৃষ্ঠা।
৫. *কানযুল উম্মাল*, ৭ম খণ্ড, ৩৬ পৃষ্ঠা।
৬. *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, ৪র্থ খণ্ড, ৩১৩ পৃষ্ঠা।
৭. *মুসনাদু আবী দাউদ*, ১৬১-১৬২ পৃষ্ঠা।
৮. *তারীখুল খুলাফা*, ৫৬ পৃষ্ঠা।
৯. *মাজমাউয যাওয়ায়িদ*, ৪র্থ খণ্ড, ২৫৬-২৫৭ পৃষ্ঠা।
১০. *হায়াতুস সাহাবা*, (৪র্থ খণ্ডের সূচি)।
১১. *তাহযীবুত তাহযীব*, ৩য় খণ্ড, ২৬২-২৬৩ পৃষ্ঠা।
১২. *খুলাসা তাহযীব তাহযীবুল কামাল*, ১১৬ পৃষ্ঠা।
১৩. *তাযরীদু আসমাইস সাহাবা*, ১ম খণ্ড, ১৯৪ পৃষ্ঠা।
১৪. *আল-জামউ বাইনা রিজালিস সহীহাইন*, ১ম খণ্ড, ১৩৬ পৃষ্ঠা।
১৫. *আল-জারহু ওয়াত-তা'দীল*, ২য় খণ্ড, ৪৭২ পৃষ্ঠা।
১৬. *আত-তারীখুল কাবীর*, ১ম খণ্ড, ২৫৬ পৃষ্ঠা।
১৭. *তারীখু খলীফা ইবনে খাইয়াত*, ১১১ পৃষ্ঠা।
১৮. *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, ৪র্থ খণ্ড, ৩১৩-৩১৪ পৃষ্ঠা।
১৯. *তারীখুল সিলাম* লিযযাহাবী, ৩য় খণ্ড, ১৫ পৃষ্ঠা।
২০. *আল-কাসাসুল ইসলামিয়্যাহ ফী আহদিন নবুওওয়াহ ওয়াল খুলাফাইর রাশিদীন* লি-আহমাদ ইবনে হাফিয আল-হাকমী, ২য় খণ্ড, ৬৫৬ পৃষ্ঠা।

যুল বিজাদাইন

পৃথিবীর ধন-ঐশ্বর্য যুল বিজাদাইনকে হাতছানি দিয়ে ডেকেছে। তিনি সেই ডাকে সাড়া দেননি। তিনি আখেরাতের প্রতি ঝুঁকেছেন, সকল পন্থায় আখেরাতকেই খুঁজেছেন।

'ওয়ারকান' পাহাড়।

দীর্ঘ ও বিস্তীর্ণ তার শীতল ছায়া।

মনোরম ও দৃষ্টিনন্দন সেই পাহাড়ের সুউচ্চ চূড়া।

চারপাশে সবুজ ঘেরা সেই সুন্দর ওয়ারকান পাহাড়টি ছিল মদীনা থেকে মক্কার পথে যাত্রীদের ডান হাতে অবস্থিত।

এই সুন্দর পাহাড়কে ঘিরে আবাস গড়ে তুলেছিল 'মুযাইনা' কবীলার ছোট এক শাখা গোত্র।

* * *

'ইয়াসরিবে'র নিকটবর্তী সেই পাহাড়ের কোণে এক উপত্যকায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন দরিদ্র ও নিঃস্ব পিতা-মাতার সন্তান 'আবদুল উয্যা ইবনে আবদে নাহাম আল-মুযানী।'

এই শিশু বাচ্চার জন্মের ঘটনাটি ঘটেছিল মক্কাতে ইসলামের সূর্যোদয় ঘটার অল্প কিছুকাল পূর্বে।

শিশুটি হাঁটতে শেখার পূর্বেই মৃত্যুর থাবা কেড়ে নিল তার পিতার প্রাণ। এর ফলে দরিদ্রতা আর পিতৃহীনতা শিশুটির চিরসঙ্গী হয়ে গেল।

কিন্তু গরিব ও এতীম শিশুটির ছিল বিশাল ধনী ও স্বাচ্ছন্দময় জীবনের অধিকারী এক চাচা। এই চাচা ছিল নিঃসন্তান। যার জীবনে কোনো সুখ ছিল না। ছিল না কোনো আনন্দ। ছিল না তার বিশাল এই সম্পদের কোনো উত্তরসূরী।

ফলে ছোট্ট ভাতিজার প্রতি চাচার স্নেহ-ভালোবাসা তীব্রতা লাভ করল। সে তাকেই মনে মনে নিজের সন্তান ও উত্তরসূরী ভাবতে শুরু করল।

* * *

মুযানী বালক যৌবনে পদার্পণ করলেন মনোমুগ্ধকর ওয়ারকান পাহাড়ের কোমল পরিবেশে। এই সুন্দর পরিবেশ তাঁর হৃদয়ে ঢেলে দিল কোমলতা ও পরিচ্ছন্নতা।

তিনি গড়ে উঠলেন অনুভূতিপ্রবণ, নির্মল অন্তর ও পবিত্র সব স্বভাব বৈশিষ্ট্য নিয়ে।

এই স্বভাব-বৈশিষ্ট্যগুলোর কারণে চাচা তাকে আরও বেশি ভালোবাসতে লাগলেন। অন্য সকলের চেয়ে তাঁকেই সর্বাধিক আপনজন ভাবতে থাকলেন।

* * *

এই মুযানী যুবক যদিও ধীরে ধীরে পূর্ণবয়স্ক মানুষ হয়ে গেলেন। কিন্তু ততদিনেও তিনি কিছুই শুনতে পেলেন না নতুন ধর্মের কথা। কিছুই জানতে পারলেন না ইসলাম সম্পর্কে। ইসলামের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোনো সংবাদই তার কানে পৌঁছল না।

অথচ এই ঘটনা ঘটার পরে অনেক লম্বা সময় পেরিয়ে গেছে। এমনকি এরই মধ্যে 'ইয়াসরিব' সেই উজ্জ্বল ও মোবারক দিনটির সাক্ষাৎ লাভে ধন্য হয়েছে যেই দিনে মহান নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা ছেড়ে সেখানে এসে পড়েছেন।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মদীনায় হিজরতের কথা শোনার পর থেকে মুযানী যুবক খুব কৌতূহল নিয়ে তাঁর খোঁজ-খবর শুরু করে দিলেন। এমনকি প্রায়ই তিনি দিনভর মদীনাগামী পথে ঘোরাঘুরি করে সময় কাটাতেন, ইসলাম এবং এই দীনের সাহায্যকারী মদীনার আনসারদের ব্যাপারে মদীনার যাত্রীদের কাছে অথবা সেখান থেকে ফেরত আসা লোকদের কাছ থেকে জানার তীব্র আগ্রহ নিয়ে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খবরাখবর জানার জন্য এভাবে উদগ্রীব হয়ে মদীনার পথে অপেক্ষা করতে থাকতেন। এভাবেই একসময় আল্লাহ তাআলা তার পবিত্র অন্তরকে ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করে দিলেন।

তার সজীব হৃদয়ের বন্ধ দুয়ারকে ঈমানের নূর প্রবেশের জন্য খুলে দিলেন।

তিনি অন্তরের নতুন বিশ্বাসের ঘোষণা করে বললেন,
'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল।'

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে চোখে দেখার পূর্বেই এবং তাঁর কথা নিজ কানে শোনার পূর্বেই তিনি এভাবে ইসলাম গ্রহণ করে নিলেন।

ফলে তিনি হলেন 'ওয়ারকান' পাহাড়ের পাদদেশে বসবাসকারী মুযানী গোত্রের সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণকারী ব্যক্তি।

* * *

মুযানী তরুণ তার ইসলাম গ্রহণের কথা গোপন রাখলেন। বিশেষভাবে চাচা যেন জানতে না পারেন সে জন্য বিশেষভাবে তৎপর

রইলেন। তখন থেকে তিনি পাহাড়ের গিরিপথ ধরে বহুদূর চলে যেতে লাগলেন, মানুষের দৃষ্টি থেকে নিজেকে আড়াল করে আল্লাহর ইবাদতে মগ্ন হওয়ার জন্য।

তিনি ব্যাকুল হয়ে অপক্ষো করতে থাকেন সেই শুভ দিনটির যেদিন ইসলাম গ্রহণ করবেন তার চাচা—যেন তার সম্মুখে বুক ফুলিয়ে নিজের ইসলাম গ্রহণের কথা জানাতে পারেন। এবং যেন চাচাকে সঙ্গে নিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সোহবতে হাজির হতে পারেন। কারণ, ইতিমধ্যেই রাসূলের সঙ্গে সাক্ষাতের আগ্রহ তার হৃদয়-মনকে ব্যাকুল করে তুলেছে।

* * *

মুযানী যুবক দেখলেন, তার প্রতীক্ষার প্রহর দীর্ঘতর হয়ে উঠেছে অথচ তার চাচা ইসলাম থেকে দূরেই রয়ে গেছেন। ইসলাম গ্রহণের কোনো আলামতও দেখা যাচ্ছে না।

অন্যদিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে যুদ্ধের ময়দানে হাজির হওয়ার সুযোগ একটা একটা করে তার হাত ছাড়া হয়ে যাচ্ছে। তাই তিনি পরিণতি সম্পর্কে সজাগ থেকেই দৃঢ়সংকল্প করে চাচার কাছে গিয়ে বললেন,

'চাচা! আমি দীর্ঘদিন ধরে অপেক্ষা করে আছি কবে আপনি ইসলাম গ্রহণ করবেন। আমার আর ধৈর্যে কুলাচ্ছে না, তাই বিণীতভাবে জানতে চাই, ইসলাম কবুল করার আগ্রহ আপনার আছে কি? আপনি যদি আগ্রহী হন এবং আল্লাহ তাআলা আপনাকে ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য দান করেন, তাহলে তো খুবই ভালো। আর যদি আপনার কোনো আগ্রহ না থাকে তাহলে আমাকে অনুমতি দিন যেন সকলের সামনে আমার ইসলাম গ্রহণের সংবাদ প্রচার করে দিতে পারি।'

* * *

ভাতিজার কথাগুলো চাচার কানে পড়ামাত্রই তিনি রাগে একেবারে অগ্নিমূর্তি ধারণ করলেন এবং কাঠোর ভাষায় হুমকি দিয়ে বললেন,

'লাত ও উযযা দেবীর নামে শপথ করে বলছি, তুমি যদি ইসলাম গ্রহণ করো তাহলে যত অর্থ-সম্পদ তোমাকে এতদিন দিয়েছি, সবকিছু কেড়ে নেব। তোমার দানা-পানি বন্ধ করে আবার তোমাকে ক্ষুধা আর অভাবের মধ্যে ঠেলে দেব।'

চাচার এই হুমকি ও ধমক মুমিন ভাতিজার অন্তরে একটুও ভয় ঢোকাতে পারল না। তাকে একটুও টলাতে পারল না সংকল্প থেকে।

বাধ্য হয়ে চাচা সাহায্য চাইলেন কওমের লোকজনের কাছে। তারা তাকে ভয় দেখাল। লোভ দেখাল। নানা ভাবে ভয়-ভীতি ও হুমকি-ধমকি দিতে থাকল। তিনি শান্তভাষায় তাদেরকে নিজের দৃঢ় সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিয়ে বললেন,

'তোমাদের যা মনে চায়, করতে থাক। আমি মুহাম্মাদের অনুসরণ করেই যাব। পাথরের তৈরি দেব-দেবীর পূজা বর্জন করেই যাব। এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহর ইবাদত করতেই থাকব। তোমরা আর আমার চাচা মিলে যা ইচ্ছা তাই করতে পারো।'

ভাতিজাকে দেওয়া সবকিছুই চাচা ছিনিয়ে নিল। তার জন্য বরাদ্দ সকল খরচ ও অর্থ-কড়ি বন্ধ করে দিল। সকল দান থেকে চাচা তার ভাতিজাকে চিরতরে বঞ্চিত করে দিল।

পরনের মোটা চাঁদারটি ছাড়া ভাতিজার কাছে আর কিছুই অবশিষ্ট রাখল না।

* * *

মুযানী যুবক চাচার সকল সম্পদ ও ঐশ্বর্যকে উপেক্ষা করে...

আল্লাহর কাছে সংরক্ষিত সাওয়াব ও প্রতিদানের আশায়...

নিজের দীন ও ঈমান নিয়ে হিজরত করলেন আল্লাহ ও রাসূলের উদ্দেশ্যে, শৈশব ও কৈশোরের স্মৃতিময় সকল স্থান ও খেলার সাথীদের সকলকে পেছনে ফেলে তিনি মদীনার উদ্দেশ্যে এগিয়ে যেতে থাকলেন।

মদীনার পথে তিনি দ্রুতবেগে চলতে লাগলেন। দীর্ঘদিনের পুঞ্জিভুত হৃদয় মথিত করা আবেগ-ভালোবাসা তাকে আকর্ষণ করছিল। তিনি যখন মদীনার কাছাকাছি পৌঁছলেন তখন পরনের মোটা চাদরটি দু'ভাগ করে একটাকে চাদর হিসাবে দেহের উর্দ্ধাঙ্গে জড়িয়ে আরেক অংশকে লুঙ্গি হিসাবে পরে থাকলেন।

তিনি মসজিদে নববীতে পৌঁছে গেলেন। সেই রাত তিনি মসজিদেই কাটালেন।

ফজরের নামাযের সময় ঘনিয়ে এলে তিনি প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘরের দরজার পাশে দাঁড়িয়ে গেলেন। তীব্র আকাঙ্ক্ষা ও আবেগ নিয়ে নবীজীর বের হওয়ার অপেক্ষা করতে থাকলেন।

তার দৃষ্টি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা মুবারকের ওপর পড়ামাত্রই অবিরাম আনন্দের অশ্রু ঝড়তে থাকল তার দুই গাল বেয়ে। তিনি অনুভব করলেন যেন তার হৃদয় দুই পাঁজর থেকে লাফিয়ে পড়তে চাচ্ছে রাসূলের সামনে, তাঁকে সালাম জানাতে।

* * *

ফজরের নামায শেষ হওয়ার পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতিদিনের মতো দাঁড়িয়ে উপস্থিত মুসুল্লিদের দিকে তাকাতে থাকলেন। মুযানী যুবকের প্রতি দৃষ্টি পড়তেই বুঝলেন, একেবারে নতুন মুখ। আজই প্রথম দেখছি। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন,

'হে যুবক! কোথা থেকে, কোন্ গোত্র থেকে এসেছ?'

তিনি জবাব দিলেন,

'আমি মুযাইনা গোত্রের মানুষ। ওয়ারকান পাহাড় ঘেঁষে গড়ে ওঠা সেই জনবসতি থেকেই এসেছি।'

'তোমার নাম কি?' নবীজী প্রশ্ন করলেন।

'আবদুল উয্‌যা।' (অর্থ উয্‌যা দেবীর বান্দা)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,
'না, উয্‌যার বান্দা তোমার নাম হতেই পারে না। বরং তোমার নাম হবে আল্লাহর বান্দা আবদুল্লাহ।'

তখন থেকেই তিনি সকলের কাছে 'আবদুল্লাহ' নামে পরিচিত হলেন।

এরপর তিনি বললেন,
'তুমি আমাদের মেহমান হিসাবে আমাদের কাছে থাক।'

সাহাবায়ে কেরাম তার চাদর দু'ভাগ করার ঘটনা জানার পর তাকে 'যুল বিজাদাইন' (দুই চাঁদরওয়ালা) উপাধিতে ভূষিত করলেন। ইতিহাসে তিনি নামের চেয়েও এই উপাধিতেই বেশি পরিচিত।

* * *

প্রিয় পাঠক! যুল বিজাদাইন রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি এর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য...

তাঁর পেছনে নামায পড়া...
তাঁর মজলিসে উপস্থিত থাকা...

তাঁর স্বভাব ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য থেকে শিক্ষা গ্রহণের এত সুযোগ পাওয়ার পর তার সুখ ও সৌভাগ্যের অবস্থা কী ছিল—সে কথা আর জিজ্ঞাসা করবেন না।

* * *

পৃথিবীর ধন-ঐশ্বর্য তাকে হাতছানি দিয়ে ডেকেছে, অবজ্ঞা করে তিনি নিজেকে সেই আহ্বান থেকে দূরে সরিয়ে নিয়েছেন। তিনি আখেরাতের প্রতি ঝুঁকেছেন, সকল পন্থায় আখেরাতকেই খুঁজেছেন।

দুআ ও মুনাজাতের মাধ্যমে তিনি আখেরাতের প্রার্থনা করেছেন। সর্বদা তিনি আল্লাহর ভয়ে ভীত অন্তরে দুআ ও কান্নাকাটি করতে থাকতেন। যে কারণে সাহাবায়ে কেরাম তাকে 'অধিক ক্রন্দনকারী' বলে আখ্যায়িত করেন।

কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে তিনি আখেরাতেরই প্রার্থনা করেছেন।

তিনি সারাক্ষণ মসজিদে নববীর বিভিন্ন স্থানকে কুরআনের সুস্পষ্ট আয়াত তেলাওয়াতের মাধ্যমে সুবাসিত করে রাখতেন।

জিহাদের মাধ্যমেও তিনি আখেরাত প্রার্থনা করেছেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যত যুদ্ধ করেছেন, একটি যুদ্ধেও তিনি অনুপস্থিত থাকেননি।

* * *

'তাবুক' যুদ্ধে রওনা হওয়ার প্রাক্কালে যুল বিজাদাইন রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে দুআ চাইলেন। বললেন,

'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার জন্য দুআ করুন, আল্লাহ তাআলা যেন আমাকে শহীদী মৃত্যু দান করেন।'

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুআ করলেন,
'ইয়া আল্লাহ! যুল-বিজাদাইনের রক্তকে কাফেরদের তরবারি থেকে হেফাজত করো।'

এই দুআ শুনে যুল বিজাদাইন রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন,

'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি তো এই দুআ চাইনি, আমি তো শহীদ হতেই চাই।'

তখন রাসুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শহীদের বৃহত্তর পরিসর বর্ণনা করে বললেন,

إِذَا خَرَجْتَ غَازِيًا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ فَمُتَّ فَأَنْتَ شَهِيْدٌ

وَإِذَا جَمَحَتْ بِكَ دَابَّتُكَ فَسَقَطْتَ فَقُتِلْتَ فَأَنْتَ شَهِيْدٌ

'তুমি যদি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের উদ্দেশ্যে বের হয়ে অসুস্থ হয়ে মারা যাও, তবুও তুমি শহীদই।

আবার তুমি যদি তোমার বাহনের পিঠ থেকে পড়ে মারা যাও, তবুও তুমি শহীদ।'

* * *

এই কথাবার্তা আলোচনার মাত্র একদিন পরে মুযানী যুবক প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হলেন এবং সেই অবস্থায়ই ইন্তেকাল করলেন।

আল্লাহর উদ্দেশ্যে হিজরতকারী হিসাবে...
আল্লাহর পথের মুজাহিদ হিসাবে...
স্বদেশ ও স্বজন থেকে দূরে ইন্তেকাল করলেন।
আল্লাহ তাআলা এই সবকিছুর সর্বোত্তম বদলা দিয়ে দিলেন।

সাহাবায়ে কেরাম রাযিয়াল্লাহু আনহুম নিজেদের পবিত্র হাতে তার কবর খুঁড়লেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং তার কবরে নেমে মাটি সমান করলেন।

এই উম্মতের সর্বশ্রেষ্ঠ দুই ব্যক্তি আবু বকর এবং উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুমা কবরে নামানোর জন্য তার দেহ মোবারক নিজেদের হাতে

তুলে নিয়ে এগিয়ে গেলেন। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

'তোমাদের ভাইকে আমার কাছে নিয়ে এসো।'

তখন আবু বকর এবং উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুমা মুযানী যুবকের দেহ এগিয়ে নিয়ে গেলেন এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ হাতে তাকে গ্রহণ করলেন এবং কবরে শুইয়ে দিলেন।

আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ রাযিয়াল্লাহু আনহু সেখানে উপস্থিত ছিলেন। মুযানী যুবক যুল বিজাদাইন রাযিয়াল্লাহু আনহুর এই ঈর্ষণীয় সৌভাগ্য দেখে বলে উঠলেন,

'হায়! আমি যদি হতাম এই কবরওয়ালার মতো। হায়! আজ যদি তার জায়গায় আমি হতাম!

আমি তার পনেরো বছর পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছি। কিন্তু অল্পদিন ইসলাম কবুল করলেও তিনি এমন সৌভাগ্য অর্জন করেছেন যা দেখে আমি ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়েছি।'

তথ্যসূত্র :

১. *উসদুল গাবাহ*, ৩য় খণ্ড, ২২৭ পৃষ্ঠা, *আত্তারজামা*, ২৯২৮।
২. *সিফাতুস সফওয়া*, ১ম খণ্ড, ৬৭৭ পৃষ্ঠা।
৩. *আল-ইসাবা*, ২য় খণ্ড, ৩৩৮ পৃষ্ঠা, *আত্তারজামা*, ৪৮০৪।
৪. *আস-সীরাতুন্নবিয়্যাহ* লিবনি হিশাম, ৪র্থ খণ্ড, ১৭১-১৭২ পৃষ্ঠা।
৫. *হায়াতুস সাহাবাহ*, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৭৮-৮১।

আবুল আস ইবনে রাবী

আবুল আস আমাকে যা বলেছে তা সত্যে পরিণত করেছে এবং যে ওয়াদা করেছে তা পরিপূর্ণরূপে পালন করেছে।

–মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

রাবী আল-আবশামী আল-কুরাইশীর পুত্র আবুল আস ছিলেন উজ্জ্বল, লাবণ্যময় ও নজরকাড়া সৌন্দর্যের এক টগবগে যুবক। তার অগাধ ধনসম্পদ ও প্রচুর্যঘেরা জীবনের সবখানে ছিল বিলাসিতার ছাপ স্পষ্ট। উচ্চ বংশ-মর্যাদার মহিমা তাকে আবৃত করে রেখেছিল চাদরের মতো। তিনি হয়ে উঠলেন আরবসমাজের কাছে ঘোরসওয়ারী ও সাহসী যোদ্ধার দৃষ্টান্ত। আরব্য সংস্কৃতির রীতি হিসাবে তার মধ্যে ছিল পূর্ব-পুরুষের ঐতিহ্যের গর্ব। ছিল ওয়াদা পুরণের গুণ, মানবিক ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। যেন তিনি আরবসমাজের আগামী দিনের সরদার ও নেতা।

আবুল আস বাণিজ্যের প্রতি আসক্তি পেয়েছিলেন নিজ বংশ কুরাইশের ঐতিহ্য থেকে। কুরাইশের লোকেরা ছিল শীতকালে ইয়েমেনে ও গ্রীষ্মকালে সিরিয়ায় বাণিজ্য যাত্রায় অভ্যস্থ। সেই সূত্র ধরে এক সময় কুরাইশের এই বাণিজ্যে আবুল আস ব্যাপক সফলতা লাভ করলেন। তার বিশাল বাণিজ্য-কাফেলার উটবহর নিয়মিত মক্কা থেকে সিরিয়া বা

ইয়ামেনে যাতায়াত করত। তার এই বিরাট কাফেলায় থাকত উট ও দুইশো জন উট পরিচালক। সকলের কাছে আবুল আসের আমানতদারী, সত্যবাদিতা ও বিচক্ষণতা পরীক্ষিত হওয়ায় বহু মানুষ নিজেদের অর্থসম্পদ তার ব্যবসায় বিনিয়োগ করত।

* * *

মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহর স্ত্রী খাদীজা বিনতে খুওয়াইলিদ ছিলেন আবুল আসের খালা। বোনের এই পুত্রকে তিনি নিজের সন্তানের মতোই ভালোবাসতেন। যেভাবে তাকে হৃদয় নিংড়ানো ভালোবাসায় সিক্ত করেছিলেন একইভাবে নিজ গৃহের দুয়ারও তার জন্য সর্বদা উন্মুক্ত করে দিয়ে পরম স্নেহ ও মমতার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছিলেন। আবার তার জন্য মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভালোবাসাও খালার চেয়ে কোনো দিক দিয়ে কম ছিল না।

* * *

এরপর মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবারের অনেকগুলো বছর দ্রুত গতিতে পার হয়ে গেল। একদিন ঘর আলো করে জন্ম নিল বড় মেয়ে যায়নাব। শৈশব, কৈশোর পেরিয়ে সে তরুণী হয়ে উঠল। ফুলকলির মতো পরিপূর্ণ প্রস্ফুটিত হয়ে তাঁর ঘরে সৌন্দর্য ও সুবাস ছড়াতে থাকলেন। মক্কার নেতৃস্থানীয় ও মর্যাদাবান সব পরিবারের যুবকদের আগ্রহ তৈরি হলো যয়নাবের প্রতি।

কেন হবে না? কুরাইশী তরুণীর মাঝে তিনি যে ছিলেন অতুলনীয়া। রূপে-গুণে, বংশ মর্যাদায়, আদব-লেহায ও চাল-চলনের সকল বিচারে তিনিই ছিলেন সর্বসেরা কুরাইশী যুবতী।

কিন্তু তার প্রতি যুবকদের এই আগ্রহ হলে কি হবে? যায়নাবের খালাতো ভাই মক্কার সেরা যুবক আবুল আস ইবনুর রাবীর সঙ্গেই যে তার বিবাহ নিশ্চিত হয়ে আছে। সুতরাং এখানে মুখ খুলবে—এমন সাহস আর কার আছে!

মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বড় মেয়ে যায়নাবের সঙ্গে আবুল আস ইবনুর রাবীর বিয়ে হয়ে যাওয়ার মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই মক্কা নগরী আল্লাহর প্রদত্ত নবুওয়াতের সমুজ্জল নূরের আলোয় আলোকিত হয়ে উঠল। আল্লাহ তাআলা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হিসাবে মনোনীত করলেন। তাঁকে ইসলাম অর্থাৎ হক ও হিদায়াতের দীন দান করে নির্দেশ দিলেন, 'আপনার নিকটবর্তী আত্মীয়-স্বজন ও আপন মানুষদের সতর্ক করুন। তারা যেন নিজের ইচ্ছামত ভ্রান্ত পথে জীবন-যাপন ত্যাগ করে আল্লাহ তাআলার আদেশ-নিষেধ মেনে জীবন গড়ে তোলে।'

তাঁর এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে নারীদের মধ্যে সর্বপ্রথম ঈমান গ্রহণ করলেন তাঁরই প্রিয়তমা জীবন সঙ্গিনী খাদীজা বিনতে খুওয়াইলিদ এবং মেয়ে যায়নাব। রুকাইয়া, উম্মে কুলসূম এবং ফাতেমা রাযিয়াল্লাহু আনহুন্না। যদিও সে সময় ফাতেমা রাযিয়াল্লাহু আনহা ছিলেন একেবারেই ছোট।

তাঁর বড় জামাতা আবুল আস ইবনুর রাবী বাপ-দাদা ও পূর্বপুরুষদের পৌত্তলিক ধর্ম ত্যাগ করতে রাজি হলেন না। স্ত্রী যায়নাব যে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিতা হলেন, সেই ধর্মগ্রহণ করতে তিনি অস্বীকার করলেন। পক্ষান্তরে স্ত্রীর প্রতি গভীর ও আন্তরিক ভালোবাসা বজায় রেখে তাঁরই সঙ্গে তিনি মধুময় দাম্পত্য জীবনও অব্যাহত রাখলেন।

* * *

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে যখন কুরাইশের বিরোধ চরম আকার ধারণ করল, তখন কিছু লোক আবুল আসের পরিবারকে গিয়ে বলল,

'তোমরা কেমন আহম্মক হ্যাঁ! মুহাম্মাদের মেয়েকে ঘরের বউ বানিয়ে সুখের সংসার গড়ে তুলেছ? কেন তার চিন্তার বোঝা তোমরা মাথায় তুলে

রাখবে? মেয়েদের বাপের বাড়ি ফেরত পাঠিয়ে দিলে সে মেয়েদের চিন্তায় ব্যস্ত হয়ে পড়বে। আর তখন নিশ্চিন্তে কুরাইশের সঙ্গে বিবাদ করার কথা মনে থাকবে না।'

কিছু লোক ভীষণ খুশি হয়ে বলল,

'বাহ চমৎকার পরিকল্পনা তো! তাহলে আর দেরি কিসের? চলো যাই আবুল আসের কাছে গিয়ে তার মাধ্যমেই আমাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন শুরু করি।'

তারা আবুল আসের কাছে গিয়ে বলল,

'আবুল আস! তোমার স্ত্রীকে তালাক দিয়ে তাঁর পিতা মুহাম্মাদের কাছে ফেরত পাঠিয়ে দাও। এর পরিবর্তে কুরাইশের সেরা সুন্দরীদের মাঝে যাকে তুমি চাও তাকেই তোমার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দেওয়া হবে।'

আবুল আস তাদের এই প্রস্তাব সোজাসুজি প্রত্যাখ্যান করে বললেন,

'আল্লাহর কসম! এটা কিছুতেই সম্ভব নয়। আমি কিছুতেই আমার স্ত্রীকে তালাক দেব না। তার পরিবর্তে আমাকে যদি কোনো বিশ্বসুন্দরীও এনে দেওয়া হয়, তবুও না।'

বড় মেয়ের ক্ষেত্রে কুরাইশের এই পরিকল্পনা কার্যকর না হলেও প্রিয় নবীর অন্য দুই মেয়ে রুকাইয়া ও উম্মে কুলসূমকে সেই পরিকল্পনা মতো তালাক দিয়ে পিতার কাছে ফেরত পাঠানো হলো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর দুই মেয়ের ফেরত আসায় খুশি হয়ে বললেন,

'কতই না ভালো হতো! যদি আবুল আসও অন্য দুই জামাইয়ের মতো বড় মেয়েকে তার কাছে ফেরত পাঠিয়ে দিত। তাহলে সেও শিরকের বন্ধন-মুক্ত হয়ে যেত।

মনে মনে এটা কামনা করলেও তিনি আবুল আসের ওপর কোনো বল প্রয়োগ করতে পারছিলেন না। এর কোনো নৈতিক অধিকারও ছিল না। কেননা, তখন পর্যন্ত মুশরিক পুরুষের সঙ্গে মুমিন নারীর বিবাহ নিষিদ্ধ হয়নি।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনায় চলে গেলেন, মদীনায় তাঁর ব্যাপক প্রভাব ও শক্তি গড়ে উঠল। কুরাইশের লোকজন তাঁকে ও মুসলিমদের স্বস্তিতে থাকতে দেবে না—এই প্রত্যয় নিয়ে তাঁর ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে 'বদর' প্রান্তরে যুদ্ধের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বড় জামাই আবুল আসও তাদের সঙ্গে যেতে বাধ্য হলেন। কুরাইশের লোকজনের মতো মুসলিমদের বিরুদ্ধে কোনো ক্ষোভ তার অন্তরে ছিল না। মুসলিমদের পরাজিত করা অথবা কুরাইশবাহিনীকে বিজয়ী দেখা এসব কোনোটার প্রতিই তার কোনো আগ্রহ ছিল না। কিন্তু নিজের কওমের মধ্যে নেতৃস্থানীয় হওয়া এবং তার উঁচু মর্যাদাই তাকে বাধ্য করেছিল কুরাইশী বাহিনীর সঙ্গী হতে।

বদর প্রান্তরে সংঘটিত ইসলাম ও কুফরী শক্তির সর্বপ্রথম এই অসম যুদ্ধে মুশরিক কুরাইশী বাহিনীর চরম লজ্জাজনক পরাজয় ঘটে। মক্কাসহ গোটা আরবে তাদের শক্তির অহঙ্কার ও শ্রেষ্ঠত্বের দর্প একেবারেই ধুলায় মিশে গেল। বলা যায় ইসলাম বিরোধী শক্তির কোমর ভেঙে গেল। একদল নিহত হলো। একদল বন্দী হলো। আর একদল পালিয়ে কোনোরকম জীবন বাঁচাল।

যায়নাব বিনতে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্বামী অর্থাৎ নবীজীর বড় জামাই আবুল আস ছিলেন যুদ্ধবন্দীদের একজন।

* * *

যুদ্ধবন্দীদের মুক্তির জন্য তাদের আর্থিক অবস্থা ও নিজ নিজ কওমের মধ্যে কর্তৃত্ব ও মর্যাদার কথা বিবেচনায় রেখে এক হাজার দিরহাম পর্যন্ত 'মুক্তিপণ' নির্ধারণ করা হয়।

যুদ্ধবন্দীদের আপনজন অথবা তাদের প্রতিনিধিরা যার যার বন্দী আত্মীয়কে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে নির্ধারিত মুক্তিপণ নিয়ে মদীনায় আসা-যাওয়া শুরু করে।

এ সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বড় মেয়ে যায়নাব রাযিয়াল্লাহু আনহা নিজের স্বামী আবুল আসকে মুক্ত করার জন্য নির্ধারিত পরিমাণ মুক্তিপণ দিয়ে তার প্রতিনিধিকে মদীনায় পাঠালেন। মুক্তিপণ হিসাবে তিনি পাঠিয়ে ছিলেন মমতাময়ী মা খাদীজা বিনতে খুওয়াইলিদের সেই হার যা তিনি বিয়ের সময় তাকে উপহার দিয়েছিলেন এবং যা ছিল যায়নাবের কাছে মৃতা মায়ের এক অমূল্য স্মৃতি।

আবুল আসের মুক্তির লক্ষ্যে যায়নাবের পাঠানো মুক্তিপণ যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে পেশ করা হলো, হারটি দেখামাত্রই তিনি সেটা চিনতে পারলেন। তাঁর মনে পড়ে গেল প্রিয়তমা স্ত্রী খাদীজা রাযিয়াল্লাহু আনহার কথা। প্রিয়তমা স্ত্রী বিয়োগের গভীর বেদনা ও শোক তাঁর নিষ্পাপ চেহারায় রেখাপাত করল। একই সঙ্গে তিনি মেয়ে যায়নাবের অসহায়ত্বেও ভীষণ ব্যথিত হলেন। বুঝলেন, একান্ত নিরূপায় হয়েই মায়ের এই স্মৃতিচিহ্নটুকু স্বামীর মুক্তিপণ হিসাবে পাঠিয়ে দিয়েছেন তিনি। প্রিয় নবী দায়িত্বে থাকা সাহাবীদের ডেকে বললেন,

‘দ্যাখো! আমার মেয়ে যায়নাব তার মায়ের স্মৃতি এই হারটা আবুল আসের জন্য মুক্তিপণ হিসাবে পাঠিয়েছে। তোমরা যদি আবুল আসকে মুক্ত করা এবং যায়নাবের কাছে তার মায়ের হারটি ফেরত দেওয়া সমীচীন মনে করো তাহলে সেটাই করো।’

সাহাবায়ে কেরাম বললেন,

‘ইয়া রাসূলাল্লাহ! অবশ্যই আমরা সেটাই করব যা আপনি চেয়েছেন। আমরা আপনার মোবারক চেহারায় প্রফুল্লতা দেখতে চাই। সেখানে কোনো বেদনার ছাপ আমরা রাখতে চাই না।’

* * *

তবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুক্ত করার পূর্বেই আবুল আসের প্রতি শর্তারোপ করে বলেন, তাঁর মেয়ে যায়নাবকে অবিলম্বে তাঁর কাছে ফেরত পাঠাতে হবে।

মুক্ত হয়ে মক্কায় পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গেই আবুল আস রাসূলের দেওয়া শর্ত পূরণ করেন।

তিনি স্ত্রীকে সফরের জন্য তৈরি হতে বললেন। তাকে এই সংবাদও জানিয়ে দিলেন যে তাঁর পিতার পাঠানো লোকজন মক্কার অদূরে অপেক্ষা করছেন, তারাই তাকে মদীনায় নিয়ে যাবেন।

আবুল আস স্ত্রীর সফরের জন্য উট ও খাদ্য-পানির ব্যবস্থা করলেন। নিজের ভাই আমর ইবনুর রাবীকে তার সঙ্গে পাঠালেন যেন সে তার পক্ষ হয়ে যায়নাবকে তার পিতার পাঠানো লোকদের কাছে সরাসরি সমর্পণ করতে পারে।

* * *

আমর ইবনুর রাবী ভাই আবুল আসের দেওয়া দায়িত্ব পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে তীর ধনুক কাঁধে ঝুলিয়ে এবং অতিরিক্ত একটি তীরের থলে নিয়ে প্রস্তুত হয়ে গেল। প্রথমে যায়নাবকে তার উটের পিঠে হাওদায় বসিয়ে সে নিজের বাহনে চড়ে বসল। তারা দু'জন প্রকাশ্যে দিনের আলোয় কুরাইশের লোকজনের চোখের সামনে মদীনার উদ্দ্যেশ্যে রওনা হয়ে গেল। কুরাইশের লোকেরা এই দৃশ্য দেখে রাগে ক্ষোভে ও উত্তেজনায় অস্থির হয়ে উঠল। কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা ঐ দু'জনের পিছু ধাওয়া করে এসে তাদের ঘিরে ফেলল। এটা দেখে যায়নাব রাযিয়াল্লাহু আনহা প্রাণনাশের আশঙ্কায় সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লেন।

সেই আতঙ্কজনক অবস্থায় আমর ইবনুর রাবী ধনুকে তীর লাগিয়ে তীরের থলেটি সামনে পজিশন মতো রেখে চিৎকার করে বলল,

'আল্লাহর কসম করে বলছি, কেউ যদি যায়নাবের কাছাকাছি আসে তাহলে সোজা তার গলার মধ্যে এমনভাবে তীর বিদ্ধ করব যে তাকে সঙ্গে সঙ্গে মরতে হবে। তোমাদের কারোর অজানা নয় যে আমার তীর একচুল পরিমাণ এদিক সেদিক হয় না।'

পরিস্থিতির ভয়াবহতা বুঝে কুরাইশের দলপতি আবু সুফিয়ান এগিয়ে এসে শান্তভাবে আমর ইবনুর রাবীকে বললেন,

'বেটা! তোমার তীরটা একটু নামাও, তারপর আমার দুটো কথা শোনো।'

আমার ইবনুর রাবী কুরাইশ নেতার অনুরোধ মতো তীর-ধনুক নামিয়ে ফেলল। আবু সুফিয়ান তখন বললেন,

'তুমি যা করেছ সেটা মোটেও ঠিক করোনি। তুমি যায়নাবকে যেভাবে আমাদের চোখের সামনে বুক ফুলিয়ে মক্কা থেকে বের করে এনেছ, সেটা আমাদের জন্য কুরাইশের লোকজনের জন্য খুবই বিব্রতকর। কারণ, সারা আরব বদর-যুদ্ধে আমাদের লজ্জাজনক পরাজয়ের কথা জেনেছে। জেনেছে তাঁর বাবার হাতে আমাদের নাকানি-চুবানি খাওয়ার কথা। আমাদের এতবড় বিপর্যয়ের পর তুমি যে কাজটা করলে, সেই মুহাম্মাদের মেয়েকে বীরদর্পে আমাদের চোখের সামনে দিয়ে বের করে আনলে, এখন যদি আমরা এটাতে বাধা না দেই তাহলে সারা আরবের সকল গোত্রের মানুষ কুরাইশের প্রতি ছিঃ ছিঃ করবে। আমাদের ভীতু-কাপুরুষ বলে গালি দেবে। লাঞ্ছনার কোনো শেষ থাকবে না। অতএব, এখনকার মতো তাকে ফেরত নিয়ে যাওয়ার মাধ্যমে অন্তত লোকজনকে এই কথাটা বলাবলি করতে দাও যে কুরাইশের মেরুদণ্ড এখনো একেবারে ভেঙে যায়নি। তারা মুহাম্মাদের মেয়েকে মদীনায় বাবার কাছে যাওয়ার পথে বাধা দিয়ে তাকে ফেরত আসতে বাধ্য করেছে। দু'চারদিন পর আমাদের অগোচরে সম্মানের সঙ্গে তাকে তার পিতার কাছে পৌঁছে দাও। তাকে আটকে রাখার কোনো প্রয়োজন আমাদের নেই।'

আবু সুফিয়ানের এই অনুরোধে আমর ইবনুর রাবী রাজি হয়ে যায়নাব রাযিয়াল্লাহু আনহাকে বাড়িতে ফিরিয়ে আনল।

এর মাত্র কয়েকদিন পরেই রাতের বেলা যায়নাব রাযিয়াল্লাহু আনহাকে তার পিতার পাঠানো লোকদের হাতে সরাসরি পৌঁছে দিল।

স্ত্রী চলে যাওয়ার পর আবুল আস বিচ্ছেদবেদনা নিয়ে দীর্ঘকাল মক্কায় একাকী জীবন কাটাতে থাকলেন। মক্কা বিজয়ের অল্প কিছুদিন পূর্বে তিনি এক বাণিজ্য-কাফেলা নিয়ে গেলেন সিরিয়ায়। সে কাফেলায় উটের সংখ্যা ছিল একশো আর উটের পরিচালক ছিল প্রায় একশো সত্তর জন। এই বিশাল বাণিজ্য কাফেলা নিয়ে তিনি যখন সিরিয়া থেকে ফিরছিলেন, ফেরার পথে মদীনার কাছাকাছি পৌঁছামাত্র মদীনার ইসলামী রাষ্ট্র-নিযুক্ত প্রতিরক্ষা টহলদারবাহিনী হঠাৎ করে তাদের ওপর আক্রমণ করে বসে এবং বিশাল উটবহরকে কজা করে এবং সকল কর্মচারীকে বন্দী করে। কিন্তু আবুল আসকে তারা কোনোভাবেই খুঁজে পায় না। তিনি সকলের চোখ ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে যেতে সক্ষম হন।

রাতের অন্ধকার চারদিকে ছড়িয়ে পড়লে আবুল আস সেই সুযোগে মক্কার পথে না গিয়ে সন্ত্রস্ত ও আতঙ্কিত হয়ে মদীনায় ঢুকে পড়েন। অনেক ঘোরাঘুরি ও খোঁজাখুজি করে যায়নাব রাযিয়াল্লাহু আনহার কাছে হাজির হয়ে তাঁর কাছে নিরাপত্তা ও আশ্রয় প্রার্থনা করেন। তিনি আবুল আসকে অভয় দিয়ে বলেন, 'আমি আপনাকে আশ্রয় দিলাম। আপনার নিরাপত্তার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা আমার দায়িত্ব। আপনি কোনো চিন্তা করবেন না।'

* * *

ভোরে যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের নামাযের জন্য মসজিদে গেলেন, কাতার সোজা করে মেহরাবে দাঁড়িয়ে তাকবীরে তাহরীমা বলে হাত বেঁধে দাঁড়ালেন তখন মেয়েদের কাতার থেকে উচ্চস্বরে যায়নাব রাযিয়াল্লাহু আনহা বলে উঠলেন,

'হে মুসলিম ভাই সকল! আমি যায়নাব বিনতে মুহাম্মাদ। আমি আবুল আসকে নিরাপত্তা ও আশ্রয় দিয়েছি। দয়া করে আপনারা তাকে নিরাপদ হিসাবে দেখবেন।'

নামায শেষ করার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসুল্লিদের দিকে ঘুরে বসে বললেন,

'নামায শুরু করার পর আমি যে কথা শুনেছি তোমরাও কি সেটা শুনতে পেয়েছ?'

সবাই সমস্বরে বলে উঠলেন,
'জী হাঁ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরাও শুনতে পেয়েছি।'

তিনি বললেন,
'যেই মহান আল্লাহর নিয়ন্ত্রণে আমার জীবন-মরণ তাঁর শপথ করে বলছি, এ বিষয়ে পূর্ব থেকে আমার কিছুই জানা ছিল না। তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আমিও বিষয়টি মাত্রই জানতে পারলাম। যে কোনো সাধারণ ও দুর্বল মুসলিমেরও অধিকার আছে কাউকে আশ্রয় দেওয়ার। কোনো মুসলিম যদি কাউতে আশ্রয় ও নিরাপত্তা দিয়ে থাকে তবে সে ব্যক্তি সকল মুমিন মুসলিমেরই আশ্রিত হয়ে যায়। সকলেরই কর্তব্য তাকে নিরাপদে রাখা।'

এরপর তিনি বাড়িতে চলে গেলেন এবং মেয়েকে বললেন,
'আবুল আসের মেহমানদারী ও আপ্যায়নে যেন কোনো ত্রুটি না হয়। তবে মনে রেখো, তুমি তার জন্য হালাল নও। কারণ, কোনো মুশরিক পুরুষের সঙ্গে মুমিন নারীর বৈবাহিক সম্পর্ক বৈধ নয়।'

এরপর তিনি টহল দলের সকলকে ডেকে এনে বললেন,
'আবুল আসের সঙ্গে আমাদের কি সম্পর্ক, সেটা তোমরা সকলেই জানো। তোমরা তার বাণিজ্য-কাফেলার সমুদয় মাল কব্জা করেছ। যদি তোমরা তার প্রতি দয়া দেখিয়ে তার মাল তাকে ফেরত দিতে পছন্দ করো, তাহলে সেটা খুবই ভালো হয়। এটাই আমার পছন্দ। আর যদি তোমরা সেটা না করতে চাও তাহলে এই সমুদয় সম্পদ তোমাদের জন্য 'ফাই' বা বিনা যুদ্ধে তোমাদের জন্য আল্লাহর দেওয়া গনীমত যা তোমাদের জন্য সম্পূর্ণ হালাল। তোমরা এর উপযুক্ত হকদার।'

তারা সকলে সমস্বরে বলে উঠলেন,
'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা বরং তার সব মাল তাকেই ফেরত দিতে চাই।'

আবুল আস তার মালামাল ফেরত নিতে এলে টহলদারবাহিনীর সকলে মিলে তাকে বললেন,

'হে আবুল আস! কুরাইশ বংশের তুমি একজন মর্যাদাশালী ব্যক্তি আবার তুমি উম্মুল মুমিনীন খাদীজা রাযিয়াল্লাহু আনহার ভাগ্নে এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বড় জামাতা। তুমি যদি ইসলাম গ্রহণ করো তাহলে আমরা আমাদের কব্জা করা এইসব মাল তোমাকে দিয়ে দেব। তোমার ব্যবসায় বিনিয়োগকারী সকলের এই মালের তুমি একাই মালিক হয়ে যাও এবং আমাদের সঙ্গেই মদীনায় বসবাস করতে থাক।'

আবুল আস তাদের কথার উত্তরে বললেন,

'ছি; ছিঃ কত নিকৃষ্ট প্রস্তাব আপনারা আমাকে দিলেন! তার মানে আমি কি বিশ্বাসঘাতকতা দিয়েই আমার নতুন দীনের সূচনা করব?'

* * *

প্রতিশ্রুতি মতো আবুল আস বিশাল উটবহর এবং তাতে বোঝাই সকল সম্পদ ফিরে পেয়ে নিরাপদে মক্কায় পৌঁছে গেলেন। প্রত্যেকের প্রাপ্য অংশ বুঝিয়ে দিয়ে তিনি ঘোষণা করলেন,

'হে আমার বিনিয়োগকারী ব্যবসায়ী ভাইয়েরা! তোমাদের কারও কি কোনো প্রাপ্য আমার কাছে আছে যা আমি শোধ করিনি? আমার কাছে কি কারও কোনো পাওনা আছে?

সবাই একবাক্যে উত্তর দিল,

'না, তোমার কাছে আমাদের কারও কোনো পাওনা নেই। সকল পাওনাই তুমি পরিশোধ করে দিয়েছ।

আল্লাহ তোমাকে উত্তম বদলা দান করুন। আমরা দেখেছি তুমি একজন নীতিবান ও দয়ালু ব্যক্তি। যথার্থরূপে হক আদায়কারী।'

এই কথা শোনার পর আবুল আস বললেন,

'তোমাদের সকল পাওনা আমি পরিপূর্ণরূপে বুঝিয়ে দিয়েছি। এবার তোমরা আমার কথা শোনো, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ ছাড়া আমার আর কোনো মাবূদ নেই। আমি কখনোই আল্লাহ ছাড়া আর কারোর ইবাদত করব না। আর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল। আমি আল্লাহর কসম করে বলছি যে মদীনাতে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছেই আমি ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা করতে পারতাম কিন্তু আমার আশঙ্কা হচ্ছিল যে তোমরা হয়তো মনে করবে, আমি বন্দী হওয়ার বাহানা করে প্রকৃতপক্ষে তোমাদের সম্পদ আত্মসাৎ করার পরিকল্পনা করেছি। আল্লাহ তাআলা যখন তোমাদের পাওনাগুলো নিজ হাতে পৌঁছে দেওয়ার তাওফীক দিয়ে আমাকে দায়মুক্ত করে দিলেন, এখন আর আমার সামনে কোনো বাধা না থাকায় আমি ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দিলাম।'

এরপর তিনি মদীনায় গিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলে তিনি আবুল আস রাযিয়াল্লাহু আনহুর আগমনে খুশি হয়ে তাকে আন্তরিক অভ্যর্থনা জানান এবং তার স্ত্রী যায়নাব রাযিয়াল্লাহু আনহাকে তার কাছে ফেরত দিয়ে তার সম্পর্কে মন্তব্য করলেন,

'সে আমাকে যা বলেছে তা সত্যে পরিণত করেছে এবং আমার কাছে যে ওয়াদা করেছে তা পরিপূর্ণরূপে পালন করেছে।'

তথ্যসূত্র :

১. *সিয়ারু আলামিন নুবালা* লিয-যাহাবী, ১ম খণ্ড, ২৩৯ পৃষ্ঠা।
২. উসদুল গাবাহ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১৮৫ পৃষ্ঠা অথবা *আত্তারজামা*, ৬০৩৫।
৩. *আনসাবুল আশরাফ*, ৩৯৭ পৃষ্ঠা ও পরবর্তী।
৪. *আল-ইসাবা*, ৪র্থ খণ্ড, ১৬১ পৃষ্ঠা অথবা *আত্তারজামা*, ৬৯২।
৫. *আল-ইসতীআব*, ৪র্থ খণ্ড, ১২৫ পৃষ্ঠা।
৬. *আস-সীরাতুন্নববিয়্যাহ* লিবনি হিশাম, ২য় খণ্ড, ৩০৬ থেকে ৩১৪ পৃষ্ঠা।
৭. *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৩৫৪ পৃষ্ঠা।
৮. *হায়াতুস সাহাবা*, সূচিপত্র দ্রষ্টব্য।

আসেম ইবনে সাবেত

কেউ যদি যুদ্ধ করতে চায়, তবে তার উচিত আসেম ইবনে সাবেতের মতো যুদ্ধ করা।

–মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

কুরাইশের একেবারে সকলে মিলে—ক্রীতদাস থেকে মালিক, নেতা থেকে সর্বসাধারণ সকল যুদ্ধবাজই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে যুদ্ধের উদ্দেশ্যে ওহুদের প্রান্তরে বেরিয়ে এল।

তাদের প্রত্যেকের অন্তরে বিদ্বেষের আগুন জ্বলছিল দাউ দাউ করে। বদর যুদ্ধে নিহত স্বজনদের প্রতিশোধ-জিঘাংসা উত্তপ্ত উত্তেজনা ছড়িয়ে দিচ্ছিল তাদের রক্তের প্রবাহে।

এখানেই শেষ হয়নি এই বাহিনীর কীর্তি। এরা যোদ্ধা পুরুষদেরকে আক্রমণে উদ্বুদ্ধ করার জন্যে এবং তাদের সাহস ও মনোবল চাঙ্গা করার জন্য সঙ্গে এনেছিল কুরাইশী নারীদের একদল গায়িকা।

এই নারীদের দলে উল্লেখযোগ্য যারা ছিলেন তারা হচ্ছেন, আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দ বিনতে উতবা, আমর ইবনুল আসের স্ত্রী রাইতা বিনতে মুনাব্বিহ, তালহার স্ত্রী সুলাফা বিনতে সাদ আর সঙ্গী ছিল তিন ছেলে মুসাফি, জুলাস ও কিলাব।

ওহুদ প্রান্তরে কুরাইশী মুশরিকবাহিনী আর তাওহীদের ঝাণ্ডাবাহী মুসলিমবাহিনী যখন মুখোমুখি হলো, যুদ্ধের আগুন যখন জ্বলে উঠল, তখন আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্‌দের নেতৃত্বে গায়িকা দল তৎপর হয়ে উঠল। তারা কুরাইশী সৈন্যদের পেছনে দাঁড়িয়ে দফ বাজিয়ে রণ-উন্মাদনা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে গাইতে শুরু করল,

إِنْ تُقْبِلُوْا نُعَانِقْ وَنَفْرُشُ النَّمَارِقْ

أَوْ تُدْبِرُوا نُفَارِقْ فِرَاقَ غَيْرِ وَامِقْ

'যদি তোমরা সাহস দেখিয়ে সামনে বেড়ে শত্রুসৈন্য নিপাত করতে পারো তাহলে আমরা খুশি হয়ে তোমাদের বুকে নেব, উষ্ণ আলিঙ্গন আর ভালোবাসার উত্তাপে তোমাদের প্রাণ জুড়িয়ে দেব। ফুলের শয্যা বিছিয়ে ভালোবাসা উজাড় করে দেব। আর যদি শত্রুর আক্রমণে ভীরু-কাপুরুষের মতো পিছু হটো, তাহলে চিরদিনের মতো আমরা তোমাদের ঘৃণা করব আর গলায় ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দেব।'

তাদের গানের এই কথাগুলো সৈনিক যোদ্ধাদের নিদারুণ উত্তেজনায় অস্থির করে তুলল আর তাদের স্বামীদের অন্তরেও জাদুর মতো প্রভাব বিস্তার করল। তারা উন্মাদের মতো শত্রুনিধনে তৎপর হয়ে পড়ল।

মুসলিমবাহিনীর বিরুদ্ধে কুরাইশবাহিনীর বিজয়ের মাধ্যমে এই যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটল। আর তখন নারী দল শুরু করল বিজয় উল্লাসের নামে বিকৃত উন্মাদনা। ওহুদের সারা মাঠ জুড়ে তারা চিৎকার আর হৈচৈ করে পৈশাচিকতার হাট বসিয়ে দিল।

শহীদ হয়ে যাওয়া মুসলিমসৈনিকদের পবিত্র দেহের প্রতি তারা চালায় ইতিহাসের নিকৃষ্টতম অমর্যাদা। লাশগুলোর পেট কেটে, বুক ফেঁড়ে কলিজা বের করে ফেলে। চোখ উপড়ে, নাক ও কান কেটে নেয়।

এখানেই শেষ হলে তাও একরকম হতো। কিন্তু ঐ নারীদের একজন এত কিছু করেও নিজের বিদ্বেষ আর ক্রোধের আগুন নেভাতে না পেরে

শহীদদের মৃতদেহ থেকে কর্তিত নাক কান দিয়ে গলার মালা, কানের দুল ও পায়ের নুপুর বানিয়ে সেইগুলো পরে পিশাচের সাজে সেজে মনের ক্ষোভ মেটায়। বদর যুদ্ধে নিহত তার ভাই, পিতা ও চাচার প্রতিশোধ এভাবেই সে গ্রহণ করে।

* * *

আবার আরেক নারী সুলাফা বিনতে সাদ—তার অবস্থা ছিল অন্য সকলের চেয়ে আলাদা। সে কুরাইশী নারীদের সঙ্গে বিজয় উল্লাসে শরীক হওয়ার জন্য ছটফট করছিল। মনে মনে অস্থির হয়ে অপেক্ষা করছিল—আগে স্বামী অথবা তিন ছেলের সঙ্গে সাক্ষাৎ হোক অথবা তাদের একটু খোঁজ-খবর জেনে নেই, তারপর শরীক হব ঐ বিজয় উল্লাসে।

কিন্তু তার অকারণ অপেক্ষা শুধু দীর্ঘই হলো। যাদের জন্য সে এত লম্বা সময় ধরে অপেক্ষা করছে, তারা কেউই এল না। অবশেষে সে তাদের খোঁজে নিজেই নেমে পড়ল। ঢুকে পড়ল যুদ্ধের ময়দানের অনেক ভেতরে। সে একটি একটি করে নিহত লাশগুলোর চেহারা পরখ করতে থাকল। দীর্ঘ সময় অস্থির হয়ে খুঁজে খুঁজে হয়রান হওয়ার পর হঠাৎ তার চোখে পড়ে গেল নিহত স্বামীর রক্তমাখা অসাড় দেহ। হঠাৎ দেখা ভয়ঙ্কর এই দৃশ্যে সুলাফা অতঙ্কিত সিংহির মতো একলাফে ঝাঁপিয়ে পড়ে স্বামীর লাশ জড়িয়ে ধরল এবং চারদিকে ভীত দৃষ্টি ফেলে তিন ছেলে মুসাফ, কিলাব ও জুলাসকে খুঁজতে থাকল। সে ওহুদ পাহাড়ের কাছ ঘেঁষা নিম্নভূমিতে নিজের দুই ছেলে মুসাফ ও কিলাবের লাশ পড়ে থাকতে দেখে ছুটে চলে গেল সেই দিকে। তবে সেখানে গিয়ে সুলাফা তাদের লাশের কাছাকাছি পেয়ে গেল জুলাসকে। সে ছিল তখনো জীবিত।

* * *

জীবনের একেবারে শেষ মুহূর্তে ছটফট করতে থাকা ছেলের রক্তাক্ত মাথা আদর করে কোলে তুলে নিয়ে মা উন্মাদের মতো ছেলের

মুখমণ্ডলের জমাট রক্ত মুছতে থাকে। দীর্ঘসময় ধরে জমাট রক্তে বন্ধ হয়ে থাকা চোখের রক্ত মুছতে মুছতে অস্থির ও পেরেশান মা জুলাসকে প্রশ্ন করে,

'বেটা! কে তোমাদের সকলের এই অবস্থা করেছে? কে তোমাদের আঘাত করেছে?

জুলাস মায়ের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করল। কিন্তু মৃত্যুযন্ত্রণায় তার অন্তিম শ্বাস রুদ্ধ হয়ে গেল। মা অস্থির হয়ে আবারও জিজ্ঞাসা করলে জুলাস শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে করতে শুধু এতটুকু বলতে পারল,

'আসেম ইবনে সাবেত আমাকে আর ভাই মুসাফি ও ... ...

কথা শেষ হলো না, জুলাসের জীবন শেষ হয়ে গেল।

* * *

সুলাফা বিনতে সাদ চরম শোকে যেন উন্মাদ হয়ে গেল। চিৎকার করে বিলাপ বকতে বকতে লাত ও উয্যা দেবীর কসম খেয়ে বলতে লাগল, 'কুরাইশের লোকেরা যতক্ষণ পর্যন্ত আমার তিন ছেলের খুনী আসেম ইবনে সাবেত থেকে প্রতিশোধ না নেবে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত তার মাথার খুলিতে মদ ঢেলে খাওয়ার জন্য আমাকে তার মাথা কেটে না এনে দেবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমার কান্না বন্ধ হবে না। আমার চোখের পানি শুকাবে না।'

এরপর সে শপথ করে ঘোষণা দিল,

'যে ব্যক্তি আসেম ইবনে সাবেতের মাথা কেটে আনতে পারবে, তাকে তার চাহিদা মতো অঢেল অর্থ-সম্পদ দিয়ে পুরস্কৃত করা হবে।'

এই পুরস্কারের ঘোষণা কুরাইশের সকলের কানে কানে পৌঁছে গেল। মক্কার প্রতিটি যুবক তখন কামনা করতে লাগল, ইস্! আসেম ইবনে

সাবেতের মাথাটা যদি আমিই কেটে এনে সুলাফাকে দিতে পারতাম, তাহলে ঐ বিশাল পুরস্কারে আমিই ভূষিত হতাম।

* * *

ওহুদ যুদ্ধের পর মুসলিমবাহিনী মদীনায় ফিরে যুদ্ধের বিভিন্ন দিক ও শিক্ষনীয় বিষয় নিয়ে পর্যালোচনা করতে লাগল। প্রথমেই তারা এই যুদ্ধের বীর শহীদদের প্রতি মহান আল্লাহর রহমত কামনা করে দুআ করলেন। যে সকল জানবাজ মুজাহিদ এই যুদ্ধে চরম ঝুঁকি নিয়ে শত্রুসৈন্য নিপাতে সফলতা দেখিয়েছেন, তাদের বিষয়ে পর্যালোচনা করতে গিয়েই প্রসঙ্গ এসে যায় আসেম ইবনে সাবেত রাযিয়াল্লাহু আনহুর।

তখন তারা বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন,

'আসেম ইবনে সাবেতের পক্ষে শত্রুবাহিনীর এক পরিবারের তিন ভাইকে হত্যার বিরল সৌভাগ্য কিভাবে অর্জিত হলো? এ তো এক মহা-আশ্চর্যের ব্যাপার!'

অন্য একজন সাহাবী বলে উঠলেন,

'এতে বিস্ময়ের কী আছে? আপনাদের কি মনে পড়ে না! বদর যুদ্ধের অল্পকদিন পূর্বে যখন রাসূলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] জিজ্ঞাসা করেছিলেন তোমরা কীভাবে যুদ্ধ করবে? তখন তাঁর সামনে আসেম ইবনে সাবেত উত্তরে বলেছিলেন,

'শত্রুবাহিনী যদি আমার একশো গজের ভেতরে থাকে তাহলে আমি ওদের তীর ছুঁড়ে হত্যা করব।

আর যদি তারা আমার আরও কাছাকাছি অর্থাৎ বর্শার আঘাতের সীমার মধ্যে চলে আসে, তাহলে আমি বর্শা দিয়েই তাদের এককে সৈন্যকে কুপোকাত করতে থাকব যতক্ষণ বর্শা ভেঙ্গে না যায়।

যখন বর্শা ভেঙে যাবে তখন সেটা ফেলে দিয়ে তরবারি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ব আর একেক আঘাতে একেক শত্রুকে জাহান্নামের ঠিকানায় পাঠিয়ে দেব।'

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার বর্ণিত পদ্ধতির কথা শুনে প্রচণ্ড খুশি হয়ে বলেছিলেন,

'এটাই হলো যুদ্ধের সর্বোত্তম পদ্ধতি। অতএব কেউ যদি সর্বোত্তম পদ্ধতিতে যুদ্ধ করতে চায়, সে যেন আসেম ইবনে সাবেতের মতো যুদ্ধ করে।'

* * *

ওহুদ যুদ্ধের পরপরই ছয়জন সাহাবীকে একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজে মদীনার বাহিরে পাঠানোর প্রয়োজন দেখা দিলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসেম ইবনে সাবেত রাযিয়াল্লাহু আনহুকে সেই ক্ষুদ্র দলটির আমীর মনোনীত করে দিলেন।

যথাসময়ে তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে রওনা হয়ে গেলেন। যেতে যেতে তারা মক্কা ও উসফানের মাঝামাঝি পৌঁছার পর হুযাইল গোত্রের দস্যুবাহিনী হঠাৎ তাদের চারদিক থেকে ঘিরে ধরে।

আসেম ইবনে সাবেত রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং তার সঙ্গীরা দস্যুদলকে প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে তরবারি বের করলেন। তাদের এই প্রস্তুতি দেখে আক্রমণকারী হুযাইলীরা কৌতুক করে বলল,

'আমাদের এলাকার মধ্যে আমাদেরই শত শত মানুষের ঘেরাও এর মধ্যে থেকে আমাদের মুকাবেলা করার মতো যথেষ্ট শক্তি কি তোমাদের আছে বলে মনে করো? আমাদের এতগুলো সশস্ত্র মানুষের সঙ্গে মাত্র ছয়জন মানুষ তোমরা কতক্ষণই বা টিকতে পারবে? আমাদের এক ডাকে আরও শত শত মানুষ আমাদের সাহায্যে এগিয়ে আসবে। অতএব,

বুদ্ধিমানের কাজ হবে যদি তোমরা তরবারি ফেলে দিয়ে নিজেদেরকে আমাদের হাতে সমর্পণ করো। আমরা আল্লাহর নামে শপথ করে ওয়াদা করছি, তোমরা যদি আত্মসমর্পণ করো তাহলে তোমাদের হেফাজতের দায়িত্ব আমরা নেব। তোমাদের কোনো ক্ষতি আমরা হতে দেব না।'

তখন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই সাহাবীরা একে অন্যের প্রতি দৃষ্টি বিনিময় করে যেন 'এখন কী করণীয়' সেটাই পরামর্শ করে নিলেন।

আসেম ইবনে সাবেত রাযিয়াল্লাহু আনহু অন্য সঙ্গীদের দিকে দৃষ্টির ইশারায় স্পষ্ট করেই জানান দিলেন যে,

'আমি মুশরিকদের ওয়াদায় বিশ্বাস করি না, সুতরাং তাদের হাতে নিজেকে সমর্পণ করার প্রশ্নই আসে না।'

পাশাপাশি সুলাফা বিনতে সাদ কর্তৃক তার মাথার বিনিময়ে বিশাল পুরস্কার ঘোষণার কথাটিও তার মনে আছে। অতএব আসেম ইবনে সাবেত রাযিয়াল্লাহু আনহু আর এক মুহূর্ত বিলম্ব না করে নাঙ্গা তরবারি উঁচিয়ে বলতে থাকলেন,

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَحْمِى لِدِيْنِكَ وَأُدَافِعُ عَنْهُ

فَاحْمِ لَحْمِىْ وَعَظْمِىْ وَلَاتُظْفِرْبِهِمَا أَحَدًا مِنْ أَعْدَاءِ اللهِ

'হে আল্লাহ! তোমার দীন ইসলামকে হেফাজতের লক্ষ্যে আমি তরবারি ধারণ করলাম। তুমি আমাকে সাহায্য করো। আমার দেহ এবং হাড় হাড্ডিকে তুমি রক্ষা করো। আমার দেহকে যেন দুশমনরা কব্জা করতে না পারে, তুমি সেই ব্যবস্থা করে দাও।'

এরপর তিনি হুযাইলী দস্যুদের ওপর প্রচণ্ড গতিতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তাঁর দুই সাথী মারসাদ আল্-গানাওয়ী এবং খালি আল্-লাইসী রাযিয়াল্লাহু আনহুমাও তাঁকে দেখে শত্রুদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আক্রমণ

শুরু করে দিলেন। দুশমনের বিরুদ্ধে তাঁরা জীবন-মরণপণ করে লড়তে লড়তে একের পর এক শহীদ হয়ে গেলেন।

তাঁদের অপর তিন সঙ্গী আবদুল্লাহ ইবনে তারেক, যায়েদ ইবনে দুসুন্নাহ এবং খুবাইব ইবনে আদীই রাযিয়াল্লাহু আনহুম দস্যুদের কথামতো তাদের কাছে আত্মসমর্পণ করলেন। কিন্তু হুযাইলীরা তাদের প্রতিশ্রুতি ভেঙ্গে আত্মসমর্পণকারীদের হত্যা করে ফেলল।

* * *

হুযাইলী দস্যুরা প্রথমে জানত না যে তাদের সঙ্গে লড়াই করে নিহত তিনজনেরই একজন আসেম ইবনে সাবেত। অবশেষে তারা যখন বিষয়টি অবগত হলো তখন তাদের খুশি আর দেখে কে? তারা মনে মনে বিশাল পুরস্কারের আশায় আনন্দিত হতে থাকল।

কারণ, তারাও শুনেছে সুলাফা বিনতে সাদ ঘোষণা দিয়েছে, আসেম ইবনে সাবেতকে পেলে তার মাথার খুলিতে মদ ঢেলে খাবে এবং তার স্বামী ও সন্তানদের হত্যার বদলা নেবে। তা ছাড়া সুলাফার পুরস্কারের বিখ্যাত সেই ঘোষণাও তারা শুনেছে যে জীবিত কিংবা মৃত আসেমকে এনে দিতে পারলে সে দাতাকে দেবে তার ইচ্ছামতো পুরস্কার।

* * *

আসেম ইবনে সাবেত শহীদ হওয়ার মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সংবাদটি হুযাইল গোত্রের অদূরে মক্কায় কুরাইশের লোকজনের মধ্যে পৌঁছে গেল।

সংবাদটি শোনার সঙ্গে সঙ্গে কুরাইশ নেতৃবৃন্দ হুযাইল গোত্রের কাছে আসেম ইবনে সাবেতের মাথা চেয়ে লোক পাঠাল। যেই মাথা তারা সুলাফার হাতে তুলে দিয়ে তার অন্তরে দাউ দাউ করে জ্বলা আগুন নেভাতে এবং তার শপথ পূর্ণ করাতে চাইল। তারা চাইল সুলাফার হারানো তিন ছেলের শোক-যন্ত্রণা কিছুটা লাঘব করতে।

কুরাইশ নেতারা তাদের প্রতিনিধির হাতে প্রচুর অর্থ-সম্পদ ও সোনা-দানা দিয়ে এই নির্দেশনা দিয়ে পাঠাল যে, আসেমের মাথা নেওয়ার জন্য হুযাইলীদের সঙ্গে যেন বেশি দর-কষাকষি না করে। যে কোনো মূল্যে ঐ মাথা নিয়েই তাদের ফিরতে হবে।

হুযাইলীরা আসেম ইবনে সাবেত রাযিয়াল্লাহু আনহুর মাথা কেটে কুরাইশী প্রতিনিধির হাতে তুলে দেওয়ার উদ্দেশ্যে লাশের কাছে এগিয়ে গেল। কিন্তু একি কাণ্ড! মৌমাছি আর ভীমরুলের ঝাঁক সেই লাশকে ঘিরে পাহাড়া বসিয়েছে। লাশের নিকটবর্তী হওয়ার চেষ্টা করতেই সেই মৌমাছি ও ভীমরুলরা তাদের সারা শরীরে হুল ফুটিয়ে দিচ্ছে। বেশ কয়েকবার চেষ্টা করেও তারা আসেম ইবনে সাবেত রাযিয়াল্লাহু আনহুর লাশের কাছে যেতে ব্যর্থ হয়।

বারবার চেষ্টার পরও তারা লাশের কাছে ঘেঁষতে যখন চরমভাবে ব্যর্থ হলো তখন তারা ঠিক করল, এখন থাক রাত হলে এই মাছিরা চলে যাবে তখনই আমরা মাথাটা কেটে নেব।

এই বলে তারা দূরে বসে অপেক্ষা করতে থাকল।

* * *

কিন্তু মানুষ যা ভাবে সবসময়ই কি তাই ঘটে?

দিনের আলো ফুরিয়ে সন্ধ্যা ঘনিয়ে অসতে না আসতেই আকাশ ঘনকালো মেঘে আচ্ছন্ন হয়ে গেল। ভয়ঙ্কর মেঘগর্জন আর বজ্রপাতের দরুন জনপদে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল। এরপর শুরু হলো মুষলধারে বৃষ্টি। এমন ভয়াবহ মুষলধারার অবিরাম বর্ষণ এলাকার প্রবীণতম ব্যক্তিও আর কখনো হতে দেখেনি। সারারাত চলল সেই অবিরাম বৃষ্টি। অতি দ্রুত মাঠ-ঘাট ডুবে সমগ্র এলাকা বাঁধ ভাঙ্গা ঢলে প্লাবিত হয়ে গেল।

ভোর হতেই হুযাইলীর লোকেরা আসেম ইবনে সাবেত রাযিয়াল্লাহু আনহুর লাশ খুঁজতে বেরিয়ে পড়ল। সর্বত্র খুঁজে খুঁজে তারা হয়রান হয়ে গেল কিন্তু তাঁর লাশের কোনো হদিস পাওয়া গেল না।

এর কারণ, বাঁধভাঙা সেই প্লাবন আসেম রাযিয়াল্লাহু আনহুর লাশকে বহু দূরে অজানা কোনো স্থানে ভাসিয়ে নিয়ে যায়—যা একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানেন না।

আল্লাহ তাআলা আসেম ইবনে সাবেত রাযিয়াল্লাহু আনহুর কৃত দুআ কবুল করে নেন এবং সে কারণেই তাঁর পবিত্র দেহকে আল্লাহর দুশমন মুশরিকদের কব্জা থেকে সম্পূর্ণরূপে হেফাজত করেন।

আল্লাহ তাআলা তার মাথার খুলিতে মদ খাওয়ার ঘৃণ্য বাসনাকে পরিপূর্ণরূপে বাঞ্চাল করে দেন।

আল্লাহ তাআলা এভাবেই যুগে যুগে মুমিনদের বিরুদ্ধে মুশরিকদের পরিকল্পনাকে ধূলিসাৎ করে দিয়ে থাকেন।

তথ্যসূত্র :

১. *আস-সীরাতুন্নববিয়্যাহ* লিবনি হিশাম, সূচিপত্র দ্রষ্টব্য।
২. *আল-ইসতীআব*, ৩য় খণ্ড, ১৩২ পৃষ্ঠা।
৩. *দিওয়ানে হাস্‌সান ইবনে সাবেত ওয়া শুরুহুহু*, আসেম ইবনে সাবেতের আলোচনা।
৪. *আত-তাবাকতুল কুবরা*, ২য় খণ্ড, ৪১, ৪৩, ৫৫, ৭৯ এবং ৩য় খণ্ডের ৯০ পৃষ্ঠা।
৫. *হায়াতুস সাহাবা*, ৪র্থ খণ্ড সূচি দ্রষ্টব্য।
৬. *সিফাতুস সফওয়া*, সূচি দ্রষ্টব্য।
৭. *তারীখুত তাবারী*, ১০ম খণ্ডের সূচি দ্রষ্টব্য।
৮. *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, ৩য় খণ্ড, ৬২-৬৯ পৃষ্ঠা।
৯. *তারীখু খলীফা ইবনে খায়াত*, ২৭ ও ৩৬ পৃষ্ঠা।
১০. *আল-ইসাবা*, ২য়খণ্ড, ২৪৪ পৃষ্ঠা, *আত্তারজামা*, ৪৩৪৭।
১১. *আল-মুহাব্বারু ফিত-তারীখ*, ১১৮ পৃষ্ঠা।
১২. *উসদুল গাবাহ*, *আত্তারজামা*, ২৬৬৩।
১৩. *হুলয়াতুল আউলিয়া*, ১ম খণ্ড, ১১০ পৃষ্ঠা।

উতবা ইবনে গাযওয়ান

> দীন ইসলামে উতবা ইবনে গাযওয়ানের রয়েছে বিশেষ অবদান।
>
> –উমর ইবনুল খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহু

আমীরুল মুমিনীন উমর ইবনুল খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহু এশার নামাযের পর বিছানায় গেলেন কিছুটা ঘুমিয়ে শরীরটা সতেজ করার জন্য। এশার পর পর সামান্য যেটুকু ঘুমিয়ে নেওয়া যায়, সেটুকুই তো তার নিজের বিশ্রামের জন্য বরাদ্দ। রাতের বাকি অংশে তো তিনি ইবাদত-বন্দেগী আর প্রজাদের অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য ঘুরে ঘুরেই কাটিয়ে দেন।

আজ বিছানায় যাওয়ার পরও খলীফাতুল মুসলিমীনের দুই চোখে ঘুম নেই মোটেও। ঘুমেরা যেন বহুদূর পালিয়ে গেছে তাকে ছেড়ে। কারণ, পারস্যবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধরত মুসলিমবাহিনীর সেনাপতি তাঁর কাছে যে সংবাদ পাঠিয়েছেন দূতের মাধ্যমে, সেই সংবাদের কারণেই দুশ্চিন্তায় ও উৎকণ্ঠায় তার ঘুম আসছে না।

সেনাপতি সংবাদ পাঠিয়েছে, 'মুসলিমবাহিনীর মরণপণ লড়াইয়ের সামনে পর্যুদস্ত হয়ে পারস্যবাহিনী পিছু হটে যায় এবং কিছুটা সময় নিয়ে মুসলিমবাহিনী যখনই তাদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত আক্রমণ পরিচালনা করতে

যায়, দেখা গেছে পর্যুদস্ত ও পিছু হটে যাওয়া পারস্যবাহিনীর কাছে বিভিন্ন দিক থেকে সাহায্য এসে গেছে। যার ফলে সেই বাহিনীই নতুন শক্তি আর উদ্যম নিয়ে মুসলিমবাহিনীর সামনে এসে দাঁড়াচ্ছে অপ্রতিরোধ্য হয়ে। মুসলিমবাহিনী এখন না পারছে শত্রুর বিরুদ্ধে চূড়ান্ত আক্রমণ চালাতে, না তারা শত্রুদের মতো নতুন সৈন্যের সাহায্য পাচ্ছে।'

খলীফাকে আরও জানানো হয়েছে যে, 'পরাজিত-প্রায় বাহিনী যেই শহর থেকে প্রয়োজনীয় খাদ্য, রসদ ও সেনা সাহায্য লাভ করছে সেটা হলো বসরা নগরীর পাশ ঘেঁষা 'উবুল্লা'। এই যুদ্ধে কোনো মীমাংসা করতে হলে সর্বপ্রথম 'উবুল্লা' শহরের একটা ব্যবস্থা করা জরুরি। সে জন্যই আরও সেনা সাহায্যের প্রয়োজন।'

খলীফাতুল মুসলিমীন উমর ফারুক রাযিয়াল্লাহু আনহু সিদ্ধান্ত নিলেন, শত্রুবাহিনীর কাছে সাহায্য যাওয়ার ব্যবস্থা আগে বন্ধ করতে হবে আর সেজন্যই সর্বপ্রথম 'উবুল্লা' শহর জয় করতে হবে।

কিন্তু এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করতে যেই পরিমাণ সৈন্য দরকার, এই মুহূর্তে সেটা তাঁর কাছে নেই।

কেননা, মদীনার যুবক, পৌঢ় ও বৃদ্ধ মুজাহিদরা বিভিন্ন ময়দানে জিহাদের উদ্দেশ্যে আগেই বেরিয়ে গেছেন। এখন যারা মদীনায় রয়ে গেছেন এই কাজের জন্য তারা যথেষ্ট নন।

তাই তিনি সৈন্যস্বল্পতার এই জটিল সমস্যার সমাধান চিন্তা করতে থাকলেন। তিনি চিন্তা-ভাবনা করে দেখলেন. স্বল্পসংখ্যক সৈন্য দ্বারা বিপুল সংখ্যক সৈন্যের কাজ নেওয়া সম্ভব একমাত্র সেনাপতির বিচক্ষণতা দ্বারা। বয়স ও বহুযুদ্ধে অংশগ্রহণের বাস্তব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন, বিচক্ষণ ও রণকৌশলী হিসাবে পরীক্ষিত এমন সেনাপতি তিনি মনে মনে খুঁজতে শুরু করলেন। তীরন্দাজ যেভাবে থলের সব তীর ঢেলে একটি একটি করে যাচাইয়ের মাধ্যমে সেরা তীরটি বেছে নেয়, সেভাবেই খলীফা উমর ফারুক রাযিয়াল্লাহু আনহু তার মুজাহিদবাহিনী ও সেনাপতিদের তালিকা ধরে একজন একজন করে পরীক্ষা করতে করতে অবশেষে স্বতস্ফূর্তভাবে উচ্চস্বরে বলে উঠলেন,

'পেয়ে গেছি! পেয়ে গেছি!!'

এইবার একটু চিন্তামুক্ত হয়ে তিনি আবার ঘুমানোর উদ্দেশ্যে বিছানার দিকে গেলেন আর মনে মনে বলতে থাকলেন,

'উবুল্লা শহর অভিযানের জন্য জরুরি সেনাসংখ্যার অভাব পুষিয়ে নিয়ে নিজের মেধা, দক্ষতা ও বিশেষ রণকৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে ঐ শহর জয়ের যোগ্য সেনাপতি একমাত্র তিনিই হতে পারেন। কারণ, বদর, ওহুদ ও খন্দকের মতো ঐতিহাসিক যুদ্ধগুলোতে স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সেনাপতিত্বে যুদ্ধ করার অভিজ্ঞতা তাঁর রয়েছে। ইয়ামামা-যুদ্ধের মতো বিশাল সংখ্যক ভয়ঙ্কর ও প্রশিক্ষিত শত্রুবাহিনীর বিরুদ্ধে বীর সাহসী ও রণকৌশলী যোদ্ধা হিসাবে ভূমিকা পালনের কৃতিত্বও রয়েছে তাঁর ঝুলিতে।

কোনো তরবারি আজ পর্যন্ত যাকে আঘাত করতে পারেনি এবং যার নিক্ষিপ্ত কোনো তীর আজ পর্যন্ত লক্ষভ্রষ্ট হয়নি।

ইসলামের জন্য হাবশায় এবং মদীনায় দুটো হিজরতের যিনি বিরল মর্যাদা লাভকারী এবং এই পৃথিবীর বুকে ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে যিনি সপ্তম ব্যক্তিত্ব।'

যখন সকাল হলো তিনি বললেন, 'উতবা ইবনে গাযওয়ানকে ডেকে নিয়ে এসো।' তিনি এসে হাজির হলে খলীফা তাকে তিনশো তেরোজন যোদ্ধাবাহিনীর সেনাপতি মনোনীত করে বললেন, 'যথাশীঘ্রই তাকে আরও সামরিক সাহায্য পাঠানো হবে।'

* * *

সেনাপতি উতবা ইবনে গাযওয়ান রাযিয়াল্লাহু আনহু তিনশো তেরোজন যোদ্ধার এই ছোট্ট বাহিনী নিয়ে রওনা করার সময় খলীফা উমর ফারুক রাযিয়াল্লাহু আনহু সেনাপতিকে বিদায়ী উপদেশ দিয়ে বললেন,

'হে উতবা! আমি আপনাকে উবুল্লা অভিযানের জন্য পাঠাচ্ছি। সেই শহরটি মুসলিমবাহিনীর দুশমন পারস্যবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ ও সুরক্ষিত সামরিক ঘাঁটি হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। আল্লাহর কাছে আশা করছি তিনি আপনাকে শত্রুদের ঐ ঘাঁটি বিজয়ে সাহায্য করবেন। ইনশাআল্লাহ আপনার হাতেই ঐ শহর বিজিত হবে।

সেখানে পৌঁছার পর তাদের সকলকে ইসলাম কবুল করার আহ্বান জানাবেন। যারা সেই আহ্বানে সাড়া দেবে তাদের দীনী ভাই হিসাবে গ্রহণ করে নেবেন। আর যারা ইসলাম কবুলের আহ্বান মানতে অস্বীকৃতি জানাবে তাদের ইসলামী রাষ্ট্রের সংখ্যালঘু আশ্রিত হিসাবে জিযিয়া বা নিরাপত্তা কর দেওয়ার আহ্বান জানাবেন।

ইসলাম গ্রহণ ও কর প্রদান দুটো প্রস্তাবই যদি তারা প্রত্যাখ্যান করে তাহলে তাদের প্রতি দয়া দেখানোর আর কোনো সুযোগ নেই। যুদ্ধই তখন অবধারিত।

হে উতবা! আপনি যে দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়েছেন, সেই দায়িত্বপালনে সর্বদা আল্লাহর নির্দেশকে সামনে রাখুন, তাঁর হুকুম মতো নিজের কতর্ব্য পালন করুন।

খবরদার! অহঙ্কার ও দম্ভ যেন আপনার আখেরাতকে বরবাদ করতে না পারে। ভুলে যাবেন না যে আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একজন সন্মানিত সাহাবী। লক্ষ্যহীন জীবন-যাপনের পর তাঁর সংশ্রবের মাধ্যমেই আল্লাহ আপনাকে দান করেছেন বিশেষ মর্যাদার জীবন। এলোমেলো জীবনের পর ঐ সংশ্রবের মাধ্যমেই আল্লাহ আপনাকে করেছেন শক্তিশালী। এখন একজন মনোনীত শাসক ও অনুসরণীয় সেনানায়ক হয়ে গেছেন। এখন আপনি যা বলবেন তাই মনোযোগ দিয়ে শোনা হবে। আপনি যা আদেশ দেবেন তাই পালন করা হবে। আহা! এটা মহান আল্লাহর কত বড় দান ও অনুগ্রহ হবে যদি আপনি দাম্ভিকতা ও আত্মপ্রতারণার শিকার না হন। যদি এটা আপনাকে

জাহান্নামের দিকে ঠেলে না দেয়। আল্লাহ আমাকে ও আপনাকে জাহান্নাম থেকে হেফাজত করুন।'

* * *

সেনাপতি উতবা ইবনে গাযওয়ান রাযিয়াল্লাহু আনহু তাঁর সেনাদলকে সঙ্গে নিয়ে উবুল্লা শহরের উদ্দেশ্যে রওনা করলেন। তাঁর সঙ্গে তাঁর স্ত্রী ছাড়াও কোনো কোনো সৈনিকের স্ত্রী ও বোনদের মধ্য থেকে আরও পাঁচজন নারী ছিলেন। তারা উবুল্লা শহরের অনতি দূরে আখ ক্ষেতের সারি বিশিষ্ট বিশাল একটি ভূমিতে পৌঁছার পর যাত্রা বিরতি দিলেন।

কিন্তু এতদূর পথ আসতে আসতেই তাদের বয়ে আনা যৎসামান্য খাদ্য ও পানির মজুদ একেবারে নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল এবং এখানে যাত্রা বিরতির পর সকলকেই তীব্র ক্ষুধা ও পিপাসায় কাতর দেখে উতবা ইবনে গাযওয়ান রাযিয়াল্লাহু আনহু কয়েকজন সৈনিককে ডেকে বললেন, 'আশপাশের এলাকা থেকে কিছু খাবার সংগ্রহ করার চেষ্টা করো।'

দায়িত্বপ্রাপ্ত সৈনিকেরা খাবার খুঁজতে বেরিয়ে পড়লেন। এরপর কী হলো? সেটা শুনুন এই দলেরই একজনের মুখ থেকে :

'আশপাশের এলাকায় খুঁজতে খুঁজতে আখ ক্ষেতের গভীরে ঢুকে পড়লাম। হঠাৎ দেখতে পেলাম দুটো বস্তা, যার একটি খেজুর ভর্তি আর অন্যটিতে শক্ত হলুদ রঙের আবরণে ঢাকা সাদা ছোট ছোট শস্যদানা। আমরা দুটো বস্তাই সেনাদলের কাছে টেনে নিয়ে এলাম। একজন সৈনিক সেই অপরিচিত দানা দেখে বলল, এগুলো হয়তো বিষাক্ত কিছু, শত্রুরা আমাদের প্রিয় খাবার খেজুরের পাশাপাশি রেখে দিয়েছে, যেন এটাকেও খাবার ভেবে খেয়ে আমরা সবাই মরে যাই। অতএব, তাদের এই ফাঁদে কিছুতেই পা দেওয়া যাবে না। কেউ যেন এগুলো না খায়। সুতরাং অপরিচিত সেই দানার বস্তা ফেলে রেখে আমরা শুধু খেজুরই খেতে থাকলাম।

ইতিমধ্যে একটি ঘোড়া রশি ছিঁড়ে এসে সেই দানার বস্তায় মুখ ঢুকিয়ে খাওয়া শুরু করল। আমরা ভয় পেয়ে গেলাম যে ঘোড়াটা তো নির্ঘাত

মারা পড়বে। সে কারণে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম, মরে যাওয়ার আগেই আমরা সেটাকে জবাই করে তার গোস্ত দিয়ে খাদ্যের অভাব পূরণ করব।

কিন্তু ঘোড়ার মালিক এসে আমাদের নিবৃত্ত করে বললেন, আমি রাতভর ঘোড়াটির ওপর কড়া নজর রাখব। যদি ওর মধ্যে মৃত্যুর কোনো ভাব বোঝা যায় তাহলে সঙ্গে সঙ্গেই জবাই করে ফেলব। সকাল হলে আমরা দেখলাম ঘোড়াটি একদম সুস্থ-স্বাভাবিক। বিষক্রিয়ার কোনো আলামতই তার মধ্যে দেখা যাচ্ছে না।

তখন আমাকে ডেকে আমার বোন বললেন, ভাইজান! বাবা বলতেন, আগুনের উত্তাপে বিষক্রিয়া অকার্যকর হয়ে যায়।

এরপর তিনি নিজেই অল্প কিছু দানা হাড়িতে নিয়ে তার মধ্যে পানি দিয়ে জ্বালাতে শুরু করলেন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই আমার বোন ডেকে বললেন, এই দেখো.. হলুদ রঙের খোসা কেমন লাল হয়ে গেছে। এরপর সেই দানাগুলোর খোসা ছাড়ানোর পর বেড়িয়ে এল সাদা সাদা দানা।

এরপর সেগুলো বড় বড় পাত্রে নিয়ে খাওয়ার জন্য প্রস্তুত করলাম। তখন সেনাপতি উতবা বললেন, 'বিসমিল্লাহ বলে খাওয়া শুরু করো।' আমরা আল্লাহর নামে খাওয়া শুরু করলাম এবং অবাক হয়ে গেলাম, কি দারুন সুস্বাদু খাবার!

পরে আমরা জানতে পেরেছিলাম ঐ শস্যগুলোর নাম ধান এবং সেগুলো থেকেই তৈরি করা হয় চাউল।'

* * *

উতবা ইবনে গাযওয়ান রাযিয়াল্লাহু আনহুর নেতৃত্বে ক্ষুদ্র বাহিনীকে যে উবুল্লা শহরের উদ্দেশ্যে পাঠানো হলো সেটা ছিল দজলা বিধৌত, পারস্যসাম্রাজ্যের একটি সুরক্ষিত শহর। যাকে তারা ব্যবহার করত নিজেদের অস্ত্রভাণ্ডার হিসাবে।

পারস্য-বাহিনী এই শহরের সবগুলো প্রবেশ দুয়ারের নিকট অবস্থিত বড় বড় দূর্গের ওপর তৈরি করে রেখেছিল পর্যবেক্ষণের চৌকি, যেখানে বসে তারা শত্রুদের গতিবিধির ওপর কড়া নজর রাখত।

কিন্তু এত আয়োজনের কোনো কিছুই উতবা ইবনে গাযওয়ান রাযিয়াল্লাহু আনহুকে প্রতিরোধ করতে পারল না। অথচ তাঁর কাছে না ছিল বিরাট সংখ্যক সৈন্য, না-ছিল ব্যাপক অস্ত্র। তাঁর তিনশো তেরোজনের বাহিনীকে সাহায্যের জন্য পরবর্তীতে ওয়াদা মোতাবেক খলীফা উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু পাঠাতে পেরেছিলেন মাত্র তিনশো সৈনিক। এর মধ্যেও ছিল ক্ষুদ্র একদল নারী। আর ছয়শো জনের এই ক্ষুদ্র মুসলিমবাহিনীর হাতে অস্ত্র হিসাবে তরবারি আর বর্শা ছাড়া কিছুই ছিল না। পক্ষান্তরে প্রতিপক্ষ পারস্যবাহিনীর কাছে ছিল সর্বাধুনিক সমরাস্ত্রের সকল আয়োজন।

এই বিপদসঙ্কুল পরিস্থিতিতে মুসলিমসৈনাপতির কাছে বুদ্ধিমত্তা ও রণ-চাতুর্যের ব্যবহার ছাড়া আর কোনো উপায়ই ছিল না।

* * *

সুতরাং সেনাতি উতবা ইবনে গাযওয়ান রাযিয়াল্লাহু আনহু নারীদের বর্শার মাথায় উড়ানোর জন্য ঝাণ্ডা তৈরি করালেন। এবং তাদেরকে সৈনিকদের থেকে বেশ দূরত্ব বজায় রেখে ঝাণ্ডা উঠিয়ে আগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দিলেন। তিনি নারীদেরকে আরও একটি নির্দেশ দিয়ে বললেন যে,

'আমরা উবুল্লা শহরের কাছাকাছি যখন পৌঁছে যাব, আপনারা আমাদের অনেক পেছন থেকে এত বেশি পরিমাণে ধুলা উড়াতে থাকবেন যেন আকাশ ধুলায় একেবারে আচ্ছন্ন হয়ে যায়। এভাবে ধুলা উড়াতে উড়াতে আপনারা ধীরে ধীরে সামনে বাড়তে থাকবেন।'

মুসলিমবাহিনী উবুল্লা শহরের প্রবেশদ্বারে পৌঁছে গেলে তাদেরকে প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ে পারস্য-বাহিনী। কিন্তু শত্রুবাহিনীকে

এভাবে নাকের ডগায় পৌঁছে যেতে দেখে তারা প্রথমেই আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। তারা এই বাহিনীর পেছনের দিকে তাকিয়ে দেখতে পায় আকাশ একেবারে ধুলায় ধূসরিত হয়ে পড়েছে এবং এই ধুলাচ্ছন্নতার ভেতরেই হালকা হালকা চোখে পড়ছে যেন অগণিত ঝাণ্ডা নিয়ে এগিয়ে আসছে দুর্জয় মুসলিমবাহিনী।

তারা পরস্পর বলাবলি করতে থাকে,

'এখানে সন্মুখে যে সামান্য সংখ্যক মুসলিমসৈনিক দেখা যাচ্ছে, নিঃসন্দেহে এরা হচ্ছে তাদের অগ্রবাহিনী। শুধু এই অগ্রবাহিনীর সৈন্যসংখ্যা দেখে প্রতারিত হওয়া যাবে না। এদের পেছনে দূর-দিগন্ত পর্যন্ত যেভাবে ধুলা উড়ছে তাতে অনুমান করা যায় যে প্রশিক্ষিত ও ব্যাপক অস্ত্রসজ্জিত বিশাল বাহিনী আমাদের দিকে ধেয়ে আসছে। যাদের তুলনায় আমাদের সেনা সংখ্যা একেবারেই নগন্য।'

আল্লাহর অসীম কুদরতে এভাবেই তারা নিজেদের ভুল চিন্তা-ভাবনার কারণে সাহস ও মনোবল হারিয়ে ফেলে। শত্রুবাহিনীকে প্রতিরোধের চিন্তা মাথা থেকে ফেলে দিয়ে হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে তারা অতি দ্রুত পালিয়ে আত্মরক্ষার চিন্তা করতে থাকে। হাতের কাছে হালকা ও দামী আসবাবপত্র যে যা পারল তাই নিয়ে দজলা নদীর তীরে নোঙর করে রাখা জাহাজগুলোতে হুমড়ি খেয়ে উঠে উবুল্লা শহর ছেড়ে পালাতে থাকল।

সেনাপতি উতবা ইবনে গাযওয়ান রাযিয়াল্লাহু আনহু এভাবেই বুদ্ধি ও কৌশল ব্যবহার করে বিনা লড়াই ও বিনা রক্তপাতে উবুল্লা শহর জয় করে নিলেন এবং পারস্যবাহিনীর সুরক্ষিত মজবুত দুর্গ ও অস্ত্র-ভাণ্ডার এই উবুল্লাতে প্রবেশ করে এই শহরের আশপাশের সকল শহর ও গ্রাম দখল করে বিজয়ের ধারা অব্যাহত রাখলেন।

এ সকল অভিযান থেকে এতো বেশি গনিমতের মাল তারা অর্জন করলেন, যা ছিল সকল হিসাবের বাইরে। বরং সকল কল্পনার ঊর্ধ্বে। এমনকি এই বাহিনীর একজন মদীনায় ফিরে এলে একজন তার কাছে উবুল্লা শহর বিজয়ী সেনাদলের অবস্থা জানতে চাইলে তিনি বলেন,

'আরে ভাই! তাদের কথা কি আর বলব! আমি দেখে এসেছি তারা স্বর্ণ আর রৌপ্যমুদ্রা পাত্রে ভরে ভরে এক একজনকে ভাগ করে দিচ্ছেন।'

এ কথা শুনে তো মদীনার কিছু লোক বসবাসের জন্য উবুল্লা শহরের উদ্দেশ্যে সফর শুরু করে দিলেন।

* * *

পারস্যসাম্রাজ্যের বিজিত এইসব অঞ্চলে সীমাহীন ঐশ্বর্য আর বিলাস সামগ্রীর ছড়াছড়ির মাঝে দীর্ঘদিন বসবাস করলে মুসলিমসৈনিকদেরও বিলাসী জীবন-যাপনে অভ্যস্ত হয়ে পড়ার আশঙ্কায় সেনাপতি উতবা ইবনে গাযওয়ান রাযিয়াল্লাহু আনহু চিন্তায় পড়ে গেলেন। স্থানীয় জনগণের স্বভাব চরিত্রের প্রভাবে আর ধন-সম্পদের প্রাচুর্যের মধ্যে বসবাসের কারণে এই সকল মুজাহিদের অন্তর থেকে জিহাদের জযবা, হিম্মত ও সাহস ক্রমেই স্তিমিত হয়ে যাবে। এসব আশঙ্কার কথা জানিয়ে তিনি খলীফা উমর ফারুক রাযিয়াল্লাহু আনহুর কাছে পত্র পাঠালেন। পত্রে তিনি সৈনিকদের বসিয়ে না রেখে উবুল্লা শহর থেকে সামান্য দূরে বসরা নগর নির্মাণ এবং সেখানেই সৈনিকদের জন্য সেনা নিবাস গড়ে তোলার অনুমতি চাইলেন। খলীফা তাঁর দূর-দর্শিতায় মুগ্ধ হয়ে বসরা নগর গড়ার ব্যাপারে তাঁর পরিকল্পনা অনুমোদন করলেন।

* * *

উতবা ইবনে গাযওয়ান রাযিয়াল্লাহু আনহু নতুন বসরা-নগর পত্তনের উদ্দেশ্যে পরিকল্পনার বাস্তবায়ন শুরু করলেন।

সর্বপ্রথম গড়ে তুললেন বসরা নগরের বিশাল জামে মসজিদ।

নগর গড়ার ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম মসজিদ নির্মাণে বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই। কারণ, তিনি এবং তাঁর অন্য সকল সঙ্গী আল্লাহর পথে জিহাদে বেরিয়েছেন, এর উদ্দেশ্য তো এটাই যে আল্লাহর জমীনে আল্লাহর ইবাদত ও ইবাদতের কেন্দ্র মসজিদ প্রতিষ্ঠা করবেন। মুসলিমবাহিনী তো

সর্বদাই আল্লাহর ঘর মসজিদ থেকেই দুশমনবাহিনীর বিরুদ্ধে সাহায্য প্রার্থনা করে থাকে। তা ছাড়া মুসলিমসমাজের ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক সকল কর্মকাণ্ডর কেন্দ্রবিন্দুই হয়ে থাকে মসজিদ।

পরিকল্পনা মোতাবেক বসরা নগরের পত্তন শেষে উতবা ইবনে গাযওয়ান রাযিয়াল্লাহু আনহুর এই বাহিনী একের পর এক আরও অনেক শহর, নগর ও গ্রাম জয় করলেন। এরপর বিজিত সেইসব অঞ্চলে নিজেদের নামে জমি বরাদ্দ নিয়ে বাড়ি-ঘর বানানোর প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেল মুসলিমসৈনিকদের মাঝে। কিন্তু এই বাহিনীর বদরী সাহাবী উতবা ইবনে গাযওয়ান রাযিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন একেবারেই ব্যতিক্রম। তিনি কোনো জমি-জায়গা নিজের নামে বরাদ্দ নিলেন না এবং নিজের জন্য কোনো বাড়ি-ঘরও নির্মাণ করলেন না। মুজাহিদদের জন্য নির্ধারিত সাধারণ মোটা কাপড়ের তাঁবুতেই তিনি বসবাস করতে থাকলেন। কেননা, তাঁর অন্তরের আকাঙ্ক্ষা ছিল অন্যদের চেয়ে ভিন্ন রকমের। ক্ষণিকের পান্থশালা এই দুনিয়ার কোনো ঘর-বাড়িই তাঁর কাম্য ছিল না। চিরস্থায়ী জান্নাতের ঘর-বাড়ির প্রতিই ছিল তাঁর হৃদয়ের একমাত্র গোপন আকাঙ্ক্ষা।

* * *

উতবা ইবনে গাযওয়ান রাযিয়াল্লাহু আনহু অবাক বিস্ময়ে সৈনিকদের আয়েশী ও বিলাসী জীবন-যাপনে অভ্যস্ত হয়ে পড়া দেখে ব্যথিত হতে থাকলেন। তিনি দেখলেন,

বসরায় বসবাসরত সৈনিকদের হাতে দুনিয়ার অর্থ-সম্পদের প্রাচুর্য এমন ভাবে ধরা দিয়েছে এবং তারা বিলাসদ্রব্য ও বিলাসী খাবার-দাবারে এতটাই অভ্যস্ত হয়ে যাচ্ছে যে তারা নিজেদের আদর্শ, অতীত প্রায় ভুলে যেতে বসেছে।

এই তো কিছুদিন পূর্বেও যারা সিদ্ধ ধানের খোসা ছড়িয়ে চাল খেয়ে মনে করেছিল 'এর চেয়ে সুস্বাদু খাবার আর হতে পারে না,' সেই

মানুষগুলোই আজ পারস্যবাসীর বিখ্যাত 'ফালুদা,' 'লাচ্ছি' ইত্যাদি সুস্বাদু ও বিলাসী খাবারের স্বাদে প্রতিদিনই তাদের রসনা তৃপ্ত করছে।

তিনি শঙ্কিত হয়ে পড়লেন দীনের ওপর দুনিয়ার কারণে...

চিন্তিত হয়ে পড়লেন পরকালের ব্যাপারে ইহকালের কারণে...

এজন্যই তিনি কুফার জামে মসজিদে সকল মুসলিমকে সমবেত করে বললেন,

'উপস্থিত প্রিয় মুসলিম ভাইয়েরা!

এই পৃথিবী এবং এই পৃথিবীর জীবনের সমাপ্তি অনিবার্য। এই চরম অনিশ্চিত, ক্ষণস্থায়ী ইহকালীন জীবনের পরেই শুরু হয়ে যাবে এক অনন্ত ও অসীম পরকালীন জীবন। সেই জীবনে আমাদের সকলকেই যেতে হবে। সুতরাং সর্বোত্তম আমল নিয়েই আমাদের সেখানে যাওয়ার জন্য যত্নবান হতে হবে।

আমি ছিলাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সপ্তম সাহাবী। গাছের পাতা ছাড়া আমাদের কপালে আর কোনো খাবার জুটত না। আর সেইসব পাতাও ছিল এমন খস্‌খসে যা খেয়ে আমাদের ঠোঁটে ঘা হয়ে যেত।

একদিন এক টুকরো পরিত্যক্ত চাদর কুড়িয়ে পেয়েছিলাম। আমি আর সাদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস সেই কুড়িয়ে পাওয়া চাদরটি ভাগাভাগি করে নিয়েছিলাম। একভাগ দিয়ে বনালাম আমার লুঙ্গি আর অন্য ভাগ দিয়ে বানালেন সাদ। অথচ আজ আমরা সেই দুইজনই এক এক এলাকার গভর্নর। নিজেদের কাছে বিরাট ও মহৎ কিন্তু আল্লাহর কাছে তুচ্ছ ও নিকৃষ্ট হওয়া থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি।'

এরপর উতবা ইবনে গাযওয়ান রাযিয়াল্লাহু আনহু একজনকে তাঁর খলীফা ও স্থলাভিষিক্ত বানিয়ে সেখানের সকলকে বিদায় জানিয়ে মদীনার উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেলেন। তিনি মদীনায় খলীফা উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর খেদমতে হাজির হয়ে তাঁর কাছে বিনীত আবেদন জানিয়ে বললেন,

'দয়া করে আমাকে সেনাপতি ও গভর্নরের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দান করুন।'

খলীফাতুল মুসলিমীন উমর ফারুক রাযিয়াল্লাহু আনহু তাঁর এই অব্যাহতির আবেদন প্রত্যাখ্যান করে অবিলম্বে তাকে কুফায় ফিরে গিয়ে দায়িত্ব পালনের জন্য চাপ দিতে থাকেন। উভয়ের পাল্টাপাল্টি অনুরোধের এক পর্যায়ে উতবা ইবনে গাযওয়ান রাযিয়াল্লাহু আনহু অনিচ্ছা সত্ত্বেও খলীফার নির্দেশ মেনে নিতে বাধ্য হলেন। খলীফার নির্দেশে বিষণ্ন মনে কুফার উদ্দেশ্যে রওনা করলেন। তবে উটে চড়েই তিনি এই দুআ শুরু করলেন,

أَللّٰهُمَّ لَا تَرُدَّنِىْ إِلَيْهَا - أَللّٰهُمَّ لَا تَرُدَّنِىْ إِلَيْهَا

'হে আল্লাহ! আমাকে কুফায় আবার ফিরিয়ে নিয়ো না। হে আল্লাহ! আমাকে আবার কুফায় নিয়ে যেয়ো না।'

আল্লাহ তাআলা সঙ্গে সঙ্গে তাঁর দুআ কবুল করলেন এবং তাঁর আবেদন মঞ্জুর করলেন। তিনি মদীনা থেকে বেশি দূর যেতে পারলেন না। হঠাৎ তাঁর উটটি হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল আর সঙ্গে সঙ্গে তিনিও ছিটকে পড়ে সেখানেই ইন্তেকাল করলেন।

তথ্যসূত্র :

১. *আল-ইসাবা*, ২য় খণ্ড, ৪৫৫ পৃষ্ঠা। *আত্তারজামা*, ৪৫১১।
২. *আল-ইসতীআব*, ৩য় খণ্ড, ১১৩ পৃষ্ঠা।
৩. *তারীখুল ইসলাম* লিয-যাহাবী, ২য় খণ্ড, ৭পৃষ্ঠা।
৪. *উসদুল গাবাহ*, ৩য় খণ্ড ৩৬৩ পৃষ্ঠা।
৫. *তারীখু খলীফা ইবনে খয়্যাত*, ১ম খণ্ড, ৯৫-৯৭ পৃষ্ঠা।
৬. *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, ৭ম খণ্ড, ৪৮ পৃষ্ঠা।
৭. *মুজামূল বুলদান ইনদাল কালাম আলাল বাছরা*, ১ম খণ্ড, ৪৩০ পৃষ্ঠা।
৮. *আত-তাবাকাতুল কুবরা* লিবনি সাআদ, ৭ম খণ্ড, ১ পৃষ্ঠা।
৯. *তারীখুত তাবারী*, (১০ম খণ্ডের সূচি দ্রষ্টব্য)।
১০. *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, ১ম খণ্ড, ৩০৪ পৃষ্ঠা।
১১. *হায়াতুস সাহাবা*, (৪র্থ খণ্ডের সূচি দ্রষ্টব্য)।

নুআইম ইবনে মাসউদ

নুআইম ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু জানতেন, যুদ্ধের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো শত্রুপক্ষকে ধোঁকা দেওয়া।

তীক্ষ্ম বুদ্ধির সজাগ হৃদয়, দৃঢ়চেতা, চঞ্চল ও চটপটে এক যুবক নুআইম ইবনে মাসউদ। এইমাত্র বাড়িতে ঢুকলেন তো দেখা যাবে মুহূর্তেই আবার বেরিয়ে পড়লেন সফরে। দুর্বার, দুর্বিনীত। কোনো বাধা তাকে থামাতে পারে না, কোনো জটিলতাই তাকে দমাতে পারে না।

আল্লহপ্রদত্ত প্রচণ্ড উপস্থিত বুদ্ধি, যে কোনো কঠিন পরিস্থিতির চটপট ও তাৎক্ষণিক সমাধানকারী, পরিশ্রমী এই যুবক একজন নির্ভেজাল মরু-সন্তানের বাস্তব উপমা হলেও বিপরীতমুখী আমোদ-প্রমোদ ও বিলাসী জীবনের আয়েশী বদস্বভাব অর্থাৎ নাচ, গান ও নর্তকীপ্রীতি তিনি লাভ করেছিলেন ইয়াসরিবের ইহুদী বন্ধুদের সংসর্গ থেকে।

নজদের এই যুবকের অন্তরে যখনই আমোদ-প্রমোদ কিংবা গান-বাজনার প্রতি আকর্ষণ প্রবল হয়ে উঠত, তখনই তিনি ছুটে চলে যেতেন ইয়াসরিবের ইহুদী বন্ধুদের কাছে। দু'হাত খুলে তাদের কাছে তুলে দিতেন অঢেল অর্থ, যেন তারা তার খায়েশ পূরণে ব্যাপক বিনোদনের আয়োজন করতে পারে।

এ কারণেই নুআইম ইবনে মাসউদের ইয়াসরিবে আসা-যাওয়া প্রায় চলতেই থাকত। সেখানের ইহুদীদের সঙ্গে বিশেষত বনূ কুরাইযার ইহুদীদের সঙ্গে গড়ে উঠেছিল তার মধুর ও গভীর সম্পর্কের বন্ধন।

* * *

মহান রাব্বুল আলামীন যখন সত্য ও সঠিক পথের দিশা ও নির্ভুল সত্য দীন ইসলাম দিয়ে আখেরী নবীকে পাঠিয়ে বিশ্বমানবতাকে সম্মানিত করলেন এবং সর্বপ্রথম পবিত্র মক্কায় ইসলামের আলো চারিদিক আলোকিত করে তুলল, নুআইম ইবনে মাসউদ তখনো নিজের জীবনকে আগের মতোই রাখলেন লাগামহীন।

তিনি নতুন ধর্ম থেকে নিজেকে অত্যন্ত কঠোরভাবে দূরে সরিয়ে রাখলেন শুধু এই ভয়ে যে ইসলাম তার ভোগ-বিলাস ও আমোদ-প্রমোদে অন্তরায় হয়ে যাবে। ভোগ-বিলাস আর আমোদ-প্রমোদই যদি ছেড়ে দিতে হয় তাহলে আর জীবনের মানে কি?—এই কথা ভেবে তিনি নতুন ধর্ম ইসলামকে শুধু অবজ্ঞাই করলেন না বরং ইসলামকে নির্মূল করার জন্য ইসলামের চরম দুশমনদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ইসলামের বিরুদ্ধে তরবারিও ধারণ করলেন।

* * *

পক্ষান্তরে খন্দকের যুদ্ধের সময় এই নুআইম ইবনে মাসউদই এমন এক বিস্ময়কর ভূমিকা পালন করেন যা রাতারাতি তাকে ইসলামের দুশমন থেকে ইসলামের একজন অগ্রসেনায় রূপান্তরিত করে দেয়।

তার দুর্দান্ত কূটনৈতিক কৌশল নতুন ইসলামী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সম্মিলিত দুশমনবাহিনীর আক্রমণ পরিকল্পনাকে একেবারে নস্যাত করে দেয়। তার বিস্ময়কর সেই ভূমিকার কারণে ইসলামের ইতিহাস আজও তাকে বিচক্ষণ কূটনৈতিক কৌশলের অনন্য নায়ক হিসাবে শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ের সঙ্গে স্মরণ করে।

আমোদ-প্রমোদেমত্ত নুআইম ইবনে মাসউদের আলোকিত জীবনের পথে পরিবর্তনের প্রেক্ষাপট জানতে হলে ফিরে তাকাতে হবে কিছুটা পেছনের দিকে।

আহযাব বা খন্দক যুদ্ধের অল্পক'দিন পূর্বে ইয়াসরিবের বনূ নাযীর গোত্রের ইহুদীরা ইসলামের বিরুদ্ধে তৎপর হয়ে উঠল। তাদের নেতারা সেই তৎপরতার অংশ হিসাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ও তার দীন ইসলামকে একেবারে নির্মূল করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে ঘুরে ঘুরে দল গঠন করতে থাকল। মক্কায় গিয়ে কুরাইশ নেতাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে তাদেরকে ইসলামের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত লড়াই করার জন্য উদ্বুদ্ধ করল। তাদের সঙ্গে এই চুক্তিতে আবদ্ধ হলো, কুরাইশবাহিনী মদীনায় পৌঁছার পর তারাও কুরাইশের সঙ্গে মিলে যুদ্ধে শরীক হবে। কুরাইশের মদীনায় পৌঁছার এবং তাদেরকে মিলিত হওয়ার জন্য দিন-তারিখ ও সময় ধার্য করে বলে দেওয়া হলো ধার্যকৃত দিন তারিখ ও সময়ের মধ্যে কোনোরকম হেরফের করা যাবে না।

কুরাইশদের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদন শেষে বনূ নাযীর নেতৃবৃন্দ চলে গেল নজদের 'গাতফান' গোত্রের কাছে। গাতফানের নেতৃবৃন্দকেও ইসলাম ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে প্ররোচনা দিয়ে নতুন ধর্ম ইসলামকে সমূলে ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য তাদের আহ্বান জানাল। চুপি চুপি তাদের কাছে কুরাইশের সঙ্গে সম্পাদিত গোপন চুক্তির সংবাদটিও জানিয়ে দিল। এরপর তারা গাতফান গোত্রের সঙ্গেও একই ধরনের আরেকটি চুক্তি করল যেমন করেছিল কুরাইশের সঙ্গে। কুরাইশের সঙ্গে ধার্যকৃত একই দিন-তারিখ ও সময় এদেরকেও জানিয়ে দেওয়া হলো।

* * *

চুক্তি অনুসারে যথা সময়ে কুরাইশের সকল মানুষ তাদের সরদার আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে মদীনার উদ্দেশ্যে বের হয়ে পড়ে। গাতফান গোত্রের

লোকজনও সকল প্রস্তুতি নিয়ে উয়াইনা ইবনে হিস্ন আল-গাতফানীর নেতৃত্বে বের হয়ে আসে। এই গাতফানী-বাহিনীর অগ্রভাগে ছিলেন আমাদের এই জীবনীর নায়ক নুআইম ইবনে মাসউদ...

কুরাইশী আর গাতফানী-বাহিনী মদীনার ওপর আক্রমণ করতে আসছে— এই সংবাদ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগেভাগেই জেনে গেলেন। তিনি সাহাবায়ে কেরামকে ডেকে পরিস্থিতির ব্যাখ্যা করে প্রত্যেকের মতামতের ভিত্তিতে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত নিলেন, মদীনার প্রবেশ পথে খন্দক (পরিখা) খনন করা হবে। যেন এই বিশাল অপ্রতিরোদ্ধ বাহিনীর মদীনায় প্রবেশ ঠেকিয়ে দেওয়া যায়। যেন এই যুদ্ধবাজ সম্মিলিত বাহিনী দীর্ঘ ও গভীর খন্দকের সামনে এসেই থমকে দাঁড়ায়।

* * *

মক্কা ও নজদ থেকে আসা বিশাল দুই বাহিনী মদীনার প্রবেশ দুয়ারের নিকটবর্তী হতেই বিশাল খন্দকের সামনে পড়ে থমকে দাঁড়ায়। অপরদিকে বনূ নাযীর গোত্রের ইহুদী নেতারা মদীনার ভেতরে বসবাসকারী ইহুদী গোত্র বনূ কুরাইযার নেতাদের কাছে ছুটে গেল। তাদের মক্কা ও নজদ থেকে আগত বাহিনী দুটোর সহযোগিতায় এগিয়ে আসতে এবং মুহাম্মাদের বিরুদ্ধে এই যুদ্ধে অংশ নিতে প্ররোচিত করতে থাকল।

বনূ কুরাইযার ইহুদী নেতারা তাদের প্রস্তাবের জবাবে বলল,

‘আপনারা যে প্রস্তাব দিয়েছেন, মনে মনে আমরা সেটাই পছন্দ করি এবং সেটাই করতে চাই। কিন্তু মনে চাইলেও আমরা সেটা করতে পারি না যে কারণে, সেটা হলো আমাদের সমঝোতা চুক্তি। আপনারা জানেন, আমাদের ও মুহাম্মাদের মাঝে এই মর্মে চুক্তি রয়েছে যে আমরা পরস্পরের শান্তিতে বিঘ্ন ঘটতে দেব না। পরস্পরের শত্রুকে সাহায্য করব না। মদীনাতে আমরা শান্তিতে ও নিরাপদে বসবাস করব।

আপনাদের জানা আছে যে আমাদের চুক্তির মেয়াদ এখনো শেষ হয়ে যায়নি। আমাদের আশঙ্কা হচ্ছে, আপনাদের কথামতো আমরা যদি চুক্তি ভঙ্গ করে আপনাদের এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করি, আর মুহাম্মাদ এই যুদ্ধে জয়ী হয়ে যায় তাহলে সে আমাদের এই গাদ্দারীর নির্মম ও নিষ্ঠুর প্রতিশোধ নেবে এবং মদীনা থেকে আমাদের চিরতরে উচ্ছেদ করে ছাড়বে।'

বনূ কুরাইযার এই স্পষ্ট জবাব শুনেও বনূ নাযীরের নেতৃবৃন্দ মোটেও দমল না। বরং এরপরও তারা উপুর্যপরি চুক্তি ভঙ্গ করার জন্য উসকানি দিতে থাকল। তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তি ভাঙ্গার বর্তমান ও ভবিষ্যত সুফলের কথা বলে তাদের বুঝাতে থাকে। তারা জোর নিশ্চয়তা দিয়ে বনূ কুরাইযার নেতাদের বিশাল দুটো বাহিনীর ব্যাপক প্রস্তুতিসহ মুহাম্মাদের বিরুদ্ধে সমাগত হওয়ার যুক্তি পেশ করে বুঝাতে সক্ষম হলো যে,

'এবারের যুদ্ধে মুহাম্মাদের নিশ্চিত পরাজয় ঘটবে। সুতরাং নির্ভয়ে আপনারা চুক্তির কথা ভুলে আমাদের সঙ্গে যুদ্ধে নেমে পড়ুন।'

অবশেষে বনূ কুরাইযার ইহুদীরা বনূ নাযীরের ইহুদীদের প্ররোচনার জালে ধরা দিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তি ভেঙে সম্মিলিত আক্রমণকারী বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে যোগদানের ঘোষণা দিল। মদীনার ভেতরকার ইহুদীদের এভাবে চুক্তি ভেঙে আক্রমণকারী বিশাল বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে যোগ দেওয়ার সংবাদ মুসলিমদের মাথায় বজ্রপাতের মতো আপতিত হলো।

* * *

সম্মিলিত আক্রমণকারী বাহিনী মদীনাকে অবরোধ করে সেখানের খাদ্যদ্রব্যসহ সকল প্রকার নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যসামগ্রী আনা-নেওয়ার ব্যবস্থা রুদ্ধ করে দেয়। এতে মুসলিমদের জীবন কঠিন থেকে কঠিনতর সঙ্কটে পড়ে যায়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বুঝতে পারলেন, মদীনা এখন বহুমুখী শত্রুর বেষ্টনিতে এবং সঙ্কটের জটিল জালে আটকা পড়ে গেছে।

মদীনার বাহির থেকে কুরাইশ আর গাতফান-বাহিনী মুসলিমদের মুখোমুখি ছাউনি গেড়ে বসে আছে আর ভেতর থেকে বনূ কুরাইযার ইহুদীরা পেছন থেকে মুসলিমদের ওপর আক্রমণ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে।

মুসলিমদের এই সঙ্কটজনক অবস্থা দেখে তাদের সঙ্গে মিশে থাকা তাদের চরম শত্রু মুনাফিকরা সুযোগ পেয়ে এই বলে ব্যঙ্গ করতে লাগল যে,

'মুহাম্মাদ আমাদের কত স্বপ্ন দেখিয়েছিল, রোম ও পারস্যসাম্রাজ্যের ধনভাণ্ডার নাকি আমাদের হাতে চলে আসবে। ধন-ঐশ্বর্য, শান-শওকত, নিরাপত্তা সবই নাকি আমাদের হস্তগত হবে। অন্য বিষয়ের কথা নাইবা বললাম, এখন সারাবেলা আমাদের এতটাই আতঙ্কের ভেতরে কাটছে যে নির্ভয়ে আমরা হাগু-মুতুর জন্যও বের হতে পারছি না।'

এরপর মুনাফিকরা দলে দলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এই অজুহাত দেখিয়ে ছুটি নিয়ে পালাতে লাগল :

'যুদ্ধ বেধে গেলে মদীনায় আমাদের বাড়ি-ঘর, স্ত্রী, সন্তানদের কে দেখবে? বনূ কুরাইযা চুক্তি ভঙ্গ করার কারণে আমরা পরিবার-পরিজনের ব্যাপারে শঙ্কামুক্ত থাকতে পারছি না। এখানে পড়ে থাকা আমাদের আর সম্ভব হচ্ছে না।'

শেষ পর্যন্ত দেখা গেল, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে মাত্র কয়েকশো খাঁটি মুমিন যোদ্ধা রয়ে গেলেন।

প্রায় বিশদিন স্থায়ী লাগাতার অবরোধের এক রাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন প্রভুর সমীপে সমর্পিত হলেন। দিশাহারা,

ব্যাকুল হৃদয়ে তাঁর কাছে মিনতি জানিয়ে একটিমাত্র কথা বারবার করে দুআয় পেশ করতে থাকেন :

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَنْشِدُكَ عَهْدَكَ وَوَعْدَكَ – اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَنْشِدُكَ عَهْدَكَ وَوَعْدَكَ

'হে আল্লাহ! তোমার সেই সাহায্য পাঠাও, যার ওয়াদা ও প্রতিশ্রুতি তুমি দিয়েছ। হে আল্লাহ! তোমার সেই সাহায্যের প্রার্থনা জানাচ্ছি, যার ওয়াদা ও প্রতিশ্রুতি তুমি দিয়েছিলে।'

* * *

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যাকুল দুআর সেই রাতে নুআইম ইবনে মাসউদ যথারীতি বিছানায় গেলেন ঘুমানোর উদ্দেশ্যে। কিন্তু আজ তিনি অস্থির হয়ে বিছানায় শুধু এপাশ ওপাশ করছেন। চোখের পাতা তিনি মেলাতেই পারছেন না, যেন পেরেক মেরে চোখের পাতা দুটো আটকে রাখা হয়েছে। কিছুতেই তিনি ঘুমাতে পারলেন না। ঘুমহীন চোখদুটোকে তিনি ছেড়ে দিলেন উপরের ঐ আকাশের পানে। ভাসমান অসংখ্য তারকার পেছনে মেঘমুক্ত আকাশের গায়ে বিচরণ করতে থাকল তার দৃষ্টি। তার মনটা আজ ভারি বিষণ্ন। তিনি আজ ভীষণ চিন্তিত। তার বিবেক আজ তাকে বারবার তিরস্কার করে বলছে,

'এটা তোমার কেমন মূর্খতা নুআইম! সেই দূর নজদ থেকে এত পথ পাড়ি দিয়ে তুমি এই মহান মানুষটি ও তাঁর অনুসারীদের বিরুদ্ধে কিসের জন্য যুদ্ধ করতে এসেছ? আছে কি তোমার মহৎ কোনো উদ্দেশ্য?

তোমার এই যুদ্ধ কি কোনো হারানো অধিকার পুনরুদ্ধারের? নাকি কোনো ইজ্জত-সম্ভ্রম লুণ্ঠনের বিরুদ্ধে প্রতিশোধের?

ধিক্কার জানাই তোমার প্রতি হে নুআইম! এই মহান নবীর বিরুদ্ধে তোমার যুদ্ধ করতে আসা একেবারেই অকারণ, অযৌক্তিক ও অন্যায়।

হে নুআইম! তোমার মতো একজন বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ ব্যক্তির পক্ষে কি এরকম অযৌক্তিক ও অন্যায় যুদ্ধে জড়ানো শোভা পায়? অকারণ যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে কাউকে হত্যা করা অথবা নিহত হওয়া কি তোমার উচিৎ?

ছি: নুআইম, ছি:!! একজন নিরপরাধ ও সদাচারি মানুষ যিনি নিজের অনুসারীদের সর্বদা ন্যায়-ইনসাফ, দয়া-অনুগ্রহ এবং আত্মীয়-স্বজনের উপকার করার নির্দেশ দিয়ে থাকেন, তাঁর বিরুদ্ধে তরবারি ধরতে কে তোমাকে বাধ্য করল?

কে তোমাকে প্ররোচিত করল তোমার বর্শাকে তাঁর সঙ্গী-সাথীদের রক্তে রঞ্জিত করতে, যারা তার আনিত সত্য ও হিদায়াতের অনুসরণ করে গড়ে তুলেছেন নিজেদের সোনার জীবন?'

নুআইম ইবনে মাসউদ ও তার বিবেকের এই বিতর্ক এক সময় শেষ হলো। তবে তিনি এরই মধ্যে একটি কঠিন সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন। সঙ্গে সঙ্গেই সেটা বাস্তবায়নের জন্য উঠে পড়লেন।

* * *

গভীর রাত। চারদিকে সুনসান নীরবতা। নুআইম ইবনে মাসউদ সতর্কতার সঙ্গে সেনাছাউনি থেকে বেরিয়ে পড়লেন। সকলের চোখ ফাঁকি দিয়ে দ্রূতগতিতে পৌঁছে গেলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞাসা করলেন,

'তুমি কি নুআইম ইবনে মাসউদ?'

তিনি উত্তর দিলেন,
'হাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ!'

'যুদ্ধাবস্থায়, একা, এত রাতে কী উদ্দেশ্যে এসেছ?'

নুআইম ইবনে মাসউদ ব্যাকুল কণ্ঠে বললেন,

'ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই অসময়ে একাকী আপনার কাছে ছুটে এসেছি শুধুমাত্র আপনাকে এটা জানানোর জন্য,

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُه وَرَسُوْلُه

ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি কুফর ও শিরকের অন্ধকার পথ ছেড়ে ইসলামের আলোর মিছিলে শামিল হয়ে গেলাম। আমি একমাত্র মাবুদ হিসাবে আল্লাহকে মেনে নিলাম এবং আল্লাহর প্রেরিত সত্য রাসূল হিসাবে আপনাকে স্বীকার করলাম।'

এরপর তিনি নিবেদন করলেন,

'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার ইসলাম গ্রহণের কথা আর কেউই জানে না। এই অবস্থায় যদি আমার দ্বারা ইসলামের কোনো খেদমত নেওয়া সম্ভব হয় তাহলে আমাকে নির্দেশ করুন।'

একথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

إِنَّمَا أَنْتَ فِيْنَا رَجُلٌ وَاحِدٌ .. فَاذْهَبْ إِلى قَوْمِكَ وَخَذِّلْ عَنَّا إِنِ اسْتَطَعْتَ فَإِنَّ الْحَرْبَ خُدْعَةٌ.

'আমাদের জন্য কিছু করতে পারবে, মুমিনদের মধ্যে এমন মানুষ এই মুহূর্তে শুধুমাত্র তুমিই। তোমার মুমিন পরিচয় অজ্ঞাত থাকার কারণে একমাত্র তুমিই পারবে শত্রুবাহিনীর সবখানে নির্ভয়ে প্রবেশ করতে। অতএব, তুমি তোমার কওমসহ শত্রুদের মাঝে কৌশলে ফাটল ধরিয়ে দাও। বুদ্ধি আর চাতুর্য দিয়ে শত্রুকে ঘায়েল করতে পারাই হলো আসল যুদ্ধ।'

'আপনার আদেশ শিরোধার্য ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইনশাআল্লাহ, শিগগিরই আমি এমন কৌশল খাটাব, যাতে আপনি খুশি হয়ে যাবেন।'

* * *

নুআইম ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে সাক্ষাৎ শেষে ইসলামের বিশ্বাস বুকে নিয়ে আর রাসূলের নির্দেশ মাথায় নিয়ে তৎক্ষণাৎ চলে গেলেন বনূ কুরাইযা গোত্রে তার পুরাতন ইহুদী বন্ধুদের কাছে। তিনি তাদের বললেন,

'হে আমার কুরাইযার বন্ধুরা!

তোমাদের জন্য আমার খাঁটি ভালোবাসা আর আন্তরিক হিতাকাঙ্ক্ষার কথা তোমাদের অজানা নয়।'

তারা সবাই একই সুরে বলল,

'একেবারে যথার্থই বলেছ তুমি। কারণ, আমাদের প্রতি তোমার আন্তরিকতা ও ভালোবাসার ব্যাপারে কখনো কোনো প্রশ্ন ওঠেনি।'

তাদের মনোভাব সম্পর্কে আশ্বস্ত হয়ে বললেন,

'এবারের এই যুদ্ধে কুরাইশ আর গাতফানের স্বার্থ আর তোমাদের স্বার্থ কিন্তু এক রকম নয়।'

তারা কৌতূহলী হয়ে জানতে চাইল,

'কীভাবে সেটা? একটু ব্যাখ্যা করো।'

নুআইম রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন,

'এই মদীনা শহর হলো তোমাদের নিজেদের বাসস্থান। এখানেই রয়েছে তোমাদের বাড়ি-ঘর, ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি, স্ত্রী-পরিজন। অতএব, তোমাদের পক্ষে সম্ভব নয় যে নিজেদের এই শহর আর এখানের সবকিছু ফেলে অন্য কোথাও চলে যাবে।

পক্ষান্তরে কুরাইশ আর গাতফানের বিষয় একেবারেই আলাদা। এই মদীনা শহরে তাদের কিছুই নেই। ঘর-বাড়ি, ব্যবসা-বাণিজ্য, ধন-সম্পদ, স্ত্রী-সন্তান সবকিছুই রয়েছে তাদের অন্যখানে, অন্য শহরে। এই মদীনা শহরে তারা এসেছে মুহাম্মাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে। তোমাদের তারা নিজেদের পাশে পেতে চায়। মুহাম্মাদের সঙ্গে তোমাদের সম্পাদিত চুক্তি

ভেঙে তাদের সঙ্গে তাদের যুদ্ধে তোমাদের অংশগ্রহণ তারা কামনা করেছে। তোমরাও তাদের সেই আহ্বানে ইতিমধ্যে সাড়া দিয়েছ।

তোমরা ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করে দ্যাখো, এই যুদ্ধে যদি তারা মুহাম্মাদকে পরাজিত করতে পারে তাহলে তো ভালো। ঝামেলা শেষ। কিন্তু যদি তারা তাকে পরাজিত করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে তারা পালিয়ে চলে যাবে আপন আপন শহরে কিন্তু তোমাদের পড়ে থাকতে হবে এখানেই। এই মদীনা শহরেই। তখন তোমাদের কি হবে? চুক্তি ভেঙে শত্রুর সঙ্গে হাত মেলানো, গাদ্দারী করে যুদ্ধ করা, মুহাম্মাদ যখন এসবের প্রতিশোধ নেবে তখন তোমাদের কি উপায় হবে? মুহাম্মাদকে ঠেকানোর কোনো শক্তি কি একলা তোমাদের আছে?'

তারা সকলে চমকে উঠে বলল,

'একেবারে খাঁটি কথা বলেছ। কিন্তু এই ভুল তো আমরা করেই ফেলেছি, এখন আমাদের করণীয় কী? সে ব্যাপারে তোমার আন্তরিক পরামর্শ বলো।'

তিনি বললেন,

'আমার পরামর্শ এই যে কুরাইশ ও গাতফানের কাছে তোমাদের একটা শর্ত দেওয়া উচিত সেটা পূরণ না করলে এই যুদ্ধে তোমাদের অংশ নেওয়া উচিত হবে না। তোমরা দাবি করবে, 'কুরাইশ ও গাতফানের বেশ কিছু নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে আমাদের কাছে জামানত রাখতে হবে।' এতে তোমাদের লাভ এই যে যুদ্ধে তাদের অবস্থা খারাপ হলেই তারা পালিয়ে যেতে পারবে না। ঐ লোকগুলোর কারণেই বাধ্য হয়ে সকলেই মরণপণ করে যুদ্ধ করতে থাকবে। হয়তো জয় নয়তো তোমাদের ও তাদের শেষ ব্যক্তি পর্যন্ত নিঃশেষে হবে ক্ষয়।'

তারা ভীষণ খুশি হয়ে বলল,

'দারুন বুদ্ধি তোমার! আমরা এটাই করব।'

এরপর নুআইম ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু তাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে চলে গেলেন কুরাইশ নেতা আবু সুফিয়ানের কাছে। দেখলেন কুরাইশের নেতৃস্থানীয় সকলেই সেখানে উপস্থিত। সুতরাং বিলম্ব না করে তিনি বললেন,

'হে আমার কুরাইশী বন্ধুরা! তোমাদের সঙ্গে আমার কি পরিমাণ আন্তরিক বন্ধুত্ব আর মুহাম্মাদের সঙ্গে আমার কতটা আন্তরিক শত্রুতা, সে কথা তোমাদের ভালোভাবেই জানা আছে। আমি একটি ভয়ংকর ষড়যন্ত্রের খবর জানতে পেরেছি। তোমাদের ভালোবাসি বলেই বিপদজনক সংবাদটি গোপন রাখতে পারছি না। আমি তোমাদের সংবাদটি জানাতে চাই যদি তোমরা ছোট্ট শর্ত পূরণ করো।'

তারা জিজ্ঞাসা করল, 'কী শর্ত?'

তিনি বললেন,

'বিষয়টি গোপন রাখতে হবে আর সূত্র হিসাবে আমার নাম ব্যবহার করা যাবে না।' তারা সবাই রাজি হলো তার শর্তে।

নুআইম রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন,

'আমি জানতে পেরেছি, বনূ কুরাইযার লোকজন তোমাদের পীড়াপীড়িতে মুহাম্মাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ নেওয়ার ঘোষণা দিলেও এখন তারা মুহাম্মাদের কাছে লোক পাঠিয়ে জানিয়েছে যে তারা নিজেদের ভুলের জন্য ভীষণ অনুতপ্ত। তারা আবারও চুক্তিভুক্ত হতে চায়। তারা মুহাম্মাদের আস্থা অর্জনের জন্য একথাও বলে পাঠিয়েছে যে 'আপনি চাইলে আমাদের আন্তরিক অনুতাপের নিদর্শন স্বরূপ আপনার দুশমন কুরাইশ ও গাতফানের বেশ কিছু নেতাকে আপনার হাতে তুলে দেব। প্রথমে আপনি তাদের শিরচ্ছেদ করবেন। তারপরে আমরা মিলেমিশে শত্রুবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলে সহজেই তাদের পরাজিত করা সহজ হবে।'

মুহাম্মাদ তাদের এই প্রস্তাব মেনে নিয়েছে।

‘অতএব, ঐ ইহুদীর বাচ্চারা যদি তোমাদের কাছে জামানত চায় তাহলে খবরদার! জামানত হিসাবে তোমরা তাদের কাছে কাউকে পাঠাবে না।’

আবু সুফিয়ান উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে বলল,

‘তুমি এই গোপন ষড়যন্ত্রের খবর জানিয়ে কতই না উত্তম বন্ধুত্বের প্রমাণ দিলে! অসংখ্য ধন্যবাদ তোমাকে হে নুআইম।’

এরপর তিনি আবু সুফিয়ানসহ কুরাইশী নেতৃবৃন্দের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ফিরে এলেন নিজ কওম গাতফানের কাছে। গাতফানের নেতাদের কাছেও একই বিষয়ে আলোচনা করলেন যা আবু সুফিয়ানের কাছে করেছিলেন এবং আবু সুফিয়ানকে যে যে ব্যাপারে সাবধান করেছিলেন এদেরকেও একই ব্যাপারে সাবধান করলেন।

* * *

আবু সুফিয়ান বনূ কুরাইযার ব্যাপারে শোনা কথাটা যাচাই করার উদ্দেশ্যে নিজের ছেলেকে তাদের কাছে পাঠাল। ছেলে বনূ কুরাইযার নেতাদের গিয়ে বলল,

‘আমার পিতা আপনাদের সালাম জানিয়ে বলেছেন, মুহাম্মাদ ও তাঁর বাহিনীর বিরুদ্ধে অবরোধ যথেষ্ট দীর্ঘ হওয়ায় এখন আমরা নিজেরাই ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। সেজন্য অবরোধের সমাপ্তি ঘটিয়ে আগামীকালই আমরা আমাদের ও আপনাদের বাহিনী নিয়ে মুহাম্মাদের বিরুদ্ধে যৌথ আক্রমণের সূচনা করতে চাই।’

বনূ কুরাইযার নেতৃবৃন্দ বলল,

‘আগামীকাল শনিবার, আমাদের ধর্মে পবিত্র দিন। এদিনে আমরা যুদ্ধে জড়াতে পারব না। তা ছাড়া আমরা চিন্তা করে দেখেছি যে এই যুদ্ধে আপনারা যদি বেকায়দায় পড়ে আমাদের একা ফেলে পালিয়ে যান তাহলে মুহাম্মাদ আমাদের সমূলে বিনাশ করে ছাড়বে। সেজন্যই

আমাদের সিদ্ধান্ত হলো, আপনাদের ও গাতফানের সত্তরজন নেতাকে আমাদের কাছে জামানত হিসাবে রাখতে হবে। নতুবা আমরা কিছুতেই আপনাদের সঙ্গে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করব না।'

আবু সুফিয়ানের পুত্র কুরাইশের ছাউনিতে ফিরে এসে যখন বনূ কুরাইযা গোত্রের বক্তব্য শোনাল, কুরাইশের নেতৃবৃন্দ রাগ ও ঘৃণায় একই সুরে বলে উঠল,

'ঐ বানর ও শুকরের সন্তানেরা লাঞ্ছিত হোক। তারা বড়ই জঘন্য শর্ত দিয়েছে। আল্লাহর কসম! নেতৃস্থানীয় লোকজন তো দূরের কথা তারা যদি জামানত হিসাবে একটি ছাগলছানাও চায়, সেটাও আমরা দেব না।'

* * *

অবরোধকারী কুরাইশ, গাতফান ও তাদের মিত্র বনূ কুরাইযার জোটে ব্যাপক ফাটল ধরাতে এবং তাদের পরস্পরের মাঝে বিভেদ ও বিরোধের আগুন জ্বালাতে নুআইম ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর কুটনৈতিক চাল পরিপূর্ণ সফল হলো। একই সঙ্গে সেই রাতে আল্লাহ তাআলা কুরাইশ ও তাদের মিত্রদের ওপর পাঠালেন এমন প্রচণ্ড প্রলয়ঙ্কারী ঘূর্ণি হাওয়া ও তুফান যা তাদের তাঁবুগুলোকে ছিঁড়ে একেবারে লণ্ডভণ্ড করে দিল। ডেগ-ডেগচি উল্টে দিল, আগুন নিভিয়ে ফেলল। তাদের চোখে-মুখে ধুলাবালির স্তর জমে গেল, তারা কিছু সময়ের জন্য প্রায় অন্ধ হয়ে গেল।

সেই ভয়াবহ রাতের অন্ধকারে কুরাইশের নেতৃত্বাধীন বাহিনী প্রাণ নিয়ে পালিয়ে গেল। কারণ, সে রাতে মদীনা ছেড়ে পালানো ছাড়া তারা আর কোনো উপায় খুঁজে পায়নি।

মুসলিমবাহিনী সকালে যখন দেখল, আল্লাহর দুশমন কুরাইশ ও মিত্রবাহিনী পালিয়ে গেছে, তখন তারা স্বতঃস্ফূর্ত আওয়াজে আল্লাহর প্রশংসা করে বলে উঠলেন,

‘সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেছেন। তাঁর বাহিনীকে বিজয়ের মর্যাদায় ভূষিত করেছেন। আর দুশমনদের সম্মিলিত বাহিনীকে চরমভাবে পরাজিত করেছেন।’

* * *

নুআইম ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর বুদ্ধিদীপ্ত কূটনৈতিক তৎপরতায় খন্দক যুদ্ধে ব্যাপক সফলতা লাভ করার পর থেকেই তিনি হয়ে উঠেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিশেষ আস্থা ও বিশ্বাসভাজন ব্যক্তি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে দিয়ে বহু কাজ করান এবং তিনিও রাসূলের অনেক দায়িত্বের বোঝা বহন করে নিজেকে সীমাহীন ভাগ্যবান মনে করেন। গাতফান গোত্রের ঝাণ্ডাবাহী নেতা হিসাবে তিনি বিভিন্ন ক্ষেত্রে রাসূলের সমর্থন ও সাহযোগিতা করতে থাকেন।

মক্কা বিজয়ের দিন। কুরাইশ নেতা আবু সুফিয়ান চারদিক থেকে অপ্রতিরোদ্ধ, অগণিত মুসলিমবাহিনীর মক্কায় প্রবেশ দূরে দাঁড়িয়ে দেখছিলেন। হঠাৎ তার দৃষ্টি পড়ল গাতফানের পতাকা হাতে এগিয়ে আসা একজন মানুষের ওপর। কিন্তু তাকে চেনা গেল না। আশপাশের লোকজনকে জিজ্ঞাসা করলেন,

‘গাতফানের ঝাণ্ডা হাতে এগিয়ে আসা লোকটি কে?’

তারা জবাব দিল,
‘লোকটি বর্তমানে গাতফানের প্রধান নেতা নুআইম ইবনে মাসউদ।’

তার নাম শুনতেই আবু সুফিয়ানের পুরাতন লজ্জার কথা মনে পড়ে যাওয়ায় বলে উঠলেন,

‘আরে! এই লোকটা খন্দক-যুদ্ধের সময় আমাদের এমন ধোঁকা দিল! এমনভাবে আমাদের সর্বনাশ করল—যা ছিল আমাদের কল্পনারও অতীত!

আল্লাহর কসম! সে ছিল মুহাম্মাদের ভয়ঙ্কর ও ঘোরতর শত্রু!

অথচ আজ সেই লোকটাই মুহাম্মাদের ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে নিজ কওমের ঝাণ্ডা নিয়ে সদলবলে তাঁর সাহায্য করছে!

সেই লোকটাই মুহাম্মাদের নেতৃত্বে আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এসেছে!'

তথ্যসূত্র :

১. *আস-সীরাতুন্নববিয়্যাহ* লিবনি হিশাম, (সূচিপত্র দ্রষ্টব্য)।
২. *আল-ইসতীআব* বিহামিশিল ইসাবা, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৫৭।
৩. *উসদুল গাবাহ*, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৪৮ অথবা *আত্তারজামা*, ৫২৭৪।
৪. *আনসাবুল আশরাফ*, পৃষ্ঠা ৩৪০,৩৪৫।
৫. *আল-ইসাবা*, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৬৮, *আত্তারজামা*, ৮৭৭৯।
৬. *হায়াতুস সাহাবা*, ৪র্থ খণ্ডের সূচি দ্রষ্টব্য)।

খাব্বাব ইবনুল আরত

আল্লাহ তাআলা খাব্বাবের প্রতি রহম করুন। খুবই আগ্রহ নিয়ে তিনি ইসলাম কবুল করেছিলেন। স্বেচ্ছায় হিজরত করেছিলেন। একজন খাঁটি মুজাহিদ হিসাবে নির্মোহ জীবন কাটিয়েছেন।

-আলী ইবনে আবী তালেব

উম্মে আনমার আল-খুযাইয়্যাহ। এই মহিলা মক্কার 'দাস-বাজারে' গেল। তার ইচ্ছা অল্প বয়সের কোনো দাস ক্রয় করা। যাকে দিয়ে নিজের কাজ-কর্ম করানো যাবে এবং একই সঙ্গে আয়-রোজগারের উদ্দেশ্যেও যাকে দিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য করানো যাবে। বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে যাদের বাজারে তোলা হয়েছে, তাদের দিকে গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে তাকিয়ে অনেক চিন্তা-ভাবনার পর উম্মে আনমার অপ্রাপ্ত বয়স্ক একটি বালকের সামনে দাঁড়িয়ে গেল। দেখল ছেলেটির শরীর স্বাস্থ্য বেশ ভালো। সবচেয়ে বেশি ভালো লাগল ছেলেটির চোখে-মুখে ফুটে ওঠা বুদ্ধির ছাপ। উম্মে আনমার মূল্য পরিশোধ করে এই বালকটিকেই সঙ্গে নিয়ে বাড়ির পথে রওনা করল। পথে ছেলেটিকে জিজ্ঞাসা করল,

'তোমার নাম কী বালক?

'খাব্বাব। আমার নাম খাব্বাব।'

‘তোমার পিতার নাম কী?’

‘আল-আরত।’

‘তোমার বাড়ি কোথায়?’

‘নজদে।’

‘তারমানে তুমি আরব?’

‘হ্যাঁ, আরবের তামীম গোত্রের।’

মহিলা অবাক হয়ে প্রশ্ন করল,

‘মক্কার দাস-বিক্রেতাদের হাতে পড়লে কীভাবে?’

খাব্বাব উত্তরে বলল,

‘আরবের কোনো দস্যুগোত্র আমাদের এলাকায় আক্রমণ করেছিল। তারা আমাদের গবাদি পশুসহ যেখানে যা পেল সব নিয়ে গেল। নারীদের বন্দী করল আর শিশু বাচ্চাদেরও ধরে নিয়ে গেল। ছোট ছোট যেসব বাচ্চাকে ধরে এনেছিল আমি ছিলাম তাদেরই একজন। এরপর হাত বদল হতে হতে মক্কার ব্যবসায়ীদের কাছে। সবশেষে এখন আপনার হাতে।’

* * *

উম্মে আনমার তার বালক দাস খাব্বাবকে নিয়ে মক্কার জনৈক কর্মকারের হাতে তুলে দিয়ে বলল, ‘এই বালকটিকে উত্তমরূপে তরবারি তৈরি করা শিখিয়ে দিন।’

বালক খাব্বাব খুব অল্পদিনের মধ্যে তরবারি তৈরির কাজটি খুবই দক্ষতার সঙ্গে শিখে ফেলল। অল্পদিনেই হয়ে গেল তরবারি তৈরির দক্ষ কারিগর।

খাব্বাবের আরও কিছুটা বয়স, শক্তি ও সামর্থ্য বৃদ্ধি পেলে উম্মে আনমার তার জন্য একটি দোকান ভাড়া করল। তরবারি তৈরির জন্য

প্রয়োজনীয় আসবাব ও যন্ত্রপাতি কিনে দেওয়ার পর খাব্বাব তরবারি তৈরি করে সেই দোকানে বিক্রি করতে থাকল।

* * *

অল্প সময়ের মধ্যেই মক্কায় খাব্বাবের সুনাম ও সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়লে লোকেরা দলে দলে তার দোকান থেকে তরবারি কিনতে লাগল। কারণ, একদিকে তার তৈরি তরবারির গুণ ও মান হতো উন্নত। আবার দোকানদার হিসাবে তার আচার-ব্যবহার ও সততা, আমানতদারীর বিষয়গুলোও ছিল যথেষ্ট পরিমাণে আকর্ষণীয়।

* * *

বয়সের হিসাবে তরুণ হলেও জ্ঞান, বুদ্ধি ও বিচক্ষণতায় খাব্বাব ছিল প্রবীণদের মতোই চিন্তা-ভাবনায় বেশ পরিপক্ক।

কাজ-কর্ম শেষ করে নিরিবিলি একদণ্ড বসলেই খাব্বাব এই পা থেকে মাথা পর্যন্ত বিশৃঙ্খলা আর অশান্তিতে নিমজ্জিত জাহেলী সমাজের কথা ভাবতেন।

লক্ষ্যহীন, নীতি-আদর্শ বিবর্জিত, ঘোর অন্ধকার আর চরম অজ্ঞতায় নিমজ্জিত চলমান আরবদের জীবনধারা নিয়ে তিনি ভীষণভাবে শঙ্কিত। যেই অদ্ভুৎ জীবনধারার এক চরম নিপীড়নের অসহায় শিকার তিনি নিজে। এই অবস্থা থেকে আরব জাতির মুক্তি কীভাবে হবে? তিনি মুক্তি আর পরিত্রাণের কথা ভাবতেন। তিনি মনে করতেন এই আঁধার রাতের অবসান হতেই হবে। কিন্তু কবে এই সমাজ ও জীবনের আঁধার দূর হবে? কবে আসবে সেই প্রত্যাশিত ও প্রতিক্ষিত সুপ্রভাত? তার জীবনকালেই কি উদ্ভাসিত হবে সেই সুন্দর প্রভাত? অবসরে, নিরিবিলিতে এই ভাবনাগুলোই ছিল তার একমাত্র সঙ্গী। তিনি চাইতেন তার জীবন যেন

দীর্ঘ হয় আর তিনি যেন দেখে যেতে পারেন সেই সুন্দর সুপ্রভাতের আলোকোজ্জ্বল উপস্থিতি।

* * *

খাব্বাবের অপেক্ষার প্রহর বেশি দীর্ঘ হলো না। তিনি শুনতে পেলেন হাশেমী এক যুবকের কথা। যার নাম মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ। তিনি জানতে পারলেন মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ এক আলোকিত সুপ্রভাতের দিকে আহ্বান জানাচ্ছেন।

খাব্বাব ছুটে চলে গেলেন তাঁর কাছে। শুনলেন তাঁর কথা মন দিয়ে। কথা শুনতে শুনতেই তার হৃদয় আলোকিত হয়ে উঠল। আসমানী নূরের উজ্জ্বলতা তাকে পরিপূর্ণরূপেই আচ্ছন্ন করে দিল।

দূরে থাকা আর সম্ভব হলো না তার। স্বেচ্ছায় তাঁর দিকে বাড়িয়ে দিলেন নিজের হাত। আর পড়ে নিলেন,

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُه وَرَسُوْلُه

'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ তাআলা ছাড়া ইবাদতের উপযুক্ত মা'বুদ আর কেউ নেই আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তাআলার বান্দা ও রাসূল।'

নতুন বিশ্বাস আর চেতনায় উজ্জীবিত হলো ক্রীতদাস খাব্বাবের জীবন। ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে তার স্থান নির্ধারিত হলো ষষ্ঠ। বলা হয়, একটা সময় পর্যন্ত খাব্বাব ছিলেন ইসলামের ছয়ভাগের এক ভাগ।

* * *

খাব্বাব রাযিয়াল্লাহু আনহু নিজের ইসলাম গ্রহণের সংবাদ কারও কাছেই লুকালেন না। ফলে যা হওয়ার তাই হলো। খুব শিগগিরই খবরটি পৌঁছে গেল উম্মে আনমারের কানে। সে রাগে ক্ষোভে ফেটে পড়তে

লাগল। সে তার ভাই 'সিবা ইবনে আবদুল উয্যা'কে সঙ্গে নিল। খুযাআ গোত্রের আরও কিছু অতিউৎসাহী যুবকও তার সঙ্গী হলো। তারা সকলে মিলে খাব্বাবের কাছে গেল। দেখল তিনি নিজের কাজে মগ্ন। সিবা এগিয়ে গেল তার কাছে। বলল,

'তোমার সম্পর্কে একটি সংবাদ শুনেছি, যা বিশ্বাস করতে পারছি না।'

'কী সংবাদ?' খাব্বাব রাযিয়াল্লাহু আনহু জিজ্ঞাসা করলেন।

সিবা বলল,
'তুমি নাকি ধর্মত্যাগী হয়ে এক হাশেমী যুবকের অনুসারী হয়েছ?'

খাব্বাব রাযিয়াল্লাহু আনহু ধীর ও শান্ত আওয়াজে বললেন,
'আমি মোটেও ধর্মত্যাগী হইনি। আমি শুধু ঈমান এনেছি এক ও অদ্বিতীয় লা-শরীক আল্লাহ তাআলার প্রতি, তোমাদের নিষ্প্রাণ দেব-দেবীদের দূরে ছুঁড়ে ফেলেছি আর সাক্ষ্য দিয়েছি যে হাশেমী সেই যুবক মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াল্লাম আল্লাহর বান্দা ও রাসূল।'

এই কথাগুলো সিবা ও তার সঙ্গী খুযাঈ যুবকদের কানে যাওয়ামাত্রই তারা সকলে মিলে ঝাঁপিয়ে পড়ল খাব্বাবের ওপর। সকলে মিলে তাকে কিল, ঘুসি, লাথি মারল। হাতের কাছে যে যা পেল হাতুড়ি ও লোহার টুকরা সব তার গায়ে ছুঁড়ে মারল।

একদল নিষ্ঠুর মানুষের নির্দয় আঘাতের পর আঘাত খেয়ে খাব্বাব রাযিয়াল্লাহু আনহু এক সময় রক্তাক্ত দেহে বেহুঁশ হয়ে পড়ে গেলেন মাটিতে।

* * *

শুকনো খড়ের গাদায় আগুন যেমন মুহূর্তের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে, সেভাবেই খাব্বাব ও তার মালিকের মাঝে ঘটে যাওয়া ঘটনার সংবাদ অতিদ্রুত মক্কার সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল।

খাব্বাব রাযিয়াল্লাহু আনহুর দুঃসাহসে সকলে স্তম্ভিত হয়ে গেল। কারণ, ইতিপূর্বে তারা আর কারোর ব্যাপারেই এমন শোনেনি যে মুহাম্মাদের অনুসারী হওয়ার পর এভাবে প্রকাশ্যে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়ে নিজের ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দিয়েছে।

কুরাইশের প্রবীণ নেতৃবৃন্দ খাব্বাবের এই ঘটনায় চমকে উঠল। কারণ, তারা কল্পনাও করতে পারেনি যে উম্মে আনমারের একজন সামান্য ক্রীতদাস কর্মকার—মক্কাতে যার কোনো বংশ ও গোত্র নেই, যাকে সাহায্য করার ও আশ্রয় দেওয়ার মতো কেউ নেই, এমন অসহায় ও তুচ্ছ কর্মকার হয়ে নিজের মালিকের দেব-দেবীদের প্রকাশ্যে গালি দেবে, এমন দুঃসাহস দেখিয়ে তার পূর্ব-পুরুষদের ধর্মকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করবে, এতবড় স্পর্ধা তার কোথা থেকে এল। এটা কি করে সম্ভব?

এই ঘটনার বিশ্লেষণে তারা নিশ্চিত হয়ে গেল, এতবড় স্পর্ধা এবং দুঃসাহসী ঘটনার এটা শেষ নয় বরং এই ঘটনাটা সূচনামাত্র।

কুরাইশ নেতৃবৃন্দের আশঙ্কা ভুল ছিল না। কারণ, খাব্বাব ইবনে আরতের সাহসিকতা তার অনেক সঙ্গী মুসলিমকেই নিজেদের ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করতে উদ্বুদ্ধ করল। তারা একে একে সকলেই উচ্চকণ্ঠে হক ও সত্যের কালেমা ঘোষণা করতে লাগলেন।

* * *

উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ে কুরাইশ নেতৃবৃন্দ কাবা ঘরের পাশে পরামর্শের জন্য সমবেত হলো। শীর্ষ নেতৃবৃন্দ আবু সুফিয়ান, ওয়ালীদ ইবনে মুগীরা ও আবু জাহালের উপস্থিতিতে মুহাম্মাদের অব্যাহত তৎপরতা, প্রতিদিনই তার অনুসারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া ইত্যাদি বিষয়গুলো নিয়ে তারা উৎকণ্ঠার সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা করে।

তারা সংকল্প করল যে 'আঙ্কুরেই এই চারা উপড়ে ফেলতে হবে।' তারা সর্বসম্মতিক্রমে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল, এখন থেকে প্রতিটা

গোত্রের দায়িত্ব হবে নিজেদের মধ্যে মুহাম্মাদের অনুসারীদের নিজেরাই শায়েস্তা করবে এবং তাদের এত কঠিন শাস্তি দেবে যে, তাতে হয় তারা নতুন ধর্ম ছাড়বে আর না হয় মরবে।

* * *

সিবা ইবনে আবদুল উয্যা এবং তার জুযাআ কওমের ওপর আরোপিত হলো শুধুমাত্র খাব্বাবকে শায়েস্তা করার দায়িত্ব।

দায়িত্ব পেয়ে তারা মহাধুমধামের সঙ্গে নেমে পড়ল দায়িত্ব পালনে।

ঠিক দুপুর বেলা। সূর্য যখন ঠিক মাথার ওপর এসে পূর্ণ তেজে গনগনে আগুনের মতো উত্তাপ ছড়িয়ে মরুর সীমাহীন বালুকণাকে বানিয়ে দেয় জ্বলন্ত অঙ্গারের মতো উত্তপ্ত, সেই বালুর মধ্যে তারা খাব্বাবকে বের করে আনে। তার শরীর থেকে পোশাক খুলে ফেলে তাকে পরিয়ে দেয় লোহার বর্ম, তাঁকে ফেলে রাখে সেই উত্তপ্ত বালুর মধ্যে। ওপর থেকে গনগনে সূর্যের তাপ আর নিচ থেকে জ্বলন্ত বালুর তাপে লোহার বর্ম হয়ে ওঠে ফুটন্ত কড়াইয়ের মতো। এই নিষ্ঠুর, নির্দয় অত্যাচারের মধ্যে তৃষ্ণায় ছটফট করে খাব্বাব রাযিয়াল্লাহু আনহু যখন পানি পানি করে চিৎকার করেন, তখন তারা অট্টহাসি দিয়ে বলে,

'আপাতত তোমার জন্য পানি নিষিদ্ধ। তবে আমাদের প্রশ্নের যদি ভালো জবাব দিতে পারো তাহলে আমরা একটু বিবেচনা করব।'

'বলো দেখি মুহাম্মাদের ব্যাপারে তোমার মনোভাব এখন কেমন?'

খাব্বাব রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন,

'তিনি আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। তিনি আমাদের কুফর ও শিরকের অন্ধকার থেকে মুক্ত করে তাওহীদের আলোর পথে পরিচালনার উদ্দেশ্যে আমাদের কাছে নিয়ে এসেছেন হক ও হেদায়াতের দীন-ইসলাম।'

এই জবাব শুনে তারা উত্তপ্ত ভারী পাথর এনে খাব্বাব রাযিয়াল্লাহু আনহুর পিঠে চাপা দিয়ে রাখত। এতে তার পিঠের চর্বি গলে গলে দুই কাঁধ দিয়ে গাড়িয়ে গড়িয়ে পড়ত।

* * *

খাব্বাব রাযিয়াল্লাহু আনহুর মালিকা উম্মে আনমারও নিষ্ঠুরতায় ভাই সিবার চেয়ে কম ছিল না। সে একবার দেখতে পেল যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোকানের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় খাব্বাব রাযিয়াল্লাহু আনহুর সঙ্গে কথা বলছেন। ব্যাস, এটুকু দেখেই মহিলা হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে প্রতিশোধের আগুনে জ্বলতে থাকে। এরপর থেকে সে একদিন পরপর দোকানে আসা শুরু করে দিল। দোকানে এসেই মহিলা হাপর থেকে উত্তপ্ত লাল টকটকে লোহা তুলে এনে খাব্বাবের মাথার ওপর চেপে ধরে রাখত। এতে তিনি আল্লাহর কাছে এই নিষ্ঠুর নির্যাতনের জন্য মহিলা ও তার ভাইয়ের বিরুদ্ধে বদ-দুআ করতেন।

* * *

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সাহাবায়ে কেরামকে মদীনায় হিজরতের অনুমতি দিলেন তখন খাব্বাব রাযিয়াল্লাহু আনহু মদীনায় চলে যাওয়ার প্রস্তুতি নিয়ে রাখলেন। তবে তিনি মক্কা ছেড়ে মদীনায় রওনা হওয়ার আগেই আল্লাহ তাআলা উম্মে আনমারের পরিণতি তাকে দেখিয়ে দেন।

উম্মে আনমার এমন অসহ্য মাথার যন্ত্রণায় আক্রান্ত হয়ে পড়ে যেমন যন্ত্রণার কথা আর কখনোই শোনা যায়নি। সে তার অসহ্য যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে কুকুরের মতো চিৎকার করতে থাকত।

তার সন্তানরা চিকিৎসার উদ্দেশ্যে তাকে নানা স্থানে নিয়ে যায়। সকল চিকিৎসক বলে দেয় যে এই ব্যথার কোনো চিকিৎসা নেই। তবে এই রোগের জন্য একমাত্র ব্যবস্থা হলো, আগুনে উত্তপ্ত লোহা তার মাথায় ধরে রাখা।

অসহ্য মাথা ব্যথার যন্ত্রণা থেকে বাঁচার জন্য উম্মে আনমার উত্তপ্ত লৌহখণ্ডের দাগ নেওয়া শুরু করল। এই দাগ নেওয়ার যন্ত্রণা এতটাই তীব্র হতো যে তাতে আসল মাথা ব্যথার কথা ভুলে যেত।

* * *

খাব্বার রাযিয়াল্লাহু আনহু মক্কা ছেড়ে মদীনায় হিজরত করার পর আনসার ভাইদের যত্নে ও তাদের আতিথেয়তায় শান্তি ও স্বস্তির স্বাদ লাভ করলেন—যা থেকে তিনি বঞ্চিত ছিলেন দীর্ঘ সময় ধরে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছাকাছি থাকার সৌভাগ্য তার হৃদয়কে প্রশান্ত ও চক্ষুদয়কে শীতল করে দিল। তার সামনে ছিল না কোনো বাধা ও কোনো প্রতিবন্ধকতা।

তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে তাঁরই পতাকাতলে বদর ও ওহুদ যুদ্ধে শরীক হন। ওহুদের যুদ্ধে মহান আল্লাহ আরও একবার তার চোখকে ঠাণ্ডা করে দেন। উম্মে আনমারের সেই জালিম ভাই সিবা ইবনে আবদুল উয্যাকে খাব্বাব রাযিয়াল্লাহু নিজের চোখে আসাদুল্লাহ হামযা ইবনে আবদুল মুত্তালিব রাযিয়াল্লাহু আনহুর হাতে নিহত হয়ে মুখ থুবরে পড়ে থাকতে দেখেন।

আল্লাহর ইচ্ছায় তিনি দীর্ঘ জীবন লাভ করেছিলেন। খুলাফায়ে রাশেদার চারজান মহান খলীফার শাসনকালই তিনি নিজের চোখে দেখতে পেয়েছিলেন। তাঁদের প্রত্যেকের কাছেই তিনি লাভ করেন বিশেষ সম্মান ও সমাদর।

* * *

খাব্বাব রাযিয়াল্লাহু আনহু একবার উমর ফারুক রাযিয়াল্লাহু আনহুর শাসন আমলে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলেন। খলীফা তাঁকে সর্বোচ্চ সম্মান ও শ্রদ্ধার সঙ্গে ভেতরে নিয়ে উঁচু আসনে বসতে দিয়ে বললেন,

'এই আসনের জন্য আপনার চেয়ে বেশি উপযুক্ত এক বেলাল ছাড়া আর কেউ নয়।'

এরপর খলীফা তাকে অনুরোধ করলেন, 'আপনার জীবনে মুশরিকদের অত্যাচারের সবচেয়ে কঠিন চিত্র কি ছিল—সে সম্পর্কে আমাদের কিছু বলুন।'

তিনি এর জবাব দিতে লজ্জা বোধ করলেন। কিন্তু খলীফা বারবার অনুরোধ করায় তিনি মুখে কিছু না বলে কাপড় সরিয়ে পিঠ উন্মুক্ত করে দিলেন। তাঁর উন্মুক্ত পিঠের দিকে তাকিয়ে খলীফা আঁতকে উঠলেন। 'তিনি বললেন- এতগুলো ক্ষত কীভাবে হলো?'

খাব্বাব রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন,

'আমাকে শাস্তি দেওয়ার উদ্দেশ্যে মুশরিকরা জ্বালানি কাঠ জমা করে আগুন জ্বালাত। এরপর জ্বলন্ত কয়লা বিছিয়ে আমার জন্য তৈরি করা হতো আগুনের বিছানা। আমাকে বস্ত্রহীন করে হাত-পা বেঁধে সেই দগদগে জ্বলন্ত কয়লার বিছানায় শোওয়ানো হতো। আমার পিঠের গোশত খসে খসে পড়ত। নির্গত রক্ত ও চর্বিতে এক সময় জ্বলন্ত আগুন নিভে যেত।'

* * *

খাব্বাব রাযিয়াল্লাহু আনহু জীবনের সিংহভাগ অভাব আর কষ্টে পার করার পর জীবনের শেষ বেলায় এসে মালিক হয়ে যান অঢেল ধন-সম্পদের। তিনি এতবেশি সোনা-রূপার মালিক হয়ে যান যা ছিল তার কল্পনারও অতীত।

তবে তিনি এই অঢেল সম্পদ এমনভাবে আল্লাহর পথে বিলিয়েছেন যে সেটাও ছিল অকল্পনীয়।

তিনি দিরহাম ও দীনারগুলো বাড়ির এমন একটি স্থানে রেখে দিতেন যেটা অভাবী, গরিব ও মিসকিনদের জানা ছিল। অভাবী লোকেরা এসে নিজেদের প্রয়োজন ও ইচ্ছানুসারে সেখান থেকে নিয়ে নিত। যেন কাউকে চাইতে না হয়, অনুমতি চাওয়ার কষ্ট পোহাতে না হয় সেজন্যই তিনি করেছিলেন এমন অভাবনীয় ব্যবস্থা।

এত কিছুর পরও তিনি আশঙ্কা করতেন যে এই সব-সম্পদের জন্য তাকে জবাবদিহি করতে হবে এবং এর জন্য তাকে শাস্তির মুখোমুখি হতে হবে।

* * *

তার একদল বন্ধু বর্ণনা করেন,

'আমরা মৃত্যশয্যায় খাব্বাবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলে তিনি ঘরের একটি জায়গার দিকে ইশারা করে বললেন,

'ঐ জায়গায় আশি হাজার দিরহাম রেখে দিয়েছি। আল্লাহর কসম! আমি কখনোই ঐ জায়গায় তালা লাগাইনি এবং কখনো কাউকে নিতে বাধা দেইনি।'

একথাটুকু বলেই তিনি কান্না করতে থাকলেন।

তখন বন্ধুরা তাকে জিজ্ঞাসা করলেন,

'আপনি কিসের জন্য কাঁদছেন?'

তিনি বললেন,

'আমার সঙ্গীরা সকলেই চলে গেছেন এই দুনিয়া ছেড়ে। তারা এই পৃথিবীর কোনো কিছুই পাননি তাদের আমলের বিনিময় হিসাবে। অথচ আমি এখানে দীর্ঘদিন বেঁচে থাকলাম আর সেই সুবাদেই অঢেল সম্পদের মালিক হলাম। এগুলো যদি এজন্য হয় যে আমার আমলসমূহের

প্রতিদান এই পৃথিবীতেই দিয়ে দেওয়া হলো, তাহলে কান্না ছাড়া আমার আর কি করার আছে?'

* * *

খাব্বাব রাযিয়াল্লাহু আনহুর ইন্তেকাল হয়ে গেলে আমীরুল মুমিনীন আলী ইবনে আবী তালেব রাযিয়াল্লাহু আনহু তাঁর কবরের পাশে দাঁড়িয়ে বলেন,

'আল্লাহ তাআলা খাব্বাবের প্রতি রহম করুন। খুবই আগ্রহ নিয়ে তিনি ইসলাম কবুল করেছেন। স্বেচ্ছায় হিজরত করেছিলেন আর খাঁটি মুজাহিদ হিসাবে নির্মোহ জীবন কাটিয়েছেন।'

তথ্যসূত্র :

১. *আল-ইসাবা*, ১ম খণ্ড, ৪১৬ পৃষ্ঠা, *আত্তারজামা* ২২১০।
২. *উসদুল গাবাহ*, ২য় খণ্ড, ৯৮-১০০ পৃষ্ঠা।
৩. *আল-ইসতীআব*, ১ম খণ্ড, ৪২৩ পৃষ্ঠা।
৪. *তাহযীবুত তাহযীব*, ৩য় খণ্ড, ১৩৩ পৃষ্ঠা।
৫. *হুলইয়াতুল আউলিয়া*, ১ম খণ্ড, ১৪৩ পৃষ্ঠা।
৬. *সিফাতুস সফওয়া*, ১ম খণ্ড, ১৬৮ পৃষ্ঠা।
৭. *আল-জামউ বাইনা রিজালিস সহীহাইন*, ১২৪ পৃষ্ঠা।
৮. *আল-মাআরিফ* লিবনি কুতাইবা, ৩১৬ পৃষ্ঠা।
৯. *হায়াতুস সাহাবা*, ৪র্থ খণ্ডের সূচিপত্র দ্রষ্টব্য।
১০. *জামেউল উসূল*, ১০ম খণ্ড, ফাযায়েলে সাহাবা অধ্যায়।

রাবী ইবনে যিয়াদ আল্-হারেসী

আমি খলীফা নিযুক্ত হওয়ার পর রাবী ইবনে যিয়াদ যেভাবে আমাকে চরম সত্য ও বাস্তব কথা বলে উপদেশ দিয়েছে, সেভাবে আর কেউই উপদেশ দিতে পারেনি।

-উমর ইবনুল খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহু

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয় শহর মদীনার জনসাধারণ প্রথম খলীফা আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে হারানোর শোকে বেদনার অশ্রু এখনো মুছেই চলেছেন।

অপরদিকে নবনিযুক্ত দ্বিতীয় খলীফা উমর ফারুক রাযিয়াল্লাহু আনহুর হাতে সুখে-দুখে সর্বাবস্থায় অনুগত থাকার শপথ ও বাইয়াত গ্রহণের উদ্দেশ্যে এখানে প্রতিদিনই বিভিন্ন জনপদ থেকে প্রতিনিধি দলের আগমন লেগেই আছে।

প্রতিনিধিদল আগমনের ধারায় এক সকালে আমীরুল মুমিনীনের কাছে এল বাহরাইনের প্রতিনিধিদল অন্য একটি ছোট দলের সঙ্গে।

খলীফাতুল মুসলিমীন উমর ফারূক রাযিয়াল্লাহু আনহু এসব প্রতিনিধি দলের সদস্যদের বক্তব্য শুনতে খুবই আগ্রহী ছিলেন। কারণ, তিনি মনে

করতেন, তাদের বক্তব্য থেকে হয়তো কোনো ভালো উপদেশ পাওয়া যাবে অথবা কোনো উপকারী ভাবনার খোরাক। অথবা পাওয়া যাবে আল্লাহ, কুরআন ও মুসলিম-জনসাধারণের কল্যাণকর কিছু।

এজন্য তিনি উপস্থিত কয়েকজনকে ডাকলেন কথা বলার জন্য। তারা যা বললেন তা ছিল খুবই সাধারণ কথা। বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কিছু পাওয়া গেল না।

এ কারণে খলীফা অন্য একজনের দিকে তাকালেন। তাঁর মনে হলো এই মানুষটির কাছে বিশেষ কোনো কথা পাওয়া যেতে পারে। তিনি তাঁকে বললেন,

'তুমি কিছু বলো।'

তখন লোকটি 'বিসমিল্লাহ' ও 'আলহামদুলিল্লাহ'সহ ভূমিকা শেষ করে বললেন,

'হে মহান আমীরুল মুমিনীন!

এই উম্মতের শাসনকাজের গুরু দায়িত্ব আপনার ওপর অর্পিত হয়েছে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে এক কঠিন পরীক্ষা হিসাবে। সুতরাং এই বিরাট দায়িত্ব পালনে আপনাকে খুবই সাবধান হতে হবে। নিজের মন মতো নয়, আল্লাহর হুকুম মতো প্রজাপালন করুন। আল্লাহভীতিকে সর্বদা আঁকড়ে ধরে থাকুন। মনে রাখবেন, দূর ফুরাতের তীরেও যদি একটি ছাগলছানা খাদ্য অথবা নিরাপত্তার অভাবে মারা যায়, তাহলে কেয়ামতের ময়দানে এর জন্যও আপনাকে আল্লাহর কাছে জবাব দিতে হবে।'

লোকটির এই কঠিন বাস্তব ও চরম সত্য উচ্চারণ শুনে খলীফা চিৎকার করে কেঁদে উঠলেন। ডুকরে ডুকরে কান্না বিজরিত কণ্ঠে তিনি বললেন,

'আমি খলীফা নিযুক্ত হওয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত কেউ আমাকে এত কঠিন বাস্তব ও চরম সত্য উপদেশ দিতে পারেনি, যা পেরেছ তুমি।'

'তুমি কে যুবক?'

তিনি জবাব দিলেন,
'আমি রাবী ইবনে যিয়াদ আল-হারেসী।'

খলীফা বললেন,
'তার মানে কি তুমি মুহাজির ইবনে যিয়াদের ভাই?'

'জী, আমি তার ভাই।'

এই মজলিস শেষ হলে খলীফা উমর ফারুক রাযিয়াল্লাহু আনহু আবু মূসা আল-আশআরী রাযিয়াল্লাহু আনহুকে ডেকে বললেন,

'খোঁজখবর নিয়ে রাবী ইবনে যিয়াদের সম্পর্কে আমাকে বিস্তারিত জানাও। কারণ, তাঁর বক্তব্য থেকে তাকে যেমন বিচক্ষণ ও মুত্তাকী মনে হয়েছে, বাস্তবিক যদি সে তেমনই হয় তাহলে নিঃসন্দেহে সে একজন সুযোগ্য ও সৎকর্মশীল। এমন লোকই আমাদের প্রয়োজন। তাঁকে কোনো কাজে লাগাও।'

* * *

অল্প কয়েকদিন পরেই খলীফার নির্দেশে আবু মূসা আল-আশআরী রাযিয়াল্লাহু আনহু পারস্যসাম্রাজ্যের আহওয়াজ প্রদেশের 'মানাযির' শহর আক্রমণের উদ্দেশ্যে একটি বাহিনী প্রস্তুত করলেন। আর এই বাহিনীতেই অন্তর্ভুক্ত করে নিলেন রাবী ইবনে যিয়াদ ও তাঁর ভাই মুহাজির রাযিয়াল্লাহু আনহুমাকে।

* * *

আবু মূসা আল-আশআরী রাযিয়াল্লাহু আনহু তাঁর এই বাহিনীকে নিয়ে মানাযির শহর অবরোধ করলে বিশাল পারস্য-বাহিনীর সঙ্গে শুরু হয় এমনই রক্তক্ষয়ী ও ভয়াবহ যুদ্ধ, ইতিহাসে যার নজির দুষ্প্রাপ্য।

পারস্যের মুশরিকবাহিনী এই যুদ্ধে অকল্পনীয় বীরত্বের প্রদর্শন ঘটায়। তাদের প্রচণ্ড আক্রমণ আর দৃঢ়তার সামনে মুসলিমবাহিনীর শুধু প্রাণহানি ঘটতে থাকে।

'রমযান মাসের এই যুদ্ধে মুসলিমবাহিনীর সকলেই ছিলেন রোযাদার। এ কারণে তাদের শারীরিক দুর্বলতা হয়তো এই সীমাহীন প্রাণহানির কারণ।' রাবী ইবনে যিয়াদ মনে মনে মুসলিমবাহিনীর ব্যাপক প্রাণহানির এই কারণ চিহ্নিত করে সমাধানের উপায় ভাবছিলেন। কিন্তু তাঁর ভাই মুহাজির তখন ভাবছিলেন ভিন্ন কথা। তিনি সংকল্প করলেন, আমি জীবন দেব কিন্তু এত ব্যাপক প্রাণহানির প্রতিশোধ না নিয়ে ছাড়ব না। তিনি মৃত ব্যক্তির মতো নিজের শরীরে কর্পুর মেখে, কাফনের কাপড় পরে ভাই রাবীকে সংক্ষিপ্ত অসিয়ত করে নিজের তরবারি খাপমুক্ত করলেন...

এই দৃশ্য দেখে রাবী ইবনে যিয়াদ আল-হারেসী রাযিয়াল্লাহু আনহু সেনাপতি আবু মূসা আল্-আশআরী রাযিয়াল্লাহু আনহুর কাছে ছুটে গিয়ে বললেন,

'আমার ভাই মুহাজির জীবন-মরণপণ করে প্রতিশোধের সংকল্প করে শত্রুদের উদ্দেশ্যে বের হয়ে পড়েছেন। অথচ তিনি রোযাদার। মুসলিমবাহিনীর কেউই রোযা ছাড়তে রাজী নয়। অথচ একদিকে রোযার কারণে তারা শারীরিক ভাবে দুর্বল হচ্ছে আবার শত্রুদের প্রচণ্ড আক্রমণে তারা মনোবল ও সাহস হারাচ্ছে। সুতরাং আপনি এর সমাধান করুন।'

সেনাপতি আবু মূসা আল-আশআরী রাযিয়াল্লাহু আনহু বুঝতে পারলেন, রাবী ইবনে যিয়াদ একেবারে যথার্থ কারণ চিহ্নিত করেছেন। সুতরাং তিনি সঙ্গে সঙ্গেই মুসলিমসৈনিকদের মাঝে দাঁড়িয়ে উচ্চস্বরে জোরালো ভাষায় নির্দেশ দিয়ে বললেন,

'আমার মুসলিমসৈনিক ভাইয়েরা! আপনাদের আল্লাহর নামে শপথ করে নির্দেশ দিচ্ছি আপনারা প্রত্যেকেই হয় রোযা ভেঙে ফেলুন, না হয় যুদ্ধ থেকে বিরত থাকুন। সর্বপ্রথম আমি নিজেই আমার রোযা ভেঙে

ফেললাম। একথা বলে সঙ্গে সঙ্গে তিনি নিজের হাতে রাখা পানির পাত্র থেকে পান করলেন। যেন তাকে অনুসরণ করে সকল সৈনিক রোযা ভেঙে পানাহার শুরু করে দেয়।'

সেনাপতির নির্দেশ শোনার পর রাবীর ভাই মুহাজির এক ঢোক পানি খেয়ে বললেন,

'আল্লাহর কসম! আমি পিপাসার কারণে পানি পান করিনি, শুধুমাত্র সেনাপতির নির্দেশের মর্যাদা রক্ষা করেছি।'

এরপর আর এক মুহূর্ত অপেক্ষা করলেন না। খাপমুক্ত তরবারি নিয়ে তিনি শত্রুবাহিনীর সারি ভেদ করে একে একে কচুকাটা করতে করতে নির্ভয়ে, নিঃসঙ্কোচে ভেতরে ঢুকে পড়লেন। শত্রুদের ভেতরে হৈচৈ ও ভীতি ছড়িয়ে পড়ল। শত্রুরা তার ওপর চারদিক থেকে তরবারি নিয়ে হামলে পড়ল। দেখতে না দেখতেই তিনি শহীদ হয়ে লুটিয়ে পড়লেন।

এরপর শত্রুরা তার মাথা কেটে বর্শার মাথায় গেঁথে রণক্ষেত্রের একটি উঁচু স্থানে গেড়ে রেখে দিল।

শহীদ ভাইয়ের সেই কর্তিত মাথার দিকে তাকিয়ে রাবী ইবনে যিয়াদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন,

'ধন্য তুমি ধন্য, জান্নাতের অনন্য সুখ ও সৌভাগ্য তোমার জন্য। আল্লাহর কসম! আমি তোমার এবং মুসলিমবাহিনীর সকল শহীদের হত্যার বদলা নেব ইনশাআল্লাহ।'

সেনাপতি আবু মূসা আল-আশআরী রাযিয়াল্লাহু আনহু রাবী ইবনে যিয়াদের মধ্যে শহীদ ভাইকে হারানোর শোক, বেদনা ও অস্থিরতা দেখে এবং শত্রুবাহিনীর বিরুদ্ধে তার অন্তরে চরম প্রতিশোধের জোরালো অঙ্গীকার উপলব্ধি করে এই বাহিনীর সেনাপতির পদ থেকে নিজেকে সরিয়ে রাবী ইবনে যিয়াদের ওপর এই গুরুদায়িত্ব নিশ্চিন্তে অর্পণ

করলেন। এরপর তিনি রওনা হয়ে গেলেন পারস্যের 'সূস' নগরী দখলের উদ্দেশ্যে অন্য বাহিনীতে।

* * *

সেনাপতির দায়িত্ব পেয়ে রাবী ইবনে যিয়াদ রাযিয়াল্লাহু আনহু এই বাহিনীকে নিয়ে পারস্য-মুশরিকবাহিনীর ওপর ভয়ঙ্কর ঝড়ের মতো উপুর্যপরি আঘাত হানতে থাকলেন। মুসলিমবাহিনীর পরিবর্তিত অবস্থা আর ধারাবাহিক আক্রমণ দেখে পারস্যসৈনিকদের মনোবল ভেঙে পড়ল। তাদের সকল প্রতিরোধ ক্ষমতা ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। তারা যেদিকে পারল পালিয়ে বাঁচার চেষ্টা করল। আল্লাহ তাআলা রাবী ইবনে যিয়াদের হাতে 'মানাযির' শহরের বিজয় দান করলেন।

শত্রুসৈনিকদের কচুকাটা করে পুরোপুরি নিঃশেষ করে তাদের নারী ও শিশুদের বন্দী করলেন। আল্লাহর ইচ্ছায় অকল্পনীয় গনিমতের মাল অর্জন করলেন।

* * *

'মানাযির' যুদ্ধের প্রথম চিত্রে দেখা গেছে মুসলিমসৈনিকদের সীমাহীন প্রাণহানীর ঘটনা। অথচ এর শেষ চিত্রে দেখা গেল মুসলিমবাহিনী শত্রুদের সমূলে নিঃশেষ করে অসম্ভব এক বিজয়ের ইতিহাস সৃষ্টি করে ফেলে। এই ইতিহাসের প্রধান নায়ক হিসাবে রাবী ইবনে যিয়াদ আল-হারেসী রাযিয়াল্লাহু আনহুর নাম আকাশের উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো ঝলমল করতে থাকল। চারদিকে সকলের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ল সেই নাম। রাতারাতি সেই নামটি যুক্ত হয়ে গেল ইতিহাস সৃষ্টিকারী সেনানয়াকদের তালিকার শীর্ষে। এরই প্রভাবে ইসলামী বাহিনীর যে কোনো কঠিন ও ভয়াবহ অভিযান পরিকল্পনায় সেনাপতি হিসাবে সর্বপ্রথম যে নামটি উচ্চারিত হতে থাকল তা রাবী ইবনে যিয়াদ আল-হারেসী।

সেই হিসাবে মুসলিমসেনাবাহিনী যখন 'সিজিস্তান' অভিযানের সিদ্ধান্ত নিল তখন সেই সেনাদলের নেতৃত্বের দায়িত্বও তাঁরই ওপর ন্যস্ত করে সকলেই দুআ করতে থাকলেন 'আল্লাহ তাআলা যেন তাঁর হাতেই 'সিজিস্তানের' বিজয় দান করেন।'

* * *

সেনাপতি রাবী ইবনে যিয়াদ রাযিয়াল্লাহু আনহু তাঁর বাহিনীকে নিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদের উদ্দেশ্যে রওনা করলেন। সিজিস্তান পৌঁছতে তাঁকে দুর্গম ও বিপদসঙ্কুল এত দীর্ঘ এক মরূপথ অতিক্রম করতে হলো যার দৈর্ঘ্য পঁচাত্তর ফারসাখ। (অর্থাৎ ৫১১ মাইল/৮২২ কিলোমিটার) যে দূরত্ব অতিক্রম করতে মরুভূমির হিংস্র ও দ্রুতগামী প্রাণীরাও অক্ষম হয়ে যায়।

এই দীর্ঘ জনমানবহীন মরুপথ পারি দেওয়ার পর সর্বপ্রথম তাদের সামনে পড়ল সিজিস্তান শহরের সীমান্তবর্তী 'রুস্তাকু যালিক'। এই অঞ্চলটি ছিল খুবই মনোমুগ্ধকর। যেমন ছিল তার অপরূপ কারুকার্য খঁচিত বিশাল বিশাল আকাশচুম্বি অট্রালিকা তেমনি ছিল তার বিপুল ধন-সম্পদ ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের ছাড়াছড়ি। যেদিকেই চোখ যায় শস্য-শ্যামল আর বিচিত্র ফল ও ফুলে ভরা। তার ওপর পুরা অঞ্চলটি ছিল উঁচু ও দুর্ভেদ্য প্রাচীর দিয়ে ঘেরা।

* * *

দূরদর্শী ও বিচক্ষণ সেনাপতি 'রুস্তাকুযালিকে'র ভেতরে প্রবেশের পূর্বেই সেখানে গুপ্তচরের জাল বিছিয়ে দিলেন। তাদের সূত্রে জানতে পারলেন যে,

'খুব শিগগিরই শত্রুপক্ষ তাদের নববর্ষ উৎসব 'মেহেরযান' উপলক্ষে রুস্তাকুযালেক নগরে সমবেত হতে যাচ্ছে।'

তিনি অপেক্ষা করতে থাকলেন। নির্ধারিত রাতে শত্রুপক্ষ নববর্ষের আনন্দ-উল্লাসে যখন বিভোর হয়ে উঠল, তখন তিনি তাদের ওপর অতর্কিত আক্রমণ চালিয়ে তাদের বড় বড় নেতা, জমিদার ও প্রদেশিক গভর্নরসহ প্রায় বিশহাজার যোদ্ধাসৈনিককে বন্দী করলেন। বন্দীদের মধ্যে গভর্নরের একজন ক্রীতদাসও ছিল। যার কাছে পাওয়া গেল তিন লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা, যা সে মনিবকে দেওয়ার জন্য এনেছিল।

সেনাপতি রাবী ইবনে যিয়াদ আল-হারেসী রাযিয়াল্লাহু আনহু ক্রীতদাসকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এই বিশাল অংকের মুদ্রা তুমি কোথায় পেয়েছ?'

ক্রীতদাস জবাবে বলল,

'আমার মনিবের অধিনস্ত একটি এলাকা থেকে উসূলকৃত খাজনার অর্থ এগুলো। মনিবের কাছে পৌঁছানোর জন্য এনেছিলাম।'

'প্রতি বছরই কি একটি এলাকা থেকে এত বিপুল অংকের খাজানা উসূল করা হয়?'

ক্রীতদাস জবাব দিল, 'জী, হ্যাঁ।'

'রাবী ইবনে যিয়াদ আবারও জিজ্ঞাসা করলেন,

'এটা কিভাবে সম্ভব?'

ক্রীতদাস উত্তর দিল,

'এটাকে সম্ভব করে তুলতে হয় আমাদের কুঠার, কাস্তে আর কোদাল চালিয়ে পরিশ্রম করে, মাথার ঘাম পায়ে ঝরিয়ে।'

* * *

বিনাযুদ্ধে 'রুস্তাকুযালিক' মুসলিমবাহিনীর পদানত হয়ে যাওয়ার পর প্রাদেশিক গভর্নর নিজের ও তার পরিবারবর্গের প্রাণভিক্ষার আবেদন জানান সেনাপতি রাবী ইবনে যিয়াদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর কাছে। গভর্নর

বলেন, 'এর জন্য তিনি মুসলিমবাহিনীকে তাদের চাহিদা মতো মুক্তিপণ দিতে প্রস্তুত আছেন।'

সেনাপতি বললেন,
'প্রাণভিক্ষার আবেদন বিবেচনা করা যাবে মুক্তিপণ যদি মুসলিমবাহিনীর পছন্দ মতো দেওয়া হয়।'

গভর্নর বললেন,
'অনুগ্রহ করে আপনার পছন্দটা জানান।'

সেনাপতি পছন্দের মুক্তিপণ নির্ধারণ করতে গিয়ে বললেন,
'আমার এই বর্শাটি মাটিতে গেড়ে দিলাম, এর ওপর থেকে সোনা ও রূপা ঢালতে ঢালতে বর্শাটি এমনভাবে ঢেঁকে দিতে হবে যেন এর কোনো অস্তিত্ব বোঝা না যায়।'

গভর্নর বললেন,
'আমি রাজি আছি।'

এরপর গভর্নর তার ধন-ভাণ্ডার খুলে সোনা-রূপা এনে স্তুপ করতে শুরু করলেন। এভাবেই এক সময় সোনা ও রূপার স্তুপের মধ্যে বর্শার মাথাও ঢেঁকে গেল।

* * *

তারপর সেনাপতি রাবী ইবনে যিয়াদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বিজয়ী বাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে মূল সিজিস্তান শহরে ঢুকে পড়লেন। শীতের আগমনকালে একটুখানি বাতাসের ছোঁয়া পেলে গাছ-পালার শুকনো মরাপাতা যেভাবে ঝরে পড়ে, সেভাবেই মুসলিমবাহিনীর বিজয়ীর বেশে সিজিস্তানে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে সেখানের সুরক্ষিত দুর্গ ও ঘাঁটিগুলোরও একে একে পতন ঘটতে থাকল তাদের ঘোড়ার খুঁড়ের তলে।

শহর, নগর ও গ্রামের সকল শ্রেণির মানুষ বিজয়ী বাহিনীর সামনে কোনো প্রতিরোধ সৃষ্টি না করে বরং বিনীতভাবে তাদের অভ্যর্থনা জানিয়ে

আনুগত্যের প্রকাশ করতে থাকল। এভাবেই বিপুল ও সাদর অভ্যর্থনার মাঝ দিয়ে চলতে চলতে তারা সিজিস্তানের রাজধানী 'যারাঞ্জা' শহরে পৌঁছে গেলেন।

রাজধানীতে পৌঁছার পর তারা দেখলেন ভিন্ন চিত্র। তারা দেখতে পেলেন শত্রুরা মুসলিমবাহিনীকে প্রতিরোধ করার জন্য ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে। মুসলিমবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধের উদ্দেশ্যে বিশাল এক সেনাদল তৈরি করেছে এবং এদের সাহায্যের জন্য সারাদেশের সেনা ছাউনি থেকে বিপুল পরিমাণে সেনা এনে রিজার্ভ রাখা হয়েছে।

পারস্যসম্রাট সংকল্প করেছে, যে কোনো মূল্যে মুসলিমবাহিনীকে প্রতিরোধ করে তাদের হাত থেকে সিজিস্তান পুনরুদ্ধার করে ছাড়বে।

মুসলিমসেনাপতি রাবী ইবনে যিয়াদের বাহিনী ও পারস্যবাহিনীর মধ্যে শুরু হলো ভীষণ ও ভয়াবহ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ। এযুদ্ধে উভয় বাহিনীর কেউই অকাতরে প্রাণ বিসর্জন দিতে পিছপা হলো না।

শত্রু-মিত্র উভয় পক্ষেই বিপুল ক্ষয়-ক্ষতি ও সীমাহীন প্রাণহানির ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর এক সময় জয়ের পাল্লা মুসলিমবাহিনীর পক্ষেই ভারী হয়ে উঠল। তখন পারস্যসেনাপতি পারভেজ ভাবলেন, যুদ্ধ নয় সন্ধির ব্যবস্থা করা উচিত। কারণ তার বাহিনীতে তখনো যেটুকু শক্তি অবশিষ্ট আছে, এর কারণে হয়তো তিনি নিজের ও নিজ বাহিনীর জন্য কিছু সম্মানজনক শর্তারোপ করতে পারবেন। আরও বিলম্ব করলে সেই সুযোগটুকুও হাতছাড়া হয়ে যাবে।

অতএব, তিনি মুসলিমসেনাপতি রাবী ইবনে যিয়াদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর কাছে অবিলম্বে লোক পাঠালেন সন্ধি আলোচনার জন্য সাক্ষাতের সময় প্রার্থনা করে। পারস্যবাহিনীর দূত মুসলিমসেনাপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আলোচনার সময় ও স্থান নির্ধারণের আবেদন জানালে তিনি স্থান ও সময় জানিয়ে দূতকে বিদায় করেন।

* * *

পারস্যবাহিনীর দূত চলে যাওয়ার পর সেনাপতি রাবী ইবনে যিয়াদ রাযিয়াল্লাহু আনহু তাঁর সৈনিকদের নির্দেশ দিলেন পারস্যসেনাপতি পারভেজের সঙ্গে বৈঠকের স্থান সাজাতে। বৈঠকের স্থান কিভাবে সাজাতে হবে সেটাও তিনি সৈনিকদের জানিয়ে দিয়ে বললেন,

'বৈঠকঘরের চারপাশে নিহত পারস্যসৈনিকদের লাশের স্তূপ থাকতে হবে। আর যেই পথ দিয়ে পারভেজ এই মজলিসে আসবে, তার দু'পাশে এলোমেলো ভাবে অসংখ্য লাশ ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখতে হবে।'

মুসলিমসেনাপতি রাবী ইবনে যিয়াদ আল-হারেসী রাযিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন তীব্র তামাটে বর্ণের বিশালদেহী, উঁচু, লম্বা ও বিরাট মাথাওয়ালা একজন ভয়ঙ্কর দর্শনের মানুষ। তাকে দেখলেই ভয়ে কলিজা কেঁপে উঠত।

পারস্যবাহিনীর সেনাপতি পারভেজ লাশ বিছানো পথ পারি দিয়ে মজলিসের কাছে এসে লাশের স্তূপ দেখে এমনিতেই ছিলেন ভীষণ সন্ত্রস্ত। এরপর বৈঠক ঘরে প্রবেশ করে মুসলিমসেনাপতিকে দেখার পর তার ভয় বহুগুণ বেড়ে গেল। মুসলিমসেনাপতির কাছে গিয়ে হাত মেলানোর সাহসটুকুও তার হলো না। দূরে দাঁড়িয়েই সামরিক নিয়মে স্যালুট দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

তার কথা জড়িয়ে গেল। কোনোরকম তোতলাতে তোতলাতে তিনি বললেন,

'মুসলিমবাহিনীকে বড় বড় সোনার পাত্র বহনকারী একহাজার ক্রীতদাস উপঢৌকন হিসাবে প্রদান করার শর্তে আমি মাননীয় রাবী ইবনে যিয়াদের কাছে সন্ধির প্রস্তাব করছি।'

মুসলিমসেনাপতি সন্ধির প্রস্তাবে রাজি হয়ে পারস্যসেনাপতি পারভেজের সঙ্গে চুক্তিতে আবদ্ধ হলেন।

সন্ধিচুক্তির পরের দিন রাবী ইবনে যিয়াদ রাযিয়াল্লাহু আনহু সদলবলে শহরে প্রবেশ করলেন। সন্ধির শর্ত মতে এক হাজার ক্রীতদাস বড় বড় স্বর্ণের পাত্র মাথায় বহন করে তাঁকে অভ্যর্থনা জানাল। মুসলিমসৈনিকদের তাকবীর ও তাহলীল শ্লোগানে মুখরিত এবং অভ্যর্থনাকারীদের শোভাযাত্রা পরিবেষ্টিত হয়ে এগিয়ে চলল মুসলিমসেনাপতির অগ্রযাত্রা।

সে ছিল মুসলিমদের গৌরবময় একটি দিন।

* * *

রাবী ইবনে যিয়াদ রাযিয়াল্লাহু আনহু ইসলাম ও মুসলিমজাতির কল্যাণে নিবেদিত এমন এক খোলা তরবারির মতো জীবন কাটিয়েছেন, যা সর্বদা আল্লাহর জমিন থেকে তাঁর দুশমনদের উৎখাত করেছে। যার প্রচণ্ড আক্রমণে একের পর এক শহর, নগর ও গ্রামের বিজয় নিশ্চিত হয়েছে। প্রদেশের পর প্রদেশ ইসলামী ইনসাফপূর্ণ শাসনের আওতাধীন করেছেন। তাঁর অব্যাহত এই কর্মধারার এক পর্যায়ে মুসলিমজাহানের শাসন ক্ষমতা চলে যায় উমাইয়া বংশের হাতে। প্রথম খলীফা মুআবিয়া ইবনে আবী সুফিয়ান রাযিয়াল্লাহু আনহুমা রাবী ইবনে যিয়াদ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে খুরাসান প্রদেশের গভর্নর নিযুক্ত করেন। অথচ এই দায়িত্ব নিতে তিনি একেবারেই রাজি ছিলেন না। কিন্তু চাপিয়ে দেওয়া দায়িত্ব মানসিক অশান্তি ও দ্বিধা সত্ত্বেও তিনি সুষ্ঠুভাবেই পালন করে যাচ্ছিলেন। এরই মধ্যে একজন পদস্থ সরকারি কর্মকর্তার চিঠি তার দ্বিধা-সংকোচকে ঘৃণায় রূপান্তরিত করে দিল। সেই কর্মকর্তা যিয়াদ ইবনে আবীহ (যার পিতৃপরিচয় নেই) চিঠিতে লেখেন,

‘আমীরুল মুমিনীন মুআবিয়া ইবনে আবী সুফিয়ান আপনাকে এই মর্মে নির্দেশ দিয়েছেন, যুদ্ধলব্ধ মালে গনিমতের সোনা ও রূপার অংশ সম্পূর্ণ কেন্দ্রীয় বাইতুল মালের জন্য রেখে অবশিষ্ট সম্পদ মুজাহিদবাহিনীর মধ্যে বণ্টন করে দিন।’

তিনি সেই সরকারি কর্মকর্তা যিয়াদের পত্রের জবাবে লিখে পাঠালেন,

'মহান আল্লাহর বাণী আল-কুরআন গনিমতের মাল বণ্টনের যে পদ্ধতি বর্ণনা করেছে, আমীরুল মুমিনীনের বরাত দিয়ে পাঠানো আপনার নির্দেশ তার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। কুরআনে সমস্ত গনিমতের মাত্র একপঞ্চমাংশ বাইতুল মালে জমাদান করে বাকি সম্পূর্ণটাই মুজাহিদদের মাঝে ভাগ করে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কুরআনের স্পষ্ট নির্দেশের বিরুদ্ধে গনিমতের মালের মধ্যে থেকে সোনা ও রূপা আলাদা করে বাইতুল মালের জন্য পাঠানোর কোনো অবকাশ নেই।'

এরপর তিনি মুজাহিদদের যার যার গনিমত বুঝে নেওয়ার আদেশ দিলেন এবং যথারীতি সবাই গনিমতের মাল বুঝে নেওয়ার পর তিনি মাত্র এক পঞ্চমাংশ বাইতুল মালের জন্য ইসলামী শাসনের রাজধানী দামেস্কে পাঠিয়ে দিলেন।

* * *

যিয়াদ ইবনে আবীহের কুরআন বিরোধী সরকারি ফরমান প্রত্যাখ্যান করে যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণের পর পরবর্তী জুমার দিন ইসলামী ইতিহাসের ক্ষণজন্মা এই নন্দিত সেনাপতি রাবী ইবনে যিয়াদ আল-হারেসী রাযিয়াল্লাহু আনহু সাদা ধবধবে কাফনের কাপড় পরে মসজিদে গেলেন। জুমার খুতবা শেষ করে জনতার উদ্দেশ্যে বললেন,

'হে আমার প্রিয় ভাইয়েরা! আমার বেঁচে থাকার আগ্রহ ফুরিয়ে গেছে। আমি এখন একটি দুআ করব। দয়া করে আপনারা আমার দুআয় আমীন বলুন।'

এরপর তিনি দুআ করলেন,

'হে আল্লাহ! তুমি যদি আমার জীবনের কল্যাণ চাও, তাহলে অবিলম্বে আমাকে তোমার কাছে তুলে নাও।'

উপস্থিত সকলেই আমীন আমীন বলে আল্লাহর কাছে কবুল করে নেওয়ার ফরিয়াদ জানালেন।

এই দুআ ও প্রার্থনা ছিল অব্যর্থ। সেই দিনের সূর্যাস্তের পূর্বেই আল্লাহ তাআলা রাবী ইবনে যিয়াদ আল্-হারেসী রাযিয়াল্লাহু আনহুকে নিজের কাছে তুলে নিলেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

তথ্যসূত্র :

১. *উসদুল গাবাহ*, ২য় খণ্ড, ২০৬ পৃষ্ঠা।
২. *তারীখুত তাবারী*, ৪র্থ খণ্ড, ১৮৩-১৮৫ পৃষ্ঠা, ৫ম খণ্ড, ২২৬, ২৮৫, ২৯১ পৃষ্ঠা।
৩. *আল-ইসাবা*, ১ম খণ্ড, ৫০৪ পৃষ্ঠা। অথবা *আত্তারজামা*, ২৫৭৭।
৪. *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, (সূচিপত্র দ্রষ্টব্য)।
৫. *জামহারাতুল আনসাব*, ৩৯১ পৃষ্ঠা।
৬. *তাহযীবুত তাহযীব*, ৩য় খণ্ড, ২৪৪ পৃষ্ঠা।
৭. *হায়াতুস সাহাবা*, ২য় খণ্ড, ১৬৮ ও ২৬৮।
৮. *আল-ইসতীআব*, ১ম খণ্ড, ৫১৬ পৃষ্ঠা।

আবদুল্লাহ ইবনে সালাম

জান্নাতী কোনো মানুষকে দেখে কেউ যদি আনন্দ পেতে চায়, সে যেন আবদুল্লাহ ইবনে সালামকে দেখে।

হুসাইন ইবনে সালাম ছিলেন ইয়াসরিবের ইহুদী পণ্ডিতদের প্রধান গুরু ও সর্বাধিক বিজ্ঞ।

ইসলামপূর্ব প্রাচীন মদীনাবাসী ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলেই তাকে শ্রদ্ধা করত। সকলেই তাকে মান্যবর বুযুর্গ হিসাবে সন্মান করত।

তিনি সর্বস্তরের মানুষের কাছে পরিচিত ছিলেন একজন পরহেজগার ও নেককার মানুষ হিসাবে। সকলেই তাকে জানত একজন সত্যবাদী ও সুদৃঢ় চরিত্রের অধিকারী বলে।

* * *

হুসাইন একজন অতি সাধারণ, সাদামাটা ও নিরিবিলি, নির্ঝঞ্ঝাট মানুষ হিসাবে জীবন-যাপন করতেন। একই সঙ্গে তার জীবন ছিল বাস্তবমুখী ও কল্যাণকর। তিনি নিজের সময়কে ভাগ করে নিয়েছিলেন তিন ভাগে :

এক ঃ উপসনালয়ে—এই সময় মানুষকে সদুপদেশ দান আর নিজের ইবাদত-বন্দেগীর কাজে ব্যস্ত থাকতেন।

দুই ঃ খেজুর বাগানে—এই সময়ে বাগানের যাবতীয় পরিচর্যার কাজে যেমন, আগাছা পরিষ্কার করা, গাছের ডাল কাটা, পুরুষ ও নারী ফুলের পরাগায়ন ইত্যাদি।

তিন ঃ ধর্মগ্রন্থ তাওরাতের সঙ্গে—এই গ্রন্থ পাঠ করে গভীর ধর্মীয় জ্ঞান অর্জনের কাজে আত্মনিয়োগ করতেন।

* * *

তিনি যখনই ধর্মগ্রন্থ তাওরাত পাঠ করতে গিয়ে মক্কায় আসন্ন একজন নবীর আগমন সংবাদ পেতেন—যিনি হবেন পূর্ববর্তী সকল নবী-রাসূলের পূর্ণতা দানকারী এবং যিনি হবেন নবী আগমনের ধারার সমাপণকারী, সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবীর আলোচনা এলেই তিনি থেমে থাকতেন। দীর্ঘ সময় গভীর ভাবনা ভাবতেন।

হুসাই ইবনে সালাম তাওরাত গ্রন্থে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবীর আলোচনা পড়ার সময় তাঁর গুণাবলী, বৈশিষ্ট্যসমূহ এবং তাঁর পরিচিতি ও আলামতগুলো গভীরভাবে অনুসন্ধান করতেন। গভীর অধ্যায়ন ও ভাবনার পর তিনি এটা জেনে আনন্দে লাফিয়ে উঠতেন যে সেই নবী নিজের জন্মভূমি ত্যাগ করে ইয়াসরিবকেই হিজরতের জন্য এবং অবস্থান করার জন্য গ্রহণ করবেন।

যখনই তিনি এই সকল বিষয় পাঠ করতেন অথবা এই বিষয়গুলো যখনই তার মনে উদয় হতো তখনই তিনি আল্লাহর কাছে এই প্রার্থনা জানাতেন, যেন আল্লাহ তাআলা তাকে দীর্ঘ জীবন দান করেন। যেন তিনি প্রতীক্ষিত সেই নবীর আগমন দেখে যেতে পারেন এবং তাঁর সাক্ষাতের সৌভাগ্য লাভ করতে এবং সাবার আগে তাঁর প্রতি ঈমান আনতে পারেন।

আল্লাহু আয্যা ও জাল্লা হুসাইন ইবনে সালামের প্রার্থনা কবুল করেন। রহমত ও হিদায়াতের নবীর আবির্ভাব তার জীবদ্দশাতেই ঘটে।

সেই নবীর সাক্ষাৎ ও সাহচর্য এবং তাঁর প্রতি অবতীর্ণ মহাসত্য দীন ও কুরআনের ওপর ঈমান আনার সৌভাগ্যও তাকে দান করা হয়।

আমরা তাঁর ইসলাম গ্রহণের সেই আশ্চর্য কাহিনী তাঁর নিজের জবানীতেই শোনাব। কারণ, তাঁর কাহিনী বর্ণনার জন্য তিনি নিজেই সর্বাধিক উপযুক্ত এবং তার বিবরণটাই হবে সবচেয়ে চমৎকার ও বাস্তবসম্মত।

হুসাইন ইবনে সালাম বলেন,

'আমি যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আত্মপ্রকাশের খবর শুনতে পেলাম, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করতে শুরু করলাম। তাঁর নাম, বংশ, গুণাবলী, আবির্ভাবের সময় ও স্থান ইত্যাদি ব্যাপারগুলো আমি আসমানী কিতাবে বর্ণিত তথ্যগুলোর সঙ্গে মিলিয়ে পরীক্ষা করতে থাকলাম। পঠিত তথ্যগুলোর সঙ্গে বাস্তবের তথ্যগুলো যখন হুবহু মিলে গেল তখন আমি নিশ্চিত হয়ে গেলাম যে তিনিই প্রতিশ্রুত সেই আখেরী নবী। তাঁর নবুওয়াতের ব্যাপারে আমার মনে আর কোনো সংশয় ও সন্দেহ অবশিষ্ট থাকল না। কিন্তু ইহুদীদের কাছে আমার এই মনোভাব একদম গোপন করে রাখলাম। এ বিষয়ে কারও কাছে কোনো কথা উচ্চারণ না করে কঠোর নীরবতা অবলম্বন করলাম।

যেদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা ছেড়ে মদীনার উদ্দেশ্যে বাহির হন এবং ইয়াসরিবের কাছাকাছি এসে মাত্র দু'মাইল দূরে 'কুবা'তে যাত্রাবিরতি করেন। তখন জনৈক ব্যক্তি সবাইকে ডেকে ডেকে উচ্চস্বরে তাঁর আগমনের সংবাদ ঘোষণা করল। সেই মুহূর্তে আমি খেজুরগাছের মাথায় চড়ে গাছের পরিচর্যায় ব্যস্ত ছিলাম। আমার ফুফু খালেদা বিনতে হারিস তখন ছিলেন গাছের নিচে বসা। তাঁর আগমনের ঘোষণা আমার কানে যাওয়া মাত্রই অনিচ্ছা সত্ত্বেও দীর্ঘদিন যাবৎ মনের

মধ্যে চেপে রাখা আনন্দ প্রকাশ হয়ে গেল উচ্চস্বরে 'আল্লাহ আকবার... আল্লাহু আকবার...' ধ্বনীর সঙ্গে।

আমার ফুফু সেই 'আনন্দ' বুঝতে পেরে বলে উঠলেন,
'আরে সর্বনাশা! তুই কেন এত উল্লসিত? আমাদের নবী মুসা ইবনে ইমরানের আগমন হলেও তুই এরচেয়ে বেশি উল্লসিত হতে পারতি না।'

আমি তাকে বললাম,
'ও আমার ফুফু! আল্লাহর কসম, এই নবী ভিন্ন কেউ নন, তিনিও আমাদের নবী মুসা ইবনে ইমরানের মতোই একজন মনোনীত নবী, তাঁর মতোই এই নবীও আল্লাহ প্রদত্ত নীতি ও আদর্শের ওপর প্রতিষ্ঠিত...

এই নবীকেও সেই নবুওয়াতের দায়িত্ব দিয়ে পাঠানো হয়েছে যা দেওয়া হয়েছিল মুসাকে...'

আমার ফুফু কিছু সময় নীরব হয়ে থেকে জিজ্ঞাসা করলেন,
'তিনি কি সেই নবী যার সম্পর্কে ধর্মীয় পণ্ডিতেরা এবং তুমিও বলতে যে শিগগিরই একজন নবীর আগমন হবে পূর্বের সকল নবীর সত্যতার প্রমাণরূপে এবং মহান প্রভুর রাসূল প্রেরণের ধারা সমাপণকারী হিসাবে?'

আমি বললাম, 'জী ফুফু, তিনিই সেই নবী।'

ফুফু বললেন,
'তাহলে তো তোমার উল্লসিত হওয়া ঠিকই আছে।'

তখন আমি সঙ্গে সঙ্গেই ছুটে চলে গেলাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে। দেখলাম, অনেক মানুষ তাঁর দুয়ারে ভিড় করে আছে। আমি সেই ভিড় ঠেলে একটু একটু করে অগ্রসর হতে থাকলাম। এক সময় তাঁর একেবারে কাছে পৌঁছে গেলাম।

আমি সর্বপ্রথম তাঁর যে অমূল্য বাণী শুনতে পেলাম, তা ছিল :

أَيُّهَا النَّاس أَفْشُوا السَّلَامَ ... وَأَطْعِمُوْا الطَّعَامَ....

وَصَلُّوْا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ .... تَدْخُلُوْا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ ....

'হে লোকসকল! তোমরা বেশি বেশি সালামের প্রসার ঘটাও। ক্ষুধার্তকে আহার দাও। গভীর রাতে নামায পড়ো যখন সকলে ঘুমে বিভোর থাকে। তাহলেই তোমরা জান্নাতে যেতে পারবে নিশ্চিন্তে ও নির্বিঘ্নে।'

আমি তখন খুঁটে খুঁটে তাঁকে দেখলাম এবং আবারও তাঁর সঙ্গে আসমানী পরিচিতি ও আলামতগুলো মিলিয়ে নিলাম। প্রাণভরে তাঁর নূরানী চেহারার দিকে তাকিয়েই থাকলাম। আমার বিবেক-বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা দৃঢ়তার সঙ্গে বলে দিল, এটা কোনো মিথ্যাবাদী ও প্রতারকের চেহারা নয়।

তখন আমি তাঁর আরও কাছে চলে গেলাম আর সাক্ষ্য দিলাম,

'আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মা'বুদ নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহ তাআলার রাসূল।'

তিনি আমার দিকে ঘুরে তাকালেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন,

'তোমার নাম কী?'

আমি জবাব দিলাম,

'হুসাইন ইবনে সালাম।'

তিনি বললেন,

'নাহ, হলো না বরং তোমার নাম আবদুল্লাহ ইবনে সালাম।'

আমি বললাম,

'ঠিক আছে, আবদুল্লাহ ইবনে সালাম-ই আমার নাম। আমি সেই আল্লাহর কসম করে বলছি যিনি আপনাকে সত্য দীন দিয়ে পাঠিয়েছেন, আজকের পর আপনার দেওয়া নামটি ছাড়া আমার আর কোনো নাম থাকুক এটা আমি কিছুতেই চাই না।'

এরপর আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট থেকে আমার বাড়ি ফিরে এলাম। আমার স্ত্রী ও ছেলেমেয়েকে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানালাম। তারা আমার আহ্বান কবুল করে সকলেই

ইসলাম গ্রহণ করে নিল। তাদের সঙ্গে আমার অতিবৃদ্ধা ফুফুও দীন ইসলাম কবুল করলেন। এরপর আমি তাদের বললাম,

'যতদিন আমি অনুমতি না দেব, কেউ আমাদের ইসলাম গ্রহণের কথা ইহুদীদের কাছে প্রকাশ করবে না।'

তারা সকলেই আমার নির্দেশ মেনে নিয়ে বলল,
'ঠিক আছে, তাই হবে।'

এরপর আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গিয়ে বললাম,
'ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইহুদীরা হলো মিথ্যুক ও প্রতারক একটি জাতি, যে কোনো মানুষকে গালাগালি করতে, যে কারোর বিরুদ্ধে যে কোনো জঘন্য দোষারোপ করতে তারা বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করে না।

ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি চাই আপনি তাদের নেতৃস্থানীয় লোকদের ডেকে ইসলাম কবূলের আহ্বান জানাবেন। তার আগে আমাকে আপনার কোনো একটি কক্ষে লুকিয়ে রাখুন এবং আমার ইসলাম গ্রহণের কথা তাদের কাছে প্রকাশ না করে জিজ্ঞাসা করুন তাদের কাছে আমার মর্যাদা কেমন। এটা গোপন করার কারণ এই যে, তারা যখন আমার ইসলাম গ্রহণের কথা শুনবে, তখন তারা যে আমার কত দোষ-ত্রুটি বের করবে, আমার বিরুদ্ধে কত যে অপবাদ আরোপ করবে! আপনি নিজেই সব দেখতে পাবেন।'

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে একটি কক্ষে ঢুকিয়ে দিয়ে ইহুদী নেতৃবৃন্দকে আমন্ত্রণ জানালেন। তারা উপস্থিত হলে তাদের কাছে ঈমান ও ইসলামের সৌন্দর্য তুলে ধরলেন। আসমানী কিতাবে তাঁর পরিচিতি বিষয়ে তাদের পূর্ব থেকেই অবগতির ব্যাপারটিও স্মরণ করিয়ে দিলেন। ইহুদী নেতাদের মধ্যে তাঁর চমৎকার আলোচনার পরও কোনো ভালো প্রতিক্রিয়া হলো না। বরং স্বভাব সুলভ হঠকারিতার বসে তারা রাসূলের সঙ্গে অন্যায় তর্ক ও যুক্তি উপস্থাপন করতে থাকল। ঘরের ভেতর থেকে আমি সবই শুনছিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বুঝতে পারলেন যে এরা তার কথায় ঈমান গ্রহণ করবে না, তখন তিনি তাদের জিজ্ঞাসা করলেন,

'আচ্ছা বলো তো হুসাইন ইবনে সালাম কেমন মানুষ?'

তারা বলল,

'তিনি আমাদের মহান ধর্মীয় নেতা এবং আরেকজন মহান ধর্মীয় নেতার পুত্র। তিনি আমাদের তাওরাত কিতাবের সবচেয়ে বড় বিশেষজ্ঞ আলেম আর তাঁর পিতাও ছিলেন একই রকম তাওরাতের সবচেয়ে বড় বিশেষজ্ঞ আলেম।'

আমার সম্পর্কে তাদের এই উচ্ছ্বসিত প্রশংসার পর নবীজী প্রশ্ন করলেন,

'আচ্ছা সেই বিশেষজ্ঞ আলেম হুসাইন ইবনে সালাম যদি ইসলাম কবুল করে তাহলে কি তোমরা ইসলাম কবুল করবে?'

তারা দৃঢ়তার সঙ্গে বলল,

'অসম্ভব ব্যাপার! তাঁর পক্ষে ইসলাম গ্রহণ করা কিছুতেই সম্ভব নয়। আল্লাহ তাকে ইসলাম গ্রহণের বিপদ থেকে রক্ষা করুন।'

তখন আমি তাদের সামনে বের হয়ে এসে বললাম,

'হে ইহুদী নেতৃবৃন্দ! আল্লাহর আযাব থেকে বাঁচার চেষ্টা করো, মুহাম্মাদ যে দীন নিয়ে এসেছেন তা কবুল করে নাও।

আল্লাহর কসম! তোমরা খুব ভালো করেই জানো যে তিনি 'আল্লাহর রাসূল'—এ কথায় কোনো সন্দেহ নেই। তোমরা তাঁর নাম, গুণ ও বৈশিষ্ট্য সবই তাওরাত কিতাবে পেয়েছ।

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে তিনি আল্লাহর রাসূল, আমি তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি, তাঁকে সঠিকভাবে চিনেছি এবং তাঁকে সত্যবাদী বলেই বিশ্বাস করেছি।'

আমার এসব কথা শুনে তারা চিৎকার করে বলে উঠল,

‘তুই মিথ্যুক, মিথ্যা কথা বলেছিস। আল্লাহর কসম! তুই আমাদের সবচেয়ে নিকৃষ্ট লোকের সর্বাধিক নিকৃষ্ট সন্তান। তুই আমাদের এক জাহেলের গণ্ডমুর্খ সন্তান।’

এভাবেই তারা যতক্ষণ পারল আমার শুধু দোষ আর দোষই বলতে থাকল। দোষের যত প্রকার হতে পারে সকল প্রকারেই আমাকে দোষী বানিয়ে ছাড়ল।

আমি তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললাম,

‘ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি কি আগেই বলিনি যে ইহুদীরা হলো চরম মিথ্যুক, প্রতারক ও পথভ্রষ্ট জাতি। তারা বিশ্বাসঘাতক ও নাফরমান গোষ্ঠী?’

* * *

তৃষ্ণার্ত ব্যক্তি শীতল পানির প্রতি যে তীব্র আকর্ষণ বোধ করে ঠিক সেভাবেই ইসলাম ও ইসলামী শিক্ষার প্রতি আবদুল্লাহ ইবনে সালাম রাযিয়াল্লাহু আনহু আকৃষ্ট হয়ে উঠলেন।

তিনি হয়ে পড়লেন একজন খাঁটি কুরআন প্রেমিক। সর্বদাই তাঁর মুখে কুরআনের তেলাওয়াত চালু থেকেই যেত।

তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচর্য আঁকড়ে ধরে থাকলেন এমনকি তিনি যেন ছায়ার চেয়েও বেশি রাসূলের অনুসরণ করতে থাকলেন।

জান্নাতী আমলের জন্য তিনি নিজেকে এতটাই উৎসর্গ করে দিলেন যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জান্নাতের সুসংবাদ শুনিয়ে দিলেন। যেই সুসংবাদের কথা সাহাবায়ে কেরামের মাঝে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়ে গেল।

এই সুসংবাদেরও রয়েছে একটি চমৎকার কাহিনী, যা বর্ণনা করেছেন কায়েস ইবনে আব্বাদসহ আরও কয়েকজন বর্ণনাকারী।

এখানে শুধু কায়েস ইবনে আব্বাদের বর্ণনাটি তুলে ধরা হচ্ছে। তিনি বর্ণনা করেন,

'আমি একদিন মসজিদে নববীর একটি ইলমী মজলিসে বসেছিলাম, সেই মজলিসে ছিলেন একজন আকর্ষণীয় বৃদ্ধ শিক্ষক—যার আলোচনা ছিল খুবই হৃদয়গ্রাহী।

লোকজনের মাঝে হাদীসের দরস পেশ করে যখন তিনি উঠে চলে গেলেন তখন উপস্থিত সকলেই বলতে লাগল,

'কেউ যদি জান্নাতী মানুষকে দেখে আনন্দ পেতে চায় সে যেন এই মানুষটিকে দেখে।'

একথা শোনার পর আমি তাদের কাছে জানতে চাইলাম,

'এই লোকটি কে?'

তারা বলল, 'তার নাম—আবদুল্লাহ ইবনে সালাম।'

আমি মনে মনে সিদ্ধান্ত নিলাম, অবশ্যই আমি তাঁর অনুসরণ করব। আমি তাঁর পিছু নিলাম। তিনি যেতে যেতে মদীনা শহরের শেষ প্রান্তে গিয়ে নিজের বাড়িতে প্রবেশ করলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে আমিও পৌঁছে দরজায় আওয়াজ দিলাম। তিনি এসে জিজ্ঞাসা করলেন,

'কী চাও ব্যাটা?'

আমি বিনয়ের সঙ্গে বললাম,

'আপনি মজলিস শেষ করে চলে আসার পর লোকজন বলছিল, 'যদি কেউ জান্নাতী মানুষকে দেখে আনন্দ পেতে চায়, সে যেন এই লোকটিকে দেখে।'

এই কথা শোনার পর আমার কৌতূহল হলো। সেই জন্যই আপনার পিছে পিছে এতদূর চলে এসেছি। আপনার সম্পর্কে জানতে চাই। জানতে চাই যে লোকেরা কিভাবে জানতে পারল. আপনি জান্নাতী মানুষ?

তিনি বললেন, 'আল্লাহই ভালো জানেন কে জান্নাতী মানুষ আর কে নয়।'

আমি বললাম, 'নিশ্চয় আল্লাহ ভালো জানেন। কিন্তু তারা যেটা বলাবলি করছে এর পেছনেও নিশ্চয় কোনো কারণ রয়েছে। আমি জানতে চাই কী সেই কারণ?'

তিনি বললেন, 'বেটা! আমি তোমাকে এখনই বলছি সেই কারণ।'

আমি বললাম, 'ঠিক আছে বলুন। জাযাকাল্লাহু খাইরান।'

তিনি বললেন,

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় একরাতে আমি স্বপ্নে দেখলাম যে আমার কাছে এক ব্যক্তি এসে বললেন, 'উঠুন।' আমি তার কথামতো উঠে দাঁড়ালাম। লোকটি তখন আমার হাত শক্ত করে ধরে হাঁটতে শুরু করলেন। কিছুদূর যেতেই আমি বাম দিকে একটি রাস্তা দেখে সেইদিকে যেতে চাইলাম।

তিনি আমাকে বাধা দিয়ে বললেন,

'ওটা আপনার পথ নয়।'

তখন আমি ডানদিকে তাকিয়ে দেখলাম আরও একটি সুন্দর সুপ্রশস্ত পথ সেদিকে আছে।

তিনি বললেন,

'এই পথে চলুন।'

ডানদিকের সেই সুপ্রশস্ত পথ ধরে চলতে থাকলাম। চলতে চলতে একটি চমৎকার ফুল ও ফলে ভরা, সবুজ-শ্যামল, মনোমুগ্ধকর বাগানে পৌঁছে গেলাম।

বাগানটির ঠিক মাঝ বরাবর দেখলাম একটি বিশাল বড় লোহার খুঁটি। যার মূল অংশ জমিনে আর শেষ প্রান্ত আসমানে উঠে গেছে।

তার উর্ধ্বে দেখতে পেলাম একটি সোনার আঙটা বা হাতল।

লোকটি আমাকে বললেন, 'এই খুঁটিতে চড়ুন।'

আমি বললাম, 'এত উঁচু খুঁটিতে কিভাবে চড়ব? আমি পারব না।'

তখন একজন সাহায্যকারী এসে আমাকে সাহায্য করল। প্রথমে সে আমাকে উঁচু করে ধরল। লোকটির সাহায্যে আমি উপড়ে চড়তে লাগলাম। চড়তে চড়তে খুঁটির একেবারে শেষ মাথায় পৌঁছে গেলাম এবং দুই হাত দিয়ে শক্ত করে সেই সোনার হাতল ধরে রাখলাম।

এভাবে হাতলটি ধরে থাকতে থাকতেই আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল।

যখন সকাল হলো, আমি ব্যাকুল হয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে হাজির হলাম। তাঁর কাছে সবিস্তারে আমার স্বপ্নের বিবরণ দিলাম।

সবকথা শোনার পর তিনি বললেন,
'তোমার বামদিকে যে রাস্তা দেখেছিলে, সেটা ছিল বামপন্থী অর্থাৎ জাহান্নামীদের পথ।

আর যে পথটি দেখেছিলে ডান দিকে, সেটা হলো ডানপন্থীদের অর্থাৎ জান্নাতীদের পথ।

আর সুপ্রশস্ত, ফুলে-ফলে ভরা, সবুজ- শ্যামল যে বাগানটি দেখে তুমি মুগ্ধ হয়ে পড়েছিলে—সেটাই হলো দীন ইসলাম।

বাগানের ঠিক মধ্যখানের বিশাল খুঁটির ব্যাখ্যা হলো—দীনের খুঁটি।
সোনার হাতলটি ছিল সুদৃঢ় রশি 'আল্-উরওয়াতুল উসকা।'
এখনো যা তুমি মজবুত ভাবে আঁকড়ে ধরে আছ এবং ধরেই থাকবে মৃত্যু পর্যন্ত।

তথ্যসূত্র :

১. *আল-ইসাবা*, ২য় খণ্ড, ৩২০ পৃষ্ঠা, *আত্তারজামা* ৪৭২৫।
২. *তারীখুল ইসলাম* লিয-যাহাবী, ২য় খণ্ড, ২৩০-২৩১ পৃষ্ঠা।
৩. *আল-ইসতীআব*, ২য় খণ্ড, ৩৮২ পৃষ্ঠা।
৪. *আল-জারহু ওয়াত-তাদীল*, ২য় খণ্ড, ৬২-৬৩ পৃষ্ঠা।
৫. *তাজরীদু আসমাইস সাহাবা*, ১ম খণ্ড, ৩৩৮-৩৩৯ পৃষ্ঠা।
৬. *তারীখু দিমাশ্‌ক* লিবনি আসাকির,৭ম খণ্ড, ৪৪৩-৪৪৮ পৃষ্ঠা।
৭. *হায়াতুস সাহাবা*, ৪র্থ খণ্ডের সূচিপত্র দ্রষ্টব্য।
৮. *আস-সীরাতুন্নববিয়্যাহ* লিবনি হিশাম, সূচিপত্র দ্রষ্টব্য।
৯. *শাযারাতুয যাহাব*, ১ম খণ্ড, ৫৩ পৃষ্ঠা।
১০. *উসদুল গাবাহ*, ৩য় খণ্ড, ১৭৬-১৭৭ পৃষ্ঠা।
১১. *সিফাতুস সফওয়াহ*, ১ম খণ্ড, ৩০১-৩০৩।
১২. *তাযকিরাতুল হুফ্‌ফায*, ১ম খণ্ড, ২২-২৩ পৃষ্ঠা।
১৩. *আল-ইবার*, ১ম খণ্ড, ১৫-৩২ পৃষ্ঠা।
১৪. *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, ৩য় খণ্ড, ২১১-২১২ পৃষ্ঠা।
১৫. *তারীখু খলীফা ইবনে খয়্যাত*, ৮ পৃষ্ঠা।

খালেদ ইবনে সাঈদ ইবনুল আস

আমার পিতা খালিদ ছিলেন ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে পঞ্চম ব্যক্তি তিনিই সর্বপ্রথম লিখেছিলেন বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

—খালিদের মেয়ে।

মক্কা নগরীর এক শান্ত নিরিবিলি বিকেল। খালিদের পিতা সাঈদ ইবনুল আস। ডাক নাম আবু উহাইহা। জাহুনের নিজ বাসভবন থেকে হারামের উদ্দেশ্যে বের হলেন। দামী ঝলমলে লাল পাগড়ীটা আজ তিনি মাথায় পরেছেন। ইয়েমেনী বাদশাদের স্টাইলে দুই কাঁধের ওপর দিয়ে ঝুলিয়ে দিয়েছেন স্বর্ণসুতায় কারুকাজ করা মূল্যবান চাদর।

তার আগে আগে হেঁটে যাচ্ছে তরবারি সজ্জিত তারই একদল ক্রীতদাস। তার ডানদিক দিয়ে চলছে তারই কয়েক পুত্র, যাদের শীর্ষে আছে বড় পুত্র খালিদ।

বাম পাশে তার কওম 'আবদে শামসে'র ছোট্ট একদল নেতা, দামী রেশমী পোশাক পরা এই নেতারা বেশ গর্বভরে হেঁটে চলেছেন।

আবু উহাইহা যখন হারামের মধ্যে প্রবেশ করলেন, তাকে দেখে লোকজন বলতে লাগল,

'মুকুটধারী' সরদার এসে পড়েছেন।' তাকে এই নামে আখ্যায়িত করার কারণ হলো, তিনি যখন পাগড়ী পরতেন, সেটা না খোলা পর্যন্ত বংশের আর কেউ তার মতো একই রঙের পাগড়ী পরত না।

উপস্থিত লোকজন তার সম্মানে রাস্তা ছেড়ে দিলে তিনি কাবার সন্নিকটে নিজের আসনে গিয়ে বসে পড়লেন।

তাকে অভিবাদন জানাতে এগিয়ে এলেন আবু সুফিয়ান ইবনে হারব, উতবা ইবনে রাবীআ, আবু জাহল ইবনে হিশাম প্রমূখ কুরাইশী নেতৃবৃন্দ। আবু উহাইহা তাদের কাছে উষ্মা প্রকাশ করে বললেন,

'এগুলো কী শুনতে পাচ্ছি? সাদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস নাকি মুহাম্মাদের দলে জুটেছে? তার এতবড় স্পর্ধা যে তাকে নামাযে বাধা দেওয়ার কারণে একজন কুরাইশীকে মেরে রক্তাক্ত করেছে। সে এতবড় দুঃসাহস কিভাবে দেখাতে পারল?'

এরপর তিনি নিজের দৃপ্ত অঙ্গীকার ব্যক্ত করে বললেন,

'তোমরা যদি বনূ হাশেমের প্রতি সমীহ দেখিয়ে মুহাম্মাদকে এভাবে ঢিল দিতে থাক, তাহলে লাত আর উয্যার কসম! আমি একাই এইসব অনাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াব... আমি একাই মক্কার এই পবিত্র জমিন থেকে মুহাম্মাদের মাবুদের ইবাদত প্রতিরোধ করে ছাড়ব।'

এরপর যেভাবে দলবল নিয়ে এসেছিলেন সেভাবেই গটগট করে ফিরে গেলেন। শুধু তার ছেলে খালিদ ফিরে গেল না। রয়ে গেল সেখানেই।

* * *

খালিদ ইবনে সাঈদ ইবনুল আস হারামের মধ্যে লোকজনের বিভিন্ন সমাবেশে ঘুরে ঘুরে মুহাম্মাদের খবর সংগ্রহ করতে লাগল। তার দাওয়াত সম্পর্কে মানুষের মন্তব্য শুনতে থাকল।

অনেক কথাই সে শুনল। কিন্তু তাতে এমন কিছুই সে খুঁজে পেল না যার ভিত্তিতে মুহাম্মাদ ও তাঁর সঙ্গীদের বিরুদ্ধে তার পিতার এত বেশি

রাগ ও ঘৃণাকে বৈধ বলা যায়। সে মুহাম্মাদের প্রতি তার পিতা ও কুরাইশ নেতাদের এত বেশি বিদ্বেষকে কিছুতেই যুক্তিসঙ্গত হিসাবে মেনে নিতে পারল না।

* * *

রাতে খালিদ বাড়ি ফিরে এল। প্রতিদিনের মতো পিতার ঘরে 'শুভ সন্ধ্যা' বলতে না গিয়ে সে আজ সোজা চলে গেল নিজের ঘরে।

এরপর সে নিজের আরামদায়ক কোমল বিছানায় শুয়ে পড়ল ঘুমানোর উদ্দেশ্যে।

কিন্তু খালিদের দু'চোখে আজ কিছুতেই ঘুম এল না। কিসের এক ভাবনা যেন তার দু'চোখ থেকে ঘুমকে তাড়িয়ে দিয়েছে বহুদূর।

আজ তার সমস্ত ভাবনাজুড়ে বারবার ঘুরপাক খাচ্ছে শুধু মুহাম্মাদ ও তাঁর দাওয়াতের কথাগুলো। লোকজনের মুখে শুনে আসা কথাগুলো তার হৃদয়কে চুম্বকের মতো টানছে মুহাম্মাদ ও তাঁর দীনের দিকে। কিন্তু তারপর... পিতার ভয়ঙ্কর প্রতিক্রিয়ার কথা কল্পনা করলেই সে আঁতকে উঠছে। আজ বিকেলে কুরাইশ নেতাদের সামনে তার যে অগ্নিমূর্তি দেখেছে, সেটাই বারবার তার মানসপটে ভেসে উঠছে।

* * *

রাতের শেষ প্রহরে তন্দ্রা তার দু'চোখের পাতা ভারী করে দিল। সে ঘুমের কোলে ঢলে পড়ল।

কিন্তু সামান্য সময় যেতে না যেতেই সে আতঙ্কিত ও বিবর্ণ চেহারা নিয়ে বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠল। স্বপ্নের ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখে, কষ্টের তীব্রতায় কাঁপতে কাঁপতে বলতে লাগল,

‘আল্লাহর কসম! এটা এক বাস্তব ও সত্য স্বপ্ন। যা দেখেছি তা কিছুতেই মিথ্যা নয়।’

* * *

খালিদ স্বপ্নে দেখল, জাহান্নামের একটি ধ্বংসাত্মক ও ভয়ঙ্কর অতল গভীর উপত্যকার কিনারে সে দাঁড়িয়ে। যার ভেতরে দাউ দাউ করে জ্বলছে ভয়াবহ আগুন, যার তীব্র গর্জনে বুক কেঁপে উঠছে আর ভয়ে অন্তরের পানি শুকিয়ে যাচ্ছে। যখনই সে ঐ ভয়াবহ জাহান্নামের কিনার থেকে দূরে সরে যেতে চাইল হঠাৎ কোথাও থেকে তার পিতার অবির্ভাব হলো। তিনি জোর করে তাকে জাহান্নামের সেই ভয়াবহ আগুনের মধ্যে টেনে নিতে চাইলেন। সে সর্বশক্তি দিয়ে পিতার হাত থেকে নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা করতে থাকল। চরম ধস্তাধস্তির এক পর্যায়ে তার শক্তি ও সংকল্প দুর্বল হয়ে পড়ল এবং জাহান্নামের গভীর তলদেশে নিক্ষিপ্ত হওয়ার উপক্রম হয়ে গেল। ঠিক এমনি কঠিন মুহূর্তে সামনে এসে দাঁড়ালেন মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ। দুই হাত দিয়ে তিনি শক্ত করে তার কোমর বন্ধনী আঁকড়ে ধরে সজোরে তাকে নিজের দিকে টেনে নিলেন এবং জাহান্নামের গভীর তলদেশে পতিত হওয়া থেকে তাকে বাঁচালেন।

* * *

প্রভাতের আলো চারদিকে ছড়িয়ে পড়লে খালিদ ইবনে সাঈদ ছুটে চলে গেল আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহুর বাড়ি। কারণ, তাঁর কাছেই সে শান্তি পেত, তাঁর বুদ্ধি-পরামর্শেই লাভ করত স্বস্তি।

তার স্বপ্নের বিবরণ শুনে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে অভয় দিয়ে বললেন,

‘আল্লাহ তোমার মঙ্গল চেয়েছেন হে খালিদ!’

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সত্য ও নির্ভুল জীবনাদর্শ দিয়ে পাঠিয়েছেন মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহকে। আর অতিসত্বর তাঁর আনীত এই দীন ইসলাম অন্য সকল দীন-ধর্মের ওপর প্রবল ও বিজয়ী হয়ে উঠবে। তাতে মুশরিকদের অন্তর্জালা যতই বাড়ুক না কেন।

সুতরাং হে খালিদ! তুমি মুহাম্মাদের অনুসরণ করো।

তুমি যদি তাঁর অনুসারী হয়ে যাও, তাহলে জান্নাতের সকল দুয়ার তোমার জন্য খুলে দেওয়া হবে আর জাহান্নাম থেকে তোমাকে বাঁচানোর সকল ব্যবস্থা করা হবে। তোমার পিতা হবে অবধারিত জাহান্নামী যে তোমাকেও ফেলতে চায় সেই জাহান্নামের গভীর তলদেশে।'

* * *

খালিদ ইবনে সাঈদ আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর কথামতো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খোঁজে বেরিয়ে পড়ল। সেদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কার পাহাড়ী উপত্যকায় লুকিয়ে আল্লাহর ইবাদত করছিলেন। খালিদ খোঁজ নিয়ে সেখানেই গিয়ে হাজির হলো। সালাম দিয়ে জিজ্ঞাসা করল,

'হে মুহাম্মাদ! আপনি কিসের দাওয়াত প্রদান করে থাকেন?'

জবাবে তিনি বললেন,

'আমার আহ্বানে আমি মানুষকে বলে থাকি যে তোমরা বিশ্বাস স্থাপন করবে এক-অদ্বিতীয় ও লা-শরীক আল্লাহর প্রতি এবং একথার প্রতিও যে আমি তাঁর বান্দা ও রাসূল। তোমরা পাথরের তৈরি যে দেব-দেবীর পূজা করে থাক—যারা দেখে না, শোনে না, যারা কোনো উপকার এবং ক্ষতি করতে পারে না, কে তাদের পূজারী ও কে বিরোধী এই পার্থক্যও যারা করতে পারে না, আমার আহ্বান ঐ সকল নিষ্প্রাণ, অন্ধ, মূক ও বধির দেব-দেবীর পূজা সম্পূর্ণরূপে বর্জন করতে হবে।'

এসব কথা শুনে খালিদের হৃদয়ে ঈমানের নূর জ্বলে উঠল। সেই নূরের ঝলক দেখা গেল তার চেহারায়। দ্বিধা-সংশয়ের অস্বচ্ছতা দূর হয়ে ঐ চেহারায় ফুটে উঠল সিদ্ধান্ত ও সংকল্পের দৃঢ়তা। তিনি সুস্পষ্ট আওয়াজে ঘোষণা দিলেন,

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَنَّكَ عَبْدُ اللّٰهِ وَرَسُوْلُه

'আমি দ্বিধাহীন কণ্ঠে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই, আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আপনি আল্লাহর বান্দা ও রাসূল।'

খালিদ ইবনে সাঈদ ইবনুল আস হয়ে গেলেন জমিনের বুকে ইসলাম গ্রহণকারীদের তালিকায় পঞ্চম অথবা ষষ্ঠ[১] ব্যক্তি। এই মহান অনুগ্রহ অর্জনে খাদীজা বিনতে খুওয়ালিদ, যায়েদ ইবনে হারেসা, আলী ইবনে আবী তালেব, আবু বকর সিদ্দীক ও সাদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস রাযিয়াল্লাহু আনহুম ছাড়া আর কেউই তার চেয়ে অগ্রগামী হতে পারেননি।

* * *

খালিদ ইবনে সাঈদ ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহু আনহু হাজূনের উঁচু ভূমিতে অবস্থিত পিতার উচ্চ প্রাসাদের অবস্থান ত্যাগ করলেন। সুখ-স্বাচ্ছন্দে ভরা বিলাসী জীবনের মোহ বিসর্জন দিলেন।

পার্থিব জীবনের সকল মোহ-মায়ার আকর্ষণ পিছে ফেলে তিনি মিলিত হলেন প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে তাঁর দাওয়াতী কাফেলায়। কখনো প্রিয় নবীর সঙ্গে কখনো সাহাবীদের সঙ্গে মিলিত হতে লুকিয়ে লুকিয়ে মক্কার উপত্যকায় আসা-যাওয়া করতে থাকলেন।

---

১. শুধু পুরুষদের হিসাব করলে খালিদ পঞ্চম আর নারী-পুরুষ মিলিয়ে ষষ্ঠ।

আর এভাবেই ঈমানী শক্তি ও অনুভূতিতে সমৃদ্ধ হতে থাকলেন। নবীয়ে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর অবতীর্ণ কুরআনের আয়াতসমূহ মুখস্ত করলেন। কুরাইশ ও নিজ পিতার অত্যাচারের ভয়ে গোপনে গোপনে ইবাদত করে যেতে লাগলেন।

ইসলাম গ্রহণ করে ইসলামের এ সকল কার্যক্রমে ব্যস্ত থাকার কারণে স্বভাবিক ভাবেই বাড়িতে তাঁর অনুপস্থিতি দীর্ঘ হতে থাকল। যার ফলে তার পিতা কয়েকবার তাকে খুঁজে খুঁজেও পেলেন না। তখন তিনি খোঁজ নেওয়ার জন্য কয়েকজন গুপ্তচর পাঠালেন। যারা এসে খবর দিল, খালিদ ইসলাম গ্রহণ করে মুহাম্মাদের অনুসারী হয়ে গেছে।

* * *

মক্কার সরদার হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন ছেলের এই সংবাদ শোনার পর। তিনি কখনো কল্পনাও করতে পারেননি, তার কোনো সন্তান তার নিয়ন্ত্রণের বাইরে যাওয়ার মতো দুঃসাহস দেখাতে পারবে। লাত-উয্যার পূজা ত্যাগ করে মুহাম্মাদের সঙ্গে মিলিত হবে।

তিনি খালিদকে ডেকে আনার জন্য ক্রীতদাস 'রাফে' আর দুই ছেলে 'আবান' ও 'উমর'কে পাঠালেন। তারা গিয়ে তাকে খুঁজে পেল একটি নির্জন পাহাড়ী পথে। তারা দেখল তাদের আজন্ম পরিচিত খালিদ তাদের অচেনা পদ্ধতিতে অদেখা প্রভূর কাছে ভারি চমৎকার ভাবে প্রার্থনা করছে, যা দেখে তারা সকলেই আবেগাপ্লুত হয়ে উঠল...

তাদের হৃদয়ে এক অপার্থিব শান্তি ও প্রশান্তি জেগে উঠল...
মনে হলো এই সুখের সন্ধান তারা এই প্রথম পেল...

প্রার্থনা শেষ হলে তারা খালিদকে জানাল,
'বাবা তোমাকে ডেকেছেন, তুমি তাকে না বলে বাড়ি থেকে বেড় হয়েছ বলে তিনি তোমার ওপর ভীষণ রেগে আছেন।'

খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু তাদের সঙ্গে বাড়ি ফিরলেন এবং পিতার কাছে গিয়ে ইসলামী পদ্ধতিতে সালাম দিলেন।

সালাম শুনেই পিতা রেগে বললেন,

'মুখপোড়া! তুই তোর বাপ-দাদা আর পূর্ব-পুরুষের ধর্ম ছেড়ে মুহাম্মাদের অনুসরণ করছিস। এত বড় সাহস তোর?'

খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু অত্যন্ত শান্তভাবে জবাব দিলেন,

'আমি কোনো ধর্ম ছাড়িনি, আমি শুধু এক ও অদ্বিতীয় লা-শারীক আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি আর তাঁর রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াতকে সত্য বলে স্বীকার করেছি। একই সঙ্গে আল্লাহকে বাদ দিয়ে আপনাদের পূজিত নিষ্প্রাণ সকল দেব-দেবীকে বর্জন করেছি।'

পিতা বললেন,

'আরে মূর্খ গাধা! ঐ মিথ্যা নবুওয়াতের দাবিদারকে তুই সত্য বলে স্বীকার করে নিয়েছিস?'

খালিদ বললেন,

'বাবা! তিনি মিথ্যা দাবিদার নন, তিনি পরিপূর্ণ সত্যবাদী নবীরূপে তাঁর প্রতিপালকের বাণী প্রচার করছেন। আমার আপনার ও গোটা মানবজাতির কল্যাণে তিনি কাজ করে যাচ্ছেন।'

পিতা বললেন,

'তোমাকে অবশ্যই ঐ পথ ছেড়ে আসতে হবে। মুহাম্মাদকে মিথ্যাবাদী বলতে হবে?'

খালিদ বললেন,

'যতক্ষণ আমার হৃদয়ে প্রাণের স্পন্দন চলতে থাকবে, যতক্ষণ আমার ধমনিতে রক্তধারা প্রবাহমান থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমার পক্ষে এ কাজ করা সম্ভব হবে না।'

‘তাহলে তোমার খাদ্য পানি সব বন্ধ করে দেব। তোমাকে না খেয়ে মরতে হবে।’

‘আমি মনে করেছিলাম আপনি আরও ভয়ঙ্কর কিছু করবেন। অতএব, এতে আমি ভীত নই। রইল খাদ্য পানির ব্যাপার, তো যে আল্লাহ আপনাকে দেন তিনিই আমাকেও দেবেন।’

ছেলের মুখে এই কথা শুনে বনী আবদে শামসের সরদার রাগে ফেটে পড়লেন। আগে থেকে প্রস্তুত রাখা শক্তপোক্ত এক লাঠি দিয়ে তাকে পেটাতে লাগলেন। মারতে মারতে তার মাথা ফাটালেন। সারা শরীর রক্তাক্ত হয়ে গেলে তিনি হুকুম করলেন তার হাত-পা বেঁধে একটি অন্ধকার ঘরে ফেলে রাখতে।

তিনদিন পর্যন্ত তাকে কিছুই খেতে দেওয়া হলো না। এক ঢোক পানিও না।

চতুর্থ দিন কয়েকজন আত্মীয় এসে তাকে জিজ্ঞাসা করল,

‘কেমন আছ হে খালিদ?’

‘আমি তো মহান আল্লাহর অগণিত দয়া ও অনুগ্রহের মধ্যে হাবুডুবু খাচ্ছি।’

‘এখনো কি তোমার স্বাভাবিক বুদ্ধি-শুদ্ধিতে ফিরে এসে পিতার কথা মেনে নেওয়ার সময় হয়নি?’

‘আমি তো স্বজ্ঞানে ও স্বাভাবিক অবস্থাতেই আছি। আর আমার আল্লাহকে অমান্য করে তো পিতাকে মানা সম্ভব নয়।’

‘লাত ও উয্‌যা দেবীর ব্যাপারে কিছু একটা বলে তোমার বাবাকে খুশি করে দাও, তাহলে তিনি তোমার কষ্ট দূর করে দেবেন।’

‘লাত ও উয্‌যা হলো মূক, বধির নিষ্প্রাণ পাথরমাত্র। এদের ব্যাপারে এমন কোনো কথা বলা সম্ভব নয় যা আল্লাহ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামকে অসন্তুষ্ট করবে। বাবার যা ইচ্ছা তাই করুন, কিছু এসে যায় না।'

* * *

আবু উহাইহা তার চামচাদের হুকুম দিলেন প্রতিদিন ঠিক দুপুর বেলা যেন খালিদকে শক্ত করে হাত-পা বেঁধে তপ্ত বালুর মধ্যে ফেলে পাথর চাপা দিয়ে রাখা হয়। যেন উপরের সূর্যতাপ আর নিচের পাথর ও বালুর উত্তাপে সে দগ্ধ হতে থাকে।

চামচারা যখন নির্দেশমতো খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে মক্কার উত্তপ্ত মরুভূমিতে ফেলে রেখে আসত, তিনি তখন ঈমান ও ইসলামের মজা পেয়ে বলতেন,

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ أَكْرَمَنِىْ بِالْإِيْمَانِ وَأَعَزَّنِىْ بِالْإِسْلَامِ ....

'সকল প্রশংসা সেই মহান আল্লাহর জন্য যিনি আমাকে দয়া করে ঈমান ও ইসলামের মতো এত বড় ইজ্জত ও মর্যাদায় ভূষিত করেছেন।

আবু উহাইহার এই সকল দীর্ঘ শাস্তি আমার কাছে সেই জাহান্নামের এক মুহূর্তের আযাবের চেয়েও তুচ্ছ, যেখানে তিনি আমাকে নিক্ষেপ করতে চান।

আল্লাহ তাআলা আমার ও সকল মুসলিমের পক্ষ থেকে তাঁর মনোনীত ও নির্বাচিত নবীকে সর্বোত্তম পুরস্কারে ভূষিত করুন।'

হঠাৎ খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর সামনে এক বিরাট সুযোগ এসে যায়। সঙ্গে সঙ্গেই তিনি পিতার বন্দীখানা থেকে পালিয়ে যান রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে।

এরপর দেখতে না দেখতেই তার দুই ভাই 'উমর' ও 'আবান' তার সঙ্গে গিয়ে মিলিত হন কল্যাণ ও আলোর মিছিলে। শামিল হয়ে যায়

ইসলাম গ্রহণকারীদের দলে। তখন আবু উহাইহা পড়ে যায় একেবারে দিশেহারা অবস্থায়। মহাবিপদ আর দুশ্চিন্তায় পড়ে বেচারা বলতে থাকে,

'লাত-উয্যার কসম! আমি আমার সকল অর্থ-সম্পদ নিয়ে মক্কা ছেড়ে দূরে চলে যাব। সেটাই হবে আমার জন্য সর্বোত্তম ব্যবস্থা। আমার পূর্বপুরুষের ধর্মত্যাগী ইসলাম গ্রহণকারী ঐ কুলাঙ্গারদের চিরতরে ত্যাগ করব যারা আমার উপাস্য দেবতাদের গালাগালি করে।'

এরপর তিনি তায়েফের নিকটবর্তী একটি গ্রামাঞ্চলে গিয়ে বসবাস করতে থাকেন এবং বুকভরা আক্ষেপ ও বেদনা নিয়ে মুশরিক অবস্থাতেই মৃত্যুর মুখে পতিত হন।

* * *

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের মক্কা ছেড়ে হাবশায় হিজরত করার অনুমতি দিলে খালিদ ইবনে সাঈদ রাযিয়াল্লাহু আনহু তার স্ত্রী আমীনা বিনতে খালফ আল্-খুযাইয়্যাহকে সঙ্গে নিয়ে হাবশায় চলে গেলেন। দশ বছরেরও বেশি সেখানে অবস্থান করে মানুষকে আল্লাহর পথে আহ্বান করতে থাকেন। এরপর হাবশা ছেড়ে তিনি মদীনায় এসেছেন শুধু তখনই যখন আল্লাহ তাআলা মুসলিমদের হাতে খায়বারের বিজয় দান করেছেন।

খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর মদীনায় ফিরে আসায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুবই খুশি হন। এবং যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের মতো খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে গনিমতের অংশে শরীক করে নেন।

এর কিছুদিন পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে ইয়েমেনের গভর্নর নিযুক্ত করলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাত পর্যন্ত তিনি সেই দায়িত্ব পালন অব্যাহত রাখেন।

* * *

আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহুর শাসনামলে খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু রোমানবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধের উদ্দেশ্যে সিরিয়ায় প্রেরিত মুসলিমবাহিনীর পতাকাতলে শামিল হন। এরপর যুদ্ধের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ময়দানে দুঃসাহসী বীরযোদ্ধা হিসেবে কৃতিত্বের সঙ্গে লড়াই করতে থাকেন।

দামেস্কের নিকটবর্তী অঞ্চলে সংঘটিত 'মারজিস্ সুফ্ফার' যুদ্ধের অল্প কয়েকদিন পূর্বে খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বিয়ের প্রস্তাব দেন উম্মে হাকীম বিনতে হারেসের কাছে। তিনি রাজি হলে যথারীতি তাদের বিয়ে হয়ে যায়। তিনি বাসর রাত যাপন করতে চাইলে উম্মে হাকীম বলেন,

'হে খালিদ! কতইনা ভালো হতো যদি তুমি মাত্র কয়েকটা দিন বিলম্ব করতে, আর এই যুদ্ধ শেষ করে সবাই ফিরে যেত!'

খালিদ বললেন,

'আমার মন বলছে এই যুদ্ধে আমি শহীদ হয়ে যাব। অতএব বিলম্বের সুযোগ নেই।'

এরপর বাসর যাপন শেষে পরদিন সকালে সহযোদ্ধা বন্ধুদের ডেকে ওলীমার সুন্নতও পূর্ণাঙ্গরূপে পালন করলেন। আমন্ত্রিত মেহমানরা খাওয়া শেষ করে উঠতে না উঠতেই রোমানবাহিনী ময়দানে সারিবদ্ধ হতে শুরু করল।

যুদ্ধের ময়দানে উভয় দল মুখোমুখি দাঁড়াল। রোমানবাহিনীর একজন যোদ্ধা সারি থেকে সামনে এগিয়ে মুসলিমবাহিনীর উদ্দেশ্যে একাকী তার সঙ্গে লড়ার জন্য চিৎকার করে চ্যালেঞ্জ করতে থাকলে হাবীব ইবনে সালামা সেই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে এগিয়ে গেলেন এবং কোনো সুযোগ না দিয়ে এক আঘাতেই শত্রুকে হত্যা করে ফেলেন। এবার ক্ষিপ্ত হয়ে রোমানবাহিনীর অন্য এক সৈনিক এগিয়ে এসে লড়াই করার আমন্ত্রণ জানালে এগিয়ে গেলেন খালিদ ইবনে সাঈদ রাযিয়াল্লাহু আনহু। দু'জন

মুখোমুখি হয়ে একে অন্যের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। উভয়েই প্রাণঘাতি আক্রমণ চালাল।

খালিদ ইবনে সাঈদের আক্রমণ ব্যর্থ হলো কিন্তু রোমান সৈন্যের তরবারি অব্যর্থভাবে আঘাত করল খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে। সঙ্গে সঙ্গেই শহীদ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল তাঁর দেহ।

একজন একজন করে মল্লযুদ্ধের পালা শেষ হয়ে শুরু হয়ে গেল দুই বাহিনীর সম্মিলিত যুদ্ধ। ভয়ঙ্কর সেই যুদ্ধে তরবারির ঝনঝনানি আর আহত নিহতদের আর্ত-চিৎকার ছাড়া আর কিছুই শোনা যাচ্ছিল না।

যুদ্ধে এই রকম এক ভয়াবহ পরিস্থিতিতে ছোট্ট শিশুশাবক হারানো মা সিংহের মতো লাফিয়ে উঠলেন উম্মে হাকীম রাযিয়াল্লাহু আনহা। নববধূর সাজপোশাক শক্ত করে বাঁধলেন। বাসর রাতের সাক্ষী তাঁবুর খুঁটিগুলি উপড়ে ফেলে দিলেন। সরাসরি যোদ্ধাদের মধ্যে ঢুকে পড়ে সম্মুখ যুদ্ধে নেমে পড়লেন। ভয়ঙ্কর আক্রমণ চালিয়ে এক এক করে সাতজন রোমানসৈন্যকে হত্যা করে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি লড়াই অব্যাহত রাখলেন।

এই যুদ্ধের সমাপ্তি হলো ইসলাম আর মুসলিমবাহিনীর সুস্পষ্ট বিজয়ের মধ্য দিয়ে।

* * *

এই ভয়াবহ যুদ্ধের বিজয় কিনতে মুসলিমবাহিনীকে মূল্য হিসাবে পরিশোধ করতে হলো কিছু তরতাজা প্রাণ। আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে আর তাঁর সন্তুষ্টি হাসিল করে শাহাদাতের মর্যাদা নিয়ে যারা পৌঁছে গেলেন আপন প্রভূর সান্নিধ্যে।

খালিদ ইবনে সাঈদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর বিদেহী আত্মা সেই সকল শহীদ আত্মার মাঝে খুশিতে ডানা ঝাপটাচ্ছিল।

এদিকে খালিদ ইবনে সাঈদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর হত্যাকারী হঠাৎ দেখতে পেল আকাশে একটি উজ্জ্বল আলো ছড়িয়ে পড়ল। এরপর সেই উজ্জ্বল ও ঝলমলে আলো এসে খালিদের দেহ ও আশপাশকে আলোকিত করে দিল।

এই দৃশ্য দেখে সে ভীষণ লজ্জিত হলো এই ভেবে যে, যার মৃতদেহকে আকাশ আলোকিত করে এমন মহান মানুষকে আমি হত্যা করেছি? ছিঃ।

অবশেষে এটাই কারণ হয়ে গেল তার আল্লাহর দীনে প্রবেশ করার আর ইসলাম কবুল করে মুক্তির মিছিলে শামিল হওয়ার।

তথ্যসূত্র :

১. *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, ৩য় খণ্ড, ৩২ পৃষ্ঠা।
২. *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, ৪র্থ খণ্ড, ৯৪ পৃষ্ঠা।
৩. *হায়াতুস সাহাবা*, ১ম খণ্ড, ৯১-৯৪ পৃষ্ঠা।
৪. *আল-ইসাবা*, ১ম খণ্ড, ৪০৬ পৃষ্ঠা।
৫. *আল-ইসতীআব*, ১ম খণ্ড, ৩৯৯ পৃষ্ঠা।

সুরাকা ইবনে মালেক

হে সুরাকা! তখন তোমার কী অনুভূতি হবে যখন দু'হাতে পরবে পারস্যসম্রাট কিসরার দুই হাতের বালা?!

-মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

এক সকালে কুরাইশের লোকজনের চেহারায় উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠা ছেয়ে গেল। তাদের আড্ডাখানাগুলো থেকে সকলের কানে এই সংবাদ এল যে, 'রাতের আঁধারে মুহাম্মাদ মক্কা থেকে চুপি চুপি পালিয়ে গেছে।' কুরাইশের নেতারা কেউই সংবাদটি বিশ্বাস করল না। কারণ তারা জানে, সকল গোত্রের যুবক ছেলেরা মিলে গতরাতে মুহাম্মাদের বাড়ি ঘেরাও করে রেখেছিল।

তবুও কথাটি শোনার পর তারা খোঁজ নিতে বের হলো। বনূ হাশিমের প্রতিটি বাড়ি তন্ন তন্ন করে খুঁজে কোথাও তাঁকে পাওয়া গেল না। এরপর তাঁর প্রত্যেক সহচরের বাড়ি খুঁজতে খুঁজতে তারা এসে পড়ল আবু বকর সিদ্দীকের বাড়ি। কুরাইশের বড় বড় নেতাদের দেখে ভেতর থেকে বের হয়ে এলেন তার বড় মেয়ে আসমা বিনতে আবী বকর।

আবু জাহল তাকে জিজ্ঞাসা করল,
'এই মেয়ে! তোমার বাবা কোথায়?'

আসমা খুবই চমৎকারভাবে বললেন,

'জানি না এই মুহূর্তে তিনি কোথায়।'

ভীষণ রাগে আবু জাহল তার গালে এত জোরে থাপ্পর মারল যে তার কানের দুলজোড়া ছিটকে পড়ে গেল মাটিতে।

* * *

কুরাইশের বড় বড় নেতারা যখন জানতে পারল যে 'মুহাম্মাদের মক্কা ছেড়ে চলে যাওয়া'র সংবাদটি সত্য, তখন তাদের মাথা নষ্ট হয়ে যাওয়ার মতো অবস্থা। পায়ের চিহ্ন দেখেই যারা ব্যক্তিকে চিহ্নিত করতে পারে সেই সকল 'পদচিহ্ন বিশেষজ্ঞ'কে তারা হাজির করল। কুরাইশ নেতারা তাদের সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল মুহাম্মাদের খোঁজে। 'সাওর' পর্বতের গুহায় পৌঁছার পর বিশেষজ্ঞরা বলল,

'আল্লাহর কসম! মুহাম্মাদ এই গুহা অতিক্রম করেনি।'

কুরাইশ নেতাদের কাছে বিশেষজ্ঞরা একটুও ভুল বলেনি। কারণ, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সঙ্গী আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু সত্যি সত্যিই সেই গুহার মধ্যে ছিলেন। কুরাইশ নেতারা গুহার বাহিরে যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেটা ছিল উঁচু আর গুহার ভেতরের জায়গা গর্তের মতো নিচু। গুহার ভেতর থেকে আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহু স্পষ্টভাবে গুহার বাহিরে কুরাইশ নেতাদের দাঁড়ানো, তাদের নড়াচড়া সব দেখতে পাচ্ছিলেন। ফলে এই বুঝি ধরা পড়ে গেলাম—ভেবে তাঁর দু'চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠেছিল।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর দিকে গভীর দৃষ্টিতে তাকালেন। সেই দৃষ্টিতে ছিল একই সঙ্গে গভীর ভালোবাসা, সান্ত্বনা ও তিরস্কার।

আবু বকর সিদ্দীক সেটা বুঝতে পেরে ফিস ফিস করে বললেন,

'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহর কসম, আমি নিজের জন্য কাঁদছি না। আমি শুধু এই আশঙ্কায় কাঁদছি যে ওরা না জানি আপনার কোনো ক্ষতি করে ফেলে।'

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শান্ত ও নিশ্চিন্ত-ভাবে বললেন,

لَا تَحْزَنْ يَا أَبَا بَكْرٍ، فَإِنَّ اللهَ مَعَنَا

'আবু বকর! চিন্তা করো না। আল্লাহ রয়েছেন আমাদের সঙ্গে।'

তখন আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহুর হৃদয়ে আল্লাহ তাআলা প্রশান্তি ঢেলে দিলেন। ফলে তিনি শঙ্কামুক্ত হৃদয়ে কুরাইশ নেতাদের পায়ের দিকে তাকিয়ে তাদের কার্যকলাপ দেখতে থাকেন আর তাদের কথাবার্তা শুনতে থাকেন।

এরপর তিনি বললেন,

'ইয়া রাসূলাল্লাহ! তারা কেউ যদি পা বরাবর নিচু হয়ে গুহার ভেতরে একটু উঁকি দেয় তাহলেই আমাদের দেখে ফেলবে।'

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একথা শুনে বললেন,

مَا ظَنُّكَ يَا أَبَا بَكْرٍ بِاثْنَيْنِ، اللهُ ثَالِثُهُمَا.

'হে আবু বকর! এমন দুইজন ব্যক্তিকে তুমি কী মনে করো যাদের তৃতীয়জন আল্লাহ!' (অর্থাৎ যেই দুইজনকে স্বয়ং আল্লাহই সাহায্য করছেন, তাদের 'দেখে ফেলা' 'ধরে ফেলা' কি এত সহজ?)

এমন সময় তারা এক কুরাইশী যুবকের কণ্ঠ শুনতে পেলেন। সে সকলকে ডেকে বলছে,

'সবাই এদিকে আসুন, একবার গুহার ভেতরে উঁকি দিয়ে দেখি।'

যুবকের এই প্রস্তাবে উমাইয়া ইবনে খালফ বিদ্রুপ করে বলে উঠল,

'আরে গাধা! গুহার মুখে এত বড় মাকড়সা আর তার অক্ষত জাল কি তোমার চোখে পড়ল না? দেখেই তো বোঝা যাচ্ছে যে এটা মুহাম্মাদের জন্মেরও আগে থেকে এখানে বসে আছে।

তবে আবু জাহল এরপরও বলে উঠল,

'লাত ও উয্যার কসম! মুহাম্মাদ এখানেই, আশপাশেই কোথাও আছে এবং সে আমাদের কথাবার্তা সব শুনছে, আমরা যা করছি সবই দেখছে।

কিন্তু তার যাদুর কারণে আমাদের চোখের ওপর পর্দা পড়ে গেছে। আমরা তাকে দেখতে পাচ্ছি না।'

* * *

এত কিছুর পরও কুরাইশ নেতারা মুহাম্মাদকে খোঁজার কর্মসূচি ত্যাগ করল না এবং তাঁকে ধরে আনার সংকল্প থেকে ফিরল না। সে জন্যই মক্কা-মদীনার মধ্যবর্তী দীর্ঘপথের আশপাশে অবস্থিত সকল গোত্রের মাঝে এই ঘোষণা পৌঁছে দেওয়া হলো,

'যে ব্যক্তি মুহাম্মাদকে জীবিত বা মৃত ধরিয়ে দিতে পারবে, পুরস্কার হিসাবে তাকে দেওয়া হবে একশো দামী উট।'

* * *

সুরাকা ইবনে মালেক মক্কার কাছাকাছি 'কুদাইদ' অঞ্চলে নিজের মাদলাজ বংশীয় মিলনায়তনে বসে ছিলেন। এমন সময় সেখানে প্রবেশ করে কুরাইশের নিযুক্ত এক দূত। সে এই গোত্রের কাছে মুহাম্মাদকে জীবিত বা মৃত ধরিয়ে দেওয়ার জন্য কুরাইশ-ঘোষিত মহামূল্যবান পুরস্কারের কথা জানাতে এসেছে।

একশো মূল্যবান উটের ঘোষণা শুনতেই সুরাকা ইবনে মালেকের ভেতরে প্রচণ্ড আগ্রহ আর লোভ জেগে উঠল। তবে তিনি ভাব-ভঙ্গিতে সেই মানোভাব কিছুতেই প্রকাশ পেতে দিলেন না। এ বিষয়ে একটি শব্দও মুখে উচ্চারণ করলেন না। যেন আর কেউ এ বিষয়ে আগ্রহী হয়ে না ওঠে।

সুরাকা নিজ আসন ছেড়ে উঠে পড়ার আগেই সেই মিলনায়তনে প্রবেশ করল তার কওমের এক ব্যক্তি। সে ভেতরে ঢুকেই সুরাকাকে সামনে পেয়ে বলতে লাগল,

‘আল্লাহর কসম! এইমাত্র আমার পাশ দিয়ে তিনজন লোক চলে গেল। আমার বিশ্বাস তারা তিনজন ছিল মুহাম্মাদ, আবু বকর আর তাদের পথপ্রদর্শক।’

সুরাকা তাকে নিবৃত করার জন্য দ্রুত বলে উঠলেন,
‘আরে না, ওরা তিনজন তো অমুক বংশের অমুক, অমুক আর অমুক। আমি জানি ওরা তো ওদের হারানো উটের খোঁজে বেরিয়েছে।’

বেচারার আগ্রহে মাটি চাপা পড়ে গেল। তাই নিরাসক্তভাবে বলল,
‘হতে পারে... হয়তো উটের খোঁজেই তারা...’

সুরাকা সঙ্গে সঙ্গেই উঠে পড়লেন না। তাতে সেখানে উপস্থিত লোকদের কারও মধ্যে কৌতূহল জেগে উঠতে পারে। সেজন্যই তিনি আরও কিছু সময় এমন নিরাসক্ত ভাব নিয়ে বসে রইলেন যেন আগন্তুকের ঐ সংবাদকে তিনি মোটেও আমলে নেননি।

মিলনায়তনে উপস্থিত সকলেই যখন নিজেদের পূর্বের স্বাভাবিক আলাপ-আলোচনায় মেতে উঠল তখন অতি স্বাভাবিক ভাব নিয়ে তিনি নিজেকে সেখান থেকে আলাদা করে ফেললেন। ধীরে সুস্থে বের হলেন কিন্তু খুব দ্রুত বাড়ি পৌঁছে গেলেন। দাসীকে গোপনে নির্দেশ দিলেন, ‘কেউ যেন বুঝতে না পারে সেইভাবে গোপনে ঘোড়াটা নিয়ে মাঠের মধ্যে বেঁধে রেখে এসো।’

পাশাপাশি গোলামকে নির্দেশ দিলেন, ‘কিছু খাদ্য ও পানিসহ তার বর্শাটা নিয়ে বাড়ির পেছন দিক দিয়ে মাঠের মধ্যে ঘোড়ার কাছাকাছি রেখে তাড়াতাড়ি চলে এসো, কেউ যেন তোমাকে দেখতে না পায়।’

* * *

সুরাকা লোহার বর্ম গায়ে দিয়ে অস্ত্র সজ্জিত হয়ে ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসলেন। এরপর দ্রুতগতিতে ঘোড়া হাঁকাতে থাকলেন। যেন তার আগে কেউ গিয়ে মুহাম্মাদকে ধরে ফেলতে না পারে। কুরাইশের ঐ বিশাল পুরুস্কারটা যেন শুধু তিনিই পেয়ে যান।

সুরাকা ইবনে মালেক ছিলেন তার কওমের হাতেগোনা কয়েকজন বীর-সাহসীদের মধ্যে অন্যতম সেরা যোদ্ধা। উঁচু-লম্বা, বিশালাকৃতির দেহ ও মাথা বিশিষ্ট। পদচিহ্ন বিশেষজ্ঞ এবং মরুপথের সবধরনের কষ্টের সঙ্গে পরিচিত ও অভিজ্ঞ ঘোড়সওয়ার। সর্বোপরি তিনি একজন জ্ঞানী, বিচক্ষণ ও প্রতিভাধর কবি। একই সঙ্গে তার ঘোড়াটিও ছিল আরবের বিখ্যাত ও শ্রেষ্ঠজাতের দামী ও প্রশিক্ষিত।

* * *

সুরাকা রাস্তা অতিক্রম করতে থাকলেন সর্বোচ্চ গতিতে ঘোড়া চালিয়ে কিন্তু সামান্য কিছুদূর যেতে না যেতেই তার ঘোড়া হঠাৎ আছাড় খেয়ে পড়ে গেল। তিনি ছিটকে পড়লেন অনেকটা দূরে। ধুলার মধ্যে গড়াগড়ি দিয়ে বললেন,

'আরে পোড়া কপাল! একি সর্বনাশা কাণ্ড?'

তিনি বিষয়টাকে রীতিমতো কুলক্ষণের ইঙ্গিত মেনে নিয়ে ভয় পেলেন। আবার ঘোড়ায় চড়ে মনের মধ্যে খটকা নিয়ে আবারও দ্রুতগতিতে ঘোড়া ছোটালেন। কিন্তু আবারও ঘোড়া আছাড় খেল। তার মনের খটকা, অজানা আশঙ্কাটা দৃঢ় হয়ে গেল। তার মন বলতে লাগল, 'কোনো একটা বিপদ আসন্ন।'

তিনি একবার ভাবলেন, বিপদ আশঙ্কা মাথায় নিয়ে আর সামনে না গিয়ে বরং ফিরে চলে যাই। যাই যাই করেও তার আর ফিরে যাওয়া হলো না। একশো দামী উট যেন তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। সুরাকার আর ফেরা হলো না।

* * *

আবারও ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসলেন। বেশি দূর যেতে হলো না। তিনি দেখতে পেলেন মুহাম্মাদ ও তার সঙ্গীদের। তিনি হাত বাড়ালেন তীরের দিকে। কিন্তু একী হলো? তার হাতখানা সেখানেই স্থির ও অচল হয়ে রইল। এরপর বিস্মিত হয়ে দেখলেন ঘোড়ার পা সবগুলোই মাটির

মধ্যে অনেকখানি ডুবে গেছে। আর ভীষণ কালো ধোঁয়ায় তার সামনে সবকিছু অস্পষ্ট হয়ে গেছে। কিছুই আর দেখতে পাচ্ছেন না।

তিনি চাবুক মেরে ঘোড়াকে হাঁক দিলেন। কিন্তু কোনো লাভ হলো না। ঘোড়া একটুও নড়ল না। মনে হলো যেন ঘোড়ার পাগুলো মাটির মধ্যে পেরেক মেরে আটকে রাখা হয়েছে।

তিনি নিশ্চিত হলেন যে বড় বিপদে আটকা পড়েছেন। সুতরাং উচ্চস্বরে আর্তনাদ করে উঠলেন,

'এই যে আপনারা দু'জন শুনুন, দয়া করে আমার জন্য আর এই ঘোড়ার জন্য আপনাদের প্রভুর কাছে দুআ করুন যেন আমার হাত সচল হয় এবং ঘোড়া চলতে সক্ষম হয়। আমি কথা দিচ্ছি আপনাদের আর অনুসরণ করব না।'

লোকটির করুণ আর্তনাদ শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর নিকট দুআ করলেন। আল্লাহ তাআলা তাকে ও তার ঘোড়াটিকে স্বাভাবিক করে দিলেন। ঘোড়া চালিয়ে তিনি উল্টো পথে যেতে শুরু করলেন। কিন্তু একটু পরেই সুরাকা সবকিছু ভুলে গেল। একশো উটের বিরাট পুরস্কারের লোভ আবারও মাথা চাড়া দিয়ে উঠল তার মনে। দিক পরিবর্তন করে আবারও অগ্রসর হতে লাগলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে। এবার পূর্বের চেয়ে আরও বেশি পরিমাণ ঘোড়ার পা মাটিতে দেবে গেল। তার শরীর নিস্তেজ হতে থাকল। তিনি আবারও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর কাছে মিনতি করতে লাগলেন। তিনি কাতর ভাষায় বললেন,

'দেখুন, লোভের বশে আমি আবার ফিরে এসেছিলাম। আমাকে আপনারা ক্ষমা করে দিন। আমার কাছে যা যা আছে, খাদ্য, পানি, অস্ত্র সব আপনারা নিয়ে নিন। এছাড়া আপনারা আমার জন্য দুআ করতে রাজি হলে আমি অঙ্গীকার করছি,

আপনাদের ধরার জন্য আরও যারা পেছনে আছে আমি সকলকেই ফিরিয়ে দেব।'

তাঁরা এর উত্তরে সুরাকাকে বললেন,

'তোমার পাথেয়, সামান ইত্যাদির কোনো প্রয়োজন আমাদের নেই। তুমি শুধু সেই লোকগুলোকে ফিরিয়ে দিও।'

এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবারও সুরাকার জন্য দুআ করলেন। তার দুআর পর পরই ঘোড়ার পা মুক্ত হলো এবং চলতে শুরু করে দিল।

সুরাকা চলতে শুরু করবে এমন সময় হঠাৎ কি মনে হতেই তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহুকে ডেকে বললেন,

'আপনারা দয়া করে একটু দাঁড়ান, আমি একটু কথা বলতে চাই। নিশ্চয়তা দিচ্ছি, আল্লাহর কসম! আমার দ্বারা আপনাদের কোনো ক্ষতি হবে না।'

তারা বললেন, 'কী বলতে চাও, বলো।'

তিনি বললেন,

'হে মুহাম্মাদ! আল্লাহর কসম আমি নিশ্চিত যে শিগগিরই আপনার দীন সর্বত্র ছড়িয়ে পড়বে এবং আরবে আপনার শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে। আপনি ওয়াদা করুন, সে সময় আমি যদি আপনার রাষ্ট্রে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসি তাহলে আমাকে সম্মানের সঙ্গে গ্রহণ করবেন। আমাকে এই মর্মে একটি অঙ্গিকারপত্র লিখে দিন...'

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু একটি হাড্ডিতে লিখে তৎক্ষনাৎ সুরাকাকে দিয়ে দিলেন।

সুরাকা চলে যাওয়ার উদ্যোগ নিলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে সম্বোধন করে বললেন,

وَكَيْفَ بِكَ يَا سُرَاقَةُ إِذَا لَبِسْتَ سِوَارَيْ كِسْرَى ؟

'হে সুরাকা! তোমার কী অবস্থা হবে যখন তুমি পারস্যসম্রাট কিসরার দুইটি দামী বালা দু'হাতে পরবে?'

বিস্ময়ের ধাক্কায় সুরাকা জিজ্ঞাসা করলেন,
'কিসরা ইবনে হুরমুযের বালা?'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,
'হ্যাঁ, কিসরা ইবনে হুরমুযের বালা।'

* * *

সুরাকা যে পথে এসেছিলেন, সে পথ ধরেই ফিরতে শুরু করলেন। পথে দেখলেন বহু মানুষ দলে দলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে খুঁজতে বেরিয়েছে। তিনি তাদের সকলকে বললেন,

'ফিরে যাও তোমরা। আমি পুরা রাস্তা তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখেছি। পদচিহ্ন বিষয়ে আমার পারদর্শিতার কথা তো তোমাদের কারোর অজানা নয়। আমি খুঁজে খুঁজে ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসছি। তোমরা কি ব্যর্থ হওয়ার জন্য আরও সামনে যেতে চাও?' সুরাকার এসব কথা শুনে তারা ফিরে গেল।

এরপর সুরাকা ইবনে মালেক মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে তার সম্পর্কে কারও সঙ্গে কোনো কথাই উচ্চরণ না করে একেবারেই নীরব হয়ে থাকলেন। কয়েকদিন পর যখন তিনি নিশ্চিত হলেন যে তারা দু'জন নিরাপদে কুরাইশদের নাগালের বাইরে চলে গেছেন তখন ঐ ঘটনা সবিস্তারে সকলের কাছে প্রকাশ করতে থাকলেন। আবু জাহল সবকিছু শুনে সুরাকাকে একজন স্বার্থপর, কাপুরুষ বলে আখ্যায়িত করল। এতবড় সুবর্ণ সুযোগ হাতছাড়া করার জন্য তাকে তিরস্কারও করল। সুরাকা আবু জাহলের তিরস্কারের জবাবে বললেন,

أَبَا حَكَمٍ، وَاللهِ لَوْ كُنْتَ شَاهِدًا – لِأَمْرِ جَوَادِيْ إِذْ تَسُوْخُ قَوَائِمُهُ

عَلِمْتَ وَلَمْ تَشْكُكْ بِأَنَّ مُحَمَّدًا – رَسُوْلٌ بِبُرْهَانٍ فَمَنْ ذَا يُقَاوِمُهُ ؟

'হে আবুল হাকাম! যদি আমার উত্তম ও দ্রুতগামী ঘোড়ার পা মাটিতে দেবে যাওয়ার ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখতে, তাহলে তুমি নিঃসন্দেহে সাক্ষ্য দিতে যে মুহাম্মাদ সত্যিই একজন রাসূল যার সঙ্গে রয়েছে সরাসরি আল্লাহর সাহায্য। সুতরাং সাধ্য কার যে তাকে উৎখাত করবে?'

* * *

সময় গড়াতে থাকল। দিন গেল, মাস পেরুল। বছরের পর বছর অতিক্রম করল। এক সময় যেই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিগৃহীত ও নিঃসহায় হয়ে রাতের আঁধারে মক্কা ত্যাগ করেছিলেন, আজ আবার তিনিই মক্কায় ফিরে এসেছেন বিজয়ীর বেশে। আজ উদ্ধত আরবনেতাদের সকল অহমিকা তাঁরই পদতলে অবনত। চোখ ধাঁধাঁনো তরবারি আর ঝলমলে বর্শায় সজ্জিত হাজার হাজার অনুসারী আজ তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তিতে নিবেদিত। পক্ষান্তরে কুরাইশের সেইসব অত্যাচারী দুর্দান্ত দাপুটে নেতা—যারা একদিন অসহায় মুসলিমদের মক্কায় একটুখানি স্বস্তির নিঃশ্বাস নিতে দেয়নি তারাই আজ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে ভীত ও সন্ত্রস্ত হৃদয়ে তাঁর করুণাপ্রার্থী। তারাই আজ প্রাণ ভিক্ষার আবেদন নিয়ে ধর্ণাধারী। বারবার আজ তারা ভীরু কণ্ঠে উচ্চারণ করছে, 'আজ আমাদের সঙ্গে কেমন হবে তাঁর আচরণ?'

নবীসূলভ উদারতায় দয়ার নবীর প্রাণে আজ সেইসব অত্যাচারীর জন্যই উঠেছে দয়া ও ক্ষমার জোয়ার। তাই তো তাদের সকল ভয়-ভীতি দূর করে দিয়ে তিনি ঐতিহাসিক ঘোষণায় বললেন,

'তোমরা নিশ্চিন্তে ফিরে যাও। কোনো ভয় নেই। আমি তোমাদের সকলকেই ক্ষমা করে দিলাম।'

মক্কা বিজয়ের বিপ্লবী ঘটনার পর সুরাকা ইবনে মালেক সিদ্ধান্ত নিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন। তাঁর

সামনে ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দিয়ে, দশ বছর পূর্বে তাকে দেওয়া রাসূলের লিখিত অঙ্গীকারের বাস্তবায়ন ঘটাবেন।

সুরাকা ইবনে মালেক বর্ণনা করেন,

'আমি মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী জিরানা নামক স্থানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখতে পেলাম। আনসারদের একটি ছোট্ট দল দ্বারা তিনি পরিবেষ্টিত। আমি তাঁর দিকে অগ্রসর হতে থাকলাম, তখন আনসারদের অনেকেই আমাকে বর্শার গুঁতা দিয়ে বলতে লাগল,

'এই ব্যাটা! এখানে কেন? সরে যাও, সরো...'

আমি তাদের বাধা অতিক্রম করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে পৌঁছে গেলাম। তিনি তখন তাঁর উটনীর পিঠে বসা ছিলেন। আমি তাঁর দেওয়া সেই লিখিত চুক্তিপত্রটি তাঁর দিকে উঁচু করে ধরে বললাম,

'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি সুরাকা ইবনে মালেক, আর এইটা আমাকে দেওয়া আপনার সেই চুক্তিপত্র।'

আমাকে দেখে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

'হে সুরাকা! আমার আরও কাছে এসো। আজ ওয়াদা পূরণের দিন। আজ তোমার পুরস্কারের দিন।'

আমি তাঁর আরও কাছে এগিয়ে গিয়ে ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দিলাম। তাঁর স্নেহ, ভালোবাসা ও সর্বোত্তম আচরণে আমি আপ্লুত হয়ে গেলাম।'

* * *

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে সুরাকা ইবনে মালেক রাযিয়াল্লাহু আনহুর সাক্ষাতের মাত্র কয়েক মাস পরেই আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রিয় নবীকে আপন সান্নিধ্যে তুলে নেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হারানোর শোকে সুরাকা ইবনে মালেক রাযিয়াল্লাহু আনহু ভীষণভাবে শোকাচ্ছন্ন হয়ে পড়েন। তাঁর

স্মৃতিতে বারবার ভেসে উঠতে থাকে সেই দিনটির স্মৃতি, যেদিন তিনি মাত্র একশো উটের জন্য প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হত্যা করতে গিয়েছিলেন। সময়ের বিবর্তনে আজ তিনি ও তার মানসিকতায় কত পরিবর্তন ঘটে গেছে! আজ সারা দুনিয়ার সকল উটকেও তার কাছে প্রিয় নবীর একটি নখের সমানও মনে হয় না। তিনি বারবার প্রিয় নবীর সেই ভবিষ্যৎ বাণীটি আওড়াতে থাকতেন,

'হে সুরাকা! কেমন হবে তোমার সেই সময়ের অনুভূতি যখন তুমি হাতে পরবে পারস্যসম্রাট কিসরার বালা?'

এ বিষয়ে তার মনে বিন্দুমাত্র সংশয় ছিল না যে তিনি একদিন ঐ বালা দুটো পরবেন।

* * *

সময়ের চাকা ঘুরতে থাকল। এক সময় মুসলিমজাহানের খেলাফত বা রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব ভার এসে গেল দ্বিতীয় খলীফা উমর ফারুক রাযিয়াল্লাহু আনহুর হাতে। দীন ইসলামের বিজয়ের অগ্রযাত্রা চারদিক ছড়িয়ে পড়ল। দ্বিতীয় খলীফার গৌরবময় শাসন আমলে মুসলিমবাহিনী তদানিন্তন সর্ববৃহৎ ক্ষমতাধর পারস্যসাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে ঝড়ের গতিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

অপরাজিত মুসলিমসেনাদল পারস্যের বিশাল বিশাল গর্বিত সেনাদলকে একে একে পরাজিত করল। দুর্গের পর দুর্গ দখল করে সামনে অগ্রসর হতে থাকে। একে একে প্রাদেশিক রাজধানীগুলোর পতন শেষে পুরো পারস্যসাম্রাজ্য তাদের পরিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। বিপুল পরিমাণ গনিমতের মাল তাদের হাতে আসে।

উমর ফারুক রাযিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতের শেষ দিকে একদিন মদীনায় সাদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস রাযিয়াল্লাহু আনহুর দূত পারস্যবিজয়ের সুসংবাদ নিয়ে খলীফার দরবারে হাজির হলেন। এরই সঙ্গে তারা বয়ে আনলেন বাইতুল মালের জন্য মুজাহিদবাহিনীর অর্জিত বিশাল ও বিপুল গনিমতের এক পঞ্চমাংশ। খলীফার সামনে বিপুল

পরিমাণ গনিমতের মূল্যবান সব-সামগ্রী রাখা হলে তিনি হতবাক হয়ে দেখতে থাকেন।

সেইসব সম্পদের মধ্যে ছিল পারস্যসম্রাট কিসরার মণিমুক্তা খচিত মুকুট, স্বর্ণসুতায় কারুকার্য খচিত রাজকীয় পোশাক। হীরা-জহরত খচিত কোমর বন্ধনী। দু'হাতের মহামূল্যবান, অপূর্ব ও অকল্পনীয় সুন্দর দুটো বালা।

খলীফা উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু হাতের লাঠি দিয়ে নেড়ে চেড়ে গনিমতের এইসব মহামূল্যবান সম্পদ দেখতে দেখতে আশপাশের সকলকে লক্ষ্য করে বললেন,

'নিশ্চয় তারা আমানতদার, যারা এই মহামূল্যবান সম্পদে কোনো খিয়ানত না করে বিশ্বস্ততার সঙ্গে বাইতুল মালের জন্য পৌঁছে দিয়েছে।'

উপস্থিত লোকদের ভেতর থেকে আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু খলীফাকে উদ্দেশ্য করে বললেন,

'হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি নিজে আমানতদারী রক্ষা করেন তাই আপনার প্রজারাও আমানতদার। যদি আপনি নিজে আমানতদারী রক্ষা না করে মুসলিমজাতির সম্পদে আত্মসাৎ করতেন তাহলে তারাও অবশ্যই আত্মসাৎ করত।'

খলীফা উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু এই মজলিসে ডেকে পাঠালেন সুরাকা ইবনে মালেককে। তিনি উপস্থিত হলে খলীফা তাকে পারস্যসম্রাট কিসরার রাজকীয় জামা, পায়জামা, চাঁদর ও মোজা পরিয়ে দেন। তার কোমরে কিসরার বেল্ট বেঁধে দিয়ে তার কাঁধে ঝুলিয়ে দেন পারস্য-সম্রাটের চোখ ঝলসানো তরবারি খানাও। তার মাথায় পারস্যসম্রাটের রাজকীয় মুকুট পরিয়ে দেন আর তার দু'হাতে পরান সর্বাধিক মূল্যবান ও কারুকার্য খচিত সেই দুটো বালা—যা পরিধান সম্পর্কিত ভবিষ্যৎ বাণী করেছিলেন প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

উপস্থিত সকলে সুরাকা ইবনে মালেককে পারস্যসম্রাটের সাজে ও রাজকীয় বেশে দেখে শ্লোগানে মুখর হয়ে বলতে লাগলেন,

'আল্লাহু আকবার' 'আল্লাহু আকবার' 'আল্লাহু আকবার'।

খলীফা উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু সুরাকা ইবনে মালেক রাযিয়াল্লাহু আনহুর দিকে চেয়ে বললেন, 'বাহ! বাহ!...

মাদলাজ-গোত্রের সাধারণ এক আরব সন্তান! আজ তারই মাথায় শোভা পাচ্ছে পারস্যসম্রাটের সোনার মুকুট আর তার দু'হাতে শোভা পাচ্ছে সেই সম্রাটেরই অমূল্য দুটো বালা!'

এরপর খলীফা উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু আকাশের দিকে তাকিয়ে আবেগাপ্লুত কণ্ঠে বললেন,

'হে আল্লাহ! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন তোমার কাছে সর্বাধিক প্রিয় ও সম্মানিত। তুমি তাঁকে এইসব পার্থিব সম্পদ থেকে দূরে রেখেছিলে...

আবু বকরও ছিলেন তোমার কাছে আমার চেয়ে অধিক প্রিয়, তাঁকেও তুমি এইসব পার্থিব সম্পদ থেকে দূরে রেখেছিলে...

অথচ আমাকে এই বিপুল সম্পদ দিয়ে ভয়ঙ্কর পরীক্ষায় ফেলে দিয়েছ। তুমিই আমাকে সাহায্য করো আমি যেন এ পরীক্ষায় ব্যর্থ না হই।'

এরপর মজলিস ত্যাগ করার পূর্বেই ঐ বিপুল গনিমত সম্পূর্ণ মুসলিম-জনসাধারণের মাঝে বণ্টন করে দিলেন।

তথ্যসূত্র :

১. *উসদুল গাবাহ*, ২য় খণ্ড, ৩৩১ পৃষ্ঠা।
২. *আল-ইসাবা*, ২য় খণ্ড, ১৯ পৃষ্ঠা।
৩. *সিমারুল কুলূব ফিল মুযাফ ওয়াল মানসূব* লিস সাআলিবী, ৯৩ পৃষ্ঠা।
৪. *আত-তাবাকাতুল কুবরা* লিবনি সাআদ, ১ম খণ্ড, ১৮৮-২৩২ পৃষ্ঠা, ৪র্থ খণ্ড : ৩৬৬, ৫ম খণ্ড ৯০ পৃষ্ঠা।
৫. *আস-সীরাতুন্নবিয়্যাহ* লিবনি হিশাম, ২য় খণ্ড, ১৩৩-১৩৫ পৃষ্ঠা।
৬. *হায়াতুস সাহাবা*, ৪র্থ খণ্ডের সূচি দ্রষ্টব্য।
৭. *তাজুল আরুস মিন জাওয়াহিরিল কামূস*, ৬ষ্ঠ খণ্ড ৮৩ পৃষ্ঠা।
৮. *আল-ইসতীআব*, ২য় খণ্ড, ১১৯ পৃষ্ঠা।

ফাইরূয আদ-দাইলামী

ফাইরূয হলো বরকতময় পরিবারের একজন বরকতময় মানুষ।

–মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

বিদায় হজ থেকে ফেরার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তাঁর অসুস্থ হয়ে পড়ার এই সংবাদ বাতাসের গতিতে ছড়িয়ে গেল গোটা আরব উপদ্বীপের সর্বত্র। আর তাতেই দীন ইসলাম ত্যাগ করে মুরতাদ হয়ে গেল ইয়েমেনের আসওয়াদ আল-আন্‌সী, ইয়ামামার মুসাইলামাতুল কায্‌যাব আর বনূ আসাদ অঞ্চলের তুলাইহাতুল আসাদী। এই তিন ভণ্ড-মিথ্যুক দাবি করে বসল যে তারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ কওমের কাছে প্রেরিত আল্লাহর রাসূল। ঠিক যেমন মুহাম্মাদ কুরাইশের কাছে প্রেরিত রাসূল।

* * *

আসওয়াদ আল-আনসী ছিল একজন গণক, একজন সম্মোহনকারী ও যাদুকর। কুৎসিত, কুটিল ও কুচক্রী স্বভাবের এবং বহু মন্দ চরিত্রের মানুষ। বিশালদেহী আর প্রচণ্ড শক্তিশালী।

কিন্তু এতসব মন্দ সত্ত্বেও সে ছিল মিষ্টিভাষার একজন সুবক্তা। তার তুখোর জাদুময় বক্তৃতা শুনলে মানুষ স্বাভাবিক বিচার-বুদ্ধি হারিয়ে ফেলত। সে যা বলত, যা বুঝাতে চাইত মানুষ তাই বুঝত ও মেনে নিত। সাধারণ মানুষকে সে এভাবে তার কথার যাদু দিয়েই ভক্ত বানাত।

আর বিশিষ্ট জ্ঞানী ও বিচক্ষণদের কাবু করত অবস্থা বুঝে কাউকে প্রয়োজনীয় অর্থ দিয়ে আবার কাউকে পদ ও মর্যাদা দিয়ে।

সে সর্বদা বাহিরে বের হতো মুখোশ পরে নিজের কুৎসিত চেহারা ঢেকে। মুখ ঢাকার আরও একটি উদ্দেশ্য হলো মানুষের কাছে নিজেকে একজন রহস্যময় ও ঐন্দ্রজালিক ব্যক্তি হিসাবে প্রকাশ করা।

* * *

সে সময় ইয়েমেন দেশে সর্বাধিক প্রভাবশালী ছিল 'আবনা' গোত্র। যাদের শীর্ষে ছিলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিখ্যাত সাহাবী ফাইরূয আদ-দাইলামী রাযিয়াল্লাহু আনহু।

'আবনা' হলো সেই সকল ইয়েমেনী যাদের পূর্বপুরুষ পারস্য ত্যাগ করে ইয়েমেনে এসেছিলেন আর ইয়েমেনী আরব নারীদের বিয়ে করেছিলেন। পারস্য-পিতা ও ইয়েমেনী আরব মায়ের এই সন্তানদেরকেই বলা হয় 'আবনা'। এই আবনা গোত্রের প্রথম প্রাচীন ব্যক্তি ছিলেন 'বাযান'। তিনি ছিলেন পারস্যের অনুগত ও কদর রাজ্য ইয়েমেনের কিসরা কর্তৃক নিয়োজিত গভর্নর।

পারস্যসম্রাট কিসরার অনুগত হিসাবে ইয়েমেনের শাসক থাকাকালে তার কাছে পৌঁছয় ইসলামের দাওয়াত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সত্যতা ও উন্নত আদর্শ ও শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি পারস্যসম্রাটের বশ্যতা ত্যাগ করেন। এরপর তিনি নিজ আবনা গোষ্ঠীর সকলকে নিয়ে দীন ইসলামে প্রবেশ করেন। ইসলাম গ্রহণ করার পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকেই ইয়েমেনের শাসক হিসাবে বহাল রাখেন। ভণ্ড আসওয়াদ আল-আনসী নবুওয়াতের দাবি করার অল্প কয়েকদিন পূর্বে নিজ দায়িত্বে অব্যাহত থেকেই 'বাযান' ইন্তেকাল করেন। (বিস্তারিত জানতে পড়ুন 'সুহাইব আর-রূমী'র জীবনী, পৃষ্ঠা ৩০৫)

আসওয়াদ আল-আনসীর মিথ্যা দাবিকে সর্বপ্রথম সমর্থন দিয়ে তাকে শক্তিশালী করে তার নিজ কওম 'মাযহিজ'—যা ছিল জনসংখ্যা, শক্তি ও প্রভাবে ইয়েমেনের সর্ববৃহৎ গোত্র। নিজ গোত্রের বিশাল যোদ্ধাবাহিনী ও

শক্তিকে কাজে লাগিয়ে আসওয়াদ আল-আনসী ঝাঁপিয়ে পড়ে ইয়েমেনের রাজধানী সানআর ওপর। ইয়েমেনের নতুন গভর্নর মরহুম বাযানের পুত্র 'শাহার'কে হত্যা করে এবং তার স্ত্রী 'আযাদ'কে জোরপূর্বক বিয়ে করে। রাজধানী দখলের পর পরই সে দ্রুতগতিতে অন্যান্য অঞ্চলেও আক্রমণ করে বসে। অবস্থা এই দাঁড়ায় যে ইয়েমেনের হাযরামাউত থেকে তায়েফ, বাহরাইন, আল-আহসা থেকে এডেন বন্দর পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চল ভণ্ড আসওয়াদ আল-আনসীর করায়ত্তে চলে আসে।

* * *

আসওয়াদ আল-আনসী মানুষকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করে বিভিন্ন-ভাবে তাদের প্রতারণার শিকার বানাত। একাজে তাকে সহায়তা করত সীমাহীন বুদ্ধিদীপ্ত কুটকৌশল। সে নিজ অনুসারীদের কাছে দাবি করত,

'তার অনুগত একজন ফেরেশতা তার কাছে ওহী নাজিল করে এবং সেই ফেরেশতার মাধ্যমে অদৃশ্যের খবরসহ মানুষের অন্তরে লুকানো গোপন আশা-আকাঙ্ক্ষা, হতাশা-ব্যর্থতা এবং গোপন ও প্রকাশ্য সকল খবরই আমি জানি।'

ঐ ভণ্ড নিজের এই মিথ্যা দাবির সত্যতা প্রমাণের জন্য বিভিন্ন অঞ্চলে বিছিয়ে দিয়েছিল গুপ্তচরের জাল। এদের মাধ্যমে সে মানুষের সবরকম খবরা খবর আগেই জেনে নিত। ব্যক্তির গোপন খবর, রহস্য, অপূর্ণ আশা, হতাশা ও ভবিষ্যতের কাম্য বিষয়সহ সকল তথ্য গুপ্তচরবাহিনী তাকে সরবরাহ করত। পরে গুপ্তচরেরাই আবার সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তিদের সহজ সমাধান, আশা পূরণ ইত্যাদির জন্য আসওয়াদ আল-আনসীর কাছে যেতে উদ্বুদ্ধ করত।

যে কোনো অভাব, সমস্যা ও সংকট নিয়ে হাজির হলে ভণ্ড আসওয়াদ লোকটিকে ডেকে নিয়ে তার নাম, ঠিকানা, আসার উদ্দেশ্য ইত্যাদি থেকে শুরু করে সবকিছু বলে দিত তার মুখ খোলার আগেই। এতে করে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি একবারেই মুগ্ধ হয়ে তার ভক্ত হয়ে যেত এবং এরপর স্বতস্ফূর্তভাবেই অন্য সকলের কাছে এই ভণ্ডের গুণগান করতে থাকত।

এছাড়া সে নিজের অনুসারীদের আজগুবি ও নানা রকম যাদু দেখিয়ে চমকে দিত, বিস্মিত ও হতবাক করে দিত। তারপর মুগ্ধ জনগোষ্ঠীর কাছে নিজের প্রচার করে খুব অল্পতেই তাদের নিজের একনিষ্ঠ ভক্ত ও কর্মী বানিয়ে নিত। এভাবেই খুব দ্রুত গতিতে আসওয়াদ আল-আনসীর নবুওয়াতের দাবি প্রতিষ্ঠিত হলো। অতি অল্প সময়ে তার অনুসারীর সংখ্যা অকল্পনীয় বৃদ্ধিতে তার শক্তি, প্রভাব ও দাপট শুধু বাড়তেই থাকল।

* * *

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসওয়াদ আল-আনসীর মুরতাদ হওয়া এবং নিজ বাহিনী নিয়ে ইয়েমেন কব্জার সংবাদ যথা সময়ে পৌঁছে যায়। সকল সংবাদ অবগত হওয়ার পর তিনি প্রায় দশজন সাহাবীর মাধ্যমে পূর্বে ইসলাম গ্রহণকারী আবনা গোষ্ঠীর কাছে বার্তা পাঠান। সে বার্তায় তিনি তাদের এই সর্বগ্রাসী ফেতনায় নিজেদের ঈমান-বিশ্বাসের ওপর দৃঢ়তার সঙ্গে অটল থাকার আহ্বান জানান। একই সঙ্গে তিনি ভণ্ড নবুওয়াতের দাবিদার আসওয়াদ আল-আনসীকে যে কোনো ত্যাগের বিনিময়ে উৎখাত করার নির্দেশ প্রদান করেন।

যার কাছেই প্রিয় নবীর বার্তা পৌঁছল সেই সাড়া দিল এবং তার নির্দেশ বাস্তবায়নের জন্য সর্বান্তকরণে প্রস্তুত হয়ে গেল।

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আহ্বানে সবার আগে সাড়াদানকারী ছিলেন আমাদের বর্তমান কাহিনীর কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্ব ফাইরূয আদ-দাইলামী রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং তাঁর সমগোত্রীয় আবনার লোকজন।

প্রিয় পঠক! চলুন শোনা যাক সেই চমৎকার, বিস্ময়কর কাহিনীটি খোদ ফাইরূয আদ-দাইলামীর বর্ণনায়... তিনি বলেন,

'আমি এবং আমার 'আবনা' সঙ্গীদের কারও অন্তরে এক মুহূর্তের জন্যও আল্লাহর দীন ইসলামের ব্যাপারে সন্দেহ জাগেনি এবং আল্লাহর দুশমনকে আমরা কেউই এক মুহূর্তের জন্যও বিশ্বাস করিনি।

আমরা সকল ঈমানদার একটি সুন্দর সুযোগের প্রত্যাশায় সময় গুনছিলাম যে কখন ঐ ভণ্ডের ওপর নির্ভুল আক্রমণ করে তার হাত থেকে পূর্ণরূপে নাজাত পাব।

আমরা প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চিঠি ও বার্তা পাওয়ার পর পারস্পারিক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী হয়ে উঠলাম। আমরা সবাই নিশ্চিত হলাম যে এটাই আমাদের সেই প্রতিক্ষিত সুযোগ। সুতরাং লক্ষ্য পূরণে আমরা সকল তৎপরতা শুরু করে দিলাম।

* * *

অপরদিকে অতি অল্পসময়ে ব্যাপক সফলতা পেলে যা হয়, আসওয়াদ আল-আনসীর ক্ষেত্রেও সেটাই হলো। সে অহঙ্কারী আর দাম্ভিক হয়ে উঠল। নিজের সেনাপ্রধানের সঙ্গেই দুর্ব্যবহার শুরু করে দিল। সেনাপতি 'কায়েস ইবনে আবদে ইয়াগুস' তার দ্বারা লাঞ্ছিত হয়ে নিজের জীবনকে সঙ্কটাপন্ন ভাবতে শুরু করলেন।

এটাকে সূবর্ণ সুযোগ মনে করে আমি এবং আমার চাচাত ভাই 'দাযাওয়াই' সেনাপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম এবং তার কাছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বার্তা পৌঁছে দিয়ে বললাম, 'সে আপনার জীবন নাশ করার আগে আপনিই তাকে শেষ করে দিন।'

সেনাপ্রধান নিজের সঙ্কটনাপন্ন অবস্থায় আমাদের আগমনকে আসমানী আশীর্বাদ ভেবে নিলেন। তিনি আমাদের সঙ্গে একমত হয়ে তার নিরাপত্তা বিষয়ক গোপন তথ্যগুলো আমাদের জানিয়ে দিলেন।

আমরা তিনজন প্রতিজ্ঞা করলাম, আমরা ঐ ভণ্ড প্রতারককে ভেতর থেকে আর একই সময় অন্যরা বাহির থেকে আক্রমণ করব।

আমরা তিনজন একমত হয়ে সিদ্ধান্ত নিলাম, আমাদের চাচাত বোন আযাদকেও আমাদের সহযোগী বানাব। যাকে ভণ্ড আসওয়াদ জোরপূর্বক বিয়ে করেছে গভর্নর স্বামী শাহার ইবনে বাযানকে হত্যার পর।

আমি আসওয়াদ আল-আনসীর প্রাসাদে চলে গেলাম। আমার চাচাত বোন 'আযাদ' এর সঙ্গে দেখা করে তাকে বললাম,

'হে বোন! তুমি তো জানো এই লোকটি তোমার ও আমাদের জীবনে কী সর্বনাশ ঘটিয়েছে! সে তোমার স্বামীকে খুন করেছে। তোমার স্বজাতীয় নারীদের লাঞ্ছিত করেছে। তোমার গোত্রের বহু পুরুষকে হত্যা করে তাদের হাত থেকে রাষ্ট্রক্ষমতা ছিনিয়ে নিয়েছে।

এই দ্যাখো, বিশেষভাবে আমাদের উদ্দেশ্যে আর সাধারণভাবে সর্বস্তরের ইয়েমেনবাসীর জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পত্র। তিনি আমাদের কাছে এই ভয়াবহ ফেৎনার মূলোৎপাটন করার আহ্বান জানিয়েছেন।

তুমি কি আমাদের এ ব্যাপারে সহযোগিতা করবে?'

'কোন্ ব্যাপারে তোমাদের সাহায্য করব?'

'তাকে দেশ থেকে বহিষ্কার করার ব্যাপারে...'

'সেটা নয়, বরং তাকে হত্যার ব্যাপারে সাহায্য করব...।'

আমি বললাম, 'আল্লাহর কসম! আমারও ইচ্ছা সেটাই। কিন্তু আমার দ্বিধা হচ্ছিল এটা বলতে। কারণ, এতে তার সঙ্গে তোমার কোনো সমস্যা হয়ে যেতে পারে।'

আমার এ কথা শুনে সে বলল,

'আল্লাহর কসম! যিনি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বাশীর (সু-সংবাদ দাতা) ও নাযীর (সতর্ককারী) হিসাবে পাঠিয়েছেন। এক পলকের জন্যও আমি আমার দীনের ব্যাপারে সন্দিহান হইনি। আর এই শয়তান লোকটার চেয়ে বেশি ঘৃণা এই জীবনে আর কাউকে করিনি।

আর যখন থেকে তাকে আমি জানতে শুরু করেছি তখন থেকেই বুঝেছি সে একজন চরম পাপীষ্ঠ শয়তান ছাড়া আর কিছুই নয়। সে কোনো সত্য-ন্যায় ও হকের ধার ধারে না, আর কোনো অন্যায় ও পাপেরই পরোয়া করে না।'

আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'তাকে আমরা কিভাবে হত্যা করব?'

আমার বোন বলল,

'সে নিজের নিরাপত্তার ব্যাপারে খুবই সজাগ ও সতর্ক। দূরের ঐ পরিত্যাক্ত ঘরটি ছাড়া এই প্রাসাদের প্রতিটি স্থানে প্রহরীদের নিশ্ছিদ্র পাহারা বসানো আছে। পরিত্যক্ত ঘরটির ঐ দিকটায় কোনো পাহারার ব্যবস্থা না রাখার কারণ সম্ভবত এটাই যে ওর পেছন দিকটায় রয়েছে ঘন জঙ্গল। আর এই সুযোগটাই তোমাদের কাজে লাগাতে হবে। ঐ দিক দিয়ে রাতের বেলা ঘরটির কাছে এসে ঘরের দেয়াল ছিদ্র করে তোমরা ভেতরে ঢুকে পড়বে। সেখানে তোমাদের জন্য অস্ত্র ও আলোর ব্যবস্থা রাখা থাকবে। আর আমি থাকব তোমাদের অপেক্ষায়। তারপর তার শোয়ার ঘরে ঢুকে তাকে হত্যা করবে।'

আমি তাকে বললাম, 'কিন্তু যেই প্রাসাদের সবখানে পাহারাদার গিজগিজ করছে, তার একটি ঘরের দেয়াল ছিদ্র করা মুখে বলার মতো সহজ নয়। কারণ, একটা দেয়াল ছিদ্র করতে গেলে যে কেউ আওয়াজ শুনে হৈচৈ করে হুলস্থূল বাধিয়ে ফেলবে—যেটা হবে আমাদের জন্য আত্মহত্যার মতো একটা ভয়ঙ্কর বোকামি।'

সে বলল, 'তুমি ভুল বলোনি। তাহলে এই পরিকল্পনা বাদ। আমার কাছে আরও একটি বিকল্প প্রস্তাব আছে।'

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'কী সেই প্রস্তাব?'

সে বলল, 'আগামীকাল তোমার বিশ্বস্ত ও আস্থাভাজন কোনো লোককে শ্রমিক বেশে আমার কাছে পাঠিয়ে দেবে। আমি তাকে দিয়ে ঘরের দেয়াল ভেতর থেকে ছিদ্র করিয়ে রাখব। সামান্য একটু বাকি থাকবে, রাতের বেলা তোমাদের সামান্য চেষ্টাতেই সেটা সহজে প্রবেশ উপযোগী হয়ে যাবে।'

আমি খুশি হয়ে বললাম, 'তোমার এই পরিকল্পনাটা একদম যথার্থ।'

আমি সেখান থেকে বিদায় নিয়ে ফিরে এলাম। অপর দুই সঙ্গীকে পরিকল্পনা জানালাম। শুনে তারাও খুশি হলো। সেই মুহূর্তেই আমরা চূড়ান্ত প্রস্তুতি শুরু করে দিলাম।

আমাদের সহযোগী বিশিষ্ট মুমিনদের আক্রমণ সূচনার গোপন সংকেত জানিয়ে দিলাম। পরের দিন ফজরের সময়ই হবে আমাদের আক্রমণের সময় এটাও সকলকে জানিয়ে দিলাম।

রাতের অন্ধকার যখন ঘনিয়ে এল এবং নির্ধারিত সময় এসে গেল তখন আমি আমার দুই সঙ্গীকে নিয়ে সেই পরিত্যক্ত ঘরের ছিদ্রের কাছে পৌঁছে গেলাম। সামান্য চেষ্টাতেই ছিদ্র সম্পূর্ণ হয়ে গেল। আমরা ঘরের ভেতর ঢুকে পড়লাম। আলো জ্বালিয়ে অস্ত্র সজ্জিত হয়ে সতর্কতার সঙ্গে আমরা শয়তান আসওয়াদ আল-আনসীর শোবার ঘরের দিকে এগিয়ে গেলাম। সেই ঘরের দুয়ারে আমার চাচাত বোনকে দাঁড়িয়ে দেখে আমাদের সাহস বেড়ে গেল। সে আমাদের ঘরের ভেতরে ঢুকে পড়ার ইঙ্গিত দিল। আমরা ঢুকেই দেখি ভণ্ডটা গভীর ঘুমে জোরে জোরে নাক ডাকাচ্ছে। দেরি না করে সোজা তার গলায় ধারালো খঞ্জর চালিয়ে শরীর থেকে মাথা কেটে আলাদা করে ফেললাম।

ষাঁড়ের মতো গোঁ গোঁ শব্দ আর একই সঙ্গে হাত পা আছড়ানোর কারণে জবাই করা উটের মতো দাপাদাপির আওয়াজ হতে থাকল। সেই আওয়াজে চারদিক থেকে প্রহরীরা ছুটে আসতে লাগল।

ঘরের দরজায় আমার চাচাত বোনকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সবাই জিজ্ঞাসা করল, ‘কী ব্যাপার এরকম আওয়াজ কিসের?’

আমার বুদ্ধিমতি বোন তাদের এই বলে নিবৃত্ত করল যে,

‘কিছুই না, আল্লাহর নবীর ওপর ওহী নাজিল হচ্ছে। চিন্তার কিছু নেই। তোমরা ফিরে যাও।’

এই কথা শুনে তারা নিশ্চিন্ত মনে ফিরে গেল।

* * *

সুবহে সাদিক পর্যন্ত আমরা প্রাসাদের ভেতরে চুপচাপ বসে রইলাম। ফজরের সময় হলে আমি প্রাসাদের ওপর উঠে উচ্চস্বরে আযান দেওয়া শুরু করলাম।

'আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার
আশহাদু আল্লা... ইলাহা ইল্লাল্লাহ
আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ'

এরপর বললাম,
'আশহাদু আন্নাল আসওয়াদ আল-আনসী কায্‌যাব...
আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আসওয়াদ আল-আনসী একজন ভণ্ড-প্রতারক।'

এটাই ছিল আমাদের গোপন সঙ্কেত।

সুতরাং সংকেত পেয়ে মুসলিমবাহিনী চারদিক থেকে প্রাসাদের ওপর আক্রমণ শুরু করল। অপর দিকে প্রাসাদের প্রাচীরে আযানের আওয়াজ শুনতেই ভেতরের প্রহরীরা আতঙ্কিত হয়ে ছোটাছুটি শুরু করে দেয়। প্রহরী আর মুসলিমবাহিনী মুখোমুখি হয়ে পড়ে। লড়াই শুরু হয়।

আমি তখন প্রাচীরের ওপর থেকে আসওয়াদ আল-আনসীর মাথাটা ছুঁড়ে মারলাম। গুরুর কাটা মাথা দেখার সঙ্গে সঙ্গে প্রহরীরা শক্তি, সাহস ও মনোবল হারিয়ে ফেলল। আর মুমিনদের আনন্দ ও সাহস বেড়ে গেল। উচ্চ তাকবীর ধ্বনী দিয়ে তারা শত্রুদের ওপর আক্রমণ শুরু করল। সূর্যোদয়ের পূর্বেই যুদ্ধের মীমাংসা হয়ে গেল মুসলিমবাহিনীর বিশাল বিজয়ের মাধ্যমে।

* * *

সূর্যোদয়ের পরপরই আমরা আল্লাহর দুশমনকে খতম করার সুসংবাদ জানিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে দূত মারফত চিঠি পাঠিয়ে দিলাম। সুসংবাদ বহনকারী দল যেদিন মদীনায় পৌঁছল তারা জানতে পারল যে আগের রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তেকাল করে মহান প্রভুর সান্নিধ্যে পৌঁছে গেছেন।

তবে একটু পরেই এই দল জানতে পারল যে আসওয়াদ আল-আনসী যে রাতে নিহত হয়েছে, সেই রাতেই ওহীর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই সংবাদ জেনেছিলেন।

সংবাদটি জানার পরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপস্থিত সাহাবায়ে কেরামকে বলেছিলেন,

'গতরাতে আসওয়াদ আল-আনসী নিহত হয়েছে...
বরকতময় পরিবারের একজন বরকতময় ব্যক্তি তাকে হত্যা করেছে।'

সাহাবীরা জিজ্ঞাসা করলেন,
'কে সেই ভাগ্যবান ব্যক্তি ইয়া রাসূলাল্লাহ?'

তিনি বললেন,
'সে হলো ফাইরূয...।'

ধন্য হোক ফাইরূয...
ধন্য হোক সেই ফাইরূয...।

তথ্যসূত্র :

১. *আল-ইসাবা*, ৩য় খণ্ড, ২১০ পৃষ্ঠা।
২. *আল-ইসতীআব*, ৩য় খণ্ড, ২০৪ পৃষ্ঠা।
৩. *উসদুল গাবাহ*, ৪র্থ খণ্ড, ৩৮১ পৃষ্ঠা।
৪. *তাহযীবুত তাহযীব*, ৮ম খণ্ড, ৩০৫ পৃষ্ঠা।
৫. *আত-তাবাকাতুল কুবরা* লিবনি সাআদ, ৫ম খণ্ড ৫৩৩ পৃষ্ঠা।
৬. *তারীখুত-তাবারী*, ৩য় খণ্ড, ও ১০ম খণ্ডের সূচিপত্র দ্রষ্টব্য।
৭. *আল-কামিল* লিবনি আসীর, ১১ শ বর্ষের ঘটনাবলী দ্রষ্টব্য।
৮. *ফুতূহুল বুলদান* লিল বালাযুরী, ১১১-১১৩ পৃষ্ঠা।
৯. *জামহারাতুল আনসাব*, ৩৮১ পৃষ্ঠা।
১০. *তারীখুল খামীস*, ২য় খণ্ড, ১৫৫ পৃষ্ঠা।
১১. *দাইরাতুল মাআরিফিল ইসলামিয়্যাহ*, ২য় খণ্ড, ১৯৮।
১২. *তারীখু খলীফা ইবনে খায়্যাত*, ৮৪ পৃষ্ঠা।
১৩. *হায়াতুস সাহাবা*, ২য় খণ্ড, ২৩৮-২৪০ পৃষ্ঠা।
১৪. *আল-আলাম* লিয-যিরকলী, ৫ম খণ্ড, ২৯৯ ও ৩৭১ পৃষ্ঠা।

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত

লেখক ড. পাশা ও তাঁর রচনা সম্পর্কে কয়েকজন বিখ্যাত মনীষীর মন্তব্য :

ড. আবদুর রহমান রাফাত পাশা সাহাবী ও তাবেঈদের জীবনকথা রচনার ক্ষেত্রে তিনি গ্রহণ করেছেন এক অনন্য ধারা। জন্ম, মৃত্যু আর অবদান আলোচনার সেই সেকেলে পদ্ধতি বর্জন করেছেন। মুসলিম উম্মাহর মহান পূর্বসূরী সাহাবী ও তাবেঈদের আলোকিত জীবনধারাকে প্রথমে তিনি আত্মস্থ করেছেন নিজের মধ্যে। এরপর সেই সব জীবনের খণ্ড খণ্ড চিত্রকে আবেগ, ভালোবাসা, ভক্তি আর সাহিত্যের রস দিয়ে এমন জীবন্ত ভঙ্গিতে উপস্থাপন করেছেন যাতে মনে হয় তিনি চলমান কোনো ঘটনার ধারাভাষ্য বর্ণনা করছেন।

তাঁর রচিত সাহাবী ও তাবেঈদের ঈমানদীপ্ত জীবন পড়লে মহৎ মানুষ হওয়ার নেশা চেপে ধরে।

–ড. আয়েয আর-রদাদী

আমি যতবারই তাঁর কিতাব দু'টি পড়ি, ততবারই নতুন স্বাদ আস্বাদন করি, নতুন মজা পাই। তাঁর কালোত্তীর্ণ, আলোকিত, ঈমান জাগানিয়া সাহিত্যের সৌন্দর্য একদিকে আমাকে মোহাবিষ্ট করে তোলে, অন্যদিকে আমি যেন যাদুগ্রস্ত হয়ে পড়ি সাহাবায়ে কেরাম আর তাবেঈনে এযামের প্রতি তাঁর নিখাদ ভক্তি ও ভালোবাসা দেখে। যা স্পষ্ট চোখে পড়ে তাঁর এই রচনার প্রতিটি হরফে, শব্দে আর বাক্যে..

–নূর আলম খলীল আল-আমীনী

বহুগুণ ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ড. পাশা খ্যাতির শিখরে উন্নীত হতে পেরেছিলেন একজন সুসাহিত্যিক, লেখক, গল্পকার, গবেষক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বজনমান্য শিক্ষক হিসাবে। তিনি নিজের বহুমুখী প্রতিভার প্রভাব ছড়িয়ে দিয়ে গেছেন অগণিত ছাত্র ও ভক্তের মাঝে...। বিদ্যালয়ের হলঘরগুলো তাঁকে চিনত এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী মানুষ গড়ার কারিগর রূপে। যখন তিনি কথা বলতেন, সকলের গলা উঁচু হয়ে যেত তাঁকে দেখার জন্য, সকলেই তাকিয়ে থাকত তাঁর দিকে অপলক দৃষ্টিতে। সাহিত্য-অলঙ্কারে, শব্দের যাদুময় প্রভাব সৃষ্টিতে, বাগ্মীতা ও বাকপটুতায় তিনি ছিলেন এক মুকুটহীন সম্রাট। রচনা ও বক্তব্য-উপস্থাপনায় বিশেষত জটিল ও দুর্বোধ্য বিষয়ের সহজ ও প্রাঞ্জল উপস্থাপনায় তাঁর জুড়ি মেলা ছিল ভার।

তাঁর জীবনব্যাপী ঐকান্তিক উদ্যোগ ছিল তরুণ ও যুব-সমাজকে ইসলামী ভাবধারায় ও ইসলামী আদব-কায়দায় গড়ে তোলার। সেই উদ্যোগের গলায় মালা পরিয়েছেন *সাহাবায়ে কেরামের ঈমানদীপ্ত জীবন* ও *তাবেঈদের ঈমানদীপ্ত জীবন* নামের সুবিখ্যাত দু'টি গ্রন্থের মাধ্যমে। –ড. আবদুল্লাহ হামেদ